গান্ধী-রচনাসম্ভার

দ্বিতীয় খণ্ড

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ
সত্যাগ্রহ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সম্পাদনা
শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গান্ধী বিচার পর্ষদ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

সম্পাদকের নিবেদন

বহু মনীষীর মতে সত্যাগ্রহ বিশ্বমানবের প্রগতির পথে মহাত্মা গান্ধীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। একজন নিরস্ত্র মানুষ একক ভাবেও কি করে নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রেখে এই পৃথিবীতে চলতে পারে এবং কিভাবে অপরের কোন ক্ষতিসাধন না করে স্বাধিকার অর্জন ও রক্ষা করতে পারে তার উপায় হল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়া। তাই গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি সঙ্গত কারণেই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে গান্ধীজীর রচনাবলী একটি পৃথক খণ্ডে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং গান্ধী-রচনা-সম্ভারের এই দ্বিতীয় খণ্ড সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত তাঁর রচনার মোটামুটি প্রাতিনিধিত্ব মূলক সঙ্কলন।

এতে গান্ধীজীর প্রথম ব্যাপক সত্যাগ্রহ—দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আছে। এ বিবরণ গান্ধীজীর নিজের লেখা। এর প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় গান্ধীজীর মূল গুজরাতী রচনা থেকে এবং তার প্রথম প্রকাশকাল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। মূল গুজরাতী গান্ধীজী কেবল স্মৃতি থেকে লেখেন। তাই গান্ধীজীর তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত বালজী গোবিন্দজী দেশাই তার যে ইংরাজী অনুবাদ করেন তাতে স্মৃতি থেকে লেখার কারণ তথ্য ও সন তারিখ ইত্যাদির যেসব অপূর্ণতা ছিল তা দূর করা হয় এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখে গান্ধীজী ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকায় স্বীকার করেন যে তিনি স্বয়ং সেই অনুবাদ দেখেশুনে সংশোধন করে দিয়েছেন। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইংরাজী অনুবাদকে তাই গান্ধীজীর মূল গুজরাতী রচনা থেকে কোন অংশে কম প্রামাণ্য বলা চলে না। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক তাই সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় কৃত গুজরাতীর বঙ্গানুবাদকে মূল ভিত্তি হিসাবে রাখলেও ইংরাজী অনুবাদের তৃতীয় মুদ্রণের (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের) সঙ্গে মিলিয়ে যথাযোগ্য সংশোধন করেছেন। এছাড়া প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার ভাষাকেও মূল অনুবাদকের শৈলী অবিকৃত রেখে যথাসম্ভব আধুনিক করার জন্য পরিমার্জনা করা হয়েছে। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের অনুবাদে দ্বিতীয় খণ্ডের গোড়াতে অর্থাৎ চব্বিশতম অধ্যায়ের পর একটি প্রস্তাবনা ছিল। ইংরাজী অনুবাদ একটি খণ্ড হিসাবেই প্রকাশিত হয় এবং এই প্রস্তাবনাটি তাতে অনুপস্থিত। কিন্তু ঐ পৃষ্ঠা

কয়টির বক্তব্যের গুরুত্ব আছে বিবেচনা করে ঐ অংশকে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসের পরিশিষ্টরূপে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ পরলোকগত ভারতন কুমারাপ্পা কর্তৃক সম্পাদিত গান্ধীজীর "সত্যাগ্রহ" নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে বর্তমান সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত "সত্যাগ্রহ" নামক বাংলা পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ছাড়া গান্ধীজীর অন্যান্য সত্যাগ্রহের তৎকর্তৃক লিখিত ও কথিত বিবরণ থেকে এটি সঙ্কলিত। এ ছাড়া সত্যাগ্রহের তত্ত্বদর্শন ও মূলনীতি সংক্রান্ত অনেক রচনাও এই অংশে আছে। তবে চম্পারণ ও খেড়া সত্যাগ্রহ ইত্যাদির বিবরণ গান্ধীজীর আত্মকথায় (রচনাসম্ভারের প্রথম খণ্ডে) আছে। সত্যাগ্রহের তত্ত্বদর্শন ও মূলনীতি সংক্রান্ত অনেক রচনা হিন্দ স্বরাজ্য ও জীবনব্রত ইত্যাদি পুস্তকে (রচনাসম্ভারের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে) আছে বলে পুনরুক্তি পরিহারের জন্য সত্যাগ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়া সত্ত্বেও রচনাসম্ভারের এই খণ্ডে সেই সব রচনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আশা করি রচনাসম্ভারের পাঠকদের এই ব্যবস্থা মনঃপূত হবে।

প্রখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান মিত্র ও ঘোষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেসের কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাবশতঃ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে আপন কাজ জ্ঞানে রচনাসম্ভারের এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গান্ধীসাহিত্য-প্রেমী বাঙলী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। পশ্চিমবঙ্গের গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতির কর্তৃপক্ষ আমার উপর এই খণ্ডের সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন বলে এই অবকাশে তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

চারু-নীড়, কামডহরি,
গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

সত্যাগ্রহের গঠনমূলক ভূমিকা সম্পর্কিত এই ছক গান্ধীজীর নির্দেশে অঙ্কিত হয়। সত্য ও অহিংসাকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া জাতীয় উন্নতির জন্য "জীবন চক্রে"র পরিকল্পনা।

দক্ষিণ
আফ্রিকায়
সত্যাগ্রহীর
বেশে
গান্ধীজী

উপরে ঃ ১৮৯৪ সালে নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভায় গান্ধীজী
নীচে ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে গোখেলের সংবর্ধনা সভায় গান্ধীজী

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

প্রস্তাবনা

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ আট বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। এই যুদ্ধকালেই সত্যাগ্রহ শব্দটি সৃষ্ট হয় এবং ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধের একটা ইতিহাস নিজেই লিখিব বলিয়া অনেক দিন হইতে ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যাহা কেবল আমিই লিখিতে পারি। যে সেনাপতি যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, সেই জানে যে কোন্ সৈন্য কেন চালনা করা হইতেছে। সত্যাগ্রহের নীতি রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হওয়ার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়া ইহার পরিণতির কথা জনসাধারণের জানা আবশ্যক।

আজিকার দিনে ভারতবর্ষই অবশ্য সত্যাগ্রহের বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্র। বিরাম-গামের একটি স্থানীয় অসুবিধার প্রতিকার হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশে একটির পর একটি করিয়া কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইতেছে।

ওয়াঢ়াওয়ানের জনসেবক সুচরিত্র দর্জি ভাই মতিলালের জন্যই আমি বিরামগামের কাস্টমস্ বা শুল্কের প্রশ্নে মনোনিবেশ করি। আমি তখন সবে মাত্র (১৯১৫ সালে) ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছি এবং কাথিয়াওয়াড়ে যাইতেছি। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ওয়াঢ়াওয়ান স্টেশনে মতিলাল ছোট একদল লোক সহ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বিরামগামে লোকের যে দুর্গতি হয় তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া সে বলিল, "এই কষ্ট দূর করার জন্য আপনি কিছু করুন। আপনার জন্মভূমি কাথিয়াওয়াড়ের ইহাতে অশেষ উপকার করা হইবে।" তাহার চোখে-মুখে একটি সমবেদনা ও দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি জেলে যাইতে প্রস্তুত আছ?"

সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "জেল কেন, ফাঁসিতে ঝুলিতেও প্রস্তুত আছি।"

আমি বলিলাম, "আমার কাজ জেলে গেলেই হইবে; কিন্তু দেখিও যেন শেষকালে না পালাও।"

মতিলাল বলিল, "কাজের বেলাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।" আমি রাজকোটে গিয়া এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিয়া সরকারের সহিত পত্র-

ব্যবহার আরম্ভ করিলাম। বাগসারা এবং অন্যান্য স্থানে আমার বক্তৃতায় আমি এই ইঙ্গিত করিলাম যে, যদি আবশ্যক হয় তবে বিরামগ্রামের লোকেদের সত্যাগ্রহ করিতে প্রস্তুত হওয়া চাই। কর্তব্যপরায়ণ সি-আই-ডি পুলিস এ সংবাদ সরকারের গোচরে আনিল। এই কার্যদ্বারা তাহারা যেমন সরকারের সেবা করিয়াছিল, তেমনি জনসাধারণেরও উপকার করিল। অবশেষে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহিত আমার এ বিষয়ে কথা হয়। তিনি বিরামগ্রামের কাস্টমস্ বা শুল্ক অফিস উঠাইয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করেন এবং কথা অনুযায়ী কাজও করেন। আমি জানি, অপরেও ইহার জন্যই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অনতিবিলম্বে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম, সরকার তাহা দিয়াছিলেন; অন্ততঃ উহাই তাহা দেওয়ার প্রধান কারণ।

তাহার পর আসিল ভারতীয়দের ইমিগ্রেসন বা বিদেশ-বসতির আইন। চুক্তি করিয়া এদেশ হইতে বিদেশে যে কুলি লইয়া যাওয়া হয়, তাহাকে 'ইন্‌ডেনচার' বলে। উহা বন্ধ করার জন্য খুব প্রচেষ্টা হইয়াছিল এবং বেশ আন্দোলন চলিতেছিল। বোম্বাই-এর এক জনসভায় সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ১৯১৭ সালের ৩১শে মে তারিখের পর ঐভাবে চুক্তিবদ্ধ মজুর-প্রেরণ-প্রথা বন্ধ করা হইবে। ঐ বিশেষ তারিখটি কেন স্থির করা হইয়াছিল, সে কথা এস্থানে বলার আবশ্যকতা নাই। এই সম্পর্কে বড়লাটের নিকট মহিলাদের এক প্রতিনিধি-দল যায়। শ্রীমতী জাইজী পেটিট-ই এই প্রতিনিধি দল লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এবারও সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সঙ্কল্পের দ্বারাই কাজ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে এই পার্থক্যটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এবারে জনসাধারণ কর্তৃক আন্দোলন করা আবশ্যক হইয়াছিল। বিরামগ্রামের শুল্ক অফিস তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এ ব্যাপারটা ছিল গুরুতর। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড রাউলাট আইন ইত্যাদি অনেকগুলি ভুল কাজ করা সত্ত্বেও বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু সিভিল সার্ভিসের স্থায়ী আমলাদের দুষ্ট প্রভাব হইতে কোন্ বড়লাটই বা মুক্ত থাকিতে পারেন?

তারপর সত্যাগ্রহের তৃতীয় দফায় আসিল চম্পারণের যুদ্ধ। বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ উহার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখানকার ব্যাপারের সহিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের অনেক দিনের স্বার্থ জড়িত ছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধতার জন্য কেবলমাত্র সত্যাগ্রহের উদ্যোগ দ্বারা কাজ হয় নাই, যুদ্ধই করিতে

হইয়াছিল। চম্পারণের লোকেরা যেভাবে শান্ত ছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। সেখানকার নেতারা যে মনে বাক্যে ও কর্মে অহিংস ছিলেন, সে কথার সাক্ষী তো আমি নিজেই। আর এই জন্য ছয় মাসের মধ্যেই সেই বহু-পুরাতন অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

চতুর্থ যুদ্ধ হয় আহ্‌মদাবাদের কাপড়ের কলের মজুরদের লইয়া। গুজরাতে এ ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই। এখানে মজুরেরা চমৎকার শান্ত ছিল। আর নেতাদের সম্বন্ধে তো কিছুই বলার নাই। তবুও আমি একথা বলিব যে, এখানে যে জয়লাভ হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ছিল না। কেন না মজুরদিগকে সঙ্কল্পে স্থির রাখার জন্য আমি যে উপবাস করিয়াছিলাম, তাহার প্রভাব পরোক্ষ ভাবে মিল-মালিকদের উপরও পড়িয়াছিল। আমার উপবাসে তাঁহারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারেন না, কেন না তাঁহাদের সহিত আমার মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল। তথাপি ঐ যুদ্ধের যে নৈতিক ফল, তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। যদি মজুরেরা শান্ত থাকিয়া তাহাদের যুদ্ধ চালায়, তবে তাহারা অবশেষে জয়লাভ তো করিবেই, তাহাদের মালিকদের হৃদয়ও জয় করিয়া লইবে। এক্ষেত্রে তাহারা মালিকদের হৃদয় জয় করিতে পারে নাই, কেন না তাহারা কায়মনোবাক্যে দোষ-স্পর্শশূন্য ছিল না। তাহারা কার্যতঃ নিরুপদ্রব ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই গুণের কথাটাই বলা যায়।

পঞ্চম যুদ্ধ হয় খেড়ায়। আমি একথা বলিতে পারি না যে, সত্যাগ্রহ-পরিচালক স্থানীয় নেতাগণের সকলেই সর্বাংশে সত্যের পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। শান্তি অবশ্যই রক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু কৃষকসাধারণের অহিংস ভাবটা আহ্‌মদাবাদের কলের মজুরদের ন্যায়ই ভাসা ভাসা ছিল। আর সেই জন্য এই যুদ্ধে আমরা কোনও রকমে মান বাঁচাইয়া বাহির হইতে পারি। তবে এ কথা ঠিক যে জনসাধারণের ভিতর সেখানে বিপুল জাগৃতি দেখা দেয়। কিন্তু খেড়ার লোকেরাও অহিংসার মর্ম তখন ঠিক বুঝিতে পারে নাই এবং আহ্‌মদাবাদের মজুরেরাও শান্তিরক্ষার সত্যকার অর্থ বুঝিতে পারে নাই এই জন্য লোকেদের দুঃখও পাইতে হইয়াছে। রাউলাট সত্যাগ্রহের সময় এই জন্যই আমাকে 'পর্বতপ্রমাণ ভুল' স্বীকার করিতে হয়। আমাকে উপবাস করিতে হয় এবং অপরকেও উপবাস করিতে বলিতে হয়।

ষষ্ঠ যুদ্ধ হয় রাউলাট আইন লইয়া। এইবারেই আমাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। কিন্তু সত্যাগ্রহের বনিয়াদ বেশ ভাল ও পাকা

করিয়াই গঠন করা হইয়াছিল। আমরা আমাদের যাহা কিছু দোষ-ত্রুটি তাহা স্বীকার করি এবং প্রায়শ্চিত্ত করি। যখন আইন প্রবর্তন করা হয়, তখনই রাউলাট আইনটি অকার্যকরী ছিল এবং পরে এই বহুনিন্দিত আইন প্রত্যাহৃতও হইয়াছিল। এই যুদ্ধে আমাদের খুব শিক্ষা হয়।

সপ্তম যুদ্ধ হয় পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার ও স্বরাজ লাভের জন্য। এই যুদ্ধ আজও চলিতেছে। আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় রহিয়াছে যে যদি একজনও খাঁটি সত্যাগ্রহী শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে, তবে জয় একেবারে সুনিশ্চিত।

কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ মহাসমরের পর্যায়ভুক্ত। আমরা অজ্ঞাতসারে এই মহাসমরের জন্য যেভাবে প্রস্তুত হইতেছিলাম, তাহা বর্ণনা করিয়াছি। আমি যখন বিরামগামের ব্যাপার হাতে লই, তখন আমার কোনই ধারণা ছিল না যে আরও যুদ্ধ করিতে হইবে। আর যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলাম তখন আমি বিরামগাম সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। সত্যাগ্রহের মাধুর্যই এইখানে। সত্যাগ্রহ স্বচ্ছন্দ-লব্ধ, উহা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। সত্যাগ্রহ-নীতির ভিতরেই এই গুণটি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যে ধর্মযুদ্ধের মধ্যে গুপ্ত কিছুই নাই, যেখানে চালাকি খাটাইবার কোনও অবকাশ নাই, অসত্যের স্থান নাই—এমন যুদ্ধ অযাচিত ভাবেই আসিয়া পড়ে এবং ধর্মাচরণকারী সর্বদাই এমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন। যে যুদ্ধের জন্য পূর্ব হইতে ব্যবস্থা লইতে হয়, তাহা ন্যায়ানুমোদিত যুদ্ধ নহে। ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধের পরিকল্পনা স্বয়ং ভগবান করেন এবং তিনিই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ঈশ্বরের নাম লইয়া কেবল ধর্মযুদ্ধই করা যাইতে পারে এবং যখন দেখা যায় যে সত্যাগ্রহীর শেষ অবলম্বনও শেষ হইয়াছে, সে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল নিরুপায় হইয়াছে—যখন সে চারিদিক অন্ধকার দেখে, তখনই ঈশ্বরের কৃপা তাহার উদ্ধারার্থে অবতীর্ণ হয়। যখন কেহ নিজেকে পথের ধূলির অপেক্ষাও অসহায় ও ক্ষুদ্র মনে করে, তখনই ঈশ্বর সাহায্য করেন। কেবল দুর্বল ও অসহায়ের নিকটেই ঈশ্বরের কৃপা প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই সত্যটি আমাদের এখনও শিক্ষা করিতে হইবে। সেজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ-ইতিহাস আমাদের সহায়ক হইবে বলিয়াই মনে করি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহা যাহা ঘটিয়াছে, আমাদের বর্তমান যুদ্ধে ঠিক তাহার অনুরূপ ঘটনা পাঠক খুঁজিয়া পাইবেন। আর এই ইতিহাস হইতে পাঠক

ইহাও দেখিবেন যে, বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে নিরাশ হওয়ার কোনই কারণ নাই। কৃতকার্যতার জন্ত একমাত্র এই লক্ষ্যই রাখা দরকার যে, আমরা যেন আমাদের কর্মপদ্ধতি দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়া থাকি।

আমি জুহুতে বসিয়া এই প্রস্তাবনা লিখিতেছি। আমি এই ইতিহাসের প্রথম ত্রিশ অধ্যায় য়েরোড়া জেলে লিখি। শ্রীযুক্ত ইন্দুলাল যাজ্ঞিক লিখিয়া যাইতেন, আর আমি বলিয়া যাইতাম। পরবর্তী অধ্যায়গুলি অতঃপর আমি লিখিতে ইচ্ছা রাখি। জেলে আমার কাছে দেখিয়া-সাহায্য-লওয়ার-মত কোনও পুস্তক-পুস্তিকা ছিল না। আর এখানেও আমি কাগজপত্রের সাহায্য লইতেছি না। একটা নিয়মিত ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার সময় আমার নাই, ইচ্ছাও নাই। এই গ্রন্থ রচনা করার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে বর্তমান যুদ্ধে ইহা সহায়ক হইতে পারে এবং ভবিষ্যতের কোনও ঐতিহাসিকের সাহায্যে আসিতে পারে। যদিও আমি কোনও কাগজপত্র না দেখিয়াই লিখিতেছি, তথাপি পাঠক মনে করিবেন না যে ইহাতে একটি বিষয়েও এতটুকু ভুল আছে অথবা কোথাও অতিশয়োক্তি আছে।

জুহু
২রা এপ্রিল, ১৯২৪। } মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

প্রথম অধ্যায়

আফ্রিকা পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশগুলির মধ্যে একটি। ভারতবর্ষকে একটি দেশ না বলিয়া একটি মহাদেশ বলা হয়। কিন্তু আফ্রিকার ভিতর এমন চার-পাঁচটা ভারতবর্ষ বসানো যায়। ভারতবর্ষের মতই আফ্রিকা একটা উপদ্বীপ। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশই সমুদ্রবেষ্টিত। সাধারণতঃ একটি ধারণা আছে যে, আফ্রিকা পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম দেশ। এক দিক দিয়া দেখিলে কথাটা ঠিক। আফ্রিকার মধ্য দিয়া বিষুবরেখা চলিয়া গিয়াছে। আর বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের স্থান যে কি প্রকার উষ্ণ, তাহা ভারতবাসীরা ধারণা করিতে পারিবে না। আমরা দাক্ষিণাত্যে যে গরম সহ্য করি, তাহা হইতে বিষুবরেখার নিকটের স্থানের গরম কতকটা অনুমান করিতে পারা যায় মাত্র। কিন্তু বিষুবরেখা হইতে অনেক দূরে বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা মোটেই এরকম নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্থানে জলবায়ু এত স্বাস্থ্যপ্রদ ও নাতিশীতোষ্ণ যে, সেখানে ইউরোপীয়েরা—যাহারা ভারতবর্ষের জলবায়ুতে বাস করিতে পারে না তাহারা—স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের কাশ্মীর অথবা তিব্বতের মত খুব উচ্চ ভূখণ্ডসমূহ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিব্বতের কোন-কোনও স্থান যেমন ১০ হাজার বা ১৪ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত, সেগুলি তত উচ্চে নয়। সেই জন্য সে-স্থানের জলবায়ু শুষ্ক ও এরূপ ঠাণ্ডা যে সহ্য করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় কতকগুলি স্থান আছে যাহা যক্ষ্মা রোগীদের পক্ষে খুবই উপকারী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। জোহানস্‌বার্গ এমনি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান, ইহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণপুরী বলা হয়। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক্ষণে যেস্থানে জোহানস্‌বার্গ শহর গড়িয়া উঠিয়াছে সে-স্থান সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য শুষ্ক ঘাসে পূর্ণ জমি ছিল। কিন্তু যখন সোনার খনি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, তখন যেন মন্ত্রবলে বাড়ির পর বাড়ি নির্মিত হইতে লাগিল। আজ সেস্থান সুন্দর ও পাকাপোক্ত অনেক ইমারতে পূর্ণ। এখানকার ধনী বাসিন্দারা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকতর উর্বর স্থান হইতে অথবা ইউরোপ হইতে অনেক ব্যয়ে গাছ আনিয়া সেখানে বসাইয়াছেন। এক-একটি গাছের জন্য তাঁহাদিগকে

এক গিনি পর্যন্ত ব্যয় করিতে হইয়াছে। যে পথিক পূর্বের খবর রাখে না, সে আজ সেখানে গেলে মনে করিবে যে ঐ সকল গাছ বরাবরই ঐ স্থানে ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত অংশের বর্ণনা আমি করিতে চাই না। কেবল যে সকল স্থান আমাদের আখ্যানভাগের সহিত সম্পর্কিত সেই সকল স্থানেরই বিবরণ দিব। দক্ষিণ আফ্রিকার এক অংশ পর্তুগীজদিগের অধিকারে আছে, বাকিটা ইংরাজদিগের। পর্তুগীজদিগের অধিকারস্থ অংশের নাম 'ডেলা গোয়া বে'। ভারত হইতে আফ্রিকাগামী জাহাজ প্রথমেই আফ্রিকার উপকূলে এই বন্দরে লাগে। আর খানিকটা দক্ষিণে গেলেই নাতালে পৌছানো যায়। উহাই ইংরাজদিগের সর্বপ্রথম স্থাপিত উপনিবেশ। ইহার প্রধান বন্দরের নাম পোর্ট-নাতাল, কিন্তু আমরা ইহাকে ডারবানই বলিয়া থাকি। দক্ষিণ আফ্রিকার এই বন্দরটি সাধারণতঃ এই ডারবান নামেই পরিচিত। নাতালের রাজধানী পিটর-মরিৎসবার্গ। এই স্থান ডারবান হইতে প্রায় ষাট মাইল দূরে ভিতরের দিকে অবস্থিত এবং সমুদ্রবক্ষ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় দুই হাজার ফিট। ডারবানের আবহাওয়া বোম্বাই হইতে অধিকতর ঠাণ্ডা হইলেও প্রায় বোম্বাই-এরই মত। আমরা যদি নাতাল ছাড়িয়া আরও অধিক দূরে দেশের ভিতর দিকে যাইতে থাকি, তাহা হইলে ট্রান্সভালে পৌছাইব।

পৃথিবীতে যত সোনা ব্যবহৃত হয়, তাহার বেশীর ভাগই আসে ট্রান্সভাল হইতে। কয়েক বৎসর পূর্বে হীরকের খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই স্থান হইতেই পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। এই হীরকের নাম "কুলিনান"। হীরকের খনির মালিকের নাম হইতেই উহার ঐ নাম হইয়াছে। উহার ওজন তিন হাজার ক্যারাট, অথবা প্রায় তিপ্পান্ন ভরি। "কোহিনুরের" এখনকার ওজন ১০০ ক্যারাট এবং 'অরলফ' নামক রাশিয়ার রাজকীয় হীরকের ওজন ২০০ ক্যারাট।

জোহানস্‌বার্গ স্বর্ণখনির কাজের কেন্দ্র হইলেও এবং উহার নিকটে হীরার খনি থাকিলেও, উহা ট্রান্সভালের সরকারী রাজধানী নহে। এখান হইতে ৩৬ মাইল দূরস্থিত প্রিটোরিয়াই রাজধানী। প্রিটোরিয়াতে কেবল রাজকর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং যাঁহারা তাঁহাদের সহিত কার্যসূত্রে যুক্ত তাঁহারাই থাকেন। সেইজন্য এই স্থানটা অনেকটা নিরিবিলি, আর জোহানস্‌বার্গ হট্টগোলে পূর্ণ। গ্রামের কোনও লোক যদি বোম্বাই আসে, তবে শহরের গোলমাল ও তাড়াহুড়াতে যেমন হতভম্ব হইয়া যাইবে, প্রিটোরিয়া হইতে কেহ

জোহানস্‌বার্গে আসিলে তাহারও সেই দশা হইবে। জোহানস্‌বার্গের লোকেরা হাঁটিয়া চলে না, দৌড়ায়—একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কাহারও এমন সময় নাই যে ডাহিনে বামে ফিরিয়া অন্য কাহারও দিকে তাকাইয়া দেখে। প্রত্যেকেই কত অল্প সময়ের মধ্যে কত অধিক ধন সঞ্চয় করিতে পারা যায়, তাহার জন্যই ব্যস্ত! যদি ট্রান্সভাল পার হইয়া আমরা আরও অভ্যন্তরে পশ্চিম মুখে যাইতে থাকি, তাহা হইলে আমরা 'অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট' বা অরেঞ্জিয়াতে পৌছাইব। এখানকার রাজধানী হইতেছে ব্লুম-ফন্টেন। এটিও একটি খুব ছোট, নিরিবিলি শহর। ট্রান্সভালের মত অরেঞ্জিয়াতে কোনও খনি নাই। এই স্থান হইতে আর কয়েক ঘণ্টা রেলে চলিলেই আমরা কেপ-কলোনির সীমার মধ্যে গিয়া পড়ি। কেপ-কলোনি, দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়। কেপ-কলোনির রাজধানী কেপ-টাউন। কেপ-টাউন এই কলোনির সর্বাপেক্ষা বড় বন্দর। এই বন্দর উত্তমাশা অন্তরীপের উপর অবস্থিত। 'উত্তমাশা' অন্তরীপ নাম হওয়ার কারণ এই যে, পর্তুগীজগণ কর্তৃক উহা আবিষ্কৃত হওয়ার পর পর্তুগালের রাজা 'জন' মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ পথে ভারতবর্ষে যাওয়ায় একটা নূতন ও সহজ রাস্তা পাওয়া গেল। তখনকার দিনে ভারতবর্ষ খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সমুদ্র-যাত্রারই কামনার বিষয় ছিল।

এই চারিটি বড় ব্রিটিশ উপনিবেশ ব্যতীত আরও কতকগুলি রাজ্য আছে। সেগুলিও ব্রিটিশ রক্ষণাবেক্ষণের অধীন। ইংরেজেরা যাওয়ার পূর্বে অপরাপর জাতি দেশান্তর হইতে আসিয়া সেগুলি অধিকার পূর্বক বসবাস করিতেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান শিল্প হইতেছে কৃষি। এই ভূভাগ কৃষির জন্য অতিশয় উপযোগী। ইহার কোনও কোনও অংশ মনোরম ও উর্বর। এখানকার প্রধান শস্য মকাই। মকাই চাষ করিতে বিশেষ পরিশ্রম আবশ্যক হয় না এবং ইহাই দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদের প্রধান খাদ্য। কোনও কোনও অঞ্চলে গমের চাষও হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ফলের জন্য বিখ্যাত। নাতালে নানা প্রকারের অত্যুৎকৃষ্ট কলা, পেঁপে ও আনারস হয়। উহা এত পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় যে, দরিদ্রতম লোকেরাও খাইতে পারে। নাতালে এবং অন্যান্য উপনিবেশে কমলালেবু, পীচ এবং অ্যাপ্রিকট এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে এই দেশের সহস্র সহস্র লোককে উহা সংগ্রহ করিবার জন্য কেবল কুড়াইয়া লওয়ার পরিশ্রমটুকুই করিতে হয়। এত সুন্দর আঙুর আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। আর মরসুমের সময় উহা এতই সস্তায় পাওয়া যায় যে খুব গরীবও পেট ভরিয়া আঙুর

খাইতে পারে। ভারতবাসীরা যেখানে গিয়া বাস করিতেছে, সেখানে আম পাওয়া যাইবে না ইহা হইতেই পারে না। ভারতবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় আমের প্রবর্তন করিয়াছেন। ফলে এখন প্রচুর আম পাওয়া যায়। ওখানকার আমের কতকগুলি জাত বোম্বাই-এর অত্যুৎকৃষ্ট আমের সমকক্ষ। এই উর্বর দেশে শাক-সব্জীও খুব উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীরা ওখানে গিয়া ভারতে যত রকমের ভাল শাক-সব্জী আছে, তাহার প্রায় সবগুলিরই চাষ করিয়াছেন।

পশুপালনের কার্য দ্বারা পশুর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি করা হইতেছে। সেখানকার গাভী ও ষাঁড় ভারতবর্ষের জাতের অপেক্ষা সুগঠিত ও বলশালী। ভারতবর্ষ জগতের নিকট গো-রক্ষার দাবি করে কিন্তু যখন ভারতবর্ষের মানুষের মতই ভারতবর্ষের কঙ্কালসার গো-জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন আমার লজ্জা হয়, অনেক স্থলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যদিও আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় সর্বত্র চক্ষু খুলিয়াই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তথাপি আমি একটিও কঙ্কালসার গাভী অথবা ষাঁড় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতি দেবী যে ঐ দেশকে কেবল অকুণ্ঠিত সম্পদ দিয়াছেন তাহাই নহে, দৃশ্য ও শোভাতেও উহাকে রমণীয় করিয়াছেন।

ডারবানের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর বলা হয়। কিন্তু কেপ-টাউনের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও শোভা ইহা অপেক্ষাও রম্য। কেপ-টাউন টেবল-পর্বতের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত এবং স্থানটি অত্যধিক উচ্চ অথবা নীচুও নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধা একজন প্রতিভা-সম্পন্না মহিলা-কবি তাঁহার কবিতায় লিখিয়াছেন যে টেবল-মাউনটেন দেখিয়া তাঁহার মনে অসীমের যে ধারণা উপস্থিত হয়, অন্য কোনও পর্বত দেখিয়াই সে প্রকার হয় না। কথাটির ভিতর অত্যুক্তি থাকিতে পারে, আমার মনে হয় আছেও; কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে একটি কথা আমার কাছে সত্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, টেবল-মাউনটেন যেন কেপ-টাউন শহরবাসীর বান্ধবের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উহা অতিশয় উচ্চ নয় বলিয়া ভীতির উদ্রেক করে না, লোকে দূর হইতে উহার পূজা করিতে বাধ্য হয় না। উহার গাত্রে গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বাস করিয়া থাকে। আর উহা একেবারে সমুদ্র-সংলগ্ন বলিয়া স্বচ্ছ জলরাশি দ্বারা সমুদ্র ইহার পাদদেশ নিরন্তর ধৌত করিয়া দিতেছে। বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, সকলেই নির্ভয়ে এই পর্বতে বিচরণ করে, হাজার হাজার কণ্ঠধ্বনিতে এই পর্বত প্রত্যহ গুঞ্জরিত হয়। সু-উচ্চ বৃক্ষসমূহে নানা বর্ণের সুগন্ধী পুষ্পসম্ভারে এই স্থান

এতই রমণীয় যে, যতই দেখা যাক্ না কেন চক্ষুর আকাঙ্ক্ষা এখানে যেন মিটে না, আর ঘুরিয়া ঘুরিয়াও বেড়াইবার সাধ পূর্ণ হয় না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গঙ্গা অথবা সিন্ধুর ন্যায় বিশাল নদী নাই। অল্প যে কয়েকটি নদী আছে, তাহারা ছোট ছোট। নদীর জল সে দেশে অনেক স্থানেই পাওয়া যায় না। মালভূমিতে খাল কাটিয়াও লইয়া যাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া বড় বড় নদী না থাকিলে খালই বা কি করিয়া থাকিবে? যেখানেই ভূমির উপরিভাগে জল অপ্রচুর, সেখানেই নলকূপ বসাইয়া বায়ু চালিত পাম্প বা স্টীম এঞ্জিন চালিত পাম্পদ্বারা জল তুলিয়া সেচের কার্য চালানো হয়। স্থানীয় সরকার কৃষিকার্যের খুব সাহায্য করিয়া থাকেন। সরকার কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়ার জন্য কৃষি-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগকে পাঠাইয়া থাকেন, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনা করিয়া কৃষকদিগের উপকারার্থে পরীক্ষাদি করিয়া থাকেন, কৃষকদিগকে ভাল পশু ও ভাল বীজ যোগাইয়া থাকেন, খুব কম খরচাতে কৃষকদিগের জন্য নলকূপ খনন করিয়া থাকেন এবং উহার ব্যয় ধীরে ধীরে আদায় করিয়া থাকেন। আবার এমনি ভাবেই সরকার কৃষকদের জমি কাঁটাতারের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিয়া থাকেন।

বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর দিকে ভারতবর্ষ অবস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার জল-হাওয়ার ঠিক পাল্টা সম্পর্ক রহিয়াছে। সেখানকার ঋতুসমূহ এদেশের বিপরীতক্রমে আসে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন ভারতবর্ষে শীতকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন গ্রীষ্মকাল। সে দেশে বর্ষার কিছু নিশ্চয়তা নাই, যখন তখন বৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গড়ে বার্ষিক ২০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

পূর্ব অধ্যায়ে যে ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা মোটেই প্রাচীন নহে। পূর্বকালে দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা কাহারা ছিল, তাহা জানা যায় নাই। ইউরোপীয়েরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে, তখন তাহারা নিগ্রো-দিগকে দেখিতে পায়। আমেরিকায় নিগ্রোদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হইত, তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যাহারা পলাইয়া দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, এখানকার নিগ্রোরা তাহাদেরই সন্তান একথা বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি গোষ্ঠী আছে যেমন জুলু, স্বাজী, বাসুতো, বেচুয়ানা ইত্যাদি। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। এই নিগ্রোদিগকেই আফ্রিকার আদিম অধিবাসী ধরিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এত বড় দেশ যে এখন যত নিগ্রো আছে যে তাহার বিশ বা ত্রিশ গুণ লোকও বাস করিতে পারে। কেপটাউন ও ডারবানের মধ্যে রেলপথে প্রায় ১৮০০ মাইল ব্যবধান। সমুদ্র পথেও হাজার মাইলের কম হইবে না। চারিটি উপনিবেশের সমষ্টিতে ৪,৭৩,০০০ বর্গমাইল আয়তন। ১৯১৪ সালে এই মহাভূভাগে মাত্র ৫ লক্ষ নিগ্রো ছিল, আর ইউরোপীয় ছিল সওয়া লক্ষ।

নিগ্রোদের মধ্যে জুলুরাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় ও সুন্দর। নিগ্রোদের বেলায় সুন্দর শব্দটা আমি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের সৌন্দর্যের আদর্শ হইতেছে ফর্সা রং ও সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা। যদি এই কুসংস্কার আমরা ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করি, তাহা হইলে দেখিব যে স্রষ্টা এই জুলুদিগকে নিখুঁত করিয়া গঠন করিতে ত্রুটি করেন নাই। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা যেমন লম্বা তেমনি প্রশস্ত-বক্ষ। তাহাদের মাংসপেশী সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত। পায়ের ও হাতের মাংসপেশীসমূহ বেশ পেশল ও গোলাকার। ন্যুব্জ পৃষ্ঠ অথবা কুঁজো নিগ্রো প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না। তাহাদের ওষ্ঠ বড় ও মোটা হইলেও সারা শরীরের গঠনের সহিত উহার সামঞ্জস্য আছে বলিয়া উহা কদাকার বলা যায় না। চোখগুলি গোল ও উজ্জ্বল। নাক চেপ্টা ও বৃহদাকার; তাহাদের মুখমণ্ডল যেমন বড় তাহাতে ইহাই শোভা পায়। তাহাদের মাথার কোঁকড়ানো চুল তাহাদের

গায়ের আবলুশের মত উজ্জ্বল কালো রংয়ের সহিত বেশ মানায়। যদি কোনও জুলুকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন নিগ্রোদের মধ্যে কাহারা দেখিতে সুন্দর, তবে তাহারা নিজদিগকেই সেই সম্মানের স্থান দিবেন এবং আমার মনে হয় যে উহাতে তাহাদের বিচারের দোষ দেওয়া যাইবে না। জুলুদের শরীর-গঠন প্রকৃতি দেবীই সুঠাম ও পেশল করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাহাদের জন্য স্যাণ্ডো ইত্যাদির মত মাংসপেশী কসরৎকারী ওস্তাদের আবশ্যক হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃই বিষুবরেখার নিকটস্থ স্থানের লোকের গায়ের রং কালো হয়। যদি আমরা একথা বিশ্বাস করি যে প্রকৃতি-গঠিত সমস্ত দ্রব্যের মধ্যেই শ্রী আছে, তাহা হইলে আমরা ভারতবাসীরা গায়ের রং ফর্সা না হইলে যে খুঁৎ খুঁৎ করি ও মিথ্যা লজ্জা বোধ করি তাহা অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারি।

নিগ্রোরা গোলাকার ঘরে বাস করে, উহা শরের তৈরি এবং মাটি দিয়া লেপা। কুটিরগুলির একটিমাত্র গোলাকার দেওয়াল থাকে এবং মধ্যস্থ খুঁটি থাকে কেবল একটি, তাহার উপরে পাতার ছাউনি থাকে। বায়ু চলাচল ও মানুষের প্রবেশের জন্য একটিমাত্র নীচু দ্বার থাকে। দরজার কবাট বড় হয় না। আমাদের মতই নিগ্রোরা দেওয়াল ও মেঝে গোবর ও মাটি দ্বারা নিকায়। নিগ্রোরা গোলাকার ছাড়া নাকি কিছুই চতুষ্কোণ করিয়া গড়িতে পারে না। তাঁহাদের চক্ষু কেবলই গোল জিনিস খুঁজিতে ও গড়িতে অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কখনও প্রকৃতিকে সরল রেখা টানিতে বা সরল-রেখ-ক্ষেত্র গঠন করিতে দেখি না। আর প্রকৃতির এই সরল সন্তানেরা প্রকৃতির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইতেই তাহাদের সমুদায় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে। উহাদের কুটিরও যেমন সাদাসিধা, তাহার আসবাবও তদনুরূপ। কুটিরের ভিতর চেয়ার টেবিল বাক্স ইত্যাদির স্থান নাই, আজও এসকল দ্রব্য তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই বলিয়া কদাচিৎ এগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার আমদানির পূর্বে নিগ্রোরা জন্তুর চামড়া পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করিত। চামড়াই তাহাদের আস্তরণ, বিছানার চাদর ও লেপের কাজ করিত। আজকাল উহারা কম্বল ব্যবহার করে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থাতেই ঘুরিয়া বেড়াইত। গ্রামের ভিতর এখন অনেকেই সেই অবস্থাতেই থাকে। তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ একটুকরা চামড়া দ্বারা আবৃত রাখে, কেহ আবার তাহাও করে না। কিন্তু ইহা হইতে একথা কেহ

মনে করিবেন না যে, ইহারা ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে না। যখন একটি বৃহৎ সম্প্রদায় একটি রীতি অবলম্বন করে, তখন ইহা খুবই সম্ভব যে সে রীতি দোষশূন্য —যদিও অপর সমাজে উহা নিতান্তই দূষণীয় মনে হইতে পারে। হাঁ করিয়া একে অন্যের দিকে তাকাইয়া থাকার অবকাশ নিগ্রোদের নাই। ভাগবতে আমরা পড়িয়াছি যে শুকদেব যখন নগ্ন অবস্থায় স্নান-নিরতা স্ত্রীলোকদিগের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় নাই এবং সেই স্ত্রীলোকেরাও বিচলিত হয় নাই অথবা লজ্জাবোধ করে নাই। এ বিবরণের ভিতর যে অমানুষিক কিছু আছে একথা মনে হয় না। আজ যদি ভারতে শুকদেবের মত এমন একজনও কেহ বর্তমান না থাকেন, যিনি অনুরূপ অবস্থায় অমনি পবিত্র থাকিবেন, তবে তাহা লোকের পবিত্র হওয়ার চেষ্টায় সীমা নির্দেশক নহে, এ ঘটনা কেবল আমাদের অধঃপতনের কথাই সূচিত করে। আমরা কেবল অভিমান বশতঃই নিগ্রোদিগকে বুনো মনে করি। আমরা তাহাদিগকে যে প্রকার বর্বর মনে করি, তাহা নহে।

আইন হইয়াছে যে নিগ্রো স্ত্রীলোকদের শহরে আসিতে হইলে তাহাদের বুক হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকিয়া আসিতে হইবে। সেই জন্য এখন একটুকরা কাপড় তাহাদের দেহে জড়াইতে তাহারা বাধ্য হয়। সেই জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় আজকাল এ ধরনের টুকরার খুব বিক্রয় হয়। ঐ প্রকার সহস্র সহস্র কম্বল বা কাপড় প্রতি বৎসর ইউরোপ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। পুরুষদিগকেও আইন অনুসারে কোমর হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকিতে হয়। সেই জন্য অনেকেই ইউরোপের আমদানি পুরাতন বস্ত্র পরার প্রথা আরম্ভ করিয়াছে। আবার কেহ কেহ এক রকমের পাজামা ফিতা দ্বারা কোমরে বাঁধিয়া পরিধান করে। এ সমস্ত বস্ত্রই ইউরোপ হইতে আমদানি করা হয়।

নিগ্রোদের প্রধান খাদ্য হইতেছে মকাই, আর যদি যোটে তবে মাংস। সুখের বিষয় ইহারা মশলা, চাট্নি কি জিনিস তাহা জানে না। যদি তাহাদের খাদ্যে মশলা থাকে অথবা তাহা হলুদ দিয়াও রং করা হয় তবে তাহারা নাক সিঁট্‌কাইবে, আর তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে বেশী অসভ্য বলা হয় তাহারা তো সে খাদ্য স্পর্শই করিবে না। জুলুদের পক্ষে একবারে আধ সের মকাই একটু লবণ দিয়া খাওয়া একটা অসাধারণ কিছু নহে। মকাইয়ের জাউ একটু লবণ দিয়া খাইয়াই তাহারা বেশ সন্তুষ্ট থাকে। যখন মাংস পাওয়া যায় তখন তাহা কাঁচা, সিদ্ধকরা বা ঝলসানো—যেমনই হোক, একটু লবণ সহযোগে তাহারা

খাইয়া ফেলে। কোন পশুর মাংসেই তাহাদের অরুচি নাই।

নিগ্রোদের গোষ্ঠীর নামেই তাহাদের ভাষার নাম দেওয়া হইয়া থাকে। লিখিবার কলা ইউরোপীয়েরা তাহাদের মধ্যে সম্প্রতি প্রবর্তন করিয়াছেন। নিগ্রোদের ভাষায় বর্ণমালা বলিয়া কিছু নাই। বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তক রোমান অক্ষরে নিগ্রোভাষায় এক্ষণে ছাপানো হইয়াছে। জুলুদের ভাষা বড় মধুর। অনেক শব্দই 'আ' এই প্রকার উচ্চারণে অন্ত হয়, সেই জন্য শুনিতে মৃদু ও মধুর লাগে। উহাদের শব্দগুলি যেমন অর্থযুক্ত তেমনি কবিত্বপূর্ণ—একথা আমি শুনিয়াছি এবং পুস্তকেও পড়িয়াছি। আমি যে দুই চারিটি কথা শিখিতে পারিয়াছিলাম, তাহা হইতেও সে কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। আমি যে উহাদের বাসস্থানের নামগুলি উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি নিগ্রো নাম। উহাদের মানেও কবিত্বপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর। আমার স্মরণ নাই বলিয়া সেগুলি এখানে দিতে পারিলাম না।

খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদিগের মতে নিগ্রোদের কোনও ধর্ম ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু ধর্মের ব্যাপক অর্থ ধরিলে, নিগ্রোরা নিশ্চয়ই মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য এক পরম সত্তায় বিশ্বাস করে ও তাঁহার পূজা করে। তাহারা এই শক্তিকে ভয়ও করে। তাহারা অস্পষ্ট ভাবে ইহাই অনুভব করে যে, এই দেহের অবসানের সহিতই সত্তার সম্পূর্ণ শেষ হয় না। যদি আমরা সুনীতিকে ধর্মের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে নিগ্রোরা নীতিপরায়ণ বলিয়া উহাদিগকে ধার্মিকও বলা যায়। সত্য ও মিথ্যার ভেদ তাহারা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে। নিগ্রোরা তাহাদের আদিম অবস্থায় সত্যের যেমন সেবা করে, আমরা অথবা ইউরোপীয়েরা ততটা করি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তাহাদের কোনও মন্দির, অথবা ঐ ধরনের কিছু নাই। তাহাদের মধ্যে অন্যান্য জাতির ন্যায় অনেক কুসংস্কার আছে। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে এই জাতি—শারীরিক বলে জগতে যাহাদের সমকক্ষ কেহ নাই—এত ভীতু যে একজন নিগ্রো একজন ইউরোপীয় বালককে দেখিলেও ভয় পায়। যদি তাহার দিকে একটা পিস্তল বাগাইয়া ধরা যায় তবে সে হয় পলাইবে, আর নয়ত এত অভিভূত হইবে যে পলাইতেও পারিবে না। ইহার অবশ্যই হেতু আছে। নিগ্রোদের মনের মধ্যে এ কথাটা মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় যে তাহাদিগের মত সংখ্যায় অধিক বন্য জাতিকে দাবাইতে পারিয়াছে তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ইন্দ্রজাল

আছে। নিগ্রোরা বর্শা, ধনুক ও বাণের ব্যবহার ভাল রকমই জানিত। তাহাদিগকে ইহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহারা কখন একটা বন্দুক দেখে নাই অথবা ব্যবহার করে নাই। একটি দেশলাই পর্যন্ত আবশ্যক হয় না—আঙুল টিপিলেই নলের মুখ হইতে একসঙ্গে শব্দ হয়, আগুনের ঝলক দেখা দেয় এবং গুলি গিয়া মানুষের দেহ বিদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলে, এই জিনিসটা নিগ্রোরা বুঝিতে পারে না। সে নিজে এবং তাহার পূর্বপুরুষেরা দেখিয়াছে যে অনেক নিরপরাধ, উপায়হীন নিগ্রোর প্রাণ গুলি খাইয়াই গিয়াছে। অনেকে আজও জানে না যে, কেমন করিয়া এই ব্যাপারটা হয়। সেই জন্যই যাহারা এইপ্রকার অস্ত্র ধারণ করে তাহাদিগকে যমের মত ভয় করে।

'সভ্যতা' নিগ্রোদের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। ধর্মপ্রচারনিরত মিশনারীরা খ্রীষ্টের বাণী তাঁহারা যেমন বুঝিয়াছেন সেই মত প্রচার করেন, নিগ্রোদের জন্য স্কুল বসান এবং তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখাপড়া না জানায় এই 'সভ্যতার' মর্ম বুঝিত না এবং সেজন্য অনেক পাপ হইতে মুক্ত ছিল; আজ তাহারা পাপে পতিত হইয়াছে। এই সভ্যতার সম্পর্কে আসিয়াছে অথচ মদ খায় না, এমন কোনও নিগ্রোই আর বড় একটা দেখা যায় না। আর যখন তাহার ঐ বিশাল শক্তিমান দেহ মদের নেশার ঘোরে পড়ে, তখন সে উন্মত্ত হয় এবং নানাপ্রকার দুষ্কার্য করে। দুইয়ে দুইয়ে চার হওয়া যেমন নিশ্চিত, তেমনি যেখানে 'সভ্যতা' সেইখানেই অভাব বাড়িবে ইহাও অবধারিত। নিগ্রোদিগের অভাব বাড়াইবার জন্য অথবা তাহাদিগকে শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাদের উপর একটা মাথা পিছু অথবা ঘর পিছু কর বসানো হইয়াছে। যদি এই রকম কর ইত্যাদি না বসানো হইত, তবে নিগ্রোরা শত শত ফিট নিম্নস্থ ভূগর্ভে গিয়া পরিশ্রম করিয়া সেখান হইতে সোনা ও হীরা তুলিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের চাষবাস ছাড়িয়া খনির কাজে ঢুকিত না। আর যদি খনিতে খাটাইবার জন্য তাহাদিগকে না পাওয়া যাইত, তবে ঐ সকল সোনা ও হীরক ভূগর্ভেই থাকিয়া যাইত। আবার ঐ প্রকার কর না বসাইলে ইউরোপীয়দের চাকর পাওয়াও দুর্ঘট হইত। ফলে এই হইয়াছে যে, হাজার হাজার নিগ্রো অন্যান্য ব্যাধিতে তো ভোগেই, তাহা ছাড়া একরকম যক্ষ্মা—যাহাকে 'খনির যক্ষ্মা' বলে, তাহাতেও ভুগিতেছে। এই ব্যাধি সাংঘাতিক। যাহারা এই ব্যাধির কবলে পড়ে তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ ভাল হইতে পারে। পাঠক ইহাও বিবেচনা করিবেন যে, খনির মজুরেরা

নিজেদের ঘরবাড়ি হইতে হাজার মাইল দূরে থাকিয়া কতটা সংযম পালন করিতে পারে। এই হেতু তাহারা সহজেই উপদংশাদি রোগে আক্রান্ত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার চিন্তাশীল ইউরোপীয়েরা যে এই ব্যাপারের গুরুত্ব না বুঝেন তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একথা নিশ্চয়তার সহিত মানেন যে সকল দিক দেখিলে 'সভ্যতা' দ্বারা এই জাতির মঙ্গল হয় নাই। আর অমঙ্গল যে কি হইয়াছে তাহা তো এত স্পষ্ট যে, তাহা আপনা-আপনিই চোখে পড়ে।

নিগ্রোদের মত সরল এবং স্বাভাবিক অবস্থার লোকের দ্বারা অধ্যুষিত এই মহান দেশে প্রায় চারিশত বৎসরপূর্বে ডাচেরা আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা ক্রীতদাস রাখিত। জাভা দেশ হইতে কতকগুলি ডাচ তাহাদের মালয়ী ক্রীতদাস সহ আসিয়া যেখানে উঠিয়াছিল উহাকে এক্ষণে 'কেপ-কলোনি' বলা হয়। এই মালয়ীরা মুসলমান। তাহাদের রক্তে ডাচরক্তের মিশ্রণ ছিল এবং ডাচদের কতকগুলি গুণ তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্রই ছড়াইয়া আছে, তবে কেপটাউনই তাহাদের প্রধান আড্ডা। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপীয়দিগের ভৃত্যের কাজ করে, কেহ কেহ স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত। মালয়ী স্ত্রীলোকেরা বড়ই পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমতী। তাহাদের জীবন-যাত্রার ব্যাপারে তাহারা অতিশয় পরিচ্ছন্ন। ধোপার কাজ বা শেলাইয়ের কাজে তাহারা নিপুণ। পুরুষেরা ছোটখাটো ব্যবসা করে, অনেকে ভাড়া-গাড়ি হাঁকায়। কেহ কেহ উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছেন। কেপ-টাউনের ডাক্তার আব্দুল রহমান তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি কেপটাউনের পুরাতন ঔপনিবেশিক বিধান সভার একজন সভ্য ছিলেন। নূতন আইন অনুসারে তাঁহার বিধান সভায় প্রবেশ-অধিকার প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

ডাচদিগের কথা বলিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে আমি মালয়ীদিগের কথা কিছু বলিয়া লইলাম। এক্ষণে ডাচেরা কি করিয়াছিলেন দেখা যাক্। ডাচেরা যেমন কুশলী যোদ্ধা, কৃষিকার্যেও তাহারা তেমনি পারদর্শী। তাহারা দেখিল যে, তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল কৃষির অত্যন্ত উপযোগী এবং স্থানীয় অধিবাসীরা বৎসরে অল্পকালমাত্র কৃষিকার্যে খাটিয়াই জীবনাতিপাত করিয়া থাকে। তাহা হইলে এই লোকগুলিকে জোর করিয়া খাটাইয়া লওয়া হইবে না কেন? ডাচেদের বন্দুক ছিল, তাহারা ফন্দীবাজও ছিল। তাহারা অন্যান্য জন্তুর মত মানুষকেও পোষ মানাইতে জানিত এবং তাহাদের ধর্মে ইহা বাধে না বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা তখন স্থানীয় আদিম নিবাসী "নেটিভ"দের

সাহায্যে কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়া দিল—ঐভাবে নেটিভদিগকে খাটানো ন্যায়ানুমোদিত কিনা, সে বিষয়ে তাহাদের সন্দেহেরও অবকাশ হয় নাই। ডাচেরা কৃষিকার্যের জন্য ভাল জমি যখন খুঁজিতেছিল, ইংরেজেরাও সেই সময় ক্রমে ক্রমে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংরেজে ডাচে জ্ঞাতিভাই সম্পর্ক। তাহাদের চরিত্র, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা একই লক্ষ্য-অভিমুখী। একই পাঁজার হাঁড়ি কলসীতে মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি লাগে। অনুরূপ ভাবে এই দুই জাতি, উভয়েই নিগ্রোদিগকে শোষণ করিয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইত। তাহাদের মধ্যে প্রথমে কলহ ও পরে যুদ্ধও হয়। ইংরেজেরা "মাজুবা-হিল" নামক স্থানে পরাজিত হয়। মাজুবার পরাজয় এমন একটা ক্ষত রাখিয়া দেয়, যাহা পরবর্তী বুয়র-যুদ্ধে বিষম আকার ধারণ করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধ ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। যখন জেনারেল ক্রঞ্জি আত্মসমর্পণ করেন, তখন লর্ড রবার্টস রাণী ভিক্টোরিয়াকে তারযোগে জানান যে, মাজুবার প্রতিহিংসা লওয়া হইয়াছে। যখন এই দুই জাতের মধ্যে বুয়র যুদ্ধের পূর্বেকার ঐ প্রথম সংঘর্ষ হইয়াছিল, তখন অনেক ডাচ, ব্রিটিশের নাম-মাত্র অধীনত্বেও থাকিতে রাজী না হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অজানা অন্তরতর প্রদেশে চলিয়া যায়। ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের উৎপত্তি এমনি করিয়া হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ডাচেরা বুয়ার বলিয়া পরিচিত হয়। সন্তান যেমন মাকে আঁকড়াইয়া থাকে, এই বুয়ারেরা তেমনি তাহাদের মাতৃভাষাকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া, ঐ ভাষাকে জীবন্ত রাখিয়াছে। তাহাদের ভাষার সহিত তাহাদের স্বাধীনতার যে অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহা তাহারা অতি তীব্রভাবে অনুভূতির ভিতর গ্রহণ করিয়াছে। অনেক আক্রমণ সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের মাতৃভাষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহাদের ভাষা বুয়ারদের উপযোগী এক নূতন আকার ধারণ করে। মাতৃভূমি হলাণ্ডের সহিত তাহারা যোগ রাখিতে না পারায় ডাচ হইতে সৃষ্ট একটা রূপান্তরিত ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল। প্রাকৃত ভাষা যেমন সংস্কৃত হইতে সৃষ্ট, এ ভাষাও কতকটা সেই রকমের। নিজেদের সন্তানদের উপর ভাষার কাঠিন্যের চাপ দিতে অনিচ্ছাবশতঃ তাহারা এই প্রাকৃত ডাচকে স্থায়ী রূপ দিয়াছে। এই ভাষা 'টাল' নামে অভিহিত। তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে 'টালে'র সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, বইগুলি 'টাল' ভাষাতেই লেখা এবং ইউনিয়ন পার্লামেন্টের বুয়ার সভ্যগণ 'টাল'

ভাষাতেই বক্তৃতা দেওয়ার বিশেষত্ব জেদ করিয়াই রক্ষা করেন। ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট হওয়ার পরে 'টাল' বা ডাচ ভাষাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র ইংরাজীর সমস্থান দেওয়া হয়; এমন কি সরকারী গেজেট বা পার্লামেণ্টের নথিপত্র দুই ভাষাতেই রাখা হয়।

বুয়ারেরা সরল, অকপট এবং ধর্মভীরু। তাহারা বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে খামার করিয়া বাস করে। এই সকল খামারের ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। আমরা খামার বলিতে এক বা দুই একর (৩ বা ৬ বিঘা) জমি বুঝিয়া থাকি, কখনও বা ইহা অপেক্ষাও কম জমি খামারে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে একজন কৃষকের হাতেই শত শত অথবা হাজার হাজার একর জমি আছে। এই সমস্ত জমিই তাহার চাষে আনার কোনও গরজ নাই। এ বিষয়ে কেহ তাহার সহিত তর্ক করিলে বলিবে, "পতিত থাকুক না, এখন যে জমি পতিত থাকিবে আমাদের ছেলেরা তাহা চাষ করিবে।"

প্রত্যেক বুয়ারই ভাল যোদ্ধা। বুয়ারেরা নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়া করুক না কেন যখন তাহাদের স্বাধীনতা বিপদাপন্ন হয়, তখন সকলেই সজ্জিত হইয়া যেন একাত্ম হইয়া যুদ্ধ করে। তাহাদের বিশদভাবে কুচকাওয়াজ শিক্ষার আবশ্যকতা করে না, কেন না সমস্ত জাতিটির স্বভাবেই যুদ্ধ করা যেন মজ্জাগত। জেনারেল স্মাটস্, জেনারেল ডিওয়েট, জেনারেল হার্টজগ, ইঁহারা সকলেই বড় উকীল, বড় খামারে মালিক এবং তেমনি বড় যোদ্ধা। জেনারেল বোথার একটি খামারে নয় হাজার একর জমি ছিল। তিনি কৃষিকার্যের জটিল সমস্যা-সমূহের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। যখন তিনি শান্তির সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাইতে বিলাতে যান, তখন তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রকার একটি কথা রটিয়াছিল যে সারা ইউরোপে তাঁহার মত ভেড়ার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আর কেহ ছিল না। জেনারেল বোথা প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের স্থান লইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী খুব ভালই জানিতেন। তবুও তিনি যখন রাজা ও মন্ত্রীদিগের সহিত বিলাতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন নিজের মাতৃভাষাতেই কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। এই প্রকার করাই যে ঠিক হয় নাই, সে কথা কে বলিতে পারে? তিনি ইংরাজী বলিতে গিয়া যদি কোনও একটা ভুল করিয়া বসেন, সে দায়িত্ব তিনি কেন লইতে যাইবেন? তাঁহার চিন্তাস্রোত ঠিক একটা উপযুক্ত শব্দ খোঁজার জন্য কেনই বা ব্যাহত করিবেন? ইংরাজ মন্ত্রীরা কিছু মনে না করিয়াই এমন একটা অপরিচিত ইংরাজী বাক্য সমাবেশ করিতে পারেন যে, তিনি তাঁহাদের

কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভুল জবাব দিতে পারেন ও গোলে পড়িয়া যাইতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহার অভীষ্টের হানি হইতে পারে। তাঁহার এমন বিষম ভুল করার দরকার কি?

বুয়ার স্ত্রীলোকেরা বুয়ার পুরুষদের মতই সাহসী ও সরল। বুয়ার স্ত্রীলোকগণের সাহসে ও তাহাদের অনুপ্রেরণাতেই বুয়ারেরা যুদ্ধে অমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ও জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা বৈধব্যের ভয় করিত না, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিত না।

আমি বলিয়াছি যে, বুয়ারেরা ধর্ম-প্রবণ খ্রীষ্টান। কিন্তু তাহারা যে নিউ-টেস্টামেণ্টে (নববিধান যাহা যীশু প্রবর্তন করেন) বিশ্বাস করিত একথা বলা যায় না। বস্তুতঃ ইউরোপ যীশুর প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাস করে না, যদিও দাবি করে যে উহাতে তাহার শ্রদ্ধা আছে। অল্পসংখ্যক লোকই সেখানে যীশুর শান্তির ধর্ম জানে ও পালন করে। তবে বুয়ারদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, তাহারা নববিধানের কেবল নামটাই জানে। তাহারা পুরাতন বিধান ভক্তির সহিত পড়ে ও উহাতে বর্ণিত যুদ্ধের কাহিনী কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। মোজেস যে নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন—"একটি চক্ষুর বদলে পাল্টা আর একটি চক্ষু লইবে, একটি দাঁতের বদলে আর একটি দাঁত লইবে" এই নিয়ম তাহারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সেই মতই আচরণ করে।

বুয়ার স্ত্রীলোকেরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহাদিগকে দুঃখ পাইতে হইবে, আর সেই জন্যই ধৈর্যের সহিত এবং সন্তোষের সহিত সমস্ত ক্লেশই সহ্য করিয়াছিল। তাহাদের তেজস্বিতা নষ্ট করার জন্য লর্ড কিচেনার কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই। তাহাদিগকে পুরুষদিগের নিকট হইতে পৃথক করিয়া বন্দীশিবিরে রাখিয়াছিলেন। সেখানে তাহাদিগকে অবর্ণনীয় যাতনা সহ্য করিতে হইত। তাহারা অনাহারে থাকিয়াছে, তীব্র শীতে কষ্ট পাইয়াছে, আগুনের মত রৌদ্রের তাপ সহ্য করিয়াছে। কখনও কখনও সুরাপানে অজ্ঞান অথবা কামোন্মত্ত সৈন্য এই সব অরক্ষিত স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণও করিয়াছে। তবুও এই বীর রমণীরা দমিত হন নাই। অবশেষে রাজা এডোয়ার্ড লর্ড কিচেনারকে লেখেন যে, তিনি আর এসকল সহ্য করিতে পারিতেছেন না। বুয়ারদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার উহাই যদি একমাত্র উপায় হয়, তবে তিনি ঐ ভাবে যুদ্ধ চালানো অপেক্ষা যে কোনও শর্তে সন্ধি করা পছন্দ করিবেন। লর্ড কিচেনারকে তিনি শীঘ্র যুদ্ধ সমাপ্ত করিতে বলেন।

স্ত্রীলোকদিগের মর্মন্তুদ ক্রন্দন ইংলণ্ডে পৌছাইলে, ইংরাজেরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বুয়ারদের বীরত্বের জন্ত তাঁহাদের মন প্রশংসায় পূর্ণ ছিল। এমন ছোট একটি জাতি ইংরাজের জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে শুধু ইহার জন্তই তাহাদের হৃদয়ে দাহ সৃষ্টি হইত। বন্দীশিবিরে অনুষ্ঠিত এই সকল অত্যাচারের জন্ত স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ভেদী চিৎকার ইংলণ্ডে পৌছাইল। বুয়ার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যস্থতায় নয়, বুয়ার পুরুষদিগের দ্বারা নয়—কারণ পুরুষেরা তো যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্তায় যুদ্ধ করিতেছিল—পরন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আগত কয়েকজন উচ্চান্তঃকরণ ইংরাজ পুরুষ ও রমণীর মাধ্যমে যখন এই সংবাদ বিলাতে পৌছাইল, তখন ইংরাজদিগের মন নরম হইয়া আসিল। স্বর্গগত সার হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান ইংরাজের হৃদয়-বৃত্তি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ত প্রতিবাদ করিলেন। স্বর্গগত মিঃ স্টেড প্রকাশ্ত ভাবে ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনায় জানাইলেন যে তিনি এই যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় কামনা করেন। তিনি অপর সকলকে সেই প্রার্থনায় যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। সে এক অত্যাশ্চার্য দৃশ্ত! সত্যকার দুঃখ যদি বীরত্বের সহিত সহ্য করা যায়, তবে পাষাণ হৃদয়ও গলে। তপস্তা বা দুঃখ সহনের এমনি শক্তি। আর সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্রও ইহারই মধ্যে রহিয়াছে।

এই সকলের ফলে ভেরিনিগিং-এর সন্ধি হয়। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি উপনিবেশই সংযুক্ত হইয়া একটি ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি হয়। যদিও যে সকল ভারতবাসী সংবাদপত্র পড়েন তাঁহারা এই সন্ধির কথা জানেন, তথাপি এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা আছে যাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। সন্ধি হওয়া মাত্রই ইউনিয়ন গঠিত হয় নাই, প্রত্যেক উপনিবেশেরই নিজ নিজ বিধানসভা ছিল। মন্ত্রীগণ সম্পূর্ণভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী ছিলেন না। ট্রান্সভাল ও ফ্রী স্টেট, 'ক্রাউন-উপনিবেশ' যে ধরনে শাসিত হয় সেই শাসন-প্রথায় শাসিত হইতেছিল। জেনারেল স্মাটস্ ও বোথা এই প্রকার সঙ্কুচিত ভাবে স্বাধীনতার প্রয়োগে সন্তুষ্ট হওয়ার লোক নহেন। তাঁহারা বিধানসভা বর্জন করিলেন, অসহযোগ করিলেন, সরকারের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতে তাঁহারা অস্বীকার করিলেন। লর্ড মিলনার একটা ঝাঁজাল বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, যে জেনারেল বোথা নিজের সম্বন্ধে এতটা অভিমান না দেখাইলেও পারিতেন। তাঁহাকে বাদ দিয়াও দেশ-শাসন-কার্য ভালরূপেই চালানো যাইতে পারে। লর্ড মিলনার এই ভাবে বরকে বাদ দিয়াই বিবাহের আয়োজন করিলেন।

আমি বুয়ারদিগের সাহস, স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং আত্মোৎসর্গের অকুণ্ঠিত প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া আমি একথা বুঝাইতে চাই না যে দুর্দিনে তাহাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না, অথবা তাহাদের মধ্যে দুর্বল চিত্তের লোক কেহ ছিল না। লর্ড মিলনার, যাহারা অল্পেতেই সন্তুষ্ট এমন কতকগুলি লোক লইয়া একটি দল খাড়া করিলেন এবং মনে করিলেন ইহাদের সহায়তাতেই বিধানসভাকে কার্যকরী করিতে পারিবেন। একটা নাটকও তাহার নায়ক ব্যতীত খাড়া করা যায় না। যে রাজনীতিবিদ্ প্রধান ব্যক্তিকেই বাদ দিয়া একটি শাসন-তন্ত্র খাড়া করিতে চাহেন, তাঁহাকে বাতুল ছাড়া আর কি বলা যায়? লর্ড মিলনারের ব্যাপার এই রকমই হয়। তিনি ধাপ্পা দিয়া কাজ চালাইতে থাকিলেও, জেনারেল বোথাকে বাদ দিয়া ট্রান্সভাল ও ফ্রী স্টেট শাসন করা এত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে অনেক সময়ই তাঁহার উদ্যানে উন্মনা ও উদ্বিগ্ন মনে থাকিতে দেখা যাইত। জেনারেল বোথা সাফ্ করিয়া বলেন যে ভেরিনিগিং-এর সন্ধি দ্বারা বুয়ারেরা রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে তাহা না হইলে তিনি ঐ সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতেন। লর্ড কিচেনার উত্তরে বলেন যে তিনি জেনারেল বোথাকে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বুয়ারেরা যদি তাহাদের রাজভক্তি প্রমাণ করে তবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে। এখন এই দুই ব্যক্তির কথার মাঝখানে কে বিচারক হইয়া বসিবেন? যদি একটা সালিশীর কথাই হয়, তাহা হইলেই বা জেনারেল তাহাতে বসিতে চাহিবেন কেন? এ বিষয়ে মহামান্য সম্রাটের সরকার যে সিদ্ধান্ত করেন, তজ্জন্য তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহারা এই কথা বলেন যে সন্ধির যে অর্থ দুর্বল প্রতিপক্ষ করেন সবল পক্ষ তাহাই গ্রহণ করিবেন। ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা অনুসারে ইহাই যথার্থ ব্যবস্থা। আমি হয়ত কোনও কিছু বলিতে চাহিয়া থাকিব। কিন্তু আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার লেখার বা বক্তৃতার যে মানে পাঠক বা শ্রোতা করেন, তাহাই উহার ঠিক অর্থ। আমাদের জীবনে আমরা এই সুবর্ণ নিয়ম প্রায়ই ভঙ্গ করিয়া থাকি। এই জন্য অনেক বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয় এবং অর্ধ সত্য, যাহা অসত্য অপেক্ষাও দোষাবহ, তাহাই সত্যের পরিবর্তে কাজে লাগানো হয়।

এই ক্ষেত্রে সত্যের পক্ষ, অর্থাৎ জেনারেল বোথা যখন সম্পূর্ণ জয়লাভ

করিলেন, তখন তিনি কার্য আরম্ভ করিলেন। সমস্ত উপনিবেশগুলি একত্র যুক্ত করা হইল ও দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক, ম্যাপে উহার রং লাল দেখানো হয় (ইহাতে ইংরাজাধিকার সূচিত হয়)। তবুও একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পূর্ণ স্বাধীন। ব্রিটিশ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের অনুমতি ব্যতীত একটি পয়সাও সেখান হইতে পাইতে পারেন না। কেবলমাত্র ইহাই নহে, উপরন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রীরা একথাও মানিয়া লইয়াছেন যে যদি দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ পতাকা—ইউনিয়ন জ্যাক পরিত্যাগ করে এবং নামেও স্বাধীন হয় তাহা হইলেও কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারে না। বুয়ারেরা আজ পর্যন্ত নামেও যে এই স্বাধীনতা গ্রহণ করে নাই, তাহার বিশেষ হেতু আছে। একটা হেতু হইতেছে, বুয়ার-নেতারা চতুর ও বিচক্ষণ লোক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত একটা অংশীদারী ভাব বজায় রাখায় তাঁহাদের কোনও ক্ষতি নাই, ইহা তাঁহারা দেখিতেছেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও ব্যবহারিক হেতুও আছে। নাতালে ইংরাজের সংখ্যা বেশী, কেপ-কলোনিতে যদিও ইংরাজেরা সংখ্যায় বুয়ারদিগের অপেক্ষা বেশী নয়, তথাপি সংখ্যায় অনেক; জোহানস্‌বার্গে ইংরাজের সংখ্যাই অধিক। এই প্রকার অবস্থায় তাহারা যদি দক্ষিণ আফিকায় একটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাহা হইলে নিজেদের ভিতরেই বিরোধ এবং একটা গৃহযুদ্ধ ঘটার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা উপনিবেশ হিসাবেই রহিয়া গিয়াছে।

যেভাবে এই ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের শাসন-পদ্ধতি স্থির হয়, তাহাতে বিশেষত্ব আছে। বিভিন্ন ব্যবস্থা পরিষদের সমস্ত পক্ষের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত একটা "জাতীয় কনভেনশন" বা সভা, একটা সর্বসম্মত শাসন-পদ্ধতির খস্‌ড়া প্রস্তুত করেন এবং ইংরাজ সরকারের পার্লামেণ্টকে উহা সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে হয়। পার্লামেণ্টের হাউজ অফ কমন্সের একজন সভ্য ঐ খস্‌ড়ায় একটি ব্যাকরণের ভুল দর্শাইয়া ভুলটির সংশোধন করিতে বলেন। স্বর্গগত স্যার হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া বলেন যে রাজনীতি চালাইতে ব্যাকরণ-শুদ্ধির অত্যাবশ্যকতা নাই। তিনি বলেন যে ঐ খস্‌ড়া ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রীদের খুব ঘনিষ্ঠ যোগের ফলস্বরূপ খাড়া করা হইয়াছে এবং তাঁহারা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাতে একটা ব্যাকরণ অশুদ্ধিও সংশোধন করার ক্ষমতা দেন নাই। ঐ খস্‌ড়া সেই জন্য

ব্রিটিশ সরকারী বিলের আকারে উভয় হাউজ দ্বারা ঠিক যেমন অবস্থায় উপস্থিত করা হইয়াছিল, তেমনি বিনা পরিবর্তনে গৃহীত হইয়া যায়।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় উল্লেখ করার আছে। এই সংগঠিত ও যুক্ত সরকারের শাসন-পদ্ধতির মধ্যে এমন কতকগুলি শর্ত আছে যাহা সাধারণ পাঠকের নিকট অর্থহীন বলিয়া বোধ হইবে। উহাতে ব্যয়ভার খুব বাড়িয়াছে। ইহা সংবিধান প্রণেতাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য শুধু একটা আদর্শ পদ্ধতি খাড়া করাই ছিল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল আপস রক্ষার দ্বারা একটি কার্যকরী পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া সংবিধানকে সার্থক করা। এই জন্যই এই ইউনিয়ন সরকারের চারটি রাজধানী আছে। কোনও উপনিবেশই নিজ নিজ রাজধানী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল না। তেমনি আবার যদিও পুরাতন বিধানসভাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তবুও কেন্দ্রীয় বিধানসভার অধীন এবং কতগুলি ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারবিশিষ্ট প্রাদেশিক বিধানসভা রাখা হইয়াছে। যদিও গভর্ণরের পদ-গুলি উঠাইয়া দেওয়া হয় তথাপি রাজধানীতে গভর্ণরের অনুরূপ ক্ষমতা-সম্পন্ন কর্মচারী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা নাম দিয়া রাখা হয়। সকলেই একথা জানেন যে চারটি বিধানসভা, গভর্ণর ও রাজধানী অনাবশ্যক, কেবল দৃষ্টিশোভা মাত্র। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার তীক্ষ্মবুদ্ধি রাজনীতি-বিশারদগণ উহা গ্রাহ্য করেন নাই। ঐ ব্যবস্থার মধ্যে একটা বাহ্য আড়ম্বর রহিয়া গিয়াছে এবং উহা ব্যয়-বহুলও হইয়াছে। তথাপি রাজনৈতিকেরা এ বিষয়ে লোকে কি বলিবে তাহা না দেখিয়া যাহা নিজেরা ভাল বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাই করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দ্বারা তাহা স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন।

সত্যাগ্রহের মহাযুদ্ধের মর্মকথা দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস না জানিলে বুঝা যাইবে না বলিয়া আমি সংক্ষেপে এই ইতিহাস দিলাম। এক্ষণে আমরা দেখিব যে ভারতীয়েরা কেমন করিয়া এদেশে আসেন এবং সত্যাগ্রহের সূচনার পূর্বে প্রতিপক্ষদের সহিত কিভাবে তাঁহাদিগকে যুঝিতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রবেশ

ইংরেজেরা কেমন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিল তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি লিখিয়াছি। তাহারা নাতালে বসবাস করিতে আরম্ভ করে এবং জুলুদের নিকট হইতে কিছু সুবিধা লওয়ার ব্যবস্থা করে। তাহারা দেখিতে পাইল যে নাতালে খুব ভাল আখ, চা ও কফি উৎপন্ন হইতে পারে। ব্যাপকভাবে চাষ করাতে হাজার হাজার মজুর লাগিবে। তাহারা যে কয়েকটি সেখানে বাস করিতে গিয়াছে তাহা তো মুষ্টিমেয়।

ঐ সময় দাস-প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় যদিও তাহারা নিগ্রোদিগকে কৃষিকার্যে মজুরী করার জন্য অনুরোধ করে এবং অবশেষে ধমক দেয়, তবুও তাহাতে কাজ হয় না। নিগ্রোরা কঠিন পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত নহে। বৎসরে ছয় মাস কাজ করিলেই তাহাদের সহজেই দিনপাত হয় তবে তাহারা কেন বিদেশীদের নিকট গিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকিবে? একটা স্থায়ী মজুরের দল না পাওয়ায় এই ইংরেজদের চাষের কাছে মোটেই সুবিধা হইতেছিল না। এই অবস্থায় তাহারা ভারত সরকারের সহিত কথাবার্তা চালায় এবং মজুর যোগাড় করিয়া দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের সাহায্য চাহে। ভারত সরকার ইহাতে সম্মত হয় এবং প্রথম আমদানি-করা 'গিরিমিটিয়া' মজুরের দল ১৮৬০ সালের ১৬ই নভেম্বর নাতালে পৌছায়। বর্তমান ইতিহাসের পক্ষে উহা এক বিশেষ দিন। যদি ইহা না হইত তবে ভারতীয়েরাও সেখানে থাকিত না, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ করারও আবশ্যক হইত না এবং এই পুস্তক লেখারও প্রয়োজন থাকিত না।

আমার বিবেচনায় ভারত-সরকার মজুর যোগাইতে স্বীকার করিয়া ভাল করেন নাই।

ভারতস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের নাতালবাসী ভাইদের দিকে পক্ষপাত করিয়াছিলেন। আমদানি-করা মজুরদের স্বার্থরক্ষার্থে যতগুলি শর্ত করা দরকার মনে হইয়াছিল সে সকলই করা হইয়াছিল, একথা সত্য। তাহাদের খাওয়ার এক রকম ভাল ব্যবস্থাই হইয়াছিল। কিন্তু এতগুলি

অশিক্ষিত লোকের যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তবে তাহার প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। তাহাদের ধর্ম-আচরণের সাহায্যার্থে ও তাহাদের নৈতিকতা বজায় রাখার দিকে কোনই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। ভারতস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীরা ইহা বিবেচনা করেন নাই যে যদিও দাস-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি মালিক তাহার মজুরদিগের সহিত দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেই চাহিবে। তাঁহাদের একথা বুঝা উচিত হইলেও তাঁহারা বুঝেন নাই যে এই যে মজুরেরা কিছুদিনের জন্য বাস্তবিকপক্ষে ক্রীতদাসই হইয়া গেল। সার ডব্লিউ হান্টার এই মজুরদের সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে নাতালের ভারতীয় মজুরেরা অর্ধ ক্রীতদাসের অবস্থায় থাকে। আর একবার একখানি পত্রে তিনি উহাদের অবস্থা 'প্রায় ক্রীতদাসের' মত বলিয়া বর্ণনা করেন। তারপর নাতালের একজন প্রধানতম ব্যক্তি শ্রীযুক্ত হ্যারি এসকম্ব কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে উঠিয়া ঐ কথাই স্বীকার করেন। ভারত সরকারের নিকট যে সকল আবেদন-পত্র পাঠানো হয়, সেগুলি খুঁজিলেও দেখা যাইবে যে তাহাতে যে সকল শীর্ষস্থানীয় নাতালবাসী ইউরোপীয়দের বিবৃতি-পত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও ভারতীয় মজুরদের দাসত্বের অবস্থাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু অদৃষ্ট নিজ কার্য করিয়া যাইবেই। যে স্টীমার নাতাল অভিমুখে ঐ ভারতীয় মজুরদিগকে লইয়া গিয়াছিল, সেই স্টীমারই সত্যাগ্রহের বীজও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

আমি এই পুস্তকে ভারতীয় মজুরদের দুঃখের সকল কথা লিখিবার স্থান করিতে পারিব না। কেমন করিয়া যে তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নাতালের সহিত সম্পর্কিত ভারতীয় আড়কাঠিরা ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া ভুলের মোহে পড়িয়া তাহারা মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিল, কেমন করিয়া নাতালে পৌঁছিয়াই তাদের চোখ খুলিয়া যায়, তবুও কেমন করিয়া তাহারা সেখানে টিকিয়া থাকে, কেমন করিয়া তাহাদের পর আরও মজুরেরা যাইতে থাকে, কেমন করিয়া তাহারা সমাজ ও ধর্মের সমস্ত সংযম ত্যাগ করে, অথবা তাহাদের সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া যায়, কেমন করিয়া এই হতভাগ্যদের ভিতর হইতে বিবাহিতা স্ত্রী ও রক্ষিতা স্ত্রীলোকের ব্যবধান পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়, সে সকল কথা বলার স্থান এখানে নাই।

যখন মরিসাস্ দ্বীপে সংবাদ গেল যে ভারতবাসী মজুরেরা নাতালে আসিয়াছে, তখন এই ধরনের মজুরদের সম্পর্কযুক্ত মরিসাসের ভারতীয়

ব্যবসায়ীরাও নাতালে যাইতে প্রলুব্ধ হয়। ভারতবর্ষ হইতে নাতালে যাইতে মাঝখানে মরিসাস্ দ্বীপ পড়ে। সেখানে হাজার হাজার ভারতীয় মজুর ও বণিক বাস করে। মরিসাসের একজন ভারতীয় বণিক শেঠ আবুবকর আমদ নাতালে দোকান খোলার কথা চিন্তা করেন। তখনকার দিনে নাতালের ইংরেজেরা জানিত না যে ভারতীয়েরা ব্যবসাক্ষেত্রে কি করিতে পারে, জানিবার আগ্রহও তাহাদের ছিল না। তাহারা ভারতীয় মজুরের সাহায্যে খুব লাভজনক কৃষিকার্য করিতেছিল—ইক্ষু, চা, কফি ইত্যাদির চাষ শুরু করিয়াছিল। তাহারা চিনি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় একরূপ ভাল পরিমাণেই স্থানীয় চিনি, চা, ও কফি যোগাইতে আরম্ভ করে। তাহারা এত টাকা রোজগার করিতে লাগিল যে প্রাসাদতুল্য ঘর-বাড়ি তৈয়ারী করিয়া ফেলিল ও একটা বনভূমিকে উদ্যানে পরিণত করিল। এই অবস্থায় শেঠ আমদের মত একজন সৎ ও কুশল ব্যবসায়ী যদি তাহাদের মধ্যে গিয়া বসেন, তবে তাহা তাহাদের গ্রাহ্যের মধ্যে না আনারই কথা। আবার ইহার উপরে একজন ইংরেজই অংশীদার হিসাবে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। আবুবকর শেঠ ব্যবসা করিতে লাগিলেন, জমি ক্রয় করিলেন এবং তাঁহার সমৃদ্ধির কথা তাঁহার দেশ পোরবন্দর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে পৌঁছাইল। তাহার পর অন্য মেমানেরা নাতালে আসিলেন। সুরাটের বোরারা মেমানদের পর গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের কারবারের হিসাব রাখার দরকার হইত। সেই জন্য গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড় হইতে হিন্দু হিসাবনবীশরা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নাতালে এইভাবে দুই শ্রেণীর লোক বাস করিতে লাগিল। এক স্বাধীন ব্যবসায়ী ও তাহাদের কর্মচারীগণ, আর আমদানি করা মজুর। কালক্রমে আমদানি-করা মজুরদের সন্তান-সন্ততি হইল। যদিও তাহারা কাজ করিতে বাধ্য ছিল না, তথাপি এই সকল সন্তানদের উপরেও কতকগুলি কঠিন আইনের শর্ত প্রযুক্ত হয়। দাসের সন্তানেরা দাসত্বের দাগ এড়াইবে কি করিয়া? মজুরেরা নাতালে পাঁচ বৎসর কাজ করিবার শর্ত করিয়া যাইত। এই কাল অতিবাহিত হইলে তাহাদের আর কাজ করার বাধ্যতা থাকিত না। ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে নাতালে তাহাদের তখন মজুরী করিতে পারারই কথা অথবা ব্যবসা কিংবা বসবাস করিতে পারার কথা। কেহ কেহ ঐভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিল, কেহ কেহ বা দেশে ফিরিল। যাহারা নাতালে রহিল, তাহাদিগকে

মুক্ত ভারতবাসী বলা হইত। এই শ্রেণীর লোকের অবস্থার বিশিষ্টতা বুঝা দরকার। যাহারা একেবারে স্বাধীনভাবেই ভারত হইতে গিয়াছে, তাহাদের সমান সুখ-সুবিধা এই মুক্ত ভারতীয়েরা ভোগ করিতে পারিত না। যেমন একটা নিয়ম ছিল যে তাহারা বিনা পাসে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারিবে না। যদি তাহারা বিবাহ করে, তবে সে বিবাহ একজন রাজ-কর্মচারীর নিকট গিয়া রেজিস্ট্রী করাইয়া লইতে হইত। আরও কতকগুলি কঠিন বিধি-নিষেধ তাহাদের পালন করিতে হইত।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দেখিল যে তাহারা কেবল আমদানি-করা মজুর ও স্বাধীন ভারতীয়দের সহিত ব্যবসায় করা ছাড়াও নিগ্রোদের সহিতও ব্যবসায় করিতে পারে। নিগ্রোরা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বড় ভয় করিত বলিয়া ভারতীয়দের সহিত ব্যবসায় করিতে তাহাদের খুব সুবিধা হইত। ইউরোপীয়েরা নিগ্রোদের সহিতব্যবসায় করার ইচ্ছা রাখিত, কিন্তু তাই বলিয়া নিগ্রোর সহিত ভদ্রভাবে ব্যবহার করিবে—একথা নিগ্রোরা প্রত্যাশা করিতে পারে না। যদি টাকার মূল্যের উপযুক্ত জিনিস পায় তাহা হইলেই তাহার অদৃষ্ট ভাল বলিতে হইবে। তাহাদের কাহারও কাহারও ভাগ্যে এমনও ঘটিত যে চার শিলিং মূল্যের কিছু কিনিয়া একটি সভরেন দিলে ষোল শিলিং ফেরত না পাইয়া মাত্র চার শিলিং ফেরত পাইয়াছে। আবার কখনও বা কিছুই পায় নাই। যদি বেচারী ব্যক্তিটা চায় ও বলে যে তাহার পাওনা আছে, তাহার উত্তরে তাহার উপর অকথ্য গালি বর্ষিত হয়। আর যদি ঐ পর্যন্তই থামে এবং তাহার উপর লাথি ও থাপ্পড় না পড়ে, তবেই তাহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। সকল ইংরাজ ব্যবসাদারেরাই যে এইরূপ করে, একথা আমি বলিতে চাই না। কিন্তু ইহাও ঠিক যে এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটে। অপর পক্ষে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা নিগ্রোর সহিত মিষ্ট কথা বলিত, কখনও কখনও হাসি-তামাশাও করিত। সরল নিগ্রোরা দোকানে ঢুকিয়া যাহা কিনিতে ইচ্ছা করে তাহা যদি হাতে লইয়া দেখিতে চাহিত, ভারতীয়েরা তাহাদের সে অধিকারও দিত। অবশ্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা এরূপ করিত না। তাহাদের ব্যবসায়ের স্বার্থই ভদ্রব্যবহারের হেতু। ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও সুবিধা পাইলে নিগ্রোকে ঠকাইত, তবুও ভদ্রব্যবহারের জন্য ভারতীয়েরা নিগ্রোদের প্রিয় হইয়া উঠে। অপরপক্ষে ইহাও দেখা গিয়াছে যে হয়ত কোনও ভারতীয় নিগ্রোকে ঠকাইয়াছে এবং নিগ্রোরা ধরিতে পারিয়া ব্যবসায়ীকে লাঞ্ছিতও করিয়াছে।

উপরন্তু নিগ্রোদের মনে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে ভীতি ভাব ছিল না। নিগ্রো ক্রেতারই ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে গালিগালাজ করার কথা বেশী শুনা যায়। নিগ্রো ও ভারতীয়দের কথা ধরিলে ভারতীয়েরাই নিগ্রোদিগকে ভয় করিয়া চলিত। ফলে ভারতীয়দের নিগ্রোদের সহিত ব্যবসা খুব লাভজনকই হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় নিগ্রো তো সর্বত্রই ছিল।

১৮৮০ সালের কাছাকাছি ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে বুয়ারদিগের প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছিল। বলা বাহুল্য এই শাসনতন্ত্রে নিগ্রোর কোনও ক্ষমতা ছিল না। উহা ছিল নিছক শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপার। ভারতীয়েরা শুনিয়াছিল যে তাহারা বুয়ারদিগের সহিতও ব্যবসায় করিতে পারে। বুয়ারেরা সরল, অকপট ও অনাড়ম্বর বলিয়া ভারতীয়দের সহিত তাহাদের ব্যবসা করা সম্ভব। সেই জন্য কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ী ট্রান্সভাল ও ফ্রী স্টেটে গিয়া দোকান খোলে। তখন রেল ছিল না বলিয়া ব্যবসায়ীরা খুব লাভ করিত। ভারতীয়দের অনুমান যথার্থ প্রতিপন্ন হইল। তাহারা বুয়ার ও নিগ্রোদের সহিত ফলাও করিয়া কারবার করিতে আরম্ভ করে। আবার কেপ-কলোনিতেও জনকতক ভারতীয় ব্যবসায়ী গিয়া ভালরূপ উপার্জন করিতে আরম্ভ করে। ভারতীয়েরা এইভাবে চারিটি উপনিবেশের মধ্যে অল্প অল্প ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার, মুক্ত ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

অভাব অভিযোগের পর্যালোচনা

নাতাল

নাতালের কৃষিক্ষেত্রের ইউরোপীয় মালিকদের আবশ্যকতা ছিল কেবল ক্রীতদাসের। যাহারা নির্দিষ্ট সময় তাহাদের চাকুরি করিয়া তাহার পর তাহাদেরই সহিত যৎসামান্য ভাবেই হোক্ প্রতিযোগিতা করিতে বসিবে, এমন লোক তাহারা রাখিতে পারে না। যাহারা ভারতবর্ষে কৃষিকার্য বা অন্য কার্যে বিশেষ সফলতা পায় নাই, তাহারাই যে আমদানি-করা মজুর হইয়া

গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবুও একথা মনে করা চলে না যে তাহারা কৃষিকার্য জানিত না অথবা জমির সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল না। তাহারা দেখে যে যদি তাহারা নাতালে কেবল সব্জীরই চাষ করে তাহা হইলে বেশ উপার্জন করিতে পারে আর যদি নিজস্ব একটু জমি পায় তবে আরও ভাল হয়। সেই জন্য অনেকেই নিজেদের চুক্তির সময় শেষ হইলে কোনও না কোনও একটা কাজ লইয়া বসিয়া যাইতে লাগিল। নাতালের ঔপনিবেশিকদিগের পক্ষে মোটের উপর ইহা ভাল ছিল। অনেক তরকারি ও সব্জী যাহা পূর্বে উপযুক্ত কৃষকের অভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মিত না, এক্ষণে তাহার চাষ হইতে আরম্ভ হইল। অন্যান্য তরকারি যাহা অল্পমাত্র উৎপন্ন হইত, তাহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। তরকারির দাম সস্তা হইয়া গেল। ইউরোপীয় কৃষিক্ষেত্রের মালিকেরা এই উন্নতিটা পছন্দ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদের একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী প্রবেশ করিতেছে। মুক্ত ভারতীয় মজুরদিগের বিরুদ্ধে সেই জন্য একটা আন্দোলন আরম্ভ হইল। পাঠক হয়ত আশ্চর্য হইবেন যে, যে-ইউরোপীয়েরা অধিক সংখ্যায় আমদানি-করা মজুর চাহিতেছিল এবং যত পাইতেছিল সে সমস্তই কাজে লাগাইতেছিল, অন্যত্র আবার তাহারাই এই আমদানির শর্ত হইতে মুক্ত হওয়ার পর এই ভারতীয় মজুরদিগকে নানা প্রকারে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। ভারতীয়েরা তাহাদের পরিশ্রম ও কুশলতার জন্য এই ভাবে পুরস্কৃত হইল।

এই আন্দোলন নানারূপ আকার ধারণ করে। একদল এই চেষ্টা করিতে লাগিল যে আমদানির শর্তকাল পূর্ণ হওয়ার পরেই মজুরদিগকে হয় পুনরায় চুক্তি করিতে হইবে, নয় তো ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা হইবে এবং নূতন আমদানি যাহারা আসিবে তাহাদিগকে এই শর্তেই আনা হইবে। আর একদল আন্দোলন করিতে লাগিল যে চুক্তি-মুক্ত হওয়ার পরই ভারতীয়েরা পুনরায় নূতন মজুরীর চুক্তি না করিলে তাহাদিগের উপর মাথাপিছু খুব একটা মোটা রকম ট্যাক্স বা কর ধার্য করা হইবে। যেমন করিয়াই হোক্ ভারতীয় চুক্তি-মুক্ত মজুরের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বাধীনভাবে থাকা বন্ধ করাই উভয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। এই আন্দোলন এত প্রবল হয় যে, নাতাল সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন দ্বারা আন্দোলনকারীদের সে সময়ে বিশেষ কোন লাভ হইল না। কমিশন যে সকল সাক্ষ্য

লইলেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে উভয় দলের দাবিই অন্যায্য এবং মুক্ত-মজুরেরা থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণের মোটের উপর লাভই হইতেছে। নিরপেক্ষ লোকদিগের সাক্ষ্য আন্দোলনকারী-দিগের বিপক্ষেই যায়। আগুন যেখান দিয়া যায় সেখানে তাহার দাগ রাখিয়া যায়। এই আন্দোলনও নাতাল সরকারকে তেমনি কতকটা প্রভাবিত করিল। নাতাল সরকার কৃষিক্ষেত্রের মালিকদের সহিত বন্ধুতাসূত্রেই আবদ্ধ ছিলেন। নাতাল সরকার সেই জন্য ভারত সরকারের সহিত এ বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং উভয় দলের প্রস্তাবই ভারত সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। যে প্রস্তাবে চুক্তি-বদ্ধ মজুরেরা চিরদিনের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত হয় তাহা ভারত সরকার তখনই একেবারে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষ হইতে এতদূরে এই মজুরদিগকে যাইতে দেওয়ার একটা হেতু বা সাফাই এই ছিল যে তাহারা সেখানে গিয়া চুক্তিকাল শেষ করার পর নিজ নিজ পরিশ্রম দ্বারা অবস্থা ভাল করিয়া লইতে পারিবে। তখন নাতাল ব্রিটিশ রাজ-সরকারের উপনিবেশ ছিল। কাজেই ইংলণ্ডের উপনিবেশ দপ্তর হইতেও এই অন্যায্য বিষয়ে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল ও অন্যান্য হেতু বশতঃ নাতালে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং অবশেষে ১৮৯৩ সালে তাহা প্রাপ্ত হয়। এখন নাতাল নিজের সামর্থ্য অনুভব করিতে লাগিল। উপনিবেশের বিলাতস্থ বিভাগও যে কোন দাবি গ্রহণ করিতে আর এখন অসুবিধা বোধ করিবে না। নাতালের নব-গঠিত সরকারের প্রতিনিধিরা ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিতে ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে চুক্তি-মুক্ত ভারতীয়দিগকে নাতালে থাকিতে বাৎসরিক পঁচিশ পাউণ্ড বা তিনশত পঁচাত্তর টাকা মাথা পিছু কর দিতে হইবে। একথা বোঝা সহজ যে এই প্রকার একটা কর দিয়া বাস করার সাধ্য দরিদ্র মজুরের নাই। লর্ড এলগিন ছিলেন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। তিনি ঐ টাকাটা অতিরিক্ত মনে করেন এবং বাৎসরিক তিন পাউণ্ড কর বসাইতে সম্মতি দেন। আমদানির সময়কার বেতনের হারের তুলনায় ইহা প্রায় ছয় মাসের রোজগারের সমান। এই কর কেবল মজুরের উপর ধার্য হইল না। তাহার স্ত্রীর উপর, কন্যার বয়স তের বৎসর হইলে তাহার উপর এবং পুত্রের বয়স ষোল বৎসর হইলে তাহার উপরও এই কর ধরা হইল। সাধারণতঃ ইহাতে প্রত্যেক মজুরকেই বার্ষিক বত্রিশ পাউণ্ড কর দিতে হয়।

এই করের জন্য যে কষ্ট হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাহাদের এই কর দিতে হইত তাহারাই ইহার দুঃখ যে কত তাহা অনুভব করিত আর যাহারা তাহাদিগের দুঃখ চক্ষে দেখিত, তাহারাই উহার কতকটা ধারণা করিতে পারিত। নাতাল সরকারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চলে। বিলাতে ও ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিয়া দুঃখ জানানো হয়। কিন্তু করের পরিমাণ কিছু কমানো ছাড়া আর কোনও ফল হয় না। গরীব মজুরেরা ইহার বুঝেই বা কি, আর প্রতিকারের উপায়ই বা কি জানে? তাহাদের পক্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাই দেশপ্রেম অথবা জনসেবার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন চালান।

স্বাধীন ভারতীয়দের অবস্থাও বড় ভাল ছিল না। নাতালের ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা তাহাদের বিরুদ্ধেও একই অভিপ্রায়ে আন্দোলন চালাইতে থাকে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা ভাল জায়গায় জমি লইয়াছিল। যেমন মুক্ত মজুরদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তেমনি তাহাদের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষ হইতে হাজার হাজার বস্তা চাউল আনাইয়া ভাল লাভ রাখিয়া বিক্রীত হইতে লাগিল। স্বভাবতঃই এই ব্যবসা ভারতীয়দের হাতেই ছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা জুলুদের সহিতও ব্যবসা করিত। ইহারা এই জন্য মাঝারি ইউরোপীয় বণিকদের চক্ষুশূল হয়। এদিকে আবার কয়েকজন ইউরোপীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দেখাইয়া দেন যে আইন অনুসারে তাঁহারা নাতালের বিধানসভার নির্বাচনের ভোট দিতে পারেন এবং নির্বাচনপ্রার্থীও হইতে পারেন। কয়েকজন ব্যবসায়ী নিজেদের নাম ভোটার-তালিকাভুক্ত করিয়া দেন। ইহার ফলে ইউরোপীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সহিত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যোগ দেন। নাতালে ভারতীয়দের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের অবস্থা সুরক্ষিত হইলে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয়েরা টিকিতে পারিবেন কিনা --এই সন্দেহ তাঁহাদের হয়। সেই জন্য স্বায়ত্তাধিকার প্রাপ্ত নাতাল সরকারের প্রথম কাজই হয় এমন একটা আইন পাস করিয়া লওয়া, যাহাতে ভারতীয়দের যে কয়জন ভোটার-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাহা বাদে আর কেহ যেন ভোটের অধিকার না পান। নাতালের বিধানসভায় ১৮৯৪ সালে ঐ মর্মে এক বিল উপস্থিত করা হয়। এই বিলের মধ্যে ভারতীয়দিগকে ভারতীয় বলিয়াই বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যমূলক আইন নাতালে

এই প্রথম প্রস্তাবিত হয়। ইহার প্রতিবাদ ভারতীয়েরা করেন। একরাত্রের মধ্যে চারিশত স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া এক আবেদন প্রেরিত হয়। এই আবেদন নাতালের বিধানসভায় পেশ করিলে সভা চমকিত হইয়া পড়ে। তবে বিল যেমন পাস হওয়ার, পাস হইয়া যায়। বিলাতে তখন উপনিবেশের মন্ত্রী ছিলেন লর্ড রিপন। তাঁহার নিকট দশ হাজার লোকের স্বাক্ষর সমেত এক আবেদন পাঠানো হয়। দশ হাজার স্বাক্ষর মানে নাতালে তখন যত স্বাধীন ভারতবাসী ছিলেন তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই স্বাক্ষর। লর্ড রিপন এই বিল অনুমোদন করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এইপ্রকার বর্ণভেদ সূচক আইন করায় সম্মতি দিতে পারেন না। পাঠকেরা পরে বুঝিবেন যে এই ঘটনা ভারতীয়দের পক্ষে একটা কত বড় জয়ের ব্যাপার হইয়াছিল। নাতাল সরকার তখন আর একটি আইনের বিল উপস্থিত করিলেন। তাহাতে প্রকাশ্যে বর্ণবৈষম্য ছিল না, কিন্তু পরোক্ষভাবে ভারতীয়দিগকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। ভারতীয়েরা ইহার বিরুদ্ধেও ব্যর্থ প্রতিবাদ করেন। এই বিলের মানে দ্ব্যর্থযুক্ত ছিল। ভারতীয়েরা প্রিভিকাউন্সিলে এই আইনের ব্যাখ্যার জন্য আবেদন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। আমি এখনও মনে করি যে ভারতীয়েরা এই অকুরন্ত মামলার চক্রে না পড়িয়া ভালই করিয়াছিলেন। বর্ণভেদটা যে বিধিবদ্ধ হইতে দেওয়া হয় নাই উহাই কম কথা নয়।

নাতালের খামারের মালিকেরা ও নাতাল সরকার ইহাই যথেষ্ট মনে করিলেন না। ভারতীয়দের রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্তি সমূলে নাশ করা কেবল প্রাথমিক অত্যাবশ্যকীয় করণীয় ছিল, কিন্তু তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের ব্যবসা ও ভারতীয়দের অবাধ প্রবেশের অধিকার বন্ধ করা। কোটি কোটি লোকের সম্পদের সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ পাছে লোক পাঠাইয়া নাতাল ভরিয়া ফেলে এই ভয়ই নাতালের ইউরোপীয়দের হইয়াছিল। নাতালের এই সময়কার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ জুলু, ৪০ হাজার ইউরোপীয়, ৬০ হাজার চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়, ১০ হাজার চুক্তিমুক্ত ও ১০ হাজার স্বাধীনভাবে আগত ভারতীয়। বস্তুতঃ ইংরেজদের সত্যকার কোনও ভয় ছিল না, কিন্তু অনির্দিষ্ট ভয় যাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে যুক্তি দিয়া তাহাদিগকে বুঝানো যায় না। তাঁহারা ভারতবাসীদের অসহায় অবস্থা ও তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের কথা জানিতেন না। সেই জন্য মনে করিতেন যে ভারতীয়েরা তাঁহাদেরই মত অদৃষ্ট

লইয়া পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের মতই উপায় উদ্ভাবনে তৎপর। তাঁহাদের নিজেদের সংখ্যার তুলনায় ভারতবর্ষের বিপুল লোকসংখ্যার কথা ভাবিয়া তাঁহারা যদি মিথ্যা ভয়ে ভীত হইয়া উঠেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সে যাহাই হোক জাতি-বৈষম্যের আইনে এইভাবে বাধা দেওয়ার ফলে পরে আরও যে দুইটি আইন হয় তাহাতে পরোক্ষভাবে ঐ কার্য নাতাল সরকার সারিয়া লন। সেইজন্য অবস্থাটা যত খারাপ হইতে পারিত তাহার তুলনায় কিছু কম হইয়াছিল। এই শেষোক্ত আইনের সময় ভারতীয়েরা খুবই বাধা দেন, কিন্তু উহাও আইন হইয়া যায়। ইহার মধ্যে একটি আইন দ্বারা ভারতবাসীদের নাতালের ব্যবসায় পথে যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, অপর আইন দ্বারা ভারতীয়দের নাতালে প্রবেশ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম আইনটির মর্ম ছিল এই যে নির্দিষ্ট কর্মচারীর নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি না লইয়া নাতালে কেহ ব্যবসা করিতে পারিবে না। কার্যতঃ যে কোনও ইউরোপীয় লাইসেন্স পাইতেন, কিন্তু ভারতীয়দের অসুবিধার অন্ত ছিল না। ভারতীয়দিগকে এই জন্য উকীল লাগাইতে হইত এবং অন্য প্রকারে ব্যয় করিতে হইত। যাঁহারা ইহা করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের লাইসেন্স পাওয়া ঘটিত না। আর দ্বিতীয় আইনটি ছিল এই যে যাহারা কোনও ইউরোপীয় ভাষা-জ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে কেবল তাহাদিগকেই নাতালে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। ভারতের কোটি কোটি লোকের নিকট এইভাবে নাতালে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হয়। নাতাল সরকারের সম্বন্ধে আমি কোনও ভ্রান্ত ধারণা পাঠকদিগকে না দিয়া ফেলি সেইজন্য আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। নাতাল সরকার ঐ আইনের মধ্যে এই শর্তও রাখিয়াছিলেন যে আইন গৃহীত হওয়ার তিন বৎসর পূর্ব হইতে যাঁহারা নাতালে আছেন, তাঁহারা নাতালবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহারা স্ত্রী ও নাবালক সন্তান সহ ভারতে যাইতে ও সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় নাতালে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

উপরে যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা ছাড়াও নাতালে চুক্তি-বদ্ধ অথবা মুক্ত ভারতীয়দের আইনী ও বেআইনী অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, আজও হইতেছে। সেগুলি বর্ণনা করা অনাবশ্যক মনে করি। বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে যতটা বিবরণ দেওয়া দরকার ততটুকুই আমি দিতে ইচ্ছা করি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয়দের স্থিতির অবস্থা বর্ণনা

করিতে অনেক লেখা আবশ্যক, কিন্তু উহা বর্তমান পুস্তকের পরিধির বহির্ভূত।

পঞ্চম অধ্যায়

অভাব-অভিযোগের আলোচনা

ট্রান্সভাল ও অন্যান্য উপনিবেশে

১৮৮০ সালের পূর্ব হইতেই নাতালের ন্যায় অন্যান্য উপনিবেশেও ভারতীয় বিরোধী মনোভাব গঠিত হইতে থাকে। এক কেপ কলোনি ছাড়া অন্য সর্বত্রই এই ভাবটা দেখা দিয়াছিল যে মজুরী খাটিতে ভারতীয়েরা খুব ভাল। কিন্তু স্বাধীন ভারতীয়ের প্রবেশ দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার যে ক্ষতি হইতেছে উহা স্বতঃসিদ্ধ, উহার আর প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। ট্রান্সভাল ছিল এক সাধারণতন্ত্র। ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্টের নিকট গিয়া নিজেদের ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া ঘোষণা করা মানে ভারতীয়দের স্বেচ্ছায় উপহাসাস্পদ হওয়া। যদি কোনও অসুবিধা থাকে তবে ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে তাহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়—প্রিটোরিয়ার ব্রিটিশ এজেন্টকে জানানো। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে স্বাধীন ট্রান্সভালে এই ব্রিটিশ এজেন্ট তবুও যাহা হউক কিছু সহায়ক ছিলেন, কিন্তু যখন ট্রান্সভাল ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত হইল তখন সাহায্য করার এমন লোকও আর রহিল না। লর্ড মর্লি যখন ভারতবর্ষের সেক্রেটারী ছিলেন তখন এখানকার একদল প্রতিনিধি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া অভিযোগ জানাইতে গেলে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে উপনিবেশের উপর ব্রিটিশ সরকারের কোনও অধিকার নাই। তাঁহাদিগকে হুকুম করা যায় না। তাঁহারা কেবলমাত্র অনুরোধ করিতে পারেন, যুক্তি দেখাইতে পারেন। যাহাতে নীতি-সমূহ প্রযুক্ত হয় তাহার জন্য নির্বন্ধাতিশয় জানাইতে পারেন। বস্তুতঃ নিজেদের উপনিবেশের তুলনায় অন্যান্য রাজশক্তির সহিত তাঁহারা অধিকতর সফলতার সহিত বিতর্ক করিতে পারেন, বুয়ার সাধারণতন্ত্রের সহিত যেমন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সহিত উপনিবেশের এমন সূক্ষ্ম সূত্রের বন্ধন

যে সামান্ত টান পড়িলেই তাহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। জোর করার সেখানে কোনই সম্ভাবনা ছিল না। সেখানে কথাবার্তা চালাইয়া যতটা হয় তাহা করিবেন বলিয়া লর্ড মর্লি প্রতিশ্রুতি দেন। যখন ট্রান্সভালে বুয়রদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল, তখন ভারতীয়দিগের প্রতি বুয়রদের দুর্ব্যবহার অন্যতম কারণ একথা লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড সেলবোর্ণ এবং অন্য ইংরাজ রাজনীতিবিদেরা বলেন।

এই দুর্ব্যবহার কি প্রকারের তাহা এক্ষণে দেখা যাক। ভারতীয়েরা ১৮৮১ সালে প্রথম ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন। শেঠ আবুবকর প্রিটোরিয়াতে একটি দোকান খোলেন এবং একটি প্রধান রাস্তার উপর এক টুকরা জমি কিনেন। অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও তাঁহার পন্থানুসরণ করেন। তাঁহাদের আত্যন্তিক কৃত-কার্যতায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ঈর্ষা হয় এবং তাঁহারা সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন ও তাঁহাদের পার্লামেণ্টে দরখাস্ত দেন যে ভারতীয়দিগকে যেন বহিষ্কার করা হয় এবং তাঁহাদের ব্যবসা যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই নূতন আবিষ্কৃত দেশে ইউরোপীয়দের অর্থ-ক্ষুধা বড় বিষম ছিল। ন্যায়-অন্যায় নীতির বন্ধন সম্বন্ধে তাঁহারা একরকম অজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা যে দরখাস্ত দেন তাহাতে জানান, "এই ভারতীয়দের মানুষের মত সম্ভ্রমজ্ঞান নাই। তাহারা জঘন্য ব্যাধিতে ভোগে। তাহারা প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কামনার বস্তু মনে করে। তাহাদের বিশ্বাস এইযে, স্ত্রীলোকদিগের কোন আত্মাই নাই।" এইচারটি বাক্যে চারটি মিথ্যা কথা রহিয়া গিয়াছে। এই ধরনের উদাহরণ বাড়াইয়া যাইতে পারা যায়। ইউরোপীয়েরা এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে ছিলেন সমান। ভারতীয়েরা জানিতেনই না যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি ভীষণ ও অন্যায় প্রচার-কার্য চলিতেছে। তাঁহারা সংবাদপত্র পড়িতেন না। সংবাদপত্রের আন্দোলন এবং দরখাস্ত ইত্যাদিতে কাজ হইল। বুয়র পার্লামেণ্টে একটি আইনের খসড়া উত্থাপিত হইল। প্রধান প্রধান ভারতীয়েরা যখন শুনিলেন যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি প্রকার ঘটনা সৃষ্টি করা হইয়াছে, তখন তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি তাঁহাদিগকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড় করাইয়া রাখেন। তিনি খানিক-ক্ষণ তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলেন, "তোমরা হইতেছ ইসমেলের সন্তান, সেই জন্য জন্ম হইতেই তোমরা ইসাউ-এর সন্তানগণের দাসত্ব করিতে বাধ্য। ইসাউ-এর সন্তান হিসাবে আমরা তোমাদিগকে আমাদের সমান অধিকার দিতে

পারি না। আমরা যেটুকু দিই তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিও।" প্রেসিডেণ্টের এই জবাব যে ক্রোধ বা দ্বেষ-প্রণোদিত—একথা বলা যায় না। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার বাল্যকাল হইতেই পুরাতন বিধানের (Old Testament) গল্প শুনিয়া আসিয়াছেন এবং তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যদি কেহ নিজে যে বিশ্বাস পোষণ করেন তাহাই ব্যক্ত করেন, তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় কেমন করিয়া? কিন্তু অজ্ঞতা যদি সরলতার সহিত যুক্ত থাকে তাহা হইলেও ক্ষতি অনিবার্য। ফলে ১৮৮৫ সালে একটা বিষম আইন তাড়াহুড়া করিয়া 'ভল্‌কস্রাড্' বা পার্লামেণ্টে মঞ্জুর করানো হইল। ভাব এই প্রকার যে, ভারতীয়েরা আসিয়া যেন ট্রান্সভাল এখনই ছাইয়া ফেলিতেছে। ভারতীয় নেতাগণের অনুরোধে ব্রিটিশ এজেণ্টকেও এ বিষয়ে কিছু করিতে হয়। অবশেষে এই প্রশ্ন উপনিবেশের বিলাতস্থ সেক্রেটারীর হাতে যায়। ১৮৮৫ সালের এই তিন আইন অনুসারে প্রত্যেক ভারতীয়কেই ২৫ পাউণ্ড করিয়া ফি দিয়া ব্যবসা করার হুকুম লইতে হইবে, আর না করিলে গুরুতর সাজার ব্যবস্থা ছিল। তারপর কোনও ভারতীয়কেই এক ইঞ্চি জমিরও অধিকারী হইতে দেওয়া হইবে না। অথবা ভারতীয়েরা নাগরিকের অধিকার পাইতে পারিবে না। এই সমস্তই স্পষ্টতঃ এত অন্যায় ছিল যে, ট্রান্সভাল সরকারও ইহা যুক্তি দিয়া সমর্থন করিতে পারেন নাই। বুয়ার ও ব্রিটিশদের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল, তাহাকে "লণ্ডন কনভেনসন" বলা হইত। ইহার চতুর্দশ ধারার দ্বারা ব্রিটিশ প্রজার অধিকার রক্ষিত হইত। ব্রিটিশ সরকার, কনভেনসনের বিরোধী বলিয়া এই আইনের প্রতিবাদ করেন। বুয়ারেরা বলেন যে ব্রিটিশ সরকার পূর্বেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এই আইনে সম্মতি দিয়াছেন।

এই ভাবে ব্রিটিশ ও ট্রান্সভাল সরকারের ভিতর একটা বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং ব্যাপারটা কোনও সালিশে দেওয়ার প্রস্তাব হয়। সালিশের বিচারের ফল সন্তোষজনক হয় নাই। সালিশ উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ফলে ভারতীয়েরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। ফল কেবল এইমাত্র হয় যে অন্যায় যতটা হইতে পারিত তাহা না হইয়া কিঞ্চিৎ কম হয়। রেজেস্ট্রির ফি ২৫ পাউণ্ড হইতে তিন পাউণ্ডে নামে। ভারতীয়েরা জমি আদৌ কিনিতে পারিবেন না এ শর্ত উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সরকারের ইচ্ছানুরূপ কতকগুলি স্থান, গলি বা পাড়ায় ভারতবাসীরা স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবেন—স্থির হয়।

তবে সরকার এই প্রতিশ্রুতিও সততার সহিত পালন করেন নাই এবং

'লোকেশন' বা ভারতীয়দের জন্ম নির্দিষ্ট এলাকাতেও মৌরসী সত্ত্বে ভারতীয়দিগকে জমি কিনিতে দেওয়া হয় নাই। ভারতীয়দের বাস আছে এরূপ প্রত্যেক শহরেই শহর হইতে অনেক দূরে নোংরা জায়গায় এই 'লোকেশন' নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত এবং সেখানে নাথাকিত জল, আলো, রাস্তা বা পায়খানার ব্যবস্থা। এমনি করিয়া ভারতীয়েরা ট্রান্সভালের অস্পৃশ্য হইলেন। একথা সত্য যে ট্রান্সভালের এই ভারতীয় পাড়া বা 'লোকেশনের' সহিত ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যদের পাড়ার কোনও তফাৎ নাই। ঠিক যেমন হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে অস্পৃশ্যদিগকে ছুঁইলেই অশুচি হইতে হয়, ট্রান্সভালের ইউরোপীয়েরাও তেমনি বিশ্বাস করেন যে ভারতীয়দের স্পর্শে আসিলে অথবা তাঁহাদের নিকটে থাকিলেও তাঁহারা অশুচি হইবেন। তারপর ট্রান্সভাল সরকার ১৮৮৫ সালের তিন আইনের এমন অর্থও করেন যে ভারতীয়েরা কেবলমাত্র 'লোকেশনে'ই ব্যবসা করিতে পারিবেন। সালিশ বলিয়া দেয় যে আইনের অর্থ করা সাধারণ আদালতের উপর নির্ভর করিবে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বড়ই বিশ্রী অবস্থায় পড়েন। তবুও তাঁহারা কোনও মতে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কোথাও বা ইহা লইয়া সরকারের সহিত কথাবার্তা চালাইয়া, কোথাও বা নালিশ করিয়া, আবার কোথাও বা যতটুকু পারা যায় খাতিরে কাজ চালাইয়া লইতে লাগিলেন। বুয়ার যুদ্ধের আরম্ভের সময় ভারতীয়দের এমনি অনিশ্চিত ও দীন অবস্থা চলিতেছিল।

আমরা এখন ফ্রী-স্টেটের অবস্থা আলোচনা করিব। সেখানে দশ-বারো জন ভারতীয় দোকান খুলিতেই ইউরোপীয়েরা সোরগোল আরম্ভ করিলেন। সেখানকার পার্লামেণ্ট খুব কড়া আইন পাস করিয়া ভারতীয়দিগকে স্টেট হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের দোকানের জন্য নামমাত্র খেসারত দিলেন। সেই আইনের মর্ম এই ছিল যে কোনও ভারতীয়ই কোনক্রমেই সেখানে সম্পত্তি করিতে পারিবেন না, ব্যবসা করিতে পারিবেন না, অথবা ভোটের অধিকার পাইবেন না। বিশেষ অনুমতিক্রমে কোনও ভারতীয় মজুরী খাটার অথবা হোটেলের 'ওয়েটারের' কাজে লাগিতে পারেন। কিন্তু আবেদন করিলেই যে কর্তারা এই মহামূল্যবান অনুমোদন দিতে বাধ্য, তাহাও নহে। ফলে কোনও আত্মসম্মান-সম্পন্ন ভারতীয়ের দুই দিনের জন্তও ফ্রী-স্টেটে যাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। বুয়ার যুদ্ধের সময় ফ্রী-স্টেটে দুই একজন 'ওয়েটার' ব্যতীত আর কোনও ভারতীয়ই ছিলেন না। কেপ কলোনিতেও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে

সংবাদপত্রে আন্দোলন চলিয়াছিল এবং তাঁহাদিগের প্রতি যে ব্যবহার করা হইতেছিল তাহাও হীনতার ছাপ হইতে মুক্ত ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ভারতীয়দের ছেলেদিগকে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করা যাইত না, ভারতীয় ভ্রমণকারীরা হোটেলে থাকার স্থান পাইতেন না। কিন্তু ব্যবসা বা জমি কেনা সম্বন্ধে কোনও প্রকার বাধা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল না।

অবস্থার এই পার্থক্যের হেতুও ছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে কেপ কলোনিতে, বিশেষতঃ কেপ টাউনে অনেক মালয় ছিলেন। মালয়েরা মুসলমান বলিয়া তাঁহারা অচিরকালেই ভারতীয় মুসলমানদের সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহা হইতে অন্য ভারতীয়দের সহিতও যোগ হইয়াছিল। তারপর জনকতক ভারতীয় মুসলমান মালয় স্ত্রী বিবাহ করেন। কেপ কলোনির সরকার মালয়দের বিরুদ্ধে কেমন করিয়া আইন করেন? কেপই ছিল তাঁহাদের মাতৃভূমি, ডাচ ছিল তাঁহাদের ভাষা এবং তাঁহারা প্রথম হইতেই ডাচদের সঙ্গে থাকিয়া ডাচদের জীবনযাত্রার ধারা অনেকাংশে অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য কেপ কলোনি বর্ণবিদ্বেষ দ্বারা খুব অল্পই প্রভাবিত হইয়াছিল।

তারপর কেপ কলোনি ছিল সর্বাপেক্ষা পুরাতন উপনিবেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। কেপ কলোনিতে অনেক স্থিরবুদ্ধি উদারহৃদয় ইউরোপীয় জন্মিয়াছিলেন। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোনও স্থান নাই বা এমন কোনও জাতি নাই, উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে যাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির উদ্ভব না হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র এই প্রকারের লোকের পরিচয় পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তবে কেপ কলোনিতে এই প্রকারের লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ছিলেন মিঃ মেরিম্যান। ১৮৭২ সালে কেপ কলোনি যখন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় ইনি তখন প্রথম মন্ত্রীদিগের একজন ছিলেন এবং তাহার পর সকল মন্ত্রীসভাতেই তিনি মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। অতঃপর ১৯১০ সালে ইউনিয়ন সরকার স্থাপিত হইলে তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার গ্লাডস্টোন বলিত। তাহার পর ছিল মোলটেনো ও শ্রাইনার পরিবার। স্যার জন মোলটেনো ১৮৭২ সালের মন্ত্রীসভায় প্রধান মন্ত্রীর কার্য করেন। শ্রীযুক্ত ডবলিউ. পি শ্রাইনার এডভোকেট ছিলেন। তাহার পর কিছুকাল এটর্নি জেনারেল ছিলেন, পরে প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহার ভগ্নী অলিভার শ্রাইনার ছিলেন বিদুষী মহিলা। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি সুপরিচিতা ছিলেন এবং যেখানেই ইংরাজী ভাষার

ব্যবহার হয় সেইখানেই লোকে তাঁহাকে জানিত। তিনি 'স্বপ্ন' নামক বইখানি লেখার পর বিখ্যাত হন। সমস্ত মানবজাতির জন্য তাঁহার অসীম প্রেম ছিল। তাঁহার চক্ষু ভালবাসা-মাখা ছিল। যদিও তিনি এত উচ্চ পরিবারের কন্যা এবং এত শিক্ষিতা ছিলেন, তথাপি তাঁহার চালচলন এত সাদাসিধা ছিল যে বাড়ীতে তিনি নিজেই বাসনপত্র মাজিতেন। শ্রীযুক্ত মেরিম্যান, মোলটেনোরা ও শ্রাইনারেরা বরাবরই নিগ্রোদের হিত দেখিয়াছেন। যখনই নিগ্রোদের অধিকার বিপদাপন্ন হইত, তখনই তাঁহারা বীরত্বের সহিত তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য দাঁড়াইয়াছেন। ভারতীয়দের প্রতিও তাঁহাদের সদয় ভাব ছিল। কিন্তু ভারতীয় ও নিগ্রোদের মধ্যে তাঁহারা পার্থক্য করিতেন। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ ছিল, "নিগ্রোরা ঐ স্থানের আদিম নিবাসী, সেইজন্য ইউরোপীয় বাসিন্দারা তাঁহাদের পরে আসিয়া তাঁহাদের কোনও অধিকার অপহরণ করিতে পারেন না। আর ভারতীয়দের বেলায় তাঁহাদের অন্যায় প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য যদি আইন করা যায়, তবে তাহাতে অন্যায় হয় না।" তাহা হইলেও ভারতীয়দের জন্য তাঁহাদের দরদ ছিল। গোখলে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান, তখন শ্রীযুক্ত শ্রাইনার টাউনহলে তাঁহার সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভাই এদেশে তাঁহার প্রথম সংবর্ধনা সভা। শ্রীযুক্ত মেরিম্যানও গোখলের সহিত অতিশয় ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ভারতীয়দের প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মেরিম্যানের ন্যায় অন্য আরও ইউরোপীয় ছিলেন। আমি মাত্র কয়েকজনার নাম সেই শ্রেণীর লোকেদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিলাম।

কেপ কলোনির সংবাদপত্রগুলিও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যস্থানের সংবাদপত্র অপেক্ষা ভারতীয়দের কম বিরোধী ছিল।

এই সকল কারণে কেপ কলোনিতে ভারতীয়দের প্রতি বিরাগের ভাব দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য স্থান অপেক্ষা কম হইলেও অন্যত্র যে ভারতীয় বিদ্বেষ ছিল, তাহা কেপ কলোনিতেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এইস্থানেও নাতালের অনুকরণে দুইটি ভারতীয়-বিরোধী আইন পাস হইয়াছিল—এক ইমিগ্রেশন আইন, যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতীয়েরা আর না প্রবেশ করিতে পারে, অপরটি লাইসেন্স আইন, যাহাতে কোনও ব্যবসা করিতে হইলেই লাইসেন্স চাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার বুয়ার যুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত মুক্ত ছিল। বুয়ার যুদ্ধের সময় হইতেই ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ হয়, একথা বলা যাইতে পারে। ট্রান্সভালে তিন পাউণ্ড কর ছাড়া প্রবেশের আর কোনও বাধা ছিল

না। নাতাল ও কেপ কলোনি ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করায় তাহাদের পক্ষে ট্রান্সভালে যাওয়া কঠিন ছিল, কেন না সেখানে যাইতে নাতাল বা কেপ কলোনি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ডেলাগোয়া-বে বলিয়া যে পর্তুগীজ বন্দর আছে, সেখানে নামিয়া অবশ্য ট্রান্সভাল যাওয়া যাইত। কিন্তু পর্তুগীজেরাও অনেকটা ইংরাজদের নকল করিয়াছিল। একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে কদাচিৎ কোনও ভারতবাসী নাতাল অথবা ডেলাগোয়া-বে'র পথে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া অথবা ঘুষ দিয়া ট্রান্সভাল যাইতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাথমিক দ্বন্দ্বের পর্যালোচনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে ভারতীয়দের অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া ভারতীয়েরা তাঁহাদের প্রতি আক্রমণের প্রতিরোধ কিভাবে করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাইয়াছি। সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের উদ্ভব সম্বন্ধে ঠিকমত ধারণা করার জন্য সত্যাগ্রহের পূর্বে ভারতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক।

১৮৯৩ সালের পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় উচ্চশিক্ষিত স্বাধীন ভারতবাসী তেমন কেহ ছিলেন না, যিনি ভারতবাসীদের স্বার্থ দেখিবেন। যে সকল ভারতীয় ইংরাজী জানিতেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন কেরানী। নিজেদের কাজ চালাইবার মত ইংরাজী ভাষা তাঁহারা জানিতেন। দরখাস্তআদির মুসাবিদা করার মত জ্ঞান তাঁহাদের ছিল না, আর সমস্ত সময়ই তাঁহাদের মালিকদের কার্যে দিতে হইত। আফ্রিকাতেই জন্মিয়াছিলেন এমন আর একদল ইংরাজী জানা লোক ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই চুক্তিবদ্ধ মজুরদের সন্তান-সন্ততি। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারিতেন তাঁহারা আদালতে দোভাষীর কার্য করিতেন। ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিতেন না।

চুক্তিবদ্ধ অথবা মুক্ত মজুরেরা ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশ* অথবা মাদ্রাজ†

* বর্তমানের উত্তর প্রদেশ   † বর্তমানের তামিল নাড়ু

হইতে আসিয়াছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, স্বাধীন ভারতীয়দের মধ্যে মুসলমানেরা ছিলেন ব্যবসায়ী আর হিন্দুরা ছিলেন তাঁহাদের মুহুরী। ইহারা সকলেই গুজরাটী। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন পার্শী ব্যবসায়ীও তাঁহাদের কেরানী ছিলেন, কিন্তু সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩০।৪০ জনের বেশী পার্শী ছিলেন না। ভারতীয়দের মধ্যে একটা চতুর্থ দল ছিল সিন্ধি ব্যবসায়ীদের। তাঁহারাও সংখ্যায় দুই শত অথবা কিছু বেশী হইবেন। সিন্ধিরা ভারতের বাহিরে যেখানেই গিয়া বসেন সেখানেই ব্যবসা করেন। তাঁহাদের ক্রেতারা সাধারণতঃ ইউরোপীয়।

ইউরোপীয়েরা চুক্তিবদ্ধ মজুরদের 'কুলী' বলিত। কুলী মানে মুটে। এই 'কুলী' কথাটার এত বেশী ব্যবহার হইত যে চুক্তিবদ্ধ মজুরেরাও নিজদিগকে কুলী বলিত। শত শত ইউরোপীয়েরা ভারতীয় উকীল বা ব্যবসায়ীদিগকে 'কুলী-উকীল', 'কুলী ব্যবসায়ী' বলিত। অনেক ইউরোপীয় ছিলেন, যাঁহারা জানিতেন না যে ঐ কথায় কোনও অসম্মান করা হয়। আবার অনেকেই ঐ বাক্য ইচ্ছাপূর্বক অবজ্ঞা দেখাইবার জন্যই ব্যবহার করিতেন। স্বাধীন ভারতীয়েরা সেই জন্য নিজদিগকে চুক্তিবদ্ধ মজুর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল কারণে এবং ভারতবর্ষের অবস্থার বিশেষত্বের জন্য চুক্তিবদ্ধ ও মুক্ত মজুরদের মধ্যে এবং স্বাধীন ভারতীয়দের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করার চেষ্টা ছিল।

উপরের বর্ণিত অত্যাচারসমূহের প্রতিকারের জন্য স্বাধীন ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ মুসলমান ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সেজন্য চুক্তিবদ্ধ বা মুক্ত মজুরদের সাহায্য লওয়ার কোনও সাক্ষাৎ চেষ্টা ছিল না। হয়ত তাঁহাদের সমর্থন পাওয়ার কথা কাহারও মনে আসে নাই, হয়ত বা মনে আসিলেও তাঁহারা একথা ভাবিতেন যে উহাদিগকে ইহার সহিত জড়াইয়া লইলে ক্ষতি হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। সকলেই ইহা মনে করিতেন যে স্বাধীন ব্যবসায়ীরাই ইউরোপীয়দের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। সেইজন্য আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টাও এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রতিরোধ-কার্যে তাঁহাদের বিঘ্ন ছিল নানাপ্রকারের। তাঁহারা ইংরাজী জানিতেন না। ভারতবর্ষে এই ধরনের জনসাধারণের সেবার কাজ করার অভিজ্ঞতাও তাঁহাদের ছিল না। তাহা সত্ত্বেও তাহারা বেশ ভাল কাজই করিয়াছিলেন—একথা বলা যায়। তাঁহারা ইউরোপীয় ব্যারিস্টারের সাহায্য লইয়া দরখাস্তআদি লেখাইতেন,

কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিতেন, কখনও বা প্রতিনিধি দল গঠন করিয়া পাঠাইতেন। এইভাবে তাঁহারা যথাশক্তি প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে।

পাঠকেরা কতকগুলি তারিখ মনে রাখিলে সুবিধা হইবে। ১৮৯৩ সালের পূর্বেই ভারতীয়দিগকে অরেঞ্জ ফ্রী-স্টেট হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ট্রান্সভালে ১৮৮৫ সালের তিন আইন কার্যকরী ছিল। নাতালে কেবল চুক্তিবদ্ধ মজুরদের রাখিয়া আর সকল ভারতীয়কে তাড়াইয়া দেওয়ার পরিকল্পনা চলিতেছিল। আর সেই জন্য স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারও লওয়া হইয়াছিল।

আমি ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করি। প্রবাসী ভারতবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না। আমি ব্যবসা সম্পর্কেই সেখানে যাই। পোরবন্দরের মেমানদের এক খ্যাতনামা ব্যবসাদার "দাদা আবদুল্লা" নামে ডারবানে ব্যবসায় করিতেছিলেন। "তায়েব হাজি খান মহম্মদ" নামে সমান ধনশালী আর একজন ব্যবসায়ী প্রিটোরিয়াতে ব্যবসায়ে রত ছিলেন। ইঁহারা পরস্পর প্রতিযোগী ছিলেন এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের মধ্যে একটা গুরুতর মোকদ্দমা চলিতেছিল। "দাদা আবদুল্লা"র কারবারের একজন অংশীদার তখন পোরবন্দরে ছিলেন। তিনি মনে করেন যে আমাকে নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইলে তাঁহাদের মোকদ্দমার সাহায্য হইবে। তখন আমি সবে ব্যারিস্টার হইয়াছি এবং ব্যবসার কিছুই জানিতাম না। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মোকদ্দমার হানি হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না, কেন না তাঁহাদের মোকদ্দমার ভার দক্ষিণ আফ্রিকার যোগ্য ব্যারিস্টারদের হাতে ছিল। আদালতের কোনও কাজ নহে, ব্যারিস্টারকে সাহায্য করার জন্যই তাঁহারা আমার আবশ্যকতা বোধ করিয়াছিলেন। নূতনত্ব আমার ভাল লাগিত। নূতন স্থান দেখিতে ও নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে আমার ইচ্ছা করিত। আমাকে এখানে যাঁহারা মোকদ্দমা দিতেন তাঁহাদিগকে কমিশন দেওয়া আমার পক্ষে বড় বিরক্তিজনক ব্যাপার মনে হইত। কাথিয়াওয়াড়ের চক্রান্তপূর্ণ আবহাওয়ায় আমার যেন শ্বাসরোধ হইয়া যাইতেছিল। আমাকে কেবল এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হয়। ঐ কার্য গ্রহণ করায় আমি কোনও বাধা দেখি না। আমার ক্ষতি হওয়ার কিছুই ছিল না। কেন না তাঁহারা আমাকে যাতায়াতের ব্যয়, সেখানে থাকার সমস্ত ব্যয় ও তদুপরি একশত পাঁচ পাউণ্ড দিবেন বলিয়াছিলেন। আমার দাদা এই

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আমার পিতার ন্যায়। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছাই আমার নিকট আদেশ ছিল। তিনি আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়া পছন্দ করেন। এইভাবে আমি ১৮৯৩ সালের মে মাসে ডারবানে গিয়া উপস্থিত হই।

ব্যারিস্টার হওয়ায় আমি আমার ধারণা অনুযায়ী ভাল পোশাকে সজ্জিত হইয়া আমার নিজের সম্বন্ধে "আমি একটা কিছু" এই ধারণা লইয়া ডারবানে অবতীর্ণ হইলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমার মোহ দূর হইল। দাদা আবদুল্লার যে অংশীদার আমাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি নাতালের সম্বন্ধে আমাকে একটা ধারণা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যাহা চাক্ষুষ দেখিলাম, তাহা তাঁহার দেওয়া ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি সরল ও অকপট লোক ছিলেন, ভিতরের খবর কিছু জানিতেন না। নাতালে ভারতীয়দের যে কী দুর্গতি, তাহা তিনি জানিতেন না। যে সকল অবস্থা অতীত অপমানকর, তাহা তাঁহার নিকট সে প্রকার মনে হয় নাই। আমি যেদিন পৌঁছাইলাম সেইদিনই দেখিলাম যে ইউরোপীয়েরা ভারতবাসীদিগের প্রতি অতিশয় অপমানসূচক ব্যবহার করেন।

পৌঁছাইবার পনের দিনের মধ্যেই আমি আদালতে যে সকল দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করি, রাস্তায় রেলে চলিতে যেসব অসুবিধায় পড়ি, পথে যাইতে যাইতে যে মার খাই, হোটেল যোগাড় করিতে যে অসুবিধা ভোগ করি সে সকল কথা এখানে বর্ণনা করিব না।

এই পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট যে ঐসব ব্যবহার আমার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছিল। আমি সেখানে একটিমাত্র মোকদ্দমার জন্য অনেকটা কৌতূহলবশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেইজন্য প্রথম বৎসরটায় আমি কেবল এই সকল অত্যাচারের ভোক্তা ও সাক্ষীমাত্র হইয়াছিলাম। তাহার পর আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়। আমি দেখিলাম যে স্বার্থের দিক দিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কোনও আকর্ষণ নাই। যেখানে অপমানিত হইতে হয়, সেখানে বাস করিতে বা টাকা রোজগারের জন্য থাকিতে আমার কেবল অনিচ্ছা নয়, একটা বিতৃষ্ণা ছিল। আমি উভয়সঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমার কাছে দুইটি পথ ছিল। একটি হইতেছে, দাদা আবদুল্লাকে একথা জানানো যে নাতাল সম্বন্ধে আমি যে ধারণা পাইয়াছিলাম এস্থান সে প্রকার নহে এবং সেই জন্য তাঁহার সহিত চুক্তি হইতে মুক্তি লইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসা।

দ্বিতীয় পথ ছিল যতই কষ্ট হোক তাহা সহ্য করিয়া যে কাজ করিতে আসিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাওয়া। আমাকে মরিৎসবর্গে একটা পুলিসের পাহারাওয়ালা ট্রেন হইতে ঘাড়ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেয় ও ট্রেন চলিয়া যায়। আমি সেই তীব্র শীতে ওয়েটিংরুমে বসিয়া কাঁপিতেছিলাম। আমার মালপত্র কোথায় রাখিয়াছে জানিতাম না। জিজ্ঞাসা করিতে গেলে পাছে আবার অপমান করে ও আবার মার লাগায় সেই জন্য জিজ্ঞাসাও করিতে পারি নাই। নিদ্রা আমার সম্ভবই ছিল না। আমার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। রাত্রির শেষভাগে আমার সঙ্কল্প স্থির হইল যে এ অবস্থায় ভারতবর্ষে পলাইয়া যাওয়া ভীরুর কার্য হইবে। যে কাজ হাতে লইয়াছি তাহা শেষ করিতেই হইবে। অপমানিতই হই আর মারই খাই, আমাকে প্রিটোরিয়া পৌঁছাইতেই হইবেই। প্রিটোরিয়াতে মোকদ্দমা চলিতেছিল। আমি মনে করিলাম যে মোকদ্দমার কার্য করিতে করিতে যদি সম্ভবপর হয় তবে প্রতিবিধানের জন্য কিছু করিব। এই সঙ্কল্প আমাকে কতকটা শান্ত করিল ও শক্তি দিল, কিন্তু রাত্রে আর ঘুমাইতে পারিলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি দাদা আবদুল্লাকে ও রেলের জেনারেল ম্যানেজারের নিকট তার করিলাম। দুইজনের নিকট হইতেই জবাব পাইলাম। দাদা আবদুল্লা ও তাঁহাদের অংশীদার শেঠ আবদুল্লা হাজি আদম জাভেরী যথাসাধ্য করিলেন। তাঁহারা রেলপথে বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের এজেন্টদিগের নিকট তার করিলেন, যেন তাঁহারা আমার যত্ন লন। তাঁহারা জেনারেল ম্যানেজারের সহিত দেখা করিলেন। দাদা আবদুল্লার তার পাইয়া মরিৎসবর্গের স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ আমার সহিত স্টেশনে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহাদের সকলের অভিজ্ঞতাই ঐ প্রকার পীড়াদায়ক। তবে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া আর উহাতে কিছু মনে করেন না। ব্যবসা করা আর মান-অপমান বোধ একসঙ্গে চলে না। তাঁহারা সেই জন্য যেমন টাকা পকেটস্থ করেন, তেমনি অপমানও পকেটস্থ করিতেই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন যে রেল স্টেশনে প্রধান প্রবেশ-দ্বার দিয়া তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন না—তাঁহাদের টিকিট কিনিতেই মহা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সেই রাত্রিতেই আমি প্রিটোরিয়ার পথে রওনা হই। সকলের হৃদয়ের সঙ্কল্প যিনি জানেন, সেই ঈশ্বর আমাকে আরও পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। প্রিটোরিয়ার পথে আমি

আরও অপমানিত হই এবং আরও মার খাই। কিন্তু এই সকল ঘটনা আমাকে আমার সঙ্কল্পে আরও দৃঢ় করে।

১৮৯৩ সালেই আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের যে কি অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রিটোরিয়াস্থ ভারতীয়দিগের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করা ছাড়া আর কিছু করি নাই। বুঝিতে পারিতেছিলাম যে মোকদ্দমা লইয়া থাকা আর ভারতীয়দের অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা—এই দুই কার্য একসঙ্গে করিতে পারিব না। আমি এ কথা বুঝিয়াছিলাম যে এই দুই কাজ একসঙ্গে করিতে গেলে উভয়ই নষ্ট হইবে। ১৮৯৪ সাল আসিয়া পড়িল। আমি ভারতবর্ষে রওনা হওয়ার জন্য ডারবানে আসিলাম। আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য যে উৎসব হইয়াছিল সেখানে একখণ্ড "নাতাল মার্কারি" সংবাদপত্র আমার হাতে পড়ে। উহা আমি পাঠ করিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম যে নাতাল বিধানসভার কার্যের বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে "ভারতীয় ভোটাধিকার" সম্বন্ধে কয়েক পঙক্তি সংবাদ আছে। স্থানীয় সরকার ভারতীয়দিগকে ভোটাধিকার-চ্যুত করার জন্য একবিল উপস্থাপিত করিতে যাইতেছিলেন। ভারতীয়েরা যে অল্পস্বল্প অধিকার ভোগ করিত তাহা শেষ করার জন্য এই প্রথম পদক্ষেপ। সেই সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা হইতে সরকারের যে কি ইচ্ছা সে-বিষয় আর গোপন ছিল না। যে সমস্ত ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে আমি ঐ রিপোর্ট পড়িয়া শুনাই এবং অবস্থা সম্বন্ধে যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিই। সমস্ত বিবরণ আমার জানা ছিল না। আমি তাঁহাদিগকে বলি যে ভারতীয়েরা তাঁহাদের নিজেদের অধিকারের উপর এই আক্রমণ যেন বিশেষ দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করেন। তাঁহারা আমার কথা মানিয়া লন, কিন্তু ঐ কার্যের জন্য নিজেদের অক্ষমতার কথা জানাইয়া ঐ কাজ করিবার জন্য আমাকে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। আমি মাসখানেক অথবা আর কিছু বেশীদিন থাকিয়া যাইতে স্বীকৃত হই। ইতিমধ্যে এই বিষয়টি চুকিয়া যাওয়ার কথা। সেই রাত্রেই আমি বিধানসভায় দাখিল করার জন্য একখানা দরখাস্ত লিখিয়া ফেলি। সরকারকে একটি তার করিয়া ঐ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। তখনই হাজি আদমকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয় এবং তাহা তাঁহারই স্বাক্ষরে যায়। দুই দিনের জন্য ঐ বিলের আলোচনা মুলতুবী থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিধানসভায় ভারতীয়দের দরখাস্ত এই প্রথম গেল। ইহাতে একটা

কিছু প্রভাব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিল পাস হওয়া যে বন্ধ হয় নাই সে-কথা চতুর্থ অধ্যায়েই বলিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের এইপ্রকার আন্দোলনের এই প্রথম অনুভূতি। ইহাতে সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা উৎসাহের ঢেউ বহিয়া গেল। প্রতিদিনই সভা হইতে লাগিল এবং সভাতে ক্রমশঃই বেশী লোক আসিতে লাগিল। এ কাজে যত টাকা লাগিতে পারে তাহার অপেক্ষা বেশী টাকা সংগৃহীত হইল। অনেক স্বেচ্ছাসেবক কোনও প্রতিদান না লইয়া দরখাস্তের নকল করা, স্বাক্ষর সংগ্রহ করা ইত্যাদি কার্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। অন্য অনেকে ঐ অর্থভাণ্ডারে টাকা দেওয়া ও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে খাটা—উভয় প্রকারেই সাহায্য করিলেন। মুক্ত মজুরদিগের সন্তানগণ আনন্দের সহিত এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁহারা ইংরাজী জানিতেন, হাতের লেখাও বড় সুন্দর ছিল। তাঁহারা দিবারাত্র সন্তুষ্টচিত্তে নকল করার কাজ করিতে লাগিলেন। এক মাসের ভিতর দশ হাজার স্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্র লর্ড রিপনের নিকট পাঠানো হইল। আমি যে কার্য হাতে লইয়াছিলাম ইহাতে তাহা সমাপ্ত হইল।

আমি দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিলাম। কিন্তু এই আন্দোলন ভারতীয়দের মধ্যে এমন একটা উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল যে তাঁহারা আমাকে ছাড়িতে চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "আপনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে আমাদিগকে সমূলে উৎখাত করার চেষ্টার এই প্রথম সূচনা। আমাদের আবেদনের উত্তরে উপনিবেশের সেক্রেটারী সন্তোষজনক উত্তর দিবেন কিনা কে জানে? আপনি আমাদের উৎসাহ দেখিয়াছেন। আমাদের কার্য করিতে ইচ্ছা আছে, আমরা কাজ করিতেই চাই। আমাদের অর্থও আছে। কেবল একজন পরিচালকের অভাবে যাহা সামান্য কিছু করা হইয়াছে তাহাও ব্যর্থ যাইবে। আমরা তো মনে করি যে আপনার এখানে থাকিয়া যাওয়াই কর্তব্য।" আমিও ভাবিলাম যে যদি ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনও স্থায়ী সংস্থা গড়িয়া উঠে তাহা হইলে ভাল হয়। কিন্তু আমি কোথায় থাকিব, কেমন করিয়াই বা থাকিব? তাঁহারা আমাকে বেতন দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আমি তাহা লইতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করি। জনসেবার কাজের জন্য বেশী টাকা লওয়া ঠিক নয়। তাহা ছাড়া আমি এ কাজ নূতন প্রবর্তন করিতেছিলাম। তখনকার দিনে আমার যেমন মনের ভাব ছিল তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম

যে আর দশজন ব্যারিস্টার যেমন থাকেন আমারও তেমনি তাঁহাদের সহিত থাকা সঙ্গত। কিন্তু তাহাতে ব্যয়ও অনেক। আমি বুঝিয়াছিলাম যে সংস্থার নিজের জন্তই টাকা তুলিতে হইবে। এমন সংস্থার উপর নিজের ব্যয়ের জন্ত নির্ভর করায় আমার কার্যশক্তি কমিয়া যাইবে। এই সকল এবং অন্তান্ত হেতু বশতঃ আমি অর্থ লইয়া সাধারণের সেবায় কাজ করিতে সাফ অস্বীকার করিলাম। তাঁহাদিগকে বলিলাম যে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যবসায়ীরা যদি আমাকে মামলা দেন এবং আমাকে তাঁহাদের ঘরোয়া উকীল করিয়া আগাম বাঁধা অর্থ দেন, তাহা হইলে আমি থাকিয়া যাইতে পারি। তাঁহারা এক বৎসরের জন্ত এই ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমার এক বৎসর এইভাবে কাজ করিয়া ফলাফল দেখিয়া তাহার পর উভয় পক্ষের ইচ্ছা হইলে ঐ ব্যবস্থা বহাল রাখিতে পারা যাইবে। সকলেই এই প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন।

আমি নাতাল সুপ্রীমকোর্টে এডভোকেট হওয়ার জন্ত আবেদন করিলাম। নাতাল আইনজীবি-সমিতি আমার আবেদনের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে কোনও কালো লোক সেখানে আইন ব্যবসা করিবে, ওকালতী আইনের সে উদ্দেশ্য ছিল না। খ্যাতনামা এডভোকেট এবং এটর্নি জেনারেল এবং পরবর্তীকালে নাতালের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এসকম্ব আমার পক্ষ লইয়াছিলেন। সেখানকার রীতি এই ছিল যে-কোনও ব্যারিস্টার ঐ ধরনের আবেদন বিনা ফীতে আদালতে উপস্থিত করিবেন। মিঃ এসকম্ব আমার দরখাস্ত দাখিল করেন। দাদা আবদুল্লাদেরও তিনি সিনিয়র ব্যারিস্টার ছিলেন। কোর্ট বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। আইন-সমিতির বিরোধ তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে আরও জাহির করিয়া দিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্রসমূহ আইন-সমিতিকে উপহাস করে, কেহ কেহ আমাকে অভিনন্দিতও করেন।

যে অস্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছিল, উহাকে স্থায়ীরূপ দেওয়া হয়। আমি কখনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত হই নাই। তবে উহার সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম। কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলাম এবং কংগ্রেসের নাম জনপ্রিয় হোক এই ইচ্ছা রাখিতাম। আমি অনভিজ্ঞ ছিলাম বলিয়া আমাদের সভার জন্ত একটা নূতন নাম দেওয়ার চেষ্টা করিলাম না। ভুল করিয়া ফেলিতে পারি বলিয়া ভয়ও ছিল। সেইজন্ত আমি বন্ধুদিগকে পরামর্শ দিলাম যে আমাদের সভার নাম 'নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস' রাখা হোক।

আমার ভারতীয় মহাসভার সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ ধারণা ছিল, তাহাই কোনও প্রকারে আমার বন্ধুদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। যাহা হোক নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস ১৮৯৪ সালের মে মাসে স্থাপিত হইল। ভারতীয় কংগ্রেস ও নাতাল কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য একটা এই ছিল যে, নাতাল কংগ্রেস সারা বৎসরই কার্য করিত এবং ইহার বার্ষিক চাঁদা কমপক্ষে তিন পাউণ্ড করিয়া ছিল। তিন পাউণ্ডের অধিক অর্থও চাঁদা বলিয়া গ্রহণ করা হইত। প্রত্যেক সভ্যের নিকট হইতে যত বেশী চাঁদা পাওয়া যায় তাহা লওয়ার চেষ্টা করা হইত। জনা-ছয় সভ্য বৎসরে ২৪ পাউণ্ড চাঁদা দিতেন, বৎসরে ১২ পাউণ্ড চাঁদা দিতেন এমন অনেক সভ্য ছিলেন। এক মাসের মধ্যে প্রায় তিন শত সভ্য হয়। এই সভ্যের মধ্যে হিন্দু মুসলমান পার্শী ও খ্রীষ্টান ছিলেন এবং ভারতবর্ষের যত প্রদেশের লোক নাতালে থাকেন, সে সকল প্রদেশের লোকই ইহাতে ছিলেন। প্রথম বৎসরটি আগাগোড়াই খুব জোরের সহিত কাজ চলে। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ গাড়ীতেই দূরদূরান্তরের গ্রামে গিয়া সভ্য করিতেন ও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেন। চাওয়া মাত্রই সকলে চাঁদা দিতেন না। কাহাকেও কাহাকেও অনুরোধ করিতে হইত। এই অনুরোধ করা এক ধরনের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ করিত। ইহাতে লোকে অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পারিতেন। প্রতি মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত। উহাতে কংগ্রেসের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব পেশ করা হইত ও তাহা গৃহীত হইত। সাময়িক ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করা হইত ও কার্যবিবরণী বহিতে লেখা হইত। সভ্যেরা নানা প্রশ্ন করিতেন; ইহাতে নূতন নূতন বিষয় আলোচনা করা হইত। তাহাতে লাভ এই হয় যে যাঁহারা এই জাতীয় সভায় কখনও কিছু বলিতেন না, তাঁহারাও বলার অভ্যাস অর্জন করেন। বক্তৃতাও রীতি অনুযায়ী হওয়া চাই। এ সমস্তই এক নূতন অভিজ্ঞতা। সম্প্রদায় ইহাতে খুব আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে এই সুসংবাদটা পৌঁছাইল যে লর্ড রিপন ভোটাধিকার লোপকারী বিল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহাতে সকলের কাজে উৎসাহ বাড়িয়া গেল—আত্মপ্রত্যয়ও বাড়িল।

বাহ্যিক আন্দোলন চালানোর সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যও হাতে লওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাময় ইউরোপীয়েরা ভারতীয়দের জীবনযাত্রার ধরনের কথা লইয়া বিরুদ্ধ আন্দোলন চালাইতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, "ভারতীয়েরা বড়ই অপরিচ্ছন্ন ও কৃপণ। যেখানে দোকান করে সেইখানেই

থাকার ব্যবস্থা রাখে। বাড়ীঘরগুলি সব কুটির মাত্র। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও তাহারা ব্যয় করিতে চায় না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মুক্তহস্ত ইউরোপীয়েরা এইপ্রকার অপরিচ্ছন্ন ও কঞ্জুষ লোকদের সহিত কেমন করিয়া ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা করিবে?" সেইজন্য বক্তৃতা, তর্কসভা এবং কংগ্রেসের সভার মাধ্যমেও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, বাড়ীর ও দোকানঘর পৃথক রাখার আবশ্যকতা, অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীদের নিজ অবস্থানুরূপভাবে থাকার কথা ইত্যাদি আলোচিত হইত। গুজরাটী ভাষাতেই এইসকল সভার কার্য চালানো হইত।

পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে এইসকল কর্মসূচীর দ্বারা ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা কী পরিমাণ হইতেছিল। কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় "নাতাল ভারতীয় শিক্ষা পরিষদ" সৃষ্ট হয়। ইহাতে মুক্ত ভারতবাসীর সন্তানগণ, যাহারা নাতালেই জন্মিয়াছিল ও ইংরাজী ভাষায় কথা বলিত, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার সভ্যরা নামমাত্র একটা চাঁদা দিতেন। এই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের জন্য একটি মেলামেশার স্থানের ব্যবস্থা করা, তাঁহাদের মাতৃভূমির জন্য ভালবাসার উদ্রেক করা এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সাধারণ জ্ঞান দেওয়া। আরও একটা অভিপ্রায় ছিল এই যে তাঁহারা যেন বুঝিতে পারেন যে স্বাধীন ভারতীয়েরা তাঁহাদিগকে আপনার জন মনে করেন —স্বাধীন ভারতীয়দের ভিতরেও যেন ইঁহাদের জন্য সম্মানের ভাব দেখা দেয়। কংগ্রেসের অর্থকোষে তাহার সমস্ত খরচা কুলাইয়াও উদ্‌বৃত্ত থাকার মত অর্থ ছিল। এই টাকা দিয়া জমি কেনা হয় এবং এখনও তাহা হইতে আয় হইতেছে।

আমি ইচ্ছা করিয়াই এই সকল বিবরণ দিতেছি। ইহা না জানিলে সত্যাগ্রহ কেমন করিয়া আপনা-আপনি আরম্ভ হইয়াছিল ও কেমন করিয়া সত্যাগ্রহের জন্য সম্প্রদায় ইহার ভিতর দিয়াই স্বাভাবিকভাবে প্রস্তুত হইয়া যাইতেছিল, পাঠকেরা তাহা ধরিতে পারিবেন না। কংগ্রেসের পরবর্তীকালের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমি বর্ণনা বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি। কেমন করিয়া ইহা অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল, কেমন করিয়া সরকারী কর্মচারীরা ইহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া অনাহত অবস্থায় কংগ্রেস এই আক্রমণের মধ্যে টিঁকিয়া ছিল—এসকল কথা এখানে বলিব না। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি, সম্প্রদায় যাহাতে অত্যুক্তি করার অভ্যাস ত্যাগ করে সেজন্য সতর্কতা লওয়া হইত। সম্প্রদায়ের নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি দিতে সর্বদা চেষ্টা করা হইত। ইউরোপীয়দের যুক্তির ভিতর যতটা সত্য ছিল, তাহা স্বীকার করা হইত।

যখনই ইউরোপীয়দের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ও আত্মসম্মানের সহিত একত্র হইয়া কাজ করার অবকাশ পাওয়া যাইত, সে অবকাশ আগ্রহের সহিত কাজে লাগানো হইত। সংবাদপত্রসমূহে যত ভারতীয় সংবাদ প্রকাশ হইতে পারিত, সে সকলই জোগানো হইত। যখনই সংবাদপত্রে ভারতীয়েরা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হইতেন, তখনই তাহার জবাব দেওয়া হইত।

ট্রান্সভালেও নাতাল ভারতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্ট হয়। এই উভয় সংস্থার গঠনের যে পার্থক্য ছিল, সে-সকল কথায় আমাদের এখন কাজ নাই। আবার কেপটাউনেও একটা সংস্থা ছিল, যাহা নাতাল ও ট্রান্সভালের সংস্থা অপেক্ষা ভিন্ন ছিল। কিন্তু এই তিন সংস্থার কার্যক্রম একই ধরনের ছিল।

১৮৯৫ সালের মধ্যভাগে নাতাল কংগ্রেসের প্রথম বৎসর পূর্ণ হয়। এডভোকেট হিসাবে আমার কাজ আমার মক্কেলদের পছন্দ হয়। আমার নাতালে থাকার কাল বাড়িয়া যায়। আমি ১৮৯৬ সালে সম্প্রদায়ের নিকট অনুমতি লইয়া ছয় মাসের জন্য ভারতবর্ষে যাই। এই ছয় মাস কাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই টেলিগ্রাম পাই যে আমাকে নাতালে তখনই ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি ফিরিয়া যাই। ১৮৯৬-৯৭ সালের ঘটনাবলী পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাথমিক দ্বন্দ্বের আলোচনা
(পূর্বানুবৃত্তি)

নাতালে ভারতীয় কংগ্রেস এইভাবে স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইল। রাজনৈতিক কার্যে নাতালে আমার প্রায় আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল। আমি দেখিলাম যে যদি আমাকে আরও বেশীদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতে হয় তাহা হইলে আমার পরিবারবর্গকে ভারতবর্ষ হইতে লইয়া আসিতে হয়। এই সঙ্গে আমার এ ইচ্ছাও ছিল যে ভারতবর্ষে গিয়া একবার ঘুরিয়া সেখানকার নেতাদিগকে নাতালের ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যান্য জায়গায় প্রবাসী

ভারতীয়দের অবস্থার সম্বন্ধে অবহিত করি। কংগ্রেস আমাকে ছয় মাসের ছুটি দেয়। এই সময় আদমজী মিঞা খাঁ আমার স্থলে সেক্রেটারীর কাজ করিবেন স্থির হয়। তিনি অত্যন্ত কুশলতার সহিত তাঁহার কর্ম সম্পাদন করেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষার জ্ঞান মন্দ ছিল না এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা উহা আরও মার্জিত হইয়াছিল। তিনি সাধারণভাবে গুজরাটী শিখিয়াছিলেন। তাঁহাকে জুলুদের সহিত কাজ করিতে হইত বলিয়া তিনি জুলু ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং জুলুদের আচার-নীতি সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব শান্ত ও অমায়িক স্বভাবের লোক। তিনি বেশী কথা বলিতেন না। আমি এই সকল কথা এইজন্য বলিতেছি যে ইহা হইতে পাঠকেরা যেন বুঝিতে পারেন যে দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিতে ইংরাজী জানা, কি বইপড়া বিদ্যার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। প্রয়োজন কেবল সত্যবাদিতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস এবং ব্যবহারিক বুদ্ধির। জনসেবার কার্যে উক্ত গুণগুলির অবর্তমানে কেবল লেখাপড়ার জ্ঞান কোনও কাজে আসে না।

১৮৯৬ সালের মধ্যভাগে আমি ভারতবর্ষে আসি। তখন নাতাল হইতে বোম্বাইগামী জাহাজ অপেক্ষা কলিকাতাগামী জাহাজই বেশী পাওয়া যাইত বলিয়া আমি কলিকাতাগামী এক স্টীমারেই উঠি। 'গিরমিটিয়া'রা বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকেরা মাদ্রাজ অথবা কলিকাতা হইতেই যাত্রা করিত। কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে আমি এলাহাবাদে ট্রেন ফেল করি বলিয়া সেখানে একদিন কাটাইতে হয়। এইস্থানেই আমি কাজ আরম্ভ করিয়া দিই। আমি 'পাইওনিয়ার' সংবাদপত্রের মিঃ চেজনীর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলেন এবং অকপটে স্বীকার করিলেন যে তাঁহার সহানুভূতি ইউরোপীয়দের দিকেই রহিয়াছে। তিনি তবুও একথা স্বীকার করেন যে যদি আমি কিছু লিখিয়া পাঠাই তবে তিনি তাহা পাঠ করিবেন এবং সে বিষয়ে তাঁহার কাগজে মন্তব্য করিবেন। আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল।

ভারতবর্ষে থাকাকালে আমি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে এক পুস্তিকা লিখি। প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রেই উহার আলোচনা হইয়াছিল এবং উহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। ভারতবর্ষের নানাস্থানে পাঁচ হাজার পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছিল। এই সময় ভারতবর্ষে ভ্রমণকালে আমি মাননীয় নেতৃবর্গের সহিত দেখা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। স্যার ফিরোজশা মেহতা, জাস্টিস

বদরুদ্দীন তৈয়বজী, জাস্টিস মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এবং বোম্বের অন্যান্য নেতা, লোকমান্য তিলক ও তাঁহার বন্ধুবর্গ, অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও তাঁহার পুণাস্থ বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমি বোম্বাই মাদ্রাজ ও পুণাতে বক্তৃতা দিই।

এই বিষয়ের সহিত খুব বেশী সম্পর্ক না থাকিলেও এইস্থানে পুণার একটি পবিত্র স্মৃতির কথা বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। লোকমান্য তিলক "সার্বজনিক সভার" পরিচালক ছিলেন, আর গোখলে ছিলেন "ডেকান সভার" পরিচালক। আমি প্রথমে তিলক মহারাজের সহিত দেখা করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি গোপাল রাও-এর সহিত দেখা করিয়াছি কিনা। কাহার কথা বলিলেন আমি তাহা বুঝিলাম না। তিনি সেইজন্য আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করেন যে আমি শ্রীযুক্ত গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি কিনা এবং তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে কিনা।

আমি বলিলাম, "আমি তাঁহার সহিত এখনও দেখা করি নাই, তাঁহাকে নামে জানি। তাঁহার সহিত দেখা করিব।"

লোকমান্য বলিলেন, "আপনি দেখিতেছি ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রের সহিত পরিচিত নহেন।"

আমি বলিলাম, "আমি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া অল্পদিনই ভারতবর্ষে ছিলাম। তখন রাজনীতি আমার ক্ষমতার বহির্ভূত মনে করিয়া উহার চর্চা করি নাই।"

লোকমান্য বলিলেন, "তাহা হইলে আপনাকে কিছু খবর দিব। এখানে দুইটি দল আছে, একটি 'সার্বজনিক সভার' আর একটি 'ডেকান সভার' দল।"

আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আমি কিছু কিছু শুনিয়াছি।"

লোকমান্য বলিলেন, "এখানে সভা করা সহজ। আমার মনে হয় যে আপনি আপনার বক্তব্য সকল পক্ষকেই শুনাইয়া সকলের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে চাহেন। আপনার এই ইচ্ছা আমার নিকট ভাল মনে হয়। কিন্তু যদি 'সার্বজনিক সভার' কোনও সভ্য আপনার সভায় সভাপতি হন, তাহা হইলেই "ডেকান সভার" কোনও সভ্য তাহাতে যোগ দিবেন না। তেমনি যদি "ডেকান সভার" কেহ সভাপতি হন, তবে সার্বজনিকের কোনও সভ্য উপস্থিত হইবেন না। সেইজন্য একজন মধ্যস্থ ব্যক্তিকেই আপনার সভাপতি করা

উচিত। আমি আপনাকে এ বিষয়ে কেবল আভাস দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনও সাহায্য করিতে পারিব না। আপনি কি অধ্যাপক ভাণ্ডারকরকে জানেন? যদি নাও জানেন, তবুও তাঁহার সহিত দেখা করিবেন। তাঁহাকে মধ্যস্থ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন না, তবে আপনি হয়ত তাঁহাকে আপনার সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে রাজী করাইতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত গোখলেকে একথা বলিবেন এবং তাঁহার পরামর্শও লইবেন। সম্ভবতঃ তিনিও আপনাকে এই পরামর্শই দিবেন। যদি অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মত লোক সভাপতি হন, তবে উভয়পক্ষই চেষ্টা করিবেন যাহাতে সভা ভালরূপ হয়। সে যাহা হউক, আপনি আমাদের সম্পূর্ণ সহায়তা পাইবেন, একথা জানিবেন।"

তখন আমি শ্রীযুক্ত গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে, আমি কেমন করিয়া এই প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম।

যাঁহাদের কৌতূহল আছে, তাঁহারা এ বিষয় 'নবজীবন'* বা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'† পত্রে খুঁজিয়া দেখিতে পারেন। লোকমান্য যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, গোখলে তাহা অনুমোদন করিলেন। তখন আমি মাননীয় অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি মনোযোগের সহিত নাতালের ভারতীয়দের দুঃখের কাহিনী শুনিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখুন, আমি রাজনীতি চর্চা করি না, তারপর বৃদ্ধও হইতেছি। কিন্তু আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার হৃদয় মথিত হইতেছে। আপনি যে সকল দলের সাহায্যপ্রার্থী ইহা আমার নিকট ভালই লাগিয়াছে। আপনি যুবক এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার খবর রাখেন না। আপনি দুই দলের লোককেই বলিবেন যে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব। তাঁহাদের কেহ আমাকে সংবাদ দিলেই আমি গিয়া উপস্থিত হইব ও সভাপতিত্ব করিব।" পুণাতে ভাল সভা হয়। উভয় দলের নেতারা উপস্থিত হইয়া আমাকে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন।

তারপর আমি মাদ্রাজে যাই। সেখানে গিয়া আমি স্যার (তখন জাস্টিস্) সুব্রহ্মণ্যম্ আয়ার, শ্রীযুক্ত পি আনন্দচালু, 'হিন্দুর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি. সুব্রহ্মণ্যম্,

* ২৮শে জুলাই ১৯২১ † ১৩ই জুলাই ১৯২১

'মাদ্রাজ স্টাণ্ডার্ডের' সম্পাদক পরমেশ্বরন পিল্লাই, খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীভাষ্যম আয়েঙ্গার, শ্রীযুক্ত নর্টন এবং অন্যান্য জননায়কদের সহিত সাক্ষাৎ করি। খুব বড় একটি সভা হয়। মাদ্রাজ হইতে আমি কলিকাতায় গিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 'ইংলিশম্যানের' সম্পাদক স্বর্গগত শ্রীযুক্ত সাণ্ডার্স এবং অন্যান্য লোকের সহিত দেখা করি। কলিকাতায় একটি জনসভা করার যখন ব্যবস্থা হইতেছিল, আমি তখন ফিরিয়া যাওয়ার জন্য নাতাল হইতে তারবার্তা পাইলাম। ইহা ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসের ঘটনা। আমি ধরিয়া লইলাম যে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই এই তারবার্তা আসিয়াছে। আমি সেইজন্য কলিকাতার কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই বোম্বাই আসিলাম এবং সেখান হইতে যে স্টীমার প্রথমে পাইলাম তাহাতেই সপরিবারে রওনা হইলাম। দাদা আবদুল্লা কোম্পানী তখন "কুরল্যাণ্ড" স্টীমারখানা কিনিয়া নাতাল হইতে পোরবন্দর পর্যন্ত যাত্রী চালাইবার নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা খুব অগ্রণী ব্যবসায়ী ছিলেন। এই কার্য তাঁহাদের কুশলতার অন্যতম পরিচয়। পার্সিয়ান স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর 'নাদেরী' স্টীমারখানাও ইহার সঙ্গে সঙ্গেই নাতাল যাওয়ার জন্য রওনা হইয়াছিল। এই দুই স্টীমারে প্রায় ৮০০ যাত্রী ছিল।

ভারতবর্ষে যে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে প্রধান প্রধান সমস্ত সংবাদপত্রেই উহার আলোচনা হইয়াছিল এবং রয়টারও এ সম্বন্ধে বিলাতে তারযোগে সংবাদ পাঠান। আমি নাতালে পৌঁছাইয়া এই সংবাদ পাই। রয়টারের বিলাতের সংবাদদাতা সেখান হইতে নাতালে আমার বক্তৃতাদির সংক্ষিপ্ত অংশ অত্যুক্তিপরিপূর্ণ বিবরণ টেলিগ্রাম করিয়া পাঠান। ইহা নূতন কিছু নহে। এই প্রকারের অত্যুক্তি অনেক সময় ইচ্ছাকৃত নহে। ব্যস্ত-সমস্ত লোকেরা যখন তাড়াতাড়ি কোনও বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন, তখন তাঁহাদের সে বিষয়ে নিজেদের অনুরাগ বা বিরাগ থাকিলে কতকটা তাঁহাদের কল্পিত বিবরণই প্রস্তুত করিয়া ফেলেন। ভিন্ন স্থানে এইপ্রকার সংক্ষিপ্ত সংবাদের ভিন্ন অর্থ হয়। এই ভাবে কাহারও ইচ্ছা না থাকিলেও ঘটনার বিবরণ বিকৃত হইয়া যায়। জনসাধারণের কার্যের ভিতর এ একটা ঝুঁকি রহিয়া গিয়াছে এবং ইহা এ জাতীয় কার্যের সীমাও বটে। আমি ভারতবর্ষে থাকাকালে নাতালবাসী ইউরোপীয়দের সমালোচনা করিয়াছি। এগ্রিমেণ্ট-বদ্ধ বা 'গিরমিটিয়া' মজুরদের উপর যে তিন পাউণ্ড কর বসানো হইয়াছে, জোরের সহিত তাহার বিরুদ্ধে বলিয়াছি।

সুব্রহ্মণ্যম্ নামে একজন লোকের মনিব তাহাকে যেভাবে মারিয়াছিল আমি তাহার জীবন্ত বর্ণনা করিয়াছি, কেন না আমি তাহার আঘাত স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম ও তাহার মামলা আমার হাতে ছিল। যখন নাতালের ইউরোপীয়েরা আমার বক্তৃতাসমূহের বিকৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িলেন, তখন তাঁহারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে আমি নাতালে যাহা লিখিয়াছি তাহা ভারতবর্ষে যাহা লিখিয়াছি অথবা বলিয়াছি তদপেক্ষা অনেক অধিক তীব্র ও বিস্তারিত। ভারতবর্ষে আমার বক্তৃতায় অনুমাত্রও অতিশয়োক্তি ছিল না। আমি একথা জানিতাম যে নূতন লোকের কাছে কিছু বলিলে তাহাদিগকে যতটা বলা হয় তদপেক্ষা অধিক অনুমান করিয়া লয়। সেইজন্য ভারতবর্ষের বক্তৃতায় বস্তুতঃ যত জোর করিয়া বলা আবশ্যক আমি তদপেক্ষা লঘু করিয়া বলিতাম। তবে আমি নাতালে যাহা বলিতাম ও লিখিতাম তাহা কয়জন ইউরোপীয়ই বা পড়িতেন? এবং তাহার তোয়াক্কা করিতেন আরও স্বল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ। কিন্তু ভারতবর্ষে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা অন্য ধরনের হইয়া পড়ে, কেন না হাজার হাজার ইউরোপীয় রয়টারের তারের সংবাদ পড়িবেনই। ইহা ব্যতীত তারে খবর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ঘটনাটির নিজস্ব গুরুত্ব অপেক্ষা তাহাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিল। নাতালের ইউরোপীয়রা ভাবিলেন যে আমার ভারতবর্ষের কার্যের গুরুত্ব তাঁহারা যেমন অনুমান করিতেছেন সেই মতই হইবে। এবং সম্ভবতঃ উহার ফলে চুক্তিবদ্ধ বা 'গিরমিটিয়া' মজুর আমদানি বন্ধ হইবে। উহার ফলে শত শত কৃষিক্ষেত্রের মালিকদের অসুবিধা হইবে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের চক্ষে তাহাদিগকে তো হীন করা হইলই।

যখন নাতালে ইউরোপীয়দের মনের অবস্থা এইরূপ তখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে আমি সপরিবারে 'কুরল্যাণ্ড' জাহাজে ৩০০।৪০০শত ভারতীয় যাত্রী সহ আসিতেছি, আবার "নাদেরী" জাহাজও ঐ পরিমাণ ভারতীয় লইয়া আসিতেছে। ইহাতে তাঁহারা আরও উত্তেজিত হন। তাঁহাদের ক্রোধ ফাটিয়া পড়ে। নাতালের ইউরোপীয়েরা বড় বড় সভা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রধান লোকই উপস্থিত থাকিতেন। ভারতীয় যাত্রীরা, বিশেষ করিয়া আমি তাঁহাদের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিলাম। "কুরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী"র আগমন নাতাল 'আক্রমণ' বলিয়া ঘোষিত হইতেছিল। বক্তারা বলিতেছিলেন যে আমি সঙ্গে করিয়া ৮০০ লোক আনিতেছি।

ভারতবর্ষ হইতে লোক লইয়া নাতাল ছাইয়া ফেলার উদ্যমের ইহাই আরম্ভ। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ঐ জাহাজের সমস্ত যাত্রীকে ও আমাকে নাতালে নামিতে দেওয়া হইবে না। যদি নাতালের সরকার এই কার্য করিতে অনিচ্ছুক বা অপরাগ হন, তাহা হইলে সেই সভায় যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল সেই কমিটি নিজেরাই কর্তা হইয়া বলপূর্বক ভারতবাসীর প্রবেশ বন্ধ করিবে। দুইখানা স্টীমার একই দিনে ডারবানে পৌছায়।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে ১৮৯৬ সালেই বিউবোনিক প্লেগ ভারতবর্ষে প্রথম দেখা দেয়। আমাদিগের নাতালে প্রবেশ বন্ধ করিতে নাতাল সরকারের অসুবিধা ছিল। কেন না ভারতীয় ইমিগ্রেসন আইন তখনও পাস হয় নাই। কিন্তু সরকারের সহানুভূতি সর্বতোভাবে উক্ত কমিটির প্রতিই ছিল। বিশিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত এসকম্ব উক্ত কমিটির এক-জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই ইউরোপীয়দিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। সকল বন্দরেই একটা নিয়ম আছে যে যদি স্টীমারে কোনও সংক্রামক রোগ হয় অথবা যে বন্দরে সংক্রামক রোগ হইয়াছে স্টীমার যদি সেই স্থান হইতে আসে, তাহা হইলে তাহাকে কিছুকাল 'কোয়ারেণ্টাইন' বা 'সূতিকায়' থাকিতে হয়। এই ব্যবস্থা কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং বন্দরের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষই কেবল এই বিধি-নিষেধ প্রয়োগের অধিকারী। নাতালের সরকার এই স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। যদিও স্টীমারে কাহারও পীড়া ছিল না তথাপি নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা অনেক বেশী দিন স্টীমারগুলিকে আটকাইয়া রাখা হয়। উহাদিগকে তেইশ দিন পর্যন্ত যাত্রী নামাইতে দেওয়া হয় নাই। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় কমিটি স্বকার্য করিতেছিল। দাদা আবদুল্লা কোম্পানী 'কুরল্যাণ্ডের' মালিক এবং 'নাদেরীর' এজেণ্ট ছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া খুব টানাটানি করা হয়। যদি তাঁহারা যাত্রীসহ স্টীমার ফেরত পাঠান তবে সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে, আর নচেৎ তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি করা হইবে বলিয়া ধমক দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদারেরা ভীরু ছিলেন না। তাঁহারা জবাব দেন যে এইজন্য যদি তাঁহাদের সর্বনাশও হয়, তথাপি তাঁহারা তাহা গ্রাহ্য করিবেন না এবং তাঁহারা এই যাত্রীগুলিকে বলপূর্বক ফেরতপাঠানোর দুষ্কর্ম কখনও করিতে সম্মত না হইয়া বরঞ্চ শেষ পর্যন্ত লড়িয়া দেখিবেন। স্বদেশ-প্রেমের সহিত তাঁহারা অপরিচিত ছিলেন না। এই ব্যবসায়ীদের পুরানো

অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত লাফটন কে-সিও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন।

ভাগ্যক্রমে বিচারপতি নানাভাই হরিদাসের ভাগিনেয়, সুরাটের মনসুখলাল নাজর এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌছাইলেন। আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, তাঁহার আসার কথাও জানিতাম না। ইহাও বলা বাহুল্য যে ঐ দুই জাহাজে যে সকল যাত্রী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া আসার মধ্যে আমার এতটুকু হাত ছিল না। যাত্রীদের অধিকাংশই দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী। অনেক ট্রান্সভাল যাত্রীও ছিলেন। ইউরোপীয়দের কমিটি এই যাত্রীদেরও ভয় দেখাইয়া যেইস্তাহার পাঠাইতেছিল স্টীমারের কাপ্তানেরা তাহা যাত্রীদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। এই সব ইস্তাহারে স্পষ্ট ভাষায় ইহা লেখা থাকিত যে নাতালের ইউরোপীয়েরা খুব বদমেজাজে আছেন। যাত্রীরা যদি তাঁহাদের নিষেধ না শুনিয়াও স্টীমার হইতে নামেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এক-একজনকে ধরিয়া সমুদ্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে। আমি এই ইস্তাহারের অর্থ 'কুরল্যাণ্ডের' যাত্রীদিগকে পড়িয়া শুনাই। একজন ইংরাজী জানা 'নাদেরী'র যাত্রী তাঁহার সহযাত্রীদিগকে উহা পড়িয়া বুঝান। বুঝানো সত্ত্বেও প্রত্যেক যাত্রী ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। উহারা জবাব দিলেন যে তাঁহাদের অনেকে ট্রান্সভালে ফিরিয়া যাইতেছেন, অনেকে নাতালের পুরানো বাসিন্দা। আর যাহাই হোক, তাঁহাদিগকে নাতাল সরকার নামিতে দিতে বাধ্য। কমিটির ভয় দেখানো সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের অধিকার রক্ষার জন্য নামিয়া দেখিবেন।

নাতাল সরকারের বুদ্ধিতে কুলাইতেছিল না। কতদিন ধরিয়া এমন অন্যায় ভাবে বাধাদান করা চলে? তেইশ দিন গত হইল—দাদা আবদুল্লাও দমিলেন না, যাত্রীরাও ভয় পাইলেন না। তেইশ দিন পর 'সুতিকা' তুলিয়া লওয়া হয়, স্টীমারগুলিকে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত এসকম্ব উত্তেজিত ইউরোপীয় কমিটিকে শান্ত করিতেছিলেন। একটা সভায় তিনি বলেন, "ডারবানের ইউরোপীয়েরা প্রশংসার্হ ঐক্য ও সাহস দেখাইয়াছেন। আপনারা যাহা করার তাহা করিয়াছেন। সরকারও আপনাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। ভারতীয়দিগকে তেইশ দিন আটক রাখা হইয়াছে। আপনাদের মনোভাবের এবং সাধারণের হিতসাধনের চেষ্টার প্রচুর পরিচয় আপনারা দিয়াছেন। রাজকীয় সরকারের পথ খোলসা হইয়াছে। এক্ষণে যদি আপনার একজন ভারতীয় যাত্রীকেও বলপূর্বক নামিতে না দেন, তাহা হইলে আপনাদেরই স্বার্থহানি হইবে এবং সরকারকেও বিপদে

ফেলিবেন। আর তাহা ছাড়াও আপনারা ভারতীয়দিগের অবতরণ অকারণে বন্ধ করিতে পারিবেন না। যাত্রীদের কোনও দোষ নাই। তাহাদের মধ্যে বালক ও স্ত্রীলোকও আছেন। তাঁহারা যখন বোম্বাই হইতে রওনা হন, তখন তাঁহারা আপনাদের মনোভাবের কিছু খবর রাখিতেন না। আমি সেই জন্য আপনাদিগকে এক্ষণে ভিড় না করিয়া চলিয়া যাইতে অনুরোধ করি এবং যাত্রী-দিগকে বাধা দিতে নিষেধ করি। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এইপ্রকার যাত্রী না আসিতে পারে সেজন্য নাতাল সরকার বিধানসভা দ্বারা আইন গঠন করিয়া লইবেন।" শ্রীযুক্ত এসকম্বের বক্তৃতার ইহাই সারাংশ। তাঁহার শ্রোতারা ইহাতে নিরাশ হন। তবে নাতালের ইউরোপীয়দের উপর তাঁহার খুব প্রভাব ছিল। তাঁহারা তাঁহার কথায় ভিড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যান এবং দুইখানা স্টীমারই ঘাটে আসিয়া লাগে।

শ্রীযুক্ত এসকম্বের নিকট হইতে আমি এক সংবাদ পাই— তাহাতে আমাকে তখন নামিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি যেন অপেক্ষা করি। তখন তিনি জল-পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। আমার পরিবার যখন ইচ্ছা নামিতে পারেন। এই পত্রখানা আইন অনুযায়ী আদেশপত্র নহে। উহা কেবল কাপ্তানকে আমাকে নামিতে না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া মাত্র। আমার যে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে এইরূপে সে বিষয়েও আমাকে সতর্ক করানো হইয়াছিল। আমি জোর করিয়া নামিলে কাপ্তান ঠেকাইতে পারিতেন না। আমি স্থির করিলাম যে আমি এই কথা মানিয়া চলিব। আমার পরিবার আমার বাড়ীতে না পাঠাইয়া আমার পুরাতন বন্ধু ও মক্কেল পার্শী রোস্তমজীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া বলিলাম যে আমি সেইখানে গিয়া মিলিত হইব। যাত্রীরা জাহাজ হইতে নামার পর দাদা আবদুল্লা কোম্পানীর অ্যাডভোকেট এবং আমার ব্যক্তিগত বন্ধু শ্রীযুক্ত লাফটন আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি তখনও কেন নামি নাই জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে শ্রীযুক্ত এসকম্বের পত্রের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন যে আমার ঐভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত বা অপরাধীর মত শহরে প্রবেশ করা তিনি পছন্দ করেন না। যদি আমি সাহস করি তবে এখনই তাঁহার সহিত যেন নামিয়া পড়ি এবং যেন কিছুই হয় নাই এইভাবেই হাঁটিয়া শহরে প্রবেশ করি। আমি বলিলাম, "আমার ভয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন

এই যে, শ্রীযুক্ত এসকম্বের কথা না রাখা ভদ্রতায় বাধে কিনা। আর স্টীমারের কাপ্তানের এ বিষয়ে কি দায়িত্ব, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।" শ্রীযুক্ত লাফটন হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীযুক্ত এসকম্ব আপনার জন্য কি করিয়াছেন যে আপনাকে তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে হইবে? আপনার একথা মনে করার কি হেতু আছে যে আপনার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তিনি ঐ পত্র লিখিয়াছেন এবং বস্তুতঃ তাঁহার অন্য কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য নাই? আপনার অপেক্ষা আমি বেশী জানি যে শহরে কি ঘটিতেছে এবং শ্রীযুক্ত এসকম্ব তাহাতে কি করিতেছেন।" আমি মাথা ঝাঁকাইয়া তাঁহার কথায় বাধা দেওয়ায় তিনি বলিলেন, "ভাল, ধরিয়া লওয়া যাক্ যে শ্রীযুক্ত এসকম্বের উদ্দেশ্য ভালই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি আপনি তাঁহার কথামত চলেন, তবে আপনার এক্ষেত্রে নিজেকেই অপদস্থ করা হইবে। সেইজন্য আমি বলি যে যদি আপনি প্রস্তুত থাকেন তবে চলুন এখনি চলিয়া যাই। কাপ্তান আমাদের লোক, তাঁহার দায়িত্ব আমাদেরই দায়িত্ব। তাঁহার কার্যের জন্য তিনি কেবল দাদা আবদুল্লার নিকটই দায়ী। তাঁহারা এই ব্যাপারে খুবই সাহস দেখাইয়াছেন।" তাঁহারা এ বিষয়ে কি ভাবিবেন, তাহা আমি জানি। আমি বলিলাম, "তবে চলুন যাওয়া যাক। তৈরী হওয়ার কিছু নাই, আমার পাগড়ীটা লইলেই হইল। কাপ্তানকে বলিয়া রওনা হওয়া যাক।" আমরা কাপ্তানের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

শ্রীযুক্ত লাফটন ডারবানের পুরাতন ও খ্যাতনামা অ্যাডভোকেট। ভারতবর্ষে ফিরিবার পূর্বে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। কোনও কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে আমি তাঁহার পরামর্শ লইতাম এবং আমার সিনিয়র নিযুক্ত করিতাম। তিনি বীরপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার শরীরের গঠনও ছিল শক্ত।

আমাকে ডারবানের প্রধান রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে। আমরা অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে চারিটার সময় রওনা হই। আকাশে অল্প মেঘ ছিল। সূর্য দেখা যাইতেছিল না। হাঁটিয়া রুস্তমজী শেঠের বাড়ী যাইতে ঘণ্টাখানেক লাগিবে। স্টীমারঘাটের কাছাকাছি সাধারণতঃ যে প্রকার লোক থাকে, তদপেক্ষা বেশী লোক ছিল না। আমরা নামার পরেই কতকগুলি বালক আমাদিগকে দেখিতে পাইল। ভারতীয়দের মধ্যে আমি একপ্রকার বিশেষ ধরনের পাগড়ী পরিতাম। সেইজন্য তাহারা আমাকে তখনই চিনিয়া ফেলিল। তাহারা "গান্ধী, গান্ধী"

"মার মার" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল ও আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। কেহ কেহ ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল। কয়েকজন বয়স্ক ইউরোপীয় বালকদিগের সহিত যোগ দিলেন। দাঙ্গাকারীদের দল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। শ্রীযুক্ত লাফটন দেখিলেন যে, হাঁটিয়া যাওয়ায় বিপদ আছে। তিনি একটা রিকশা ডাকিলেন। মানুষ-টানা গাড়ীতে বসিতে আমার বড়ই বিতৃষ্ণা বলিয়া আমি এযাবৎ কখনও রিকশায় চাপি নাই। কিন্তু তখন রিকশা চড়াই কর্তব্য মনে করিলাম। আমি জীবনে ৫।৭ বার দেখিয়াছি যে যাহাকে ঈশ্বর বাঁচান, সে ইচ্ছা করিলেও তাহার পতন হইতে পারে না। আমি যে পতিত হই নাই তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই। রিকশা নিগ্রোরা টানিয়া থাকে। ছেলেরা ও বড়রা রিকশাওয়ালাকে ভয় দেখাইল যে রিকশায় আমাদিগকে চাপাইলে তাহাকে মারিবে ও রিকশা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। ইহাতে রিকশাওয়ালা আমাদিগকে লইবে না বলিয়া চলিয়া গেল, আমার রিকশা চাপা হইল না।

এখন হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমাদের পিছনে ভিড় লাগিয়া রহিল। যেমন আমরা চলিতে লাগিলাম ভিড়ও তেমনি বাড়িতে লাগিল। যখন বড় রাস্তায় পড়িলাম, তখন শত শত ছেলে-বুড়ো জড় হইয়া গেল। একজন সামর্থ্যশালী লোক শ্রীযুক্ত লাফটনের হাত ধরিয়া টানিয়া আমার নিকট হইতে সরাইয়া ফেলিল। এখন তিনি যে আর আমার কাছে আসিবেন, এরূপ অবস্থা রহিল না। ভিড় হইতে আমার উপর গালিবর্ষণ হইতে লাগিল এবং ইট-পাটকেল যে যাহা হাতের কাছে পাইল তাহাই ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। আমার পাগড়ী ফেলিয়া দিল। এই সময় একজন মোটা মত লোক আসিয়া আমাকে থাপ্পড় ও লাথি মারিল। আমি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম, একটা বাড়ীর আঙ্গিনার রেলিং ধরিয়া ফেলিলাম। দাঁড়াইয়া নিশ্বাস লইয়া মাথা খাড়া করিয়া চলিতে লাগিলাম। জীবন্ত অবস্থায় পৌঁছাইবার আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু একথা আমার স্মরণ আছে যে, এ সময়েও যাহারা মারিতেছিল তাহাদের প্রতি আমার লেশমাত্রও রোষ ছিল না।

আমার পথ-যাত্রা যখন এইরূপভাবে চলিতেছিল, তখন ডারবানের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী এই ব্যাপার দেখিতে পান। আমরা পরস্পরকে ভালরকমেই চিনিতাম। তিনি সাহসী মহিলা ছিলেন। যদিও তখন বৃষ্টি হইতেছিল না অথবা সূর্যের তেজ ছিল না, তথাপি তিনি তাঁহার ছাতা খুলিয়া

আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের অপমান—তারপর আবার ডারবানের বহু পুরাতন, লোকপ্রিয় পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রীর অপমান গোরারা করিতে পারিল না। তাঁহাকে আঘাত করিতেও পারে না, সেইজন্য তাঁহাকে বাঁচাইয়া আমাকে মার দেওয়ায় মারের ভিতর তেমন জোর আর ছিল না। ইতিমধ্যে দাঙ্গার সংবাদ পুলিসের নিকট পৌছায়, সেখান হইতে একটি দল আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। আমাদের থানার নিকট দিয়াই যাইতে হইত। সেখানে গিয়া দেখিলাম—পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে থানাতেই আশ্রয় লওয়ার পরামর্শ দেন। আমি বলিলাম, "আমি গন্তব্যস্থানেই যাইব। ডারবানের লোকের ন্যায়পরতা ও আমার নির্দোষিতার উপর আমার বিশ্বাস আছে। আপনি পুলিস পাঠাইয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার পত্নী শ্রীমতী আলেকজাণ্ডারও আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

অতঃপর ভালভাবেই রুস্তমজী শেঠের বাড়ী পৌছাইলাম। পৌছাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। 'কুরল্যাণ্ডের' ডাক্তার দাদীবরজোর তখন রুস্তমজী শেঠের বাড়ীতেই ছিলেন, তিনি আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আঘাত-গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, আঘাত বেশী হয় নাই। একটা আঘাতে রক্ত জমিয়া খুব ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু তখনও শান্তি পাওয়া অদৃষ্টে ছিল না। রুস্তমজী শেঠের বাড়ীর সামনে হাজার হাজার গোরা একত্র হইল। রাত্র হইয়াছিল বলিয়া অসচ্চরিত্র ও বদমাইস লোকেরাও ইহার মধ্যে জড় হইয়া গিয়াছিল। জনতা রুস্তমজী শেঠকে বলিতেছিল যে, "গান্ধীকে আমাদের কাছে ছাড়িয়া দাও, নচেৎ তোমাকে সুদ্ধ তোমার দোকান ও বাড়ী পোড়াইয়া ফেলিব।" ভয় দেখাইলেই ভয় পাওয়ার লোক তিনি ছিলেন না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডার সংবাদ পাইয়া ডিটেকটিভ পুলিস লইয়া প্রথমে ভিড়ের ভিতর মিশিয়া যান এবং পরে একটা বেঞ্চ আনিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া থাকেন। এইরূপে লোকের সহিত কথাবার্তা বলার অছিলায় রুস্তমজীর বাড়ীর ফটক তিনি দখল করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যাহাতে কেহ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারে। উপযুক্ত স্থানে তিনি ডিটেকটিভ পুলিসও রাখিয়াছিলেন। তিনি পৌছিয়াই একজন ডিটেকটিভকে মুখে রং মাখাইয়া ভারতীয় ব্যবসায়ী সাজাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে পাঠান। তিনি

তাঁহার মারফৎ এই খবর পাঠান যে, "যদি আপনি আপনার মিত্রের, তাঁহার অতিথিদিগের ও আপনার পরিবারের ধন ও প্রাণ রক্ষা করিতে চান, তবে আপনাকে ভারতীয় সিপাহীর পোশাক পরিয়া রুস্তমজীর গুদামের ভিতর দিয়া আমার লোকের সহিত ভিড়ের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া থানায় গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। এই গলির মুখেই আপনার জন্ম গাড়ী তৈরী থাকিবে। আপনাকে ও অন্ত সকলকে বাঁচাইবার এই একটামাত্র পথই আমার আছে। ভিড় এত উত্তেজিত হইয়া আছে যে, উহাকে আটকাইয়া রাখার আর কোনও উপায় আমার হাতে নাই। আপনি বিলম্ব করিলে এই বাড়ী ত ভস্মসাৎ হইবেই, জিনিসপত্র ও জীবনের যে কত হানি হইবে তাহা বলিতে পারি না।"

তখনই আমি অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গেই সিপাহীর পোশাক পরিয়া সেই ব্যক্তির সহিত বাহির হইয়া গিয়া নিরাপদে থানায় পৌঁছাইলাম। ইতিমধ্যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রঙ্গ-তামাশা-গান ইত্যাদি করিয়া, ভিড়ের মন যোগাইতেছিলেন। যখন তিনি সঙ্কেতে বুঝিতে পারিলেন যে আমি থানায় পৌঁছাইয়া গিয়াছি, তখন তিনি সময়োচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া তাহাদের সহিত বার্তালাপে রত হইলেন :

"তোমরা কি চাও?"

"আমরা গান্ধীকে চাই।"

"তাহাকে লইয়া কি করিবে?"

"তাহাকে পোড়াইয়া মারিব।"

"কেন, সে কি করিয়াছে?"

"ভারতবর্ষে আমাদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে, আর হাজার হাজার ভারতীয় দিয়া এই দেশ ছাইয়া ফেলিতে চাহিতেছে।"

কিন্তু সে যদি বাহিরে না আসে তবে কি করিবে?"

"তাহা হইলে এই বাড়ীটা জ্বালাইয়া দিব।"

"এখানে তাহার স্ত্রী-পুত্র, অন্ত স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে আছে। স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে পোড়াইয়া মারিতে তোমাদের লজ্জা হইবে না?"

"সে তো আপনারই দোষ। আপনি যদি আমাদিগকে বাধ্য করেন তবে আমরা কি করিব? আমরা তো আর কাহাকেও সাজা দিতে চাই না। গান্ধীকে আনিয়া দিলেই চুকিয়া যায়। দোষীকে আমাদের হাতে ফেলিয়া

দিবেন না, আর তাহাকে সাজা দিতে গেলে যদি অপরের ক্ষতি হয় তাহা হইলে সে দোষ আমাদের—এই অভিযোগ করা কি আপনার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইবে?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাল্কাভাবে হাসিয়া উত্তর দিলেন যে, গান্ধী তাঁহাদের মধ্য দিয়াই অন্যত্র গিয়া নিরাপদে পৌঁছিয়াছে। লোকে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া, "মিছে কথা—মিছে কথা" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "তোমরা যদি তোমাদের বুড়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথা বিশ্বাস না কর, তবে তোমাদের মধ্য হইতে তিন-চারজন লোকের একটি কমিটি করিয়া দাও। কথা দাও যে বাড়ীতে আর কেহ ঢুকিবে না, আর যদি তোমাদের কমিটি গান্ধীকে খুঁজিয়া না পায় তবে তোমরা খুব শান্তভাবে ফিরিয়া যাইবে। তোমরা আজ উত্তেজিত হইয়া পুলিসের কথা রাখ নাই, ইহাতে পুলিসের দোষ নাই, তোমাদেরই দোষ হইয়াছে। সেই জন্য পুলিস তোমাদের সহিতও চালাকি খেলিয়াছে। তোমাদের মধ্য দিয়াই তোমাদের শিকার লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। তোমরা হারিয়া গিয়াছ। ইহাতে পুলিসকে দোষ দিও না। তোমরাই যে-পুলিস রাখিয়াছ, এইরূপে সে-পুলিস তাহাদের নিজেদের কর্তব্যই পালন করিয়াছে।"

এই সমস্ত কথাবার্তা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এত মিষ্টভাবে, এত হাসিয়া অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, লোকে তাহাতেই স্বীকৃত হয়। কমিটি নিযুক্ত হইল। তাহারা শেঠ রুস্তমজীর বাড়ীর কোণায় কোণায় খুঁজিয়া দেখিল। তাহারা আসিয়া বলিল, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথাই ঠিক। তিনি আমাদিগকে হারাইয়াছেন।" লোকেরা নিরাশ হইলেও কথা রাখিল, কোনও লোকসান না করিয়া নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেল। ১৮৯৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী এই ঘটনা ঘটে।

যেদিন প্রাতঃকালে 'সূতিকা' উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল, সেইদিনই ডারবানের একখানা সংবাদপত্রের রিপোর্টার জাহাজে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সমস্ত অবস্থা জানিয়া লন। আমার উপর আরোপিত দোষসমূহ স্খালন করা সহজ ছিল। সমস্ত প্রমাণ দ্বারা আমি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে, আমি তিলমাত্র অতিশয়োক্তি করি নাই। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা করা আমার কর্তব্য ছিল। না করিলে আমি মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিতাম না। পরদিন এই সমস্ত কথাই পুরাপুরি প্রকাশ হইয়া যায়।

সমঝদার গোরারা নিজেদের দোষ স্বীকার করিলেন। সংবাদপত্রসমূহ নাতালের ইউরোপীয়দের অবস্থার প্রতি নিজেদের সহানুভূতি জানায়, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার কার্যও সঙ্গত হইয়াছে বলে। ইহাতে আমার প্রতিষ্ঠা বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাও বাড়িয়া যায়। এ কথাটাও প্রমাণ হইয়া যায় যে, ভারতীয়েরা গরীব হইলেও কাপুরুষ নয় এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ব্যবসার প্রয়োজন ছাড়াও নিজেদের মানের জন্য ও দেশের জন্য লড়িতে পারে।

ইহাতে যদিও ভারতীয় সম্প্রদায়কে একদিক দিয়া দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছিল—দাদা আবদুল্লাকে খুব লোকসান সহ্য করিতে হইয়াছিল, তবুও এই দুঃখের ফলে শেষ অবধি লাভই হইয়াছিল বলিয়া আমি মনে করি।

সম্প্রদায় নিজের শক্তির পরিমাপ করিতে পারিয়াছিল এবং সম্প্রদায়ের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়াছিল। আমারও খুব অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। আমি যখনই এই দিনের কথা ভাবি, তখনই মনে হয় যে ঈশ্বর আমাকে সত্যাগ্রহের জন্যই প্রস্তুত করিতেছিলেন।

নাতালের এই ঘটনার প্রভাব বিলাত পর্যন্ত পৌঁছায়। শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন সরকারী কর্তৃপক্ষকে তার করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, যাহারা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের নামে মোকদ্দমা চালাইতে হইবে। যাহাতে আমার প্রতি ন্যায়বিচার হয় তাহাও যেন করা হয়।

শ্রীযুক্ত এসকম্ব বিচার বিভাগের প্রধান কর্তা ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের তারের কথা বলেন। আমার যে লাঞ্ছনা হইয়াছিল তজ্জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। আমি যে বাঁচিয়া গিয়াছি সেজন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, "আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আপনার বা আপনার সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হোক—এই ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। আপনাকে উৎপীড়ন করিবে বলিয়া আমার ভয় হইয়াছিল, সেইজন্য আপনাকে রাত্রে স্টীমার হইতে নামার কথা বলিয়াছিলাম। আমার কথা আপনার পছন্দ হয় নাই, আপনি শ্রীযুক্ত লাফটনের কথায় নামিয়াছিলেন বলিয়া আমি আপনাকে দোষ দিতে চাই না। আপনার যাহা ভাল লাগে তাহা করার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন যাহা করিতে চাহেন নাতাল সরকারের তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। দোষীর সাজা হোক্ আমরা তাহাই চাই। দাঙ্গাকারীদের কাহাকেও কি আপনি সনাক্ত করিতে পারিবেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "সম্ভবতঃ আমি দুই-একজনকে চিনিতে পারিব। কিন্তু এ কথা লইয়া আলোচনা করিবার পূর্বেই আমি বলিয়া রাখি যে, আমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি যে আমার উপর কোনও অত্যাচার হইলে আমি কাহারও নামেই আদালতে নালিশ করিব না। যাঁহারা দাঙ্গা করিয়াছেন, তাঁহাদের দোষও আমি দেখি না। তাঁহারা ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের নেতাদের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছেন, তাহার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে তাঁহারা বিচার করিতে পারেন না। আমার সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা যদি সত্য হইত, তবে উত্তেজিত হইয়া ক্রোধের বশে অকার্য করিয়া ফেলায় আমি তাঁহাদের দোষ দেখি না। উত্তেজিত জনতা এইভাবেই যাহা ন্যায্য মনে করে তাহা করিয়া থাকে। যদি ইহাতে কাহারও দোষ থাকে তাহা হইলে এ বিষয়ে নিযুক্ত কমিটির দোষ, আপনার নিজের দোষ এবং নাতাল সরকারের দোষ। রয়টার যেমন তারবার্তাই পাঠাইয়া থাকুক না কেন, আমি যখন এখানে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিলাম, তখন আমার সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়াছিলেন তাহা আমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা আপনার ও কমিটির কর্তব্য ছিল। আমার জবাব শুনিয়া তাহার পর যাহা উচিত তাহা করিতে পারিতেন। তবে প্রহৃত হইবার জন্য আমি আপনার অথবা আপনার কমিটির নামে মোকদ্দমা চালাইতে পারি না। আর যদি তাহা সম্ভবও হইত, তবুও আদালতের মারফতে এই প্রতিকার গ্রহণ করিতে আমি চাই না। গোরাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আপনার যাহা ভাল বোধ হইয়াছে তাহা আপনি করিয়াছেন। উহা রাজনীতির বিষয়। এ সম্বন্ধে আপনার সহিত আমাকে লড়িতে হইবে। আপনাকে ও গোরাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা বড় অংশ হিসাবে গোরাদের ক্ষতি না করিয়া আমরা কেবল নিজেদের সম্মান ও অধিকার বজায় রাখিতে চাই।"

শ্রীযুক্ত এসকম্ব বলিলেন, "আপনার কথা আমি বুঝিতেছি, আমার নিকট উহা উত্তম বোধ হয়। প্রহৃতকারীদের বিরুদ্ধে আপনি যে মোকদ্দমা চালাইতে চাহেন না—এমন কথা শুনিতে পাইব বলিয়া আমি প্রত্যাশা করি নাই। আপনি যদি মোকদ্দমা করিতে চাহেন তবে আমি এতটুকুও দুঃখিত হইব না। কিন্তু আপনি যখন কেন নালিশ করিতে চাহেন না তাহার কারণ দেখাইলেন তখন আমি বলিতে চাই যে আপনার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। আপনি এই সংযম দ্বারা আপনার সম্প্রদায়ের বিশেষ সেবা করিলেন। এই কথাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আপনার এই সঙ্কল্পের জন্য নাতাল সরকারকে এক বিষম স্থিতি

হইতে বাঁচাইলেন। আপনি ইচ্ছা করিলেই এখন আমাদের ধরপাকড় আরম্ভ করিতে হইত। কিন্তু আপনাকে হয়ত একথা বলাই বাহুল্য যে, এই সব করিতে গেলে গোরাদের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিবে—নানা রকম সমালোচনা হইবে। কোনও সরকারই ইহা পছন্দ করে না। যদি আপনি নালিশ না করাই চূড়ান্তভাবে স্থির করিয়া থাকেন, তবে সেই মর্মে আমাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিবেন। আমাদের কথাবার্তার উল্লেখ করিয়াই শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের কাছে আমাদের সরকারকে বাঁচাইতে পারিব না। আপনার চিঠির ভাবার্থ আমাকে তারযোগে তাঁহাকে জানাইতে হইবে। কিন্তু এই চিঠি আপনি এখনই দিন—একথা আমি বলিতেছি না। আপনি মিত্রদের সহিত পরামর্শ করুন, শ্রীযুক্ত লাফটনের পরামর্শ গ্রহণ করুন। তারপর আপনার যদি ইচ্ছা হয় তবে চিঠি লিখিবেন। চিঠিতে আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে যে নিজ দায়িত্বে আপনি প্রহৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে অস্বীকার করিতেছেন। তাহা হইলেই কেবল সে চিঠি আমাদের কাজে লাগিবে।"

আমি বলিলাম, "আমি এখানে আসার সময় জানিতে পারি নাই যে, আপনি এইজন্য আমাকে ডাকিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয় লইয়া অতীতে কাহারও সহিত পরামর্শ করি নাই এবং ভবিষ্যতেও কাহারও সহিত আমার পরামর্শ করার ইচ্ছা নাই। আমি যখন শ্রীযুক্ত লাফটনের সহিত হাঁটিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তখনই মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিলাম যে যদি আহত হই তবে আমি যেন মনে মনে কাহাকেও দোষ না দিই। সুতরাং কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করার কথাই উঠে না। এই বিষয়টা আমার নিকট ধর্ম হিসাবে কর্তব্য। আপনি যেমন বলিলেন আমিও তাহাই মনে করি যে, এই সংযম দ্বারা আমি আমার সম্প্রদায়ের সেবাই করিব। উপরন্তু আমার বিশ্বাস আমার নিজেরও ইহাতে লাভ হইবে। সেইজন্যই আমার নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব লইয়া এইখানেই পত্র লিখিয়া দিতে চাই।" তখনই আমি তাঁহার নিকট হইতে সাদা কাগজ লইয়া পত্র লিখিয়া দিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

প্রাথমিক দ্বন্দ্বের আলোচনা (পূর্বানুবৃত্তি)

ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক

গত অধ্যায়ে পাঠকেরা দেখিয়া থাকিবেন যে, কষ্ট করিয়া অথবা সহজেই ভারতীয় সম্প্রদায় নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য কি চিন্তা করিয়াছিল এবং ইহাও দেখিয়াছেন যে সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য যেমন চেষ্টা চলিতেছিল তেমনি ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড হইতে সাহায্য পাওয়ার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছিল। ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখিয়াছি, বিলাত হইতে সাহায্য পাওয়ার জন্য কি করা হইয়াছিল তাহা এখন উল্লেখ করার দরকার। কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সহিত সম্বন্ধ অবশ্য রাখিতেই হইবে। সেইজন্য প্রত্যেক সপ্তাহে দাদাভাইকে ও উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণকে পত্র দিয়া অবস্থা জানানো হইত। আবেদনাদি করিবার ব্যয় ও অন্যান্য সামান্য খরচার জন্য কমপক্ষে দশ পাউণ্ড করিয়া পাঠানো হইত।

এখানে দাদাভাই-এর পবিত্র স্মৃতির কথা লিখিতেছি। দাদাভাই এই কমিটির সভাপতি ছিলেন না। তাহা হইলেও আমাদের মনে হইয়াছিল তাঁহার নিকট টাকা পাঠানোই ঠিক, তিনি আমাদের হইয়া ঐ টাকা সভাপতিকে দিবেন। কিন্তু তিনি প্রথমবারের টাকা ফেরত পাঠান এবং জানান যে টাকাপয়সা ইত্যাদি স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণের নিকটই যেন পাঠানো হয়। তিনি সাহায্য অবশ্যই করিবেন। তবে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণের দ্বারা কাজ করিলেই কমিটির প্রতিষ্ঠা বাড়িবে। আমি দেখিয়াছিলাম যে দাদাভাই এত বৃদ্ধ হইলেও চিঠিপত্রাদির বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন। যদি বিশেষ কিছু না লেখারও থাকিত, তথাপি ফেরত ডাকে পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারটা অন্ততঃ থাকিত। এই প্রকার চিঠি তিনি নিজ হাতেই লিখিতেন এবং 'টিসু পেপারে' নকল রাখিতেন।

পূর্বের অধ্যায়ে আমি লিখিয়াছি যে কংগ্রেসের নাম আমরা গ্রহণ করিলেও আমাদের অভিযোগগুলি একদেশদর্শী করার ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য আমরা

অপর পক্ষের সহিতও পত্র ব্যবহার করিতাম এবং আমরা যে ঐ প্রকার করিতেছি তাহা দাদাভাইকে জানাইতাম। ইহাদের মধ্যে দুইজন ব্যক্তিই প্রধান ছিলেন। একজন স্যার ম্যাঞ্চরজী ভবনাগরী আর দ্বিতীয়জন স্যার উইলিয়ম উইলসন্ হাণ্টার। স্যার ম্যাঞ্চরজী ভবনাগরী এই সময় কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে খুব সাহায্য পাওয়া যাইত এবং তিনি প্রায়ই আমাদিগকে পত্র লিখিতেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা সর্বাপেক্ষা পূর্বে বুঝিতে ও সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন স্যার উইলিয়ম হাণ্টার। তিনি টাইম্‌সের ভারতীয় বিভাগের সম্পাদক ছিলেন।

তাঁহার নিকট প্রথম পত্র লেখার পর হইতেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যকার অবস্থা ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেন। যেখানে উপযুক্ত বোধ করিয়াছেন, সেইখানেই নিজে বিশেষ করিয়া সেই প্রশ্ন বিষয়ে ব্যক্তিগত পত্র লিখিতেন। যদি কোনও গুরুতর বিষয়ে আলোচনা চলিত, তখন প্রায় সপ্তাহেই তাঁহার পত্র আসিত। তিনি যে প্রথম পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছেন যে, "আপনি যে অবস্থার কথা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমার দুঃখ হইতেছে। আপনাদের কর্তব্য আপনারা বিনয়ের সহিত, শান্তির সহিত এবং সম্পূর্ণভাবে করিয়া যাইতেছেন। আমার সহানুভূতি সম্পূর্ণ আপনাদিগের দিকেই রহিয়াছে। এই বিষয়ে আমি ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা এবং প্রকাশ্যভাবে যাহা করার তাহা করিব স্থির করিয়াছি। আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে আমরা এতটুকুও দাবি ত্যাগ করিতে পারি না। আপনাদের দাবি এত কম যে কেহই—কোনও নিষ্পক্ষপাত লোকই উহা কমাইবার কথা বলিতে পারেন না।" এ বিষয়ে প্রায় এই কথাগুলিই তিনি তাঁহার প্রথম পত্রে 'টাইমসে' লেখেন। তিনি শেষ পর্যন্ত এই ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। লেডী হাণ্টার তাঁহার মৃত্যুর পর এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে ভারতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রবন্ধমালা লেখার জন্য সংক্ষিপ্তসার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

গত প্রবন্ধে মনসুখলাল নাজরের কথা লিখিয়াছি। সম্প্রদায়ের বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে বিলাতে পাঠানো হইয়াছিল এবং যাহাতে তিনি বিলাতের উভয় পক্ষের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া কার্য করিতে পারেন, তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছিল। যখন তিনি বিলাতে ছিলেন তখন স্যার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার, স্যার ম্যাঞ্চরজী ভবনাগরী ও ব্রিটিশ কমিটির সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। তিনি ভারতীয় পেন্সনভোগী কর্মচারীদের সহিত, ভারতীয়

সেক্রেটারী অফিসের সহিত এবং উপনিবেশের অফিসের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন। এইভাবে আমরা কোনও দিকেই চেষ্টা করিতে বাকি রাখি নাই। এই সকলের পরিণামে এই হয় যে, মহামান্য সরকারের নিকট প্রবাসী ভারতবাসীদের বিষয়ে প্রশ্ন একটা বড় জিনিস হইয়া পড়ে। অন্য উপনিবেশের উপর ইহার ভাল ও মন্দ প্রভাব দুই-ই হইয়াছিল। অর্থাৎ যেখানেই ভারতীয়েরা বাস করিতেন, সেইখানেই ভারতীয়েরা ও গোরারা উভয়েই জাগ্রত হইয়া পড়িলেন।

নবম অধ্যায়

বুয়ার যুদ্ধ

যাঁহারা পূর্বের অধ্যায়গুলি ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ভারতীয়দের অবস্থা বুয়ার যুদ্ধের প্রাক্কালে কেমন হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই সকল অসুবিধা দূর করার কি চেষ্টা হইতেছিল তাহাও জানিয়াছেন। ১৮৯৯ সালে ডাঃ জেমিসন সোনার খনির মালিকগণের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া জোহানস্‌বার্গের উপর চড়াও করেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, জোহানস্‌বার্গ অধিকার করার পরে বুয়ার সরকার এ বিষয় জানিতে পারিবেন।

এইভাবে হিসাব করায় ডাক্তার জেমিসন ও তাঁহার মিত্রগণ বড় একটা ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও একটা ভুল এই করেন যে যদি এই ষড়যন্ত্র ধরাও পড়িয়া যায়, রোডেশিয়ার শিক্ষিত বন্দুকধারীদের বিরুদ্ধে বুয়ার চাষীরা কিছুই করিতে পারিবেন না। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে জোহানস্‌বার্গের অধিকাংশ বাসিন্দাই তাঁহাদিগকে সংবর্ধনার সহিত গ্রহণ করিবেন। এ হিসাবটাতেও তাঁহাদের ভুল হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার সময়মত সমস্ত সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ধীরভাবে কুশলতার সহিত ও গোপনে ডাক্তার জেমিসনের প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে তৈরী হইয়াছিলেন। সেইজন্য ডাক্তার জেমিসন জোহানস্‌বার্গের নিকটে পৌঁছাইবার পূর্বেই বুয়ার সৈন্যদের গুলি দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন। এই সৈন্যদের বিরুদ্ধে তিষ্ঠিবার শক্তি ডাঃ জেমিসনের ছিল না। জোহানস্‌বার্গেও কেহ যাহাতে বিরুদ্ধাচরণ করিতে না পারে সেজন্যও

তাঁহারা তৈয়ারী ছিলেন। বস্তুতঃ সেইজন্য জোহানস্‌বার্গে কেহ মাথাও তুলিতে পারে নাই। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের ক্ষিপ্রতায় জোহানস্‌বার্গের ক্রোড়পতিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। এত ভাল রকম প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া এই কার্যে খুব কম ব্যয় হয়, জীবনহানিও খুব কমই হয়।

ডাক্তার জেমিসন এবং তাঁহার মিত্রখনির মালিকগণ শীঘ্রই গ্রেপ্তার হইলেন এবং তাঁহাদের বিচারের দ্রুত ব্যবস্থা হইল। কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকে ক্রোড়পতি ছিলেন। মহামান্য সম্রাটের সরকার ইহাতে কি আর করিতে পারেন? তাঁহারা দিবালোকে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন দীনভাবে তার করিয়া তাঁহার দয়া ভাব জাগ্রত করিয়া এই সকল লোকের জীবন ভিক্ষা করিলেন। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার নিজের খেলা ভাল খেলিতে জানিতেন। তিনি জানিতেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন কোনও শক্তি নাই যে, তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারে। ডাক্তার জেমিসন ও তাঁহার সহযোগীগণের হিসাবে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র বেশ পাকাপোক্ত করিয়াই করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের হিসাবে উহা ছিল ছেলেখেলা। তিনি সেইজন্য শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের অনুরোধ রক্ষা করিয়া কাহাকেও ফাঁসি দিলেন না, তাঁহাদের সকলকেই ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু এভাবে বেশীদিন চলে না। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার জানিতেন যে, ডাক্তার জেমিসনের আক্রমণ একটা বিষম ব্যাধির লক্ষণ মাত্র। জোহানস্‌বার্গের ক্রোড়-পতিরা যে এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা করিবেন না, তাহা হইতেই পারে না। তারপর যে সকল সংস্কার সাধনের জন্য ডাক্তার জেমিসন এই আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়, সে সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। ক্রোড়পতিদের চুপ করিয়া থাকার কথা নয়। তাঁহাদের দাবির প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনও ডাক্তার জেমিসন আদির প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করার জন্য প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আবশ্যকীয় সংস্কারের দিকেও প্রেসিডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলেই জানিতেন যে একটা লড়াই অবশ্যম্ভাবী। খনির মালিকদের দাবি এমন ছিল যে তাহা পূরণ করিলে ট্রান্সভালে বুয়ারদের প্রাধান্য নষ্ট হয়। উভয় পক্ষই বুঝিয়াছিলেন যে যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সেইজন্য উভয় পক্ষই তৈরী হইতে লাগিলেন। এই

সময়কার শব্দ-যুদ্ধও দেখার মত ছিল। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার যখন বেশী করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র আনার আদেশ দিলেন, তখন ব্রিটিশ এজেণ্ট তাঁহাকে এই বলিয়া সতর্ক করিলেন যে অতঃপর ইংরেজদেরও আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্য তলব করিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সৈন্য হাজির হইলে প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার ইংরেজদের পরিহাস করিয়া যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি দোষারোপকরতঃ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার যখন পুরাপুরি তৈয়ারী হইলেন, তখন দেখিলেন যে তাহার পরও বসিয়া থাকা মানে শত্রুর হাতে গিয়া পড়া। ব্রিটিশ সরকারের অর্থ ও জনবলের অক্ষয় ভাণ্ডার ছিল। সেইজন্য তাঁহাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে তৈরী হওয়ারও সুবিধা ছিল। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকেও তাঁহারা বলিয়া যাইতে পারিতেন যে, অভিযোগের প্রতিকার করা হউক এবং অবশেষে প্রতিকার না করার জন্য বাধ্য হইয়াই যুদ্ধ করিতে হইতেছে ইহাও জগৎকে দেখাইতে পারিতেন। বস্তুতঃ এই অবকাশে তাঁহারা এমন ভাবে এত প্রস্তুত হইয়া লইতে পারিতেন যে, যুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের জয়ের সম্ভাবনা থাকিত না এবং দীনভাবে ব্রিটিশ সরকারের দাবি মানিয়া লইতে হইত। যে জাতির ১৮ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক সকলেই যুদ্ধে কুশল, যাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিতে পারেন, যাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা একটা ধর্মকার্য বলিয়া গণ্য করেন, সে জাতি বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের অধিকারী কোন শক্তির কাছে ঐ প্রকার দীন-দশা স্বীকার করে না। বুয়ার প্রজারা এমনি বাহাদুর।

অরেঞ্জ ফ্রী-স্টেটের সহিত প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার পূর্বেই পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই দুইটি বুয়ার রাজ্য একই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের দাবি মানিয়া লইতে অথবা খনির মালিকদের সন্তোষ বিধান হয় অন্ততঃ ততটা স্বীকার করিতেও প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য এই দুই রাজ্যই এ বিষয়ে একমত হইল যে যখন যুদ্ধ করিতেই হইবে তখন যত সময় দেওয়া যাইবে ব্রিটিশ সরকার ততই প্রস্তুত হইয়া পড়িবে। এইজন্য প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার ব্রিটিশ সরকারকে লর্ড মিলনারের মারফৎ চরমপত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী-স্টেটের সীমায় সৈন্য বসাইয়া দিলেন। ইহার একটিমাত্রই পরিণাম হইতে পারে। ব্রিটিশের ন্যায় বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের

অধিকারী ধমকে ভয় পাইতে পারে না। চরমপত্রের মেয়াদ পূর্ণ হইলেই বুয়ার সৈন্ত বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইল। লেডি স্মিথ, কিম্বারলী ও মেফিকিং অবরুদ্ধ হইল। এইভাবে ১৮৯৯ সালে এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। পাঠকেরা জানেন যে লড়াইয়ের অন্যান্ত কারণের মধ্যে ব্রিটিশ তরফ হইতে বুয়ার রাজ্যে ভারতীয়দের দুরবস্থাও একটা কারণ ছিল এবং ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতিরও একটা দাবি তাঁহারা করিয়াছিলেন।

এই অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের কর্তব্য কি? এই মহাপ্রশ্ন তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইল। বুয়ারদের মধ্যে পুরুষেরা সকলেই যুদ্ধে বাহির হইয়া পড়িলেন। উকিলেরা ওকালতী ছাড়িলেন, কৃষকেরা কৃষিকর্ম ছাড়িলেন, ব্যবসায়ী ব্যবসায় ছাড়িলেন, চাকুরিয়া চাকুরি ছাড়িলেন, ইংরাজদের দিকে ওরূপ না হইলেও কেপ্ কলোনি নাতাল ও রোডেশিয়ার সাধারণ লোকেদের মধ্য হইতে অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হইলেন। অনেক বড় বড় ইংরাজ উকিল ও ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিলেন। যে আদালতে আমি ওকালতী করিতাম সেখানে অতঃপর অল্পসংখ্যক উকিলই দেখিতে পাইলাম। বড় উকিলদের সকলেই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। ভারতীয়দিগের উপর যে সকল দোষারোপ করা হইত তাহাদের মধ্যে একটি ছিল এই যে ভারতীয়েরা কেবল অর্থের সন্ধানেই দক্ষিণ আফ্রিকায় আছেন, তাঁহারা ইংরেজদিগের বোঝা স্বরূপ। কাষ্ঠের ভিতর যেমন উই প্রবেশ করিয়া তাহাকে ফোঁপরা করিয়া দেয়, তেমনি এই ভারতীয়েরা তাঁহাদের (ইংরাজদের) কলিজা কুরিয়া কুরিয়া খাইতে আসিয়াছেন। যদি দেশের উপর আক্রমণ হয় এবং ঘর-বাড়ী লুট হইতে থাকে তবুও তাঁহারা ইংরেজদের কোনও কাজে আসিবেন না। ইংরেজদের তখন কেবল নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, এই লোকগুলিকেও রক্ষা করিতে হইবে।

আমরা ভারতবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সম্বন্ধে সকলেই আলোচনা করিতেছিলাম। আমাদের অনেকেরই মনে হইল যে, এই অভিযোগের মূলে যে কোনই ভিত্তি নাই তাহা প্রমাণ করার এই সুন্দর অবসর। কিন্তু অপরদিকে নিম্নোক্ত আলোচনাও কেহ কেহ করিলেন:

"ব্রিটিশ ও বুয়ার উভয়েই আমাদিগের উপর সমান নির্যাতন করেন। ট্রান্সভালেই আমাদের দুঃখ আছে, আর নাতালে, কেপ টাউনে নাই এমন তো নয়। প্রভেদ যাহা আছে তাহা কেবল পরিমাণের। বলিতে গেলে আমরা

একরকম ক্রীতদাসেরই মত। বুয়ারেরা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। আমরা কেন তাঁহাদের ধ্বংসের নিমিত্ত হই? ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখিলে বুয়ারেরা যে হারিবেন এরূপ মনে হয় না। যদি তাঁহারা জয়লাভ করেন, তবে আমাদের উপর প্রতিশোধ তুলিতে কি তাহারা ছাড়িবেন?"

আমাদের ভিতরে একদল দৃঢ়ভাবে এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি নিজেও এই সকল যুক্তির গুরুত্ব বুঝিতে পারিতাম। উহা অগ্রাহ্য করার মত নয়। আমি উহাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতাম। তাহা হইলেও ঐ সকল যুক্তি আমার মনঃপূত ছিল না। সেইজন্য ঐ সকল যুক্তির জবাব আমি নিজের কাছে ও সম্প্রদায়ের কাছে এইভাবে দিতাম:

"দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের অস্তিত্ব নিছক ব্রিটিশ-প্রজা হিসাবে। প্রত্যেক দরখাস্তেই আমরা ব্রিটিশ-প্রজার অধিকার দাবি করি। ব্রিটিশ-প্রজা হওয়া সম্মানজনক মনে করি। অন্ততঃ উহাতে সম্মান আছে একথা শাসনকর্তাদিগকে ও জগৎকে জানাইয়া থাকি। শাসনকর্তারাও আমাদের অধিকার ব্রিটিশ-প্রজা হিসাবেই রক্ষা করিয়া থাকেন। এক-আধটুকু যে সুবিধা পাই তাহাও ব্রিটিশ-প্রজা হিসাবেই। যখন ব্রিটিশের এবং আমাদের সর্বনাশের সম্ভাবনা উপস্থিত, সেই সময় ইংরেজেরা আমাদিগকে দুঃখ দেয় বলিয়া হাত-পা গুটাইয়া থাকা মনুষ্যত্বের কার্য হয় না। ইহা এই দুঃখের উপর আরও দুঃখ বাড়াইবার হেতু হয়। আমাদের উপর যে দোষারোপ করা হয় তাহা আমরা অন্যায় মনে করিয়া থাকি এবং যখন উহা অন্যায় বলিয়া প্রমাণ করার অবকাশ আসিয়াছে তখন সেই অবকাশ পরিত্যাগ করার অর্থ সেই দোষারোপ যে সত্য নিজেরাই তাহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া। ইহার পর যদি আমাদের দুঃখ আরও বাড়ে, যদি ইংরেজেরা বেশী করিয়া কটাক্ষ করেন, তাহা হইলে তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকিবে না। এই ক্ষেত্রে দোষ সম্পূর্ণ আমাদের বলিয়া গণ্য হইবে। ইংরেজেরা আমাদের উপর যে দোষারোপ করেন তাহার কোনও ভিত্তি নাই এবং তাহা ধর্তব্য বিবেচনা করার উপযুক্ত নহে—একথা বলা ও নিজেদিগকে ঠকানো একই কথা হইবে। আমরা যে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে গোলামের মত হইয়া আছি, সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও সেই সরকারের অধীনে থাকিয়াই গোলামী-মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করিতেছি। ভারতবর্ষের নেতারাও এইভাবেই চলিতেছেন। আমরাও এই প্রকারই করিয়া আসিতেছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশস্বরূপ থাকিয়া আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিতে এবং

উন্নতিসাধন করিতে যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে ইংরেজদের এই যুদ্ধে আমাদের শরীর মন ও ধন দ্বারা সাহায্য করার সেই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বুয়ারদের পক্ষ যে ন্যায়ের পক্ষ, ইহা বহুলাংশে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রের ভিতরে থাকিয়া প্রতিটি প্রজার প্রত্যেক কার্যে নিজ নিজ স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করা চলে না। শাসনকর্তারা যাহা কিছু করেন তাহাই যে ঠিক—এমন নহে। তাহা হইলেও প্রজারা যতক্ষণ কোনও শাসন-ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লন, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে সেই শাসনকার্যের অনুকূল থাকা ও সাহায্য করা প্রজাসাধারণের স্পষ্টই কর্তব্য।

"প্রজাদের মধ্যে কোন শ্রেণী যদি মনে করে যে ধর্মীয় কারণে রাষ্ট্রের কোন কার্য অনৈতিক, তবে উক্ত কার্যে বাধা দেওয়া অথবা সাহায্য করার পূর্বে জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও তাঁহাদের সরকারকে সেই অধর্ম কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত হইবে। আমরা এমন কিছুই করি নাই। এই প্রকার ধর্ম-সঙ্কট আমাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই। আমরা যে এইপ্রকার কোনও সার্বজনীন ও সর্বব্যাপক কারণে যুদ্ধে যোগ দিতে চাই না একথাও কেহ বলেন নাই। সেই হেতু প্রজা হিসাবে আমাদের সাধারণ ধর্মই হইতেছে এখন যুদ্ধের দোষ-গুণ বিচার না করিয়া যখন যুদ্ধ হইতেছে তখন যথাশক্তি সাহায্য করা। শেষকালে যদি বুয়ারদিগেরই জয় হয়—জয় হইবে না একথা মনে করার কোনও হেতু নাই—তাহা হইলে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে একথা মনে করিলে বীর বুয়ারদের প্রতি এবং আমাদের নিজেদের প্রতিও অন্যায় করা হয়। ইহা কেবল আমাদের কাপুরুষতারই চিহ্ন বলা যাইতে পারে। এই প্রকার চিন্তা করা আনুগত্যবিহীনতার লক্ষণ। কোনও ইংরাজ কি মুহূর্তের জন্যও এই কথা চিন্তা করিতে পারেন যে যদি হারিয়া যাই তবে কি হইবে? যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া কোনও লোক নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জন না দিয়া এমন কথা ভাবিতে পারে না।"

আমি ১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম এবং আজও আমার এই যুক্তিতে পরিবর্তন করার কোন কারণ দেখি না। আমি তখন ব্রিটিশ সরকারের উপর যে প্রকার মোহগ্রস্ত ছিলাম, ব্রিটিশ শাসনাধীনে স্বাধীনতা পাওয়ার যে আশা পোষণ করিতেছিলাম, আজ যদি তাহা করিতাম, তবে আজও এই যুক্তি দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতাম এবং তেমন ঘটনা উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও উহা প্রয়োগ করিতাম।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতে ও বিলাতে শুনিয়াছি। কিন্তু তাহা শুনিয়াও আমার অভিমত বদলাইবার কোনও কারণ হয় নাই। আমি জানি যে, আজ আমি যাহা ভাবি তাহার সহিত উক্ত বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলেও দুইটি উপযুক্ত কারণে আমি ইহার উল্লেখ করিতেছি। প্রথম কারণ হইতেছে এই যে, যে-পাঠক দ্রুত এই পুস্তক পাঠ সমাপ্ত করিতে চাহিবেন, তিনি যে ধৈর্য এবং মনোযোগের সহিত ওজন করিয়া ইহা পড়িবেন, এ প্রকার আশা করার কোনও অধিকার আমার নাই। এই প্রকারের পাঠকের নিকট আমার আজকালকার আন্দোলনের সহিত আমার পূর্বোক্ত মতের সামঞ্জস্য সাধন করা মুশকিল হইতে পারে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই বিচারধারার মধ্যে সত্যলাভের জন্য আগ্রহ রহিয়াছে। আমরা অন্তরে যাহা বাহিরেও তাহাই দেখাইব—এই ধর্মের আচরণ যে শেষকালে করা কর্তব্য তাহা নহে, প্রথম হইতেই এই ধর্মের আচরণ করা চাই। এই প্রকার ভিত্তি না থাকিলে ধর্ম জীবন গড়িয়া তোলা অসম্ভব।

এক্ষণে আমরা পরবর্তী ঘটনার বিষয় বলিব। আমার এই যুক্তি অনেকের ভাল লাগিল। পাঠকদিগকে একথা বলিতে চাই না যে, এই যুক্তি কেবল আমার একারই ছিল। তাহা ছাড়া এই প্রকার আলোচনা করার পূর্বেও অনেকে যুদ্ধে যোগ দেওয়াই চাই এরূপ স্থির করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই ব্যবহারিক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যুদ্ধের যে ঝড়ের গর্জন উঠিয়াছে তাহার মধ্যে ভারতীয়দের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি কে শুনিবে? ভারতীয়দের এই সাহায্য করার মূল্য কি? আমরা তো কেহ কখনও অস্ত্র ধারণ করি নাই। অস্ত্রের ব্যবহার ব্যতীত লড়াইয়ের অন্য যে সকল কাজ করা যায়, তাহার জন্যও শিক্ষা আবশ্যক। আমরা কুচ করিয়া চলিতেও জানি না। নিজ নিজ মোট বহিয়া দীর্ঘ পথ কুচকাওয়াজ করিয়া পাড়ি দিবার শক্তিই কি আমাদের আছে? গোরারা যে আমাদিগকে 'কুলি' বলিয়া গণ্য করিবে, অপমান করিবে ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে তাহাই বা কি করিয়া সহ্য করা যাইবে? যদি সৈন্যদল-ভুক্ত হইতেই চাই, তবে তাহা কি করিয়া সরকার দ্বারা গ্রাহ্য করানো যাইবে? অবশেষে আমরা সকলেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইলাম যে যুদ্ধে গ্রহণ করাইবার জন্য খুব প্রবল চেষ্টা করিব, আর পরিশ্রম করিতে করিতেই অভ্যাস হইবে। যদি ইচ্ছা থাকে তবে ঈশ্বর শক্তি দিবেন। কাজ কেমন করিয়া করিব সে ভাবনা করিব না, যতটা পারি শিক্ষা গ্রহণ করিব। আর একবার সেবাধর্ম স্বীকার করার পর মান-অপমানের বিচার ত্যাগ

করিব, যদি অপমানিত হই তবে তাহাও সহ্য করিয়া সেবা করিয়া যাইব।

আমাদের প্রার্থনা স্বীকার করাইতেই অনেক মুস্কিল হইয়াছিল। তাহার কাহিনী যদিও মনোরম, তথাপি উহা এখানে বর্ণনা করার স্থান নহে। কেবল এই পর্যন্ত বলিয়া রাখিতেছি যে আমাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সকলেই আহত ও পীড়িতের শুশ্রূষা করার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলাম। আমরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইলাম। আমরা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিলাম। আমাদের এই আবেদনের এবং যে আগ্রহ হইতে উহার উৎপত্তি তাহার খুব ভাল প্রভাব হইয়াছিল। পত্রের উত্তরে সরকার ধন্যবাদ দিলেন কিন্তু সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে বুয়ারদের শক্তি বাড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা বন্যার স্রোতের ন্যায় অগ্রসর হইতেছিল এবং তাহাদের নাতালের রাজধানী ডারবানে আসিয়া পৌঁছাইবারও আশঙ্কা ছিল। অনেক লোক আহত হইল। এদিকে আমরাও বরাবরই চেষ্টা করিতেছিলাম। অবশেষে 'অ্যাম্বুল্যান্স কোর' (আহতদিগকে লইয়া যাওয়া ও শুশ্রূষা করার দল) বলিয়া আমাদিগকে সরকার গ্রহণ করিলেন। আমরা তো হাসপাতালের পায়খানা সাফ করার বা ঝাড়ুদারের কাজও চাহিয়াছিলাম। সেস্থলে 'অ্যাম্বুল্যান্সের' কার্য পাওয়ায় যে ধন্য হইয়াছিলাম, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আমরা স্বাধীন ও গিরমিট-মুক্ত ভারতীয়দিগকে লওয়ার জন্যই বলিতেছিলাম। ইহাও জানাইয়াছিলাম যে গিরমিটিয়াদিগকেও দলভুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এই সময় সরকার যত লোক পান তাহাই চাহিতেছিলেন। সেইজন্য প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্র-স্বামীর নিকট লোকের জন্য অনুরোধ পাঠাইয়াছিলেন। অবশেষে ১১০০ ভারতীয় দ্বারা গঠিত বিশাল দল ডারবান হইতে রওনা হইল। ইহাদিগকে রওনা করার সময় পাঠকের পূর্ব-পরিচিত শ্রীযুক্ত এসকম্ব, যিনি এক্ষণে স্বেচ্ছাসেবকদের কর্তা হইয়াছিলেন, আমাদিগকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ দিলেন।

ইংরাজ সংবাদপত্রের কাছে এ সকলই আশ্চর্যজনক ঠেকিয়াছিল। ভারতীয় সম্প্রদায় যুদ্ধে কোনও অংশ লইবে, এ আশা কেহ করেন নাই। একজন ইংরাজ লেখক কোনও প্রধান সংবাদপত্রে স্তুতিপূর্ণ এক কবিতা ছাপাইয়া দিলেন, তাহার ধুয়া ছিল—"আমরা সকলেই একই সাম্রাজ্যের সন্তান।"

এই দলে প্রায় তিন চারি শত গিরমিট-মুক্ত ভারতীয় ছিলেন, স্বাধীন ভারতীয়দের চেষ্টায় ইঁহারা সংগৃহীত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৩৭ জন

নেতা ছিলেন। ইহাদের স্বাক্ষরেই সরকারের নিকট দরখাস্ত গিয়াছিল এবং ইহারাই সকলকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নেতাদের মধ্যে ব্যারিস্টার ও হিসাব-রক্ষক ইত্যাদিও ছিলেন। অপরাপর সকলে রাজমিস্ত্রী, ছুতার ইত্যাদি কারিগর অথবা সাধারণ মজুর ছিলেন। এই দলের ভিতরে হিন্দু মুসলমান মাদ্রাজী উত্তর ভারতীয় প্রভৃতি সকল ধর্ম এবং শ্রেণীর লোকই ছিলেন। ব্যবসায়ীরা এই দলে বড় কেহ ছিলেন না কিন্তু তাঁহারা টাকা দিয়া খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। সাধারণ সামরিক ব্যবস্থায় যে খরচা পাওয়া যাইত তাহাতে এই দলের সকল প্রয়োজন মিটিত না, সেইজন্য অতিরিক্ত কিছু খাদ্যাদি পাইলে শিবির-জীবনের ক্লেশের কিছু লাঘব হইত। এই অভাব মিটাইবার কাজ ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা আহত তাঁহাদিগকে শুশ্রূষা করিতে হইত। ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের জন্যও মিঠাই সিগারেট ইত্যাদি দিতেন। যখনই আমরা শহরের নিকট ছাউনি করিয়াছি তখনই ব্যবসায়ীরা এই প্রকারে আমাদের সর্বতোভাবে দেখাশুনা করিয়াছেন।

আমাদের সহিত যে 'গিরমিটিয়ারা' আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের কারখানা বা কৃষিক্ষেত্র হইতে ইংরেজ পরিদর্শকও আসিয়াছিলেন। কিন্তু এই 'গিরমিটিয়াদে'র ও আমাদের কাজ একই ছিল। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে আমাদের সঙ্গে একত্র থাকিতে পারিবেন তখন তাঁহাদের খুব আনন্দ হইল এবং স্বভাবতই সমস্ত দলের ব্যবস্থার ভার আমাদের উপরেই আসিয়া পড়িল। এই হেতু এই সমস্ত 'কোর'টার (দল) নামই 'ভারতীয় কোর' হইয়াছিল এবং এই দলের কার্যের জন্য প্রশংসা ভারতীয় সম্প্রদায়ই পাইয়াছিলেন। বাস্তবপক্ষে 'গিরমিটিয়াদে'র কার্যের জন্য প্রশংসা ভারতীয়দের প্রাপ্য না হইয়া কুঠীওয়ালাদেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে একবার দল গঠন হইয়া গেলে সমস্ত সুব্যবস্থার জন্য প্রশংসা ভারতীয় সম্প্রদায়েরই প্রাপ্য এবং জেনারেল বুলার তাঁহার সরকারী পত্রে একথা স্বীকারও করিয়াছেন। রোগীদিগকে শুশ্রূষা করিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ডাক্তার বুথ আমাদের দলে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মভীরু পাদরী। যদিও তাঁহার কার্য প্রধানতঃ ভারতীয় খ্রীষ্টানদের সহিতই ছিল, তথাপি ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের সহিত তিনি মিশিতেন। উল্লিখিত ৩৭ জন নেতার প্রায় সকলেই তাঁহার নিকটেই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গেই একটা ইউরোপীয় 'অ্যাম্বুল্যান্স কোর'ও ছিল। দুই 'কোর'ই পাশাপাশি একই স্থানে কাজ করিত।

আমরা যে-পত্রে সরকারকে সাহায্য দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে শর্তবর্জিত ছিল। কিন্তু সরকার আমাদের কর্মগ্রহণ স্বীকার করিয়া যে পত্র দেন তাহাতে আমাদিগকে গোলাগুলির সীমার মধ্যে কার্য করা হইতে বাদ দিয়াছিলেন। স্থায়ী 'অ্যাম্বুল্যান্স কোর' যাহা সৈন্যদের সহিত থাকে, আহত সৈন্যদিগকে বহন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া যাওয়ার কথা তাহারই। জেনারেল হোয়াইট লেডীস্মিথে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। জেনারেল বুলার অবরোধ উন্মুক্ত করার জন্য মহাপ্রযত্ন করিতেছিলেন। এই প্রয়াসে অনেক সৈন্য আহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সৈন্যদের সহিত যে স্থায়ী 'অ্যাম্বুল্যান্স' থাকে তাহাতে কুলাইবে না এই আশঙ্কায় জেনারেল বুলার ভারতীয়দিগের ও গোরাদিগের অস্থায়ী 'অ্যাম্বুল্যান্স কোর' গঠন করাইয়াছিলেন। যে স্থান দিয়া যুদ্ধ হইতেছিল সেখান হইতে কেন্দ্রস্থলে আসার কোনও পাকা সড়ক ইত্যাদি ছিল না। সেইজন্য আহতদিগকে সাধারণ যানবাহনের সাহায্যে কেন্দ্রে লইয়া আসা সম্ভব ছিল না। কেন্দ্রস্থল সাধারণতঃ রেল স্টেশনের নিকটেই স্থাপন করা হইত। রণক্ষেত্রের ৭।৮মাইল হইতে ২৫ মাইল পর্যন্ত দূরে কেন্দ্রস্থল থাকিত।

আমরা শীঘ্রই কাজ পাইলাম। যাহা মনে করিয়াছিলাম কাজ তাহা অপেক্ষা কঠিন ছিল। আহতদিগকে লইয়া ৭।৮ মাইল চলা তো আমাদের সাধারণ কার্যক্রমের ভিতরেই ছিল। কিন্তু কখনও কখনও আমাদিগকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত সৈন্য ও কর্মচারীদিগকে ২৫ মাইল পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত। সাধারণতঃ প্রাতে আটটায় যাত্রা শুরু হইত। পথে রোগীকে ঔষধাদি দিতে হইত, অপরাহ্ণ ৫টায় আমাদের মূল কেন্দ্রের হাসপাতালে পৌঁছানো চাই। এ কাজ খুবই কঠিন ছিল। একবার মাত্র আহতদিগকে লইয়া আমাদের একদিনে ২৫ মাইল যাইতে হইয়াছিল। আবার এদিকে ব্রিটিশ সৈন্য যুদ্ধের প্রথম দিকটায় পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিতে লাগিল। অতএব অপ্রত্যাশিত ভাবে অধিক সংখ্যক লোক আহত হইতে লাগিল। এইজন্য সরকারী কর্মচারীরা আমাদিগকে গোলাগুলির সীমানার মধ্যে লইবেন না বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আমাদের সহিত যে শর্ত ছিল ইহা তাহার বহির্ভূত বলিয়া জেনারেল বুলার জানান যে তিনি আমাদিগকে ঐ কার্য করিতে বাধ্য করিবেন না, কিন্তু যদি আমরা করি তবে উপকৃত হইবেন। আমরা তো বিপদের মধ্যে গিয়া কার্য করিতেই চাহিতেছিলাম। দূরে থাকা আমাদের পছন্দ হইত না। আমরা

সেইজন্য এই সুযোগ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমাদের কেহই গুলিতে বা অন্য প্রকারে আহত হয় নাই।

এই 'কোরে' অনেক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কথা এখানে লিখিতে চাই না। মাত্র এইটুকু উল্লেখ করিব যে 'কোর' যদিও আমাদের এই 'গিরমিটিয়া' পর্যন্ত সাধারণ লোকদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং যদিও ইংরেজ সৈন্য ও ইংরেজ স্বেচ্ছাসেবকের 'কোরের' সহিত কাজ করিতে হইত, তথাপি একদিনও ইহা কেহ অনুভব করে নাই যে ইউরোপীয়েরা আমাদিগের সহিত অবজ্ঞাভরে অথবা অভদ্রভাবে ব্যবহার করিতেছেন। অস্থায়ী ইউরোপীয় 'অ্যাম্বুল্যান্স কোর' দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ইউরোপীয়দিগের দ্বারাই গঠিত ছিল। ইঁহারাই যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় বিরোধী আন্দোলন চালাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহাদের দুর্দিনে ভারতীয়েরা অতীতের ঘটনা ভুলিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, এই অনুভূতি সে সময়ের জন্য তাঁহাদের মন গলাইয়া দিয়াছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের কার্যের কথা জেনারেল বুলার তাঁহার সরকারী পত্রে (ডেস্‌প্যাচে) উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমাদের ৩৭ জন নেতাকে মেডেলও দেওয়া হইয়াছিল।

লেডীস্মিথের উদ্ধার সম্পর্কে জেনারেল বুলারের কার্য যখন শেষ হইল তখন, অর্থাৎ দুই মাসের মধ্যে আমাদের ও ইউরোপীয়দের 'অ্যাম্বুল্যান্স কোর' ভাঙ্গিয়া দেওয়ার হুকুম হইল। যুদ্ধ অবশ্য ইহার পরও দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। আমরা সকল সময় পুনরায় যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলাম এবং সরকারও আমাদের দল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সময় একথা জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যদি আবার ব্যাপক ভাবে কার্যের আবশ্যক হয়, তখন দলকে পুনরায় নিযুক্ত করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা এই যুদ্ধে যে সাহায্য করিয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। তাহাদের কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। তবুও সাহায্য করার জন্য একটা আন্তরিক ইচ্ছা অপর পক্ষকে প্রভাবিত না করিয়া পারে না, বিশেষতঃ যেখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য করা হয়। যুদ্ধকালটাতে ভারতীয়দের জন্য এই প্রকার সদ্ভাব বর্তমান ছিল।

এই অধ্যায় শেষ করার পূর্বে একটি প্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখ করিব। যখন লেডীস্মিথ অবরুদ্ধ হয়, তখন ইংরাজদের সহিত কতকগুলি ছুটকো ভারতবাসীও অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। ইঁহাদের কতক ছিলেন ব্যবসায়ী, আর

I want world sympathy in this battle of Right against Might.
Dandi M K Gandhi
5.4.'30

বিখ্যাত ডাণ্ডি-অভিযান ; ৭৮ জন অনুগামী সহ সবরমতী থেকে গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহ উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।
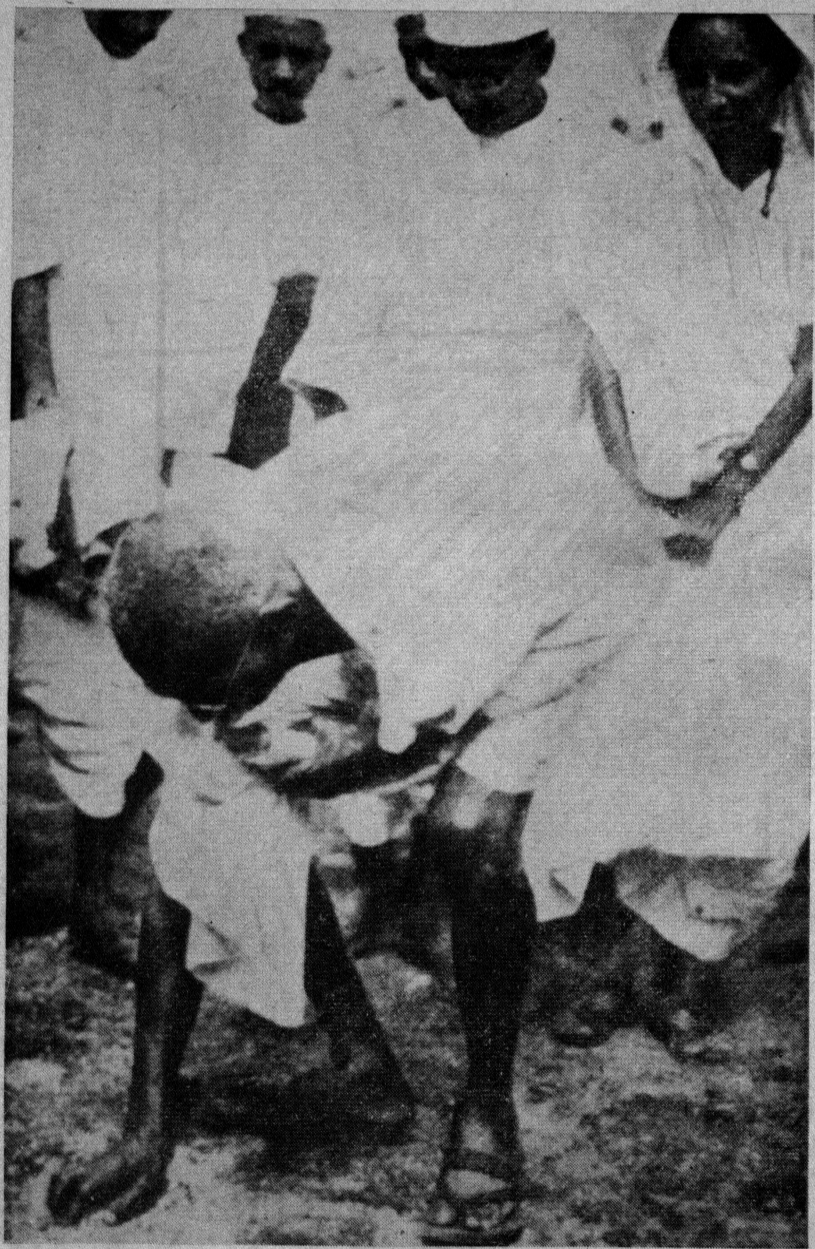
ডাণ্ডি উপকূলে গান্ধীজীর স্বয়ং লবণ আইন ভঙ্গ

বাকি সকলে ছিলেন মজুর—রেলে অথবা ইউরোপীয় গৃহস্থদের বাড়ীতে চাকুরি করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রভুসিং নামে একজন লোক ছিলেন। লেডীস্মিথের অধিনায়ক প্রত্যেক শহরবাসীকেই নির্দিষ্ট কার্য দিয়াছিলেন। এই 'কুলি' প্রভুসিংকে সব চাইতে বেশী গুরুতর ও সব চাইতে বেশী বিপদ-সঙ্কুল কার্য দেওয়া হইয়াছিল। লেডীস্মিথের নিকটবর্তী এক পাহাড়ের উপর বুয়ারেরা একটা 'পম্ পম্' তোপ বসাইয়াছিল। উহার গোলা অনেক গৃহাদি নষ্ট করিয়াছিল, কিছু প্রাণহানিও করিয়াছিল। তোপের মুখ হইতে গোলা বাহির হওয়ার পর নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িতে এক বা দুই মিনিট সময় লাগিত। যদি অবরুদ্ধেরা এতটুকু সময় পূর্বেও সাবধান হইতে পারেন, তবে নিরাপদ স্থানে মাথা গুঁজিয়া বাঁচিতে পারেন। যখনই ঐ তোপ চলিত তখন প্রভুসিং একটা গাছের উপর চড়িয়া বসিয়া থাকিতেন। তিনি তোপের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন এবং যখনই তোপের মুখে আগুনের হল্কা দেখিতেন তখনই একটা ঘণ্টা বাজাইতেন। ঘণ্টা শুনিয়াই লেডীস্মিথের বাসিন্দারা জানিতেন যে গোলা আসিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত স্থানে আশ্রয় লইতেন।

লেডীস্মিথের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এই অমূল্য সাহায্য করার জন্য প্রভুসিংকে প্রশংসা করার সময় একথা বলিয়াছিলেন যে ঘণ্টা বাজাইতে প্রভুসিং একটি বারও ভুল করেন নাই। বলাই বাহুল্য প্রভুসিং-এর জীবনের আশঙ্কা সকল সময়েই ছিল। প্রভুসিং-এর বীরত্বের কাহিনী নাতালে পৌঁছায় এবং সেখান হইতে ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড কার্জনের কানে আসে। তিনি প্রভুসিং-এর জন্য একটি কাশ্মীরী পোশাক উপহার পাঠান এবং নাতাল সরকারকে অনুরোধ করেন যে তাঁহাকে এই সম্মান-দান কার্য যেন যথাসম্ভব বিজ্ঞাপিত করিয়া সম্পন্ন করা হয়। ডারবানের মেয়রের উপর এই কার্য করার ভার পড়িয়াছিল। তিনি এই উদ্দেশ্যে টাউন হলে সভা আহ্বান করেন। এই ঘটনা হইতে আমরা শিক্ষা করার মত দুইটি জিনিস পাইতেছি। প্রথমতঃ কোনও লোককে, সে যতই দীন ও নগণ্য হোক্ না কেন, অবজ্ঞা করিতে নাই। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যতই ভীরু হোক্ না কেন, যখন অবসর উপস্থিত হয় তখন সে সাহসী হইয়া যাইতে পারে।

দশম অধ্যায়

যুদ্ধের পরে

যুদ্ধের গুরুতর অংশ ১৯০০ সালেই শেষ হইয়া যায়। ইতিমধ্যে লেডীস্মিথ, কিম্বারলী ও মেফিকিং অবরোধ-মুক্ত হয়।

জেনারেল ক্রাঞ্জী পারডিবার্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজ্যের যে সকল অংশ বুয়ারেরা দখল করিয়াছিল তাহা পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে কেবল গেরিলা যুদ্ধ চলিতেছিল। লর্ড কিচেনার ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী-স্টেট দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

আমি মনে করিলাম দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কাজ এবার শেষ হইয়াছে। যেখানে এক মাস মাত্র থাকিব মনে করিয়াছিলাম, সেখানে ছয় বৎসর হইয়া গেল। আমাদের সম্মুখে যে কাজ করার ছিল তাহার ধাঁচ মোটামুটি নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তবু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অনুমতি না পাইলে আমি দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িতে পারি না। আমার সাথীদিগকে ভারতবর্ষে গিয়া আমার জন-সেবা করার ইচ্ছার কথা জানাইলাম। স্বার্থসিদ্ধি করার পরিবর্তে কেমন করিয়া সেবা করা যায়, সে শিক্ষা আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাইয়াছিলাম এবং এই কার্য করার জন্য আমার হৃদয় তৃষিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় মনসুখলাল নাজর ছিলেন, শ্রীযুক্ত খানও ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই জন্মিয়া বড় হইয়াছেন এমন জনকতক যুবকও ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন! এই সকল কারণে আমার দেশে ফিরিয়া আসা কোনওক্রমেই অন্যায় হইত না।

এই সকল যুক্তি দাখিল করা সত্ত্বেও আমাকে একটা শর্ত করিয়া লইয়া তাঁহারা ভারতবর্ষে ফিরিতে অনুমতি দিলেন। শর্তটি এই, যদি আমার অবর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন কোনও অবস্থার উদ্ভব হয় যাহার জন্য আমার উপস্থিতি আবশ্যক, তাহা হইলে সম্প্রদায় যে কোনও সময় আমাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। এই অবস্থায় আমার আসার ব্যয় ও দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার ব্যয় তাঁহারাই বহন করিবেন।

আমি স্থির করিলাম যে আমি বোম্বাইতেই ব্যারিস্টারী করিব। ইহাতে

প্রধানত গোখলের তত্ত্বাবধানে জন-সেবার কার্য করিতে পারিব এবং গৌণতঃ এইভাবে আমার জীবিকা উপার্জনের কার্যও চলিবে। সেই অনুসারে আমি আফিস ও বাড়ী ভাড়া লইলাম এবং কিছু কিছু ওকালতী কাজ পাইতে আরম্ভ করিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজের জন্য যাঁহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইয়াছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এত কাজ দিলেন যে, কেবল তাহাতেই আমার সংসার-খরচা চলিয়া যাইত। কিন্তু জীবনে শান্ত হইয়া বসিয়া যাওয়া আমার অদৃষ্টে ছিল না। কেবল মাস তিন-চার বোম্বাই-এ স্থির হইয়া বসিয়াছি, এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তার পাইলাম যে, সেখানকার অবস্থা গুরুতর। শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন শীঘ্রই আসিবেন এবং আমার উপস্থিতি আবশ্যক।

আমি বোম্বাইয়ের বাড়ী ও অফিস উঠাইয়া দিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাগামী প্রথম স্টীমারেই রওনা হইয়া গেলাম। এই ঘটনা ১৯০২ সালের শেষদিকে হয়। ১৯০১ সালের শেষভাগে আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলাম ও ১৯০২ সালের মার্চে বোম্বাইয়ে অফিস খুলিয়াছিলাম। তারে বিশদ বিবরণ ছিল না। আমি অনুমান করিলাম যে ট্রান্সভালে গোলযোগ বাধিয়া থাকিবে। আমি এইবার পরিবার না লইয়াই দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলাম, কেননা চার-পাঁচ মাসেই ফিরিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। আমি ডারবানে পৌঁছাইয়া সমস্ত শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। আমাদের অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র আমাদের অবস্থা যুদ্ধের পর ভাল হইবে। আমরা তো ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী-স্টেটে কোন গোলযোগই আশা করি নাই, কেননা লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড সেলবোর্ন এবং আরও বড় বড় রাজনীতি-বিশারদেরা যুদ্ধ আরম্ভের সময় বলিতেছিলেন যে ট্রান্সভালে বুয়ারেরা ভারতীয়দের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করে তাহা যুদ্ধের অন্যতম কারণ। প্রিটোরিয়ার ব্রিটিশ এজেন্ট আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন যে, ট্রান্সভাল ব্রিটিশ কলোনি হওয়া মাত্রই সেখানে ভারতীয়দের যে সকল অসুবিধা ছিল, সে সমস্তই দূর হইয়া যাইবে। ইউরোপীয়েরাও বিশ্বাস করিতেন যে, ট্রান্সভালের পুরানো আইন সকল ব্রিটিশ অধিকারের পর আর চলিবে না। এই সংস্কার এতটা বিস্তারলাভ করিয়াছিল যে, পূর্বে জমির নিলামে নিলামকারীরা ভারতবাসীর ডাক গ্রহণ না করিলেও এখন প্রকাশ্যভাবে ভারতীয়দের নিলামের ডাক গ্রহণ করিতেন। এইভাবে অনেক ভারতীয় জমি কিনিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাহা রেজেস্ট্রী করার জন্য

দেওয়া হইল তখন রেজিস্ট্রার ১৮৮৫ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিতে অস্বীকার করিলেন। আমি ডারবানে পৌঁছাইয়াই এই সকল সংবাদ পাইলাম। নেতারা বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন প্রথমে ডারবানে আসিবেন এবং আমরা এইখানেই নাতালের কথা তাঁহাকে শুনাইব। এই কার্য হইয়া গেলে আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ট্রান্সভালে যাইব।

নাতালে শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের নিকট ডেপুটেশন বা প্রতিনিধিদল গেলেন। তিনি ভদ্রভাবে তাঁহাদের বক্তব্য শুনিলেন এবং আবেদনের বিষয়ে নাতাল সরকারের সহিত আলোচনা করিবেন বলিলেন। নাতালে যুদ্ধের পূর্বে যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার যে শীঘ্র পরিবর্তন হইবে এ আশা আমার ছিল না। অন্য এক অধ্যায়ে এই সকল আইনের কথা আলোচনা করা হইয়াছে।

পাঠকেরা জানেন যে যুদ্ধের পূর্বে কোনও ভারতবাসী যে কোনও সময়ে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে পারিতেন। আমি দেখিলাম যে সে দিন আর নাই। প্রবেশের উপর বিধিনিষেধ অবশ্য ইউরোপীয় ও ভারতবাসী সকলের উপরই প্রযোজ্য ছিল। যুদ্ধের পর সমস্ত দোকান না খোলায় অবস্থা এমন ছিল যে হঠাৎ অনেক লোক একসঙ্গে প্রবেশ করিলে অন্নবস্ত্রের অনটন পড়িবে। দোকানে যে সকল জিনিসপত্র ছিল তাহা পূর্বে বুয়ার সরকার আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে প্রবেশ সম্বন্ধে বাধা সাময়িক এবং তাহাতে ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু যেভাবে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইত তাহাতে ভারতবাসী ও ইউরোপীয়দের প্রভেদ করা হইতেছিল বলিয়াই আশঙ্কার কারণ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরে অনুমতি-পত্র দেওয়ার দপ্তর খোলা হইয়াছিল। কার্যতঃ কোনও ইউরোপীয় চাওয়া মাত্রই অনুমতি-পত্র পাইতেন, আর ভারতীয়দের জন্য ট্রান্সভালে আলাদা একটা এসিয়াটিক বিভাগ খোলা হয়। এই নূতন বিভাগের সৃষ্টি চিরাচরিত পদ্ধতির বহির্ভূত। ভারতীয়দিগকে প্রথমতঃ এই বিভাগের কর্তার নিকট আবেদন করিতে হইত। তিনি মঞ্জুর করিলে তারপর তাঁহারা ডারবানে অথবা অন্য বন্দরে প্রবেশের অনুমতি-পত্র পাইতেন।

যদি আমাকে এই সকল উপায়ে অনুমতি-পত্র পাইতে হয় তবে ততদিনে শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন ট্রান্সভাল ছাড়িয়া যাইবেন। ট্রান্সভালের ভারতবাসীর শক্তি ছিল না যে আমার জন্য অনুমতি-পত্র যোগাড় করিয়া দিতে পারেন। আমি অনুমতি-পত্র দেওয়ার কর্তাকে চিনিতাম না। তবে পুলিসের

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানিতাম। তাঁহাকে আমি আমার সহিত 'পারমিট অফিসে' আসিতে বলিলাম। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন ও 'পারমিট' অফিসারের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় তাহা দিলেন। আমি যে ১৮৯৩ সালে এক বৎসর প্রিটোরিয়াতে ছিলাম সেই জোরেই অনুমতি-পত্র পাইয়া প্রিটোরিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রিটোরিয়ার আবহাওয়া বিশেষ শঙ্কাজনক দেখিলাম। এসিয়াটিক বিভাগ যে সকল ভারতীয়দিগকে পীড়ন করার এক যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে ইহা আমি দেখিতে পাইলাম। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্যদলের সঙ্গে যেসব ভাগ্যান্বেষীরা আসিয়াছিলেন এবং ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ খুঁজিতে যাঁহারা সেইখানেই বসবাস করিতেছিলেন তাঁহারাই ছিলেন এই বিভাগের আমলা। তাঁহাদের ভিতর কেহ কেহ দুশ্চরিত্র ছিলেন। দুইজন ঘুষ লওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হন। জুরী তাঁহাদিগকে নির্দোষ বলিলেও তাঁহাদের অপরাধের সম্বন্ধে কোনও সংশয় না থাকাতে তাঁহাদিগকে কর্মচ্যুত করা হয়। পক্ষপাত করাই সাধারণ রীতি হইয়াছিল। যখন নূতন একটা বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং অধিকার সঙ্কোচ করাই যখন সে বিভাগের কাজ হয়, তখন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এবং তাঁহারা যে ভাল কাজ করিতেছেন ইহা দেখাইবার জন্য, কর্মচারীরা যে সময় সময় নূতন প্রকারের বাধার সৃষ্টি করিতে থাকিবেন, তাহার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। বর্তমান ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

আমি দেখিলাম যে গোড়া হইতে কাজ আরম্ভ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। আমি যে কি করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলাম তাহা এসিয়াটিক বিভাগ ধরিতে পারিলেন না। আমাকে সোজা জিজ্ঞাসা করার সাহসও তাঁহাদের ছিল না। আমার মনে হয় যে তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, আমি গোপনে প্রবেশ করিয়াছি। তাঁহারা পরোক্ষ ভাবে সংবাদ লন যে, কি করিয়া আমি অনুমতি-পত্র পাই। প্রিটোরিয়াতে এক প্রতিনিধি-দলের শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের সহিত দেখা করার কথা ছিল। যে আবেদন কথা হইবে তাহার খসড়া আমি প্রস্তুত করি। কিন্তু এসিয়াটিক বিভাগ আমাকে প্রতিনিধি-দল হইতে বাদ দিয়া দেন। ভারতীয় নেতারা সেজন্য স্থির করেন যে আমাকে বাদ দেওয়ার জন্য তাঁহারা শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের সহিত দেখা করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন। এই যুক্তি আমার পছন্দ হয় নাই। আমি তাঁহাদিগকে বলি যে, এই অপমান আমি গ্রাহ্যই

করিব না। তাঁহাদিগকেও গ্রাহ্য না করিতে বলি। আবেদন-পত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন বাকি ছিল কাহারও তাহা শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনকে পড়িয়া শুনানো। ভারতীয় ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত জর্জ গডফ্রে তখন সেখানে ছিলেন, তিনিই পড়িয়া শুনাইবেন স্থির হয়। প্রতিনিধিদল শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের সহিত সাক্ষাৎ করে। আমার নাম উল্লেখ করায় তিনি বলিলেন, "আমি শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহিত নাতালে সাক্ষাৎ করিয়াছি, সেইজন্য এখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে অস্বীকার করিয়াছি। এখানে আমি নিজে সাক্ষাৎভাবে আপনাদের নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি।" আমার মতে এই কথায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। এসিয়াটিক বিভাগ শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনকে যাহা শিখাইয়াছিল, তিনি তাহাই বলেন। এই বিভাগ এখানেও ভারতবর্ষের আবহাওয়া প্রবাহিত করিতেছিলেন। সকলেই জানেন যে ব্রিটিশ অফিসারেরা বোম্বাই-এর লোককেও যদি চম্পারণে দেখেন তবে তাঁহাকে বিদেশী বলিয়া মনে করেন। সেই গণিত অনুসারেই আমি যখন ডারবানে থাকি, তখন ট্রান্সভালের সংবাদ আমি কি জানিতে পারি? এসিয়াটিক বিভাগ শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনকে এই প্রকারেই শিখাইয়া পড়াইয়া রাখিয়াছিল। শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন জানিতেন না যে আমি ট্রান্সভালে বাস করিতাম, আর যদি বাস না-ও করিয়া থাকি, আমি সেখানকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলাম। এই প্রতিনিধি-দল গঠন বিষয়ে একটিই যথার্থ প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং তাহা হইতেছে এই যে, ট্রান্সভালে ভারতীয়দের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা কে বেশী জানে। সেখানকার ভারতীয়েরা যে এইজন্যই আমাকে ভারতবর্ষ হইতে আনাইয়াছেন, তাহাতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়া যায়। কিন্তু ক্ষমতাশালী লোকদিগের নিকট ন্যায়সঙ্গত কথাই যে বিপরীত বোধ হয়, তাহা নূতন নহে। শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন সে সময় এই পরিমাণে স্থানীয় লোকের হাতের মুঠার ভিতর ছিলেন, অথবা তিনি স্থানীয় ইউরোপীয়দিগকে তুষ্ট করিতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁহার নিকট হইতে ন্যায্য বিচার পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তবুও তাঁহার নিকট প্রতিনিধি-দল যায়। অবহেলার জন্য অথবা আত্মসম্মানে আঘাত লাগার জন্য আমাদের দুঃখ অপনোদনের চেষ্টার কোনও একটা পথও দেখা যেন বাকি থাকে ইহা আমরা চাই নাই।

১৮৯৪ সালে আমার নিকট যে ধর্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এবার তদপেক্ষা কঠিন সঙ্কটে পড়িলাম। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে শ্রীযুক্ত চেম্বারলেনের ফিরিয়া যাওয়ার পরই আমার কার্য শেষ হইয়াছিল বলিয়া আমি ভারতে ফিরিতে পারি।

অন্যদিকে আমি ইহাও দেখিলাম যে, যদি আমি এখন ভারতের বৃহৎ ক্ষেত্রে সেবা করিব মনে করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্মুখে যে আসন্ন বিপদ রহিয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে যে সেবা-ভাব আমি ধর্ম বলিয়া পোষণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহাকে দূষিত করা হয়। আমি ভাবিলাম যে, এই কর্তব্য পালনের জন্য আমাকে জীবনভোরও যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতে হয়, তবুও যে পর্যন্ত এই আসন্ন মেঘ না দূরীভূত হয় অথবা আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই মেঘ এবং ঝড়ের মুখে উড়িয়া না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়াই যাইতে হইবে। আমি ভারতীয় নেতা-দিগকেও এই কথাই বলিয়াছিলাম। ১৮৯৪ সালের ন্যায় এবারেও আমি ব্যারিস্টারী করিয়া জীবিকা উপার্জন করার সঙ্কল্প করিলাম। সম্প্রদায়ের কথা আর বলিব কি, তাঁহারা ইহাই চাহিতেন।

আমি শীঘ্রই ট্রান্সভালে ব্যারিস্টারী করার জন্য দরখাস্ত করিলাম। আশঙ্কা ছিল যে এখানেও আমার দরখাস্তের প্রতিবাদ হইবে। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক হয়। আমি সুপ্রীম কোর্টের এটর্নি শ্রেণীভুক্ত হইয়া জোহান্‌সবার্গে অফিস খুলিলাম। ট্রান্সভালের মধ্যে জোহান্‌সবার্গে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভারতীয়ের বাস সেই জন্য সেইখানেই আমার জন-সেবার ও জীবিকা অর্জনেরও সুবিধা বলিয়া অফিস করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। আমি প্রত্যহই এসিয়াটিক বিভাগের গলদের তিক্ত পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ট্রান্সভালের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এখন প্রধান কার্য হইল ইহার একটা কিছু প্রতিকার করা। ১৮৮৫ সালের ৩ আইনের রদ করা এখন দূরের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের এখানকার হাতের কাজ হইল এসিয়াটিক বিভাগের স্রোতোবেগ হইতে নিজদিগকে বাঁচাইয়া টিকিয়া থাকা। ভারতীয় প্রতিনিধি-দল লর্ড মিলনার লর্ড সেলবোর্ণ যিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ট্রান্সভালের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর স্যার আর্থার ললে যিনি পরে মাদ্রাজের গভর্নর হন ইত্যাদি অনেক ছোট বড় কর্তার সহিত একাদিক্রমে সাক্ষাৎ করিল। আমরা এখানে সেখানে কিছু কিছু সুবিধা পাইলাম, কিন্তু এ সকলই জোড়াতালি দেওয়া কাজ হইয়াছিল। ডাকাতেরা সর্বস্ব লুটের পর গৃহস্থের কাতর অনুনয়ে কৃপা করিয়া কোন তুচ্ছ জিনিস ফিরাইয়া দিলে যে অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ সেই দুজন এসিয়াটিক বিভাগের কর্মচারী—যাঁহাদের কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং তাঁহারা কর্মচ্যুত

হইয়াছিলেন। ভারতীয়দের প্রবেশ সম্বন্ধে আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই সত্য হইল। এখন ইউরোপীয়দের জন্য আর অনুমতি-পত্র আবশ্যক হইত না, কেবল ভারতীয়দেরই লাগিত। বুয়ার সরকার কদাচ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আইনগুলি কঠোরতার সহিত প্রয়োগ করিতেন না। ইহার হেতু তাঁহাদের উদারতা নহে, তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি ঢিলা-ঢালা ছিল। একজন ভাল কর্মচারী বুয়ার আমলে যতটা হিতকর কাজ করিতে পারিতেন, ইংরাজ আমলে তাহা করিতে পারিতেন না। ইংরাজের সংবিধান পুরাতন এবং বাঁধা-ধরা। উহার মধ্যে পড়িয়া কর্মচারীদিগকে কলের মত কাজ করিয়া যাইতে হয়। তাঁহাদের কার্যের স্বাধীনতা উত্তরোত্তর চাপ পড়িয়া সঙ্কুচিত হইতে থাকে। এই হেতু ব্রিটিশ-সংবিধান অনুসারে পরিচালিত সরকার কর্তৃক যদিউদার নীতি অবলম্বিত হয় তবে প্রজারা খুবই উদারতা ভোগ করিতে পারে, আবার অপরদিকে যদি ঐ নীতি অনুদার ও ক্লেশদায়ক হয়, তবে প্রজাদের ঘাড়ে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুদারতা ও ক্লেশের চাপ পড়ে। কিন্তু যে স্থানের সংবিধান ভূতপূর্ব বুয়ার গণতন্ত্রের মত সে স্থানে ইহার বিপরীত অবস্থাই ঘটে। এখানে সরকারের নীতি যাহাই হোক, জনসাধারণের পক্ষে উদারতা বা অনুদারতার স্বাদ পাওয়া বহুলাংশে কর্মচারীর উপর নির্ভর করে। সেই জন্যই যখন বুয়ার শাসনের বদলে ব্রিটিশ শাসন-পদ্ধতি ট্রান্সভালে কার্যকরী হইল, তখন ভারতীয় বিরোধী সমস্ত আইনই দিনের পর দিন অধিক কঠোরতার সহিত প্রযুক্ত হইতে লাগিল। আইনে যেখানে যেখানে ফাঁক ছিল, তাহা যত্নসহকারে বন্ধ করা হইল। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এসিয়াটিক বিভাগের কার্য-পদ্ধতি কঠোর না হইয়া যায় না। সেই জন্য পুরাতন আইনগুলি রদ হওয়া এখন সম্ভাবনার বাহিরে চলিয়া গেল। এক্ষণে ভারতীয়দের কেবল ইহাই দেখার রহিল যে, কার্যতঃ ঐ সকল আইনের প্রয়োগে কঠোরতা কতটা কমানো যায়।

একটি মূল নীতি লইয়া শীঘ্রই হউক বা বিলম্বে আলোচনা করিতে হইবেই। যদি এখন আলোচনা করি তবে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরবর্তীকালের ঘটনার পরিণতি সহজে বুঝা যাইবে। ট্রান্সভাল ও ফ্রী-স্টেটে ব্রিটিশ রাজত্ব বসিবার পরেই লর্ড মিলনার একটি কমিটি গঠন করেন। ঐ দুই দেশের আইনে জনসাধারণের স্বাধীনতার পরিপন্থী যে সকল বিধি-নিষেধ অথবা ব্রিটিশ-সংবিধান-বিরুদ্ধ ব্যবস্থা আছে, সেগুলির সম্বন্ধে ঐ কমিটিতে বিবেচনা করার কথা হয়। এই সংজ্ঞার ভিতর ভারতীয় বিরোধী বিধি-

নিষেধগুলিও স্বভাবতঃই পড়িতে পারিত। কিন্তু ভারতীয়দের নহে, ঐ কমিটি দ্বারা ইউরোপীয়দের অসুবিধা দূর করাই লর্ড মিলনারের ইচ্ছা ছিল। যে সকল আইন পরোক্ষভাবে ইংরাজদের পক্ষে ক্লেশকর ছিল, সেই সকল আইন শীঘ্র রদ করার জন্যই তিনি পথ খুঁজিতেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই কমিটি রিপোর্ট দাখিল করে এবং ছোট বড অনেক আইন, যাহা দ্বারা ইংরাজদের স্বার্থের বিরোধিতা হইত, একরকম কলমের এক আঁচড়ে তাহা উড়াইয়া দেওয়া হয়।

এই কমিটিই ভারতীয় বিরোধী আইনগুলির একটা তালিকা করেন। এই আইনগুলি সহজ-ব্যবহার-যোগ্য ম্যানুয়াল আকারে প্রকাশিত হয় এবং ইহার সদ্ব্যবহার—আমাদের দৃষ্টিতে অসদ্ব্যবহার—এসিয়াটিক বিভাগ করিতে থাকেন।

ভারতীয় বিরোধী আইনগুলিতে যদি ভারতীয়দের নাম করিয়া তাঁহাদের উপরই প্রযোজ্য হইবে এইরূপ নির্দেশ না থাকিত, ভারতীয় ইউরোপীয় সকলেই ইহার আওতায় পড়িবে যদি এইরূপ নির্দেশ থাকিত, তবে আইনের প্রয়োগকার প্রশাসকের ইচ্ছানুসারে ঐ আইন ভারতীয়দের প্রতি কঠোরভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিত। তাহাতে আইন প্রণয়নকারীদের অভিপ্রায় পূর্ণ হইলেও এই সকল আইনকে সাধারণ আইন বলা যাইত। আইনের প্রবর্তনে কেহই অপমানিত বোধ করিত না। অবশেষে যখন কালক্রমে বর্তমান তিক্ত সম্পর্ক কাটিয়া যাইত তখন আর আইন পরিবর্তিত না হইলেও চলিত, কেবল উহার উদার প্রয়োগ দ্বারাই নির্যাতিত সম্প্রদায়ের নির্যাতন দূর হইত। এই আইনগুলিকে যেমন সাধারণ আইন বলা যায়, ইহার বিপরীত আইনকে তেমনি অসাধারণ বা বিশেষ জাতিভেদমূলক আইন বলা যায়। উহা দ্বারা একটা বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, কেননা ইহার দ্বারা কৃষ্ণকায় ও বাদামী বর্ণের রঙের জাতিদের সম্মুখে ইউরোপীয়দের তুলনায় অধিকতর বাধা সৃষ্টি করা হয়।

যে সকল আইন প্রচলিত ছিল তাহার একটি উদাহরণ লওয়া যাক। পাঠকের স্মরণ আছে যে, নাতালে যে প্রথম ভোটাধিকার প্রত্যাহারকারী আইন হইয়াছিল এবং পরে যাহা বিলাতের সরকার পাস করার অনুমতি দেন নাই তাহাতে এসিয়াবাসীদের এসিয়াবাসী বলিয়াই ভোটাধিকার হরণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে এই প্রকারের আইনের পরিবর্তন করিতে হইলে জনমত এমনভাবে গঠিত হওয়া চাই যে অধিকাংশ লোক এসিয়াবাসীদের বিরোধী না

হইয়া যেন তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হন। এই প্রকার প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল বর্ণবৈষম্য দূর হইতে পারে। জাতিগত বা শ্রেণীগত ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত আইনের ইহা একটি দৃষ্টান্ত। নাতালে ঐ আইন প্রত্যাহার করিয়া আর একটি আইন প্রবর্তিত হয় এবং তাহাতে একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অথচ তাহার চারিত্রধর্ম ছিল সাধারণ এবং বর্ণ বৈষম্যের কাঁটা উহা হইতে দূর করিয়া ফেলা হইয়াছিল। উহার একটা দফার মর্মার্থ এই প্রকার: "যে ব্যক্তি এমন দেশবাসী যেখানে সংসদীয় নির্বাচনমূলক শাসনাধিকার নাই, সে সকল দেশবাসীর নাম নাতালের ভোটারের তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে না।" এখানে ভারতবাসী অথবা এসিয়াবাসী এ কথার উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষে নির্বাচন-মূলক শাসনব্যবস্থা আছে কি নাই, ইহা লইয়া আইনজীবীদের মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু যদি ধরা যায় যে ১৮৯৪ সালে অথবা আজও ভারতবর্ষে নির্বাচন-মূলক শাসনাধিকার নাই, তাহা হইলেও যদি নাতালের ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকারী কর্মচারী কোনও ভারতীয়ের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি একটা বে-আইনী কাজ করিয়াছেন, একথা কেহ চট করিয়া বলিতে পারে না। প্রজার স্বত্বাধিকারের অনুকূল ধারণাই সাধারণতঃ করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে সেই দেশের সরকার ইচ্ছাপূর্বক ভারতীয় বিরোধী না হইলে ঐ আইন থাকা সত্ত্বেও ভোটারের তালিকায় ভারতীয়দের নাম থাকায় কিছুই বাধে না। অর্থাৎ ভারতীয়দের প্রতি বিরুদ্ধভাব যদি কমিয়া যায়, যদি স্থানীয় সরকার ভারতীয়দের হানি করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে ঐ আইনের কিছু পরিবর্তন না করিয়াও ভারতীয়দিগকে ভোটাধিকার দিতে পারেন। সাধারণ আইনের এই একটা সুবিধা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য কতকগুলি আইন হইতেও এই প্রকারের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পূর্বের অধ্যায়সমূহে এই প্রকারের আইনের উল্লেখ করা হইয়া গিয়াছে। জাতি বা বর্ণভেদ সূচক আইন যত না করা যায় ততই ভাল, একেবারে না করাই সর্বাপেক্ষা ভাল। একটা আইন একবার হইয়া গেলে তাহার প্রত্যাহার করা কঠিন। দেশের জনমত সম্যক ভাবে শিক্ষিত হইলেই কেবল আইন পরিবর্তন বা রদ করা সম্ভবপর হয়। যে শাসনপদ্ধতিতে আইন চট্ করিয়া প্রবর্তন বা প্রত্যাহার করা হয়, সে সরকার স্থায়ী অথবা সুগঠিত—একথা বলা যায় না।

ট্রান্সভালে এসিয়াবাসীর বিরোধী আইনে যে বিষের উদ্ভব হইয়াছিল, এক্ষণে

আমরা তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারিব। ঐ সমস্ত আইনই বর্ণবৈষম্য মূলক ছিল। এসিয়াবাসীরা এসিয়াবাসী বলিয়াই ভোট দিতে পারিবেন না, অথবা সরকার তাঁহাদের জন্য যে 'লোকেসন' বা বস্তিপাড়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার বাহিরে জমি কিনিতে পারিবেন না—যতক্ষণ ঐ আইনটি অপসৃত না হয় ততক্ষণ শাসককের কিছুই করিবার হাত নাই। লর্ড মিলনারের কমিটি যে সকল আইন সাধারণ নহে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল। যদি এই সকল আইন সাধারণ আইন হইত তাহা হইলে সেই সমস্ত সাধারণ আইন যাহা কেবল এসিয়াবাসীদের প্রতি বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইত, অন্যান্য আইনের সহিত তাহাও রদ হইয়া যাইত। আর তাহা হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা একথা বলিতে পারিতেন না যে তাঁহারা নিরুপায় এবং ঐ সকল আইন যে পর্যন্ত না প্রত্যাহৃত হয়, সে পর্যন্ত তাঁহাদের প্রয়োগ না করিয়া উপায় নাই।

যখন আইনগুলি এসিয়াটিক বিভাগের হাতে পড়িল, তখন তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আর যদি এই সকল আইন কার্যতঃ প্রয়োগ করার যোগ্যই হয়, তবে সরকারের আরও ক্ষমতা হাতে লইয়া ঐ আইন সর্বত্র প্রয়োগ করার যে সকল ছিদ্র আছে তাহাও বন্ধ করিতে হয়। তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। হয়ত ঐ সকল ছিদ্র ইচ্ছা করিয়াই এসিয়াবাসীদের সুবিধার জন্য রাখা হইয়াছিল, হয়তো বা ভুলেই রাখা হইয়াছিল। আইনগুলি যদি খারাপ হয় তবে সেক্ষেত্রে আইন রদ করা আবশ্যক, আর আইনগুলি যদি ভাল হয় সেক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করিবার পথে যে সকল ছিদ্র আছে তাহা বন্ধ করিতে হয়। মন্ত্রীরা আইনগুলি প্রয়োগ করিবার পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয়েরা ইংরাজের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া যুদ্ধের বিপদ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তবে সেকথা এখন তিন চারি বৎসরের পুরানো হইয়া গিয়াছে। প্রিটোরিয়ার ব্রিটিশ এজেন্ট ভারতীয়দের পক্ষ লইয়া সরকারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন, কিন্তু সে পুরোনো দিনের কথা। ভারতীয়দের অভিযোগ যুদ্ধের একটা স্বীকৃত কারণ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল; কিন্তু সে বিজ্ঞপ্তি সেই সকল অল্পদৃষ্টি রাজনৈতিকেরাই করিয়াছিলেন, যাহাদের স্থানীয় অবস্থার বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না। স্থানীয় কর্মচারীরা সাফ সাফ বলিতে লাগিলেন যে পূর্বতন ট্রান্সভাল সরকার যে-সকল এসিয়াটিক বিরোধী আইন করিয়াছিলেন, তাহা যথেষ্ট কড়া অথবা

বিধিবদ্ধ নহে। ভারতীয়েরা যদি ইচ্ছামত ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে পারেন এবং যেখানে খুশী ব্যবসা করিতে পারেন, তবে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই সকল এবং এই ধরনের অন্যান্য যুক্তি ইউরোপীয়দিগের নিকট তাঁহাদের প্রতিনিধি দ্বারা চালিত সরকারের নিকট ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহারা সকলেই স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অধিকতম অর্থ সঞ্চয় করিতে চান। যদি ভারতীয়দিগকে ইহার অংশীদার করিতে হয়, তবে কি করিয়া চলে? রাজনৈতিক আবশ্যকতাকে শঠতার সহিত যুক্ত করিয়া একটা চলনসই মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বুদ্ধিমান ইংরাজদের নিকট স্বার্থ-সাধক এবং ব্যবসাদারী যুক্তি গ্রাহ্য হইত না। মনুষ্য-বুদ্ধি মিথ্যা যুক্তি রচনা করিয়া অন্যায় সমর্থন করিতে আনন্দ পাইয়া থাকে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়েরা এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। জেনারেল স্মাটস্ এবং অন্য ইউরোপীয়েরা নিম্নের যুক্তি ব্যবহার করিতেন :

"দক্ষিণ আফ্রিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিভূ এবং ভারতবর্ষ হইতেছে প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্র। আজকালকার মনীষীগণ বলেন যে, এই দুই সভ্যতা একত্র চলিতে পারে না। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতার প্রতিনিধিরা ছোট ছোট দলে একত্রিত হইলেও একটা কাটাকাটি না হইয়া যায় না। পশ্চিম দেশ হইতেছে সাদাসিধা ভাবের বিরোধী, আর পূর্বদেশ সাদাসিধা ভাবকেই প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিস মনে করে। এই দুই বিরুদ্ধভাব কেমন করিয়া এক হইয়া যাইতে পারে? রাষ্ট্রনীতিবিদেরা ব্যবহার-কুশল ব্যক্তি। এই দুই সভ্যতার কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তাহার মূল্যায়ন করা তাঁহাদের কাজ নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভাল বা মন্দ হইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয়েরা ঐ সভ্যতাই আঁকড়াইয়া থাকিতে চান। এই সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাহারা অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইহারই জন্য তাঁহারা নদীর স্রোতের ন্যায় রক্ত-পাত করিয়াছেন। এই সভ্যতা রক্ষাকল্পে তাঁহারা অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের একটা নূতন পথ খুঁজিয়া লওয়ার সময় আসে নাই। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয়দের সম্বন্ধে প্রশ্ন জাতিগত বিদ্বেষ অথবা ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নহে। প্রশ্ন হইতেছে নিছক নিজেদের সভ্যতা বজায় রাখার, অর্থাৎ আত্মরক্ষার পরম অধিকার ভোগ করা এবং তদনুরূপ কর্ম করিয়া যাওয়া। কোনও কোনও বক্তা ভারতীয়দের দোষ দেখাইয়া দিয়া ইউরোপীয়দিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে চাহেন। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাবিদেরা একথা বিশ্বাস

করেন ও বলিতে থাকেন যে ভারতীয়দের যাহা গুণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহাই অপগুণ বলিয়া গণ্য। ভারতীয়েরা তাঁহাদের সাদাসিধা চলন, তাঁহাদের ধৈর্য, তাঁহাদের একনিষ্ঠা এবং পরমার্থ ব্রতের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার অপ্রীতিভাজন। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা উৎসাহী, অধীর, অভাব বাড়াইতে এবং অভাব মিটাইতে রত, আমোদ-আহ্লাদ ভালবাসেন এবং কায়িকশ্রম না করা ও ব্যয়বাহুল্য করা পছন্দ করেন। সেইজন্য তাঁহারা ভয় পান যে, যদি হাজার হাজার পূর্ব দেশীয়েরা আসিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য-দেশীয়দিগকে স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়েরা আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত নহেন এবং তাঁহাদের নেতারা তাঁহাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া ফেলিতে ইচ্ছুক নহেন।"

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে খুব চরিত্রবান লোকেরা যাহা বলিয়া থাকেন, আমার মনে হয় তাহাই আমি নিরপেক্ষভাবে সন্নিবেশিত করিতে পারিয়াছি। আমি তাঁহাদের যুক্তি মেকী দার্শনিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তিগুলি অহেতুক নহে। বাস্তব দৃষ্টি অর্থাৎ সাময়িক স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখিলে এই যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট জোর রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিলে উহা শুদ্ধ প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নহে। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কোনও নিষ্পক্ষপাত ব্যক্তি এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং এই সকল যুক্তির সমর্থকেরা তাঁহাদের সভ্যতাকে যত দুর্বল ও অসহায় বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, কোনও সংস্কারক তাহা মানিয়া লইবেন না। আমি যতদূর জানি কোনও প্রাচ্য দার্শনিক এ ভয় করেন না যে, যদি পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা প্রাচ্য দেশের সহিত অবাধে মিশেন, তাহা হইলে প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত-প্রবাহে বালির মত ভাসিয়া চলিয়া যাইবে। প্রাচ্য চিন্তাধারা আমি যতটা গ্রহণ করিতে পারি তাহাতে বুঝি যে, প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্যের সহিত নিকট-সংযোগকে ভয় তো করেই না, বরঞ্চ সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে। যদি ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে, তথাপি তাহাতে আমার সিদ্ধান্ত বদলায় না। কেননা ইহার সমর্থনকারী অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সে যাহাই হোক্, পাশ্চাত্য দেশের ভাবুকেরা মনে করেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিই হইতেছে 'জোর যাহার মুল্লুক তাহার' অর্থাৎ পশুবলই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই নীতির উপর। সেইজন্য এই সভ্যতার রক্ষকেরা পশুবল প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় করিয়া

থাকেন। এই সভ্যতার দার্শনিকেরা একথা বলেন যে, যে জাতি নিজেদের অভাব বাড়ায় না সে জাতি অবশেষে লোপ পাইয়া যায়। এই নীতি অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য জাতি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক সংখ্যক নিগ্রোদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। গরীব ভারতীয়দিগকে আবার তাঁহাদের ভয় কি? ভারতীয়দিগকে যে ইউরোপীয়েরা ভয় করেন না তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, যদি ভারতীয়েরা কেবল মজুর হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন উপস্থিত হইত না।

এখন বাকি রহিল কেবল ব্যবসা ও বর্ণবৈষম্যের কথা। হাজার হাজার ইউরোপীয় একথা লিখিয়াছেন যে, ভারতীয়দের ব্যবসার জন্য ছোট ছোট ব্যবসায়ীর অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিয়াছে এবং কালো রং-এর লোকদের বিরুদ্ধে একটা অসদ্ভাব ইউরোপীয়দের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এমন কি যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আইনতঃ জনসাধারণের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে সেদিনও শ্রীযুক্ত বুকার, টি, ওয়াশিংটনের মত লোককে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দরবারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই এবং আজও হয়ত দেওয়া হইবে না। অথচ শ্রীযুক্ত বুকার ওয়াশিংটনে সর্বোচ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছেন, তিনি একজন অতিশয় চরিত্রবান খ্রীষ্টান এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরা পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়াছেন কিন্তু চামড়ার রং কালো হওয়াই হইতেছে তাঁহাদের অপরাধ। আর আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে তাঁহারা তো শুধু লাঞ্ছিত হন কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশের গোরারা অপরাধের আভাসমাত্রের অছিলায় তাঁহাদিগকে লিঞ্চিং করেন অর্থাৎ জীবন্ত পোড়াইয়া মারেন।

পাঠক ইহা হইতেই বুঝিবেন যে, উল্লিখিত "দার্শনিক" তত্ত্বের ভিতর বিশেষ কোনও তথ্য নাই। পাঠকেরা এ কথাও যেন না মনে করেন যে সকলেই ঐ সকল যুক্তি মিথ্যা জানিয়াও উহা অবলম্বন করিয়া থাকেন। অনেকে আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের যুক্তি দার্শনিক তত্ত্ব-সম্মত। এমনও হইতে পারে যে যদি আমরা এই অবস্থায় পড়িতাম তবে হয়ত আমরাও এই যুক্তি অবলম্বন করিতাম। এই কারণেই সম্ভবতঃ 'বুদ্ধিকর্মানুসারিণী' এই প্রবাদ বাক্যের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা কে না দেখিয়াছেন যে আমরা আমাদের আন্তরিক বৃত্তি অনুযায়ী যুক্তি খাড়া করিয়া থাকি? আর যদি আমাদের যুক্তি

অপরে স্বীকার না করেন তবে আমরা অসন্তুষ্ট, অধীর এবং এমন কি রুষ্ট পর্যন্ত হইয়া থাকি।

এই প্রশ্ন আমি ইচ্ছাপূর্বক এত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতেছি। আমি চাই যে, পাঠকেরা যেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বোঝার শিক্ষা আয়ত্ত করেন এবং যদি এ পর্যন্ত সে অভ্যাস না হইয়া থাকে, তবে অতঃপর যেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে সম্মান করিতে ও বুঝিতে শেখেন। সত্যাগ্রহের মর্ম বুঝিতে হইলে, বিশেষ করিয়া সত্যাগ্রহ-নীতি প্রয়োগ করিতে হইলে এইপ্রকার উদারতা ও সহনশক্তি খুবই আবশ্যক। ইহা না হইলে সত্যাগ্রহ হইতেই পারে না। আমি কেবল লেখার জন্যই এই পুস্তক লিখিতেছি না। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের একটা দিক পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করাও আমার অভিপ্রায় নহে। যেজন্য আমি বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি, আর যাহার জন্য তেমনি ভাবে মরার নিমিত্ত প্রস্তুত বলিয়া মনে হয় সেই সত্যাগ্রহের জন্ম কি করিয়া হইল এবং কি করিয়া তাহার ব্যাপক প্রয়োগ করা হইয়াছিল, এই সকল কথা জাতিকে জানাইবার জন্য আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। তাহা হইলে জাতি ইহার তাৎপর্য বুঝিবে এবং যতটা ইচ্ছা ও সাধ্য ততটা ইহার রূপায়ণ করিবে।

এক্ষণে পূর্বের কথায় ফিরিয়া আসিতেছি। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রিটিশ প্রশাসকগণ স্থির করিয়াছিলেন যে ট্রান্সভালে নূতন ভারতীয়ের প্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে এবং পুরানো যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের অবস্থা এমন দুঃসহ করিয়া তোলা হইবে যে, তাঁহারা বাধ্য হইয়া ট্রান্সভাল ছাড়িয়া যান। আর যদি নাও যান, তবে যেন ক্রীতদাসের পর্যায়ে পরিণত হন। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক মহা-মহা রাজপুরুষ একাধিকবার একথা বলিয়াছেন যে, ভারতীয়দিগকে এখানে কেবল জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজের জন্য চাকর হিসাবেই থাকিতে দিতে পারেন। এসিয়াটিক বিভাগে অন্যান্যদের সহিত শ্রীযুক্ত লিওনেল কার্টিসও ছিলেন। পরবর্তীকালে ইনি ভারতবর্ষে ডায়ার্কি বা বিভক্ত-দায়িত্ব-মূলক শাসন সংস্কারের প্রচারক রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। তখন অর্থাৎ ১৯০৫।৬ সালে ইনি কেবল যুবক। ইনি লর্ড মিলনারের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। সমস্ত কার্যই ইনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ করিতে চাহিতেন। তবে ইহার দ্বারা মহাভুলও সংঘটিত হইত। ইহার একটা ভুলের জন্য একবার জোহানস্‌বার্গ মিউনিসিপ্যালিটির ১৪০০০ পাউণ্ড জলে ফেলা যায়।

ইনি বুদ্ধি বাহির করিলেন যে যদি ট্রান্সভালে নূতন ভারতীয় আসা বন্ধ করিতে হয়, তবে পুরানো যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যে, একের পরিবর্তে অপর কেহই যেন প্রবেশ করিতে না পারেন এবং যদি প্রবেশ করেন তবে যেন তৎক্ষণাৎ ধরা পড়েন। ইংরাজ অধিকারের পরে যাঁহাকেই অনুমতি-পত্র দেওয়া হইত, তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর থাকিত এবং লিখিতে না জানিলে আঙুলের ছাপ লওয়া হইত। কোনও আমলা প্রস্তাব করিলেন যে ইহার সহিত উক্ত ব্যক্তির ফটোগ্রাফ দেওয়া চাই। ইহার জন্য কোন আইন করার আবশ্যকতা ছিল না, প্রশাসনিক হুকুমনামার বলেই এই প্রথা জারি হইল। সেইজন্য ভারতীয় নেতারাও শীঘ্র ইহার খবর পান নাই। ধীরে ধীরে এই নূতন প্রথার বিষয় তাঁহারা জানিতে পারিলেন। তখন সরকারের কাছে আবেদন করা হইল, প্রতিনিধি-দল গেল। কর্তারা উত্তর দিলেন যে, যখন ইচ্ছা তখন, যে ইচ্ছা সে যে প্রবেশ করিবে—ইহা চলিতে পারে না। সেইজন্য সকল ভারতীয়কে একই রকম অনুমতি-পত্র লইতে হইবে। তাহার ভিতরে এমন সকল বিবরণ থাকিবে যে, যাঁহার অনুমতি-পত্র তিনি ছাড়া আর কেহ যেন প্রবেশ করিতে না পারেন। আমি মনে করিতাম যে আমরা এইপ্রকার অনুমতি-পত্র রাখিতে বাধ্য নহি কেবল যতদিন "শান্তিরক্ষার অর্ডিনান্স" বলবৎ থাকিবে, ততদিনই সরকার উহা রাখিতে বলিতে পারেন। ভারতবর্ষে যেমন 'ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া' বা ভারতরক্ষা আইন হইয়াছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় 'শান্তিরক্ষা' আইনও তাহাই। ভারতবর্ষে যেমন লোককে উৎপীড়ন করার জন্যই আবশ্যকতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ঐ আইন রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তেমনি ভারতীয়দিগকে উৎপীড়িত করার জন্যই প্রয়োজন ফুরাইবার অনেক পরেও ঐ আইন জারি রাখা হইয়াছিল। একথা বলা যায় যে গোরাদের উপর সাধারণতঃ এই আইন আদৌ প্রযুক্ত হইত না। যাহাই হউক্ অনুমতি-পত্র যদি লইতে হয়, তবে অবশ্যই রক্ষকের পরিচয়ের কোনও চিহ্ন থাকা চাই। সেইজন্য যিনি স্বাক্ষর করিতে না পারেন তাঁহার টিপসহি লওয়া ঠিক। তবে অনুমতিপত্রে ফটোগ্রাফ দেওয়ার প্রস্তাব আমার আদৌ পছন্দ হয় নাই। মুসলমানদের আবার ইহাতে ধর্মের দিক হইতে আপত্তিও ছিল।

এই সকল কথাবার্তার পরিণাম এই হয় যে, পুরাতন ভারতীয়েরা তাঁহাদের অনুমতিপত্র ফিরাইয়া দিয়া বদলাইয়া নূতন করিয়া লইবেন এবং যাঁহারা নূতন

আসিবেন তাঁহাদিগকে নূতন করমেই অনুমতিপত্র লইতে হইবে। যদিও আইনতঃ ভারতীয়েরা এইরূপ করিতে বাধ্য ছিলেন না, তথাপি আবার নূতন কিছু বাঁধাবাঁধি পাছে হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা এই পর্যন্ত করা মানিয়া লইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহারা ইহাও আশা করিয়াছিলেন যে, যাঁহারা নূতন আসিবেন তাঁহাদিগকে শান্তিরক্ষার অর্ডিন্যান্সের কবলে ফেলিয়া আর কষ্ট দেওয়া হইবে না। একথা বলা যায় যে প্রায় সকল ভারতীয়ই এই নূতন ধরনের অনুমতিপত্র লইয়াছিলেন। ইহা যেমন তেমন কথা নয়। যে কার্য করিতে সম্প্রদায় আদৌ আইনতঃ বাধ্য নয়, তাহা একসঙ্গে অতিশীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে সম্প্রদায়ের সত্যপরায়ণতা, কুশলতা, উদারতা, ব্যবহারিক বুদ্ধি ও নম্রতার পরিচয় ছিল। এই কার্য দ্বারা সম্প্রদায় একথাও প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, এখানকার কোনও আইনের, কোনও ব্যবস্থার লঙ্ঘন করার কোন ইচ্ছা তাহার নাই। ভারতীয়েরা ইহাই ভাবিয়াছিলেন যে, যে সম্প্রদায় সরকারের সহিত এমন সম্মান সহকারে আচরণ করিয়াছিল, সরকার সেই সম্প্রদায়ের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন এবং সম্প্রদায়কে নূতন অধিকার অর্পণ করিবেন। ট্রান্সভালের ব্রিটিশ সরকার এই বিবেকোচিত ও উদার কার্যের কি প্রতিদান দিয়াছিলেন, পরবর্তী অধ্যায়ে তাহা দেখিব।

একাদশ অধ্যায়

উদারতার পুরস্কার—কালা কানুন

অনুমতিপত্র যখন রদ ও বদল-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল তখন ১৯০৬ সাল চলিতেছে। আমি ১৯০৩ সালে ট্রান্সভালে পুনঃপ্রবেশ করি। সেই বৎসরের প্রায় মধ্যভাগে আমি জোহানস্বার্গে দপ্তর খুলি। এই দুই বৎসর কেবল এসিয়াটিক বিভাগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেই কাটিয়া গেল। আমরা সকলেই একথা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে অনুমতিপত্রের ব্যাপারে একটা কিনারা হওয়ায় সরকারের সম্পূর্ণ সন্তোষ হইয়াছে এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ও এখন কতকটা শান্তি পাইবে। কিন্তু সম্প্রদায়ের কপালে শান্তিভোগ লেখা ছিল না। শ্রীযুক্ত লিওনেল কার্টিসের পরিচয় আমি গত অধ্যায়ে দিয়াছি। তিনি মনে করিলেন

যে, ভারতীয় সম্প্রদায় নূতন অনুমতিপত্র লওয়াতেই ইউরোপীয়দের স্বার্থ সিদ্ধ হইল না। পরস্পর বোঝাপড়া করিয়া যদি কোনও মহান্ ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহা ইহার চক্ষে যথেষ্ট নয়। এই প্রকার কার্যের পশ্চাতে আইনের বল থাকিলেই তবে তাহা শোভা পায় এবং তাহা হইলে তাহার অন্তস্থ নীতি চিরকালের জন্য কায়েম থাকে—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত কার্টিসের ইচ্ছা হইয়াছিল যে তিনি ভারতীয়দিগকে হাতের মুঠার ভিতর রাখার মত এমন কিছু একটা ব্যবস্থা করিবেন, যাহার প্রভাব সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ছাপাইয়া যায় এবং অন্য উপনিবেশগুলির উপরেও পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় কোথাও কোনও ফাঁক থাকে, ততক্ষণ ট্রান্সভাল সুরক্ষিত হইতেছে না। তাঁহার মনে হয় যে সরকার ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বোক্ত শান্তিময় সম্পর্ক দ্বারা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাই বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ শ্রীযুক্ত কার্টিসের ইচ্ছা ছিল ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়ানো নয়, কমানো। এই কার্যে ভারতীয়দের সম্মতির আবশ্যক ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে বাহির হইতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর চাপ দেওয়ার মত এমন আইন করিবেন যাহার দাপটে তাঁহারা থরহরি কাঁপিবেন। সেইজন্য তিনি একটা "এসিয়াটিক আইনের" মুসাবিদা খাড়া করিলেন এবং সরকারকে একথা বুঝাইলেন যে এই প্রকার আইন না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয়েরা লুকাইয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিবেনই। আর একবার যদি ঢুকিয়া পড়েন তবে প্রচলিত আইনের সাহায্যে তাঁহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ারও কোনও ব্যবস্থা নাই। শ্রীযুক্ত কার্টিসের যুক্তি এবং তাঁহার আইনের মুসাবিদা সরকারের পছন্দ হইল এবং ঐ মুসাবিদা অনুযায়ী আইন করিবার জন্য উহা "বিল" আকারে ট্রান্সভালের বিধানসভায় উপস্থিত করার নিমিত্ত তাঁহারা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিলেন।

এই আইনের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করার পূর্বে গোটাকতক প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া লওয়া দরকার। আমিই সত্যাগ্রহের প্রবর্তক বলিয়া আমার অবস্থা পাঠকের ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। ট্রান্সভালে যখন ভারতীয়দের উপর এই প্রকার নূতন চাপ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময়ে নাতালে জুলু বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই কলহটাকে বিদ্রোহ বলা যায় কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল, আজও সন্দেহ আছে। তাহা হইলেও এই ব্যাপারটা নাতালে সাধারণতঃ বিদ্রোহ নামেই পরিচিত। এবারও নাতালের অনেক গোরা বুয়ার যুদ্ধের সময়ের মত স্বেচ্ছাসেবকরূপে

সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন। আমি নিজেকে নাতালবাসী বলিয়াই গণ্য করিতাম। আমার সেইজন্য মনে হইল যে আমারও এইজন্য সেবা দেওয়া সঙ্গত। তাই সম্প্রদায়ের অনুমতি লইয়া আমি সরকারকে জানাইলাম যে আমি আহতদিগকে শুশ্রূষা করার জন্য একটা দল গঠন করিতে চাই। সরকার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তখন আমি ট্রান্সভালের বাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। নাতালের ফিনিক্স আশ্রমে আমার সহকর্মীরা বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান' সেইখান হইতে ছাপা হইত। সেইখানে ছেলেপিলেদিগকে আনিয়া রাখিলাম। দপ্তর চলিতে থাকিল। কারণ আমি জানিতাম যে এই সেবাকার্যে আমার দীর্ঘকাল থাকা আবশ্যক হইবে না।

আমি ২০।২৫ জনের একটি ছোট দল সংগঠিত করিয়া ফৌজের সহিত যুদ্ধে গেলাম। এই ছোট দলের ভিতরও সকল প্রদেশের ভারতবাসীই ছিলেন। এক মাস এই দলকে সেবা করিতে হয়। আমাদের হাতে এই কার্য পড়াটা ঈশ্বরের কৃপা বলিয়া সর্বদা মানিয়া থাকি। আমি দেখিয়াছিলাম যে, যেসকল নিগ্রোর আমরা সেবা করিয়াছিলাম আমরা না গেলে তাঁহারা অমনি পড়িয়া পড়িয়া ভুগিতেন। এই আহতদিগকে শুশ্রূষা করিতে কোনও গোরাই ইচ্ছুক ছিলেন না। যে ডাক্তারের অধীনে আমাদিগকে এই কাজ করিতে হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। আহতদিগকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেওয়ার পর তাঁহাদিগকে সেবা করা আমাদের কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু আমরা বুঝিয়া লইয়াছিলাম যে, যে-কোন কার্যই আমাদিগকে দেওয়া হউক তাহাই আমাদের কার্যের অন্তর্ভুক্ত। সদাশয় ডাক্তার বলিলেন যে তিনি গোরা শুশ্রূষাকারী পাইতেছেন না, কাহাকেও হুকুম করাইয়া কাজ করাইবার শক্তিও তাঁহার নাই। তবে আমরা যদি এই দয়ার কার্যের ভার লই, তবে তিনি উপকৃত হইবেন। আমরা সাদরে এই কার্যভার গ্রহণ করিলাম। পাঁচ-ছয়দিন যাবৎ কতকগুলি নিগ্রোর ঘায়ে হাত দেওয়া হয় নাই, উহা পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। এই সকল কাজ আমাদের হাতে পড়ায় আমাদের খুব ভাল লাগিল। জুলুরা আমাদিগের সহিত কথা বলিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের হাবভাব ও চক্ষু একথা বলিতেছিল যে ভগবান আমাদিগকে তাঁহাদের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই কার্যের জন্য আমাদিগকে কখনও কখনও দিনে চল্লিশ মাইল করিয়াও চলিতে হইত।

এক মাসের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। সরকারী ডেসপ্যাচে

আমাদের কাজের উল্লেখ করা হয়। আমাদের দলের প্রত্যেককে এই উপলক্ষে বিশেষভাবে তৈয়ারী পদক দেওয়া হয়। লাটসাহেব একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র দেন। এই দলের তিনজন সার্জেন্টই ছিলেন গুজরাটী। তাঁহাদের একজন উমিয়াশঙ্কর সেলট, অপরজন সুরেন্দ্র বাপুভাই মেড়, আর তৃতীয়জন হরিশঙ্কর ঈশ্বর যোশী। তিনজনের শরীরই খুব শক্ত ছিল এবং ইহারা খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অপর ভারতীয়দের নাম এতদিন পর আমার আর মনে পড়িতেছে না। তবে আমাদের সঙ্গে একজন পাঠান ছিলেন এবং তাঁহার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। তাঁহার সমান বোঝা আমরা সকলে বহন করিতে পারিতাম, কুচ করিয়াও সমান তালে চলিয়া যাইতে পারিতাম—ইহাতে তাঁহার আশ্চর্যের সীমা ছিল না।

বহুদিন যাবৎ আমার মনে যে দুইটি ধারণার উদ্রেক হইয়াছিল, এই দলে কার্য করার সময় তাহা স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। প্রথমটি হইতেছে এই যে কেবল সেবামূলক জীবনের অনুগামী ব্যক্তিকে ব্রহ্মচর্য পালন করিতেই হইবে। আর দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে চিরকালের জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইতে হইবে। তিনি এমন কোন পেশা গ্রহণ করিতে পারেন না যাহা দীনতম কর্তব্য অথবা বৃহত্তম ঝুঁকি লইবার পথে তাঁহার বাধক হইতে পারে।

এই দলে কাজ করিতে থাকাকালীনই অবিলম্বে ট্রান্সভালে ফিরিয়া আসার জন্য বহু পত্র ও তার পাইয়াছিলাম। সেই জন্য যুদ্ধের কাজ হইতে ছাড়া পাইয়া ফিনিক্সে সকলের সহিত একবার দেখা করিয়াই আমি জোহানস্‌বার্গে পৌঁছাইলাম। সেখানে গিয়া উপরে যে বিলের কথা লিখিয়াছি তাহা পড়িলাম। ট্রান্সভাল সরকারের ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগস্টের গেজেটে এই বিল প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানা আমি দপ্তর হইতে বাড়ী লইয়া গেলাম। বাড়ীর কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের মত ছিল। একজন সাথীকে লইয়া সেখানে গিয়া বসিয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' জন্য তাহার তরজমা করিতে লাগিলাম। বিলের একটি একটি ধারা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। ইহার ভিতরে আমি ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। আমার বোধ হইল যে এই বিল যদি গৃহীত হয় আর ভারতীয়েরা যদি নীরবে উহা মানিয়া লন, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয়েরা ডালে-মূলে উৎখাত হইবে। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা মরা-বাঁচার প্রশ্ন। আমার ইহাও বোধ হইল যে, এই বিষয়ে আবেদন-নিবেদনে

যদি কোনও ফল না হয় তাহা হইলে ভারতীয়দের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলিবে না। এই আইন স্বীকার করা অপেক্ষা মরাও ভাল। কিন্তু মরিব কেমন করিয়া? আমরা সাহস করিয়া এমন কি করিতে পারি যাহাতে হয় জয়লাভ নয় মৃত্যু ছাড়া আমাদের সম্মুখে অপর কোন পন্থা না থাকে। সম্মুখে যেন নিরন্ধ্র পর্বত দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বোধ হইল যাহা ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়ার কোনও রাস্তা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। যে আইন আমাকে এত বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছিল, পাঠকের জানা আবশ্যক যে তাহা কি। উহার মর্ম নিম্নে লিখিতেছি:

ট্রান্সভালবাসী সকল ভারতীয় পুরুষ, স্ত্রী ও আট বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বালক-বালিকাকে এসিয়াটিকবিভাগে গিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া পাস লইয়া আসিতে হইবে। এই পাস লওয়ার সময় পুরানো পাস ফেরত দিতে হইবে। দরখাস্তে নাম ধাম জাতি বয়স ইত্যাদি লিখিতে হইবে। যে আমলা দরখাস্ত লইবেন তিনি দরখাস্তকারীর দেহে প্রধান যে সকল সনাক্তকরণের চিহ্ন আছে তাহা দেখিয়া লিখিয়া লইবেন। দরখাস্তকারীর সকলগুলি আঙুলেরই টিপ-ছাপ লওয়া হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর যে স্ত্রী-পুরুষ এইভাবে রেজিস্ট্রী না করাইবেন তাঁহার ট্রান্সভালে থাকিবার অধিকার লোপ পাইবে। দরখাস্ত না করা আইন অনুযায়ী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহার জন্য জেল, অর্থদণ্ড ও ট্রান্সভালের সীমার বাহিরে নির্বাসন—আদালতের অভিরুচি অনুযায়ী যে-কোন দণ্ড দেওয়া যাইবে। ছেলেপিলেদের জন্য মা-বাপকে দরখাস্ত করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে রেজেস্ট্রীর জন্য উপস্থিত করা ও টিপ-ছাপ দেওয়ানোর ব্যবস্থা ইত্যাদির দায়িত্ব বাপ-মায়ের। যেসকল পিতা-মাতা এই সকল দরখাস্তদেওয়া আদি কর্তব্য সম্পাদন না করিবেন, ষোল বৎসর প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের সন্তানদের স্বয়ং তাহা করিতে হইবে। ইহার অন্যথায় আইন অনুযায়ী ঐ সকল দণ্ড সে নিজে পাইবে। যে পাস দেওয়া হইবে, তাহা যখন যেখানে পুলিস দেখিতে চায় তখন সেইখানেই দেখাইতে হইবে। পাস না দেখানো অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং আদালত ইচ্ছামত জেল বা অর্থদণ্ড করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি রাস্তায় চলিতেছে তাহার নিকটও পাস দেখিবার দাবি করা যাইতে পারিবে। পাস আছে কিনা দেখার জন্য আমলারা লোকের বাড়ীতেও প্রবেশ করিতে পারিবে। ট্রান্সভালের বাহির হইতে কোন ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ যদি আসেন, তবে তাঁহাদিগকে অনুসন্ধানকারী আমলার নিকট নিজেদের পাস দেখাইতে হইবে।

যদি আদালতে কোনও মোকদ্দমা করিতে হয়, অথবা যদি কোন সরকারী দপ্তরে ব্যবসায় কিংবা বাইসাইকেল রাখার লাইসেন্স চাওয়া হয় তবে সে সময়েও কর্মচারী পাস দেখিতে চাহিতে পারিবেন। যদি কেহ কোনও সরকারী দপ্তরে কোনও কাজের জন্য যান, তবে তাঁহার কোনও কথা শুনার পূর্বে পাস দেখিতে চাহিতে পারা যাইবে। পাস দেখাইতে অস্বীকার করা অথবা আমলা যে সমস্ত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাহা দিতে অস্বীকার করা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার জন্যও কয়েদ ও অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

পৃথিবীর অন্য কোথাও স্বাধীন মানুষের জন্য এই প্রকার আইন আছে বলিয়া আমি জানি না। নাতালের 'গিরমিটিয়া' ভারতীয়দের পাসের সম্বন্ধে আইন খুব কঠিন বলিয়া আমি জানিতাম। কিন্তু সে বেচারীদিগকে তো স্বাধীন বলা যায় না। তাহা হইলেও তাঁহাদের পাস সম্বন্ধে আইন, এই আইন অপেক্ষা সহজ বলা যাইতে পারে। এই আইন ভঙ্গ করার যে সাজা, তাহা নাতালের আইন ভঙ্গের সাজার সহিত তুলনাই করা যায় না। যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করিতেছেন, সেই ব্যবসায়ীও এই আইনের বলে নির্বাসিত হইতে পারেন এবং এইভাবে কেবল এই আইন ভঙ্গের জন্য আর্থিক দিক হইতে তাঁহার সর্বনাশও করা যাইতে পারে। ধৈর্যশীল পাঠক পরে দেখিবেন যে এই আইন ভঙ্গ করার জন্য লোককে নির্বাসিতও করা হইয়াছে। স্বভাব-অপরাধী উপজাতীয়দের জন্য ভারতবর্ষে কতকগুলি কঠোর আইন আছে। এই আইন সেই সব আইনের সহিত সহজেই তুলনা করা যাইতে পারে এবং দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশী কঠোর তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে প্রস্তাবিত আইন উহার অপেক্ষা কোনও ক্রমেই মৃদু নহে। তারপর যেভাবে টিপ-ছাপ লওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকাতেও নূতন। এই টিপ-ছাপের বিষয়ে সাহিত্য পড়িতে গিয়া দেখিলাম যে শ্রীযুক্ত হেনরী নামে এক পুলিস কর্মচারী তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কেবল অপরাধীর নিকট হইতেই এই প্রকার টিপ-ছাপ লওয়াই আইনের বিধান। সেইজন্য জবরদস্তি করিয়া দশ আঙুলের টিপ-ছাপ লওয়া বড় ভয়ানক বলিয়া বোধ হইল। তদুপরি স্ত্রীলোক ও ষোল বৎসরের কমবয়স্ক বালক-বালিকাদের পাস লওয়ার প্রথা এই প্রথম প্রবর্তন করা হইল।

পরদিনই আমি নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দিগকে একত্র করিয়া এই আইনটি অক্ষরে অক্ষরে বুঝাইয়া দিই। এই আইনের শর্তগুলি পড়িয়া আমার যে অবস্থা হইয়াছিল তাঁহাদেরও তাহাই হইল। একজন তো আবেশভরে বলিয়া

উঠিলেন, "আমার স্ত্রীর নিকট যদি কেহ পাস দেখিতে আসে, তবে সেইখানেই তাহাকে সাবাড় করিব। তাহার পর আমার যাহা হওয়ার হইবে।" আমি তাঁহাকে শান্ত করিয়া সকলকে বলিলাম, "এই বিষয়টি বড়ই গুরুতর। এই বিল যদি গৃহীত হয় আর যদি আমরা তাহা মানিয়া লই, তাহা হইলে সারা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ইহার অনুকরণ করা হইবে। আমার মনে হয় যে আমাদিগের অস্তিত্ব লোপ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। এই আইনই শেষ নয়। আমাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দূর করিয়া দেওয়ার ইহা প্রথম ব্যবস্থা। সেই জন্য কেবল ট্রান্সভালবাসী দশ-পনের হাজার ভারতীয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের নহে, দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত ভারতীয়ের সম্বন্ধেই আমাদের দায়িত্ব রহিয়াছে। যদি এই আইনের সম্পূর্ণ মর্ম আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে সারা ভারতবর্ষের সম্মান আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে দেখিতে পাইব। এই বিল হইতে কেবল আমাদেরই অপমান নহে, সমস্ত ভারতবর্ষেরই অপমান হইয়াছে বলা যায়। অপমান মানে নির্দোষ লোককে হতমান করার চেষ্টা করা। আমরা এমন কিছু করিয়াছি যাহার জন্য এই জাতীয় কঠোর আইন দ্বারা শাসিত হইবার যোগ্য—এমন অপবাদ কেহ দিবেন না। আমরা নির্দোষ এবং কোন জাতির একজন মাত্র নির্দোষ ব্যক্তির অপমান সমগ্র জাতির অপমানের তুল্য। সুতরাং এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিলে অথবা অধীর কিংবা ক্রুদ্ধ হইলে চলিবে না। তাহাতেও এই অত্যাচার হইতে বাঁচোয়া নাই। কিন্তু যদি শান্তভাবে প্রতিকারের পন্থা অনুসন্ধান করিয়া সময়মত প্রতিরোধ করি, সকলে একত্র হইয়া এই অপমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া যে সকল দুঃখ হয় তাহা সহ্য করি, তবে আমি মনে করি যে ঈশ্বর আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।" সকলেই বিলের গুরুত্ব বুঝিলেন। ইহাও স্থির হইল যে এক সার্বজনীক সভা করিয়া তাহাতে কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া মঞ্জুর করিয়া লইব। ইহুদীদিগের একটি নাট্যশালা ভাড়া লইয়া সেইখানে সভা করা স্থির হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

সত্যাগ্রহের জন্ম

১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এই সভা হইল। ট্রান্সভালের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। কিন্তু একথা আমাকে অস্বীকার করিতে হইবে যে, যে প্রস্তাব আমি উপস্থাপিত করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ অর্থ আমি নিজেই তখন বুঝিতে পারি নাই। আর উহার সম্ভাব্য পরিণাম কি কি হইতে পারে তাহাও আমি সে সময় ঠিক ধরিতে পারি নাই। সভা হইল। থিয়েটার-ঘরে লোক আর ধরে না। সকলেরই চোখেমুখে একটা কিছু নূতন করিতে হইবে বা ঘটিবে তাহার পূর্বাভাস আমি লক্ষ্য করিলাম। ট্রান্সভালের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আবদুল গনি খুরশী সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ট্রান্সভালবাসী প্রাচীনতম ভারতীয়দের মধ্যে ইনি একজন। 'মহম্মদ কাসিম কমরুদ্দীন' নামক বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের তিনি অংশীদার এবং উহার জোহানসবার্গ শাখার ম্যানেজার ছিলেন। সভাতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই বিখ্যাত চতুর্থ প্রস্তাব। উহার মর্ম ছিল এই যে সমস্ত প্রতিবাদ করার পরও যদি এই বিল পাস হয় তাহা হইলে ভারতীয়েরা তাহা মানিয়া লইবে না, আর মানিয়া না লওয়ার জন্য যত দুঃখই হোক তাহা সহ্য করিবে।

এই প্রস্তাব আমি সভায় ভাল করিয়া বুঝাইলাম। সকলে শান্তভাবে সে সকল কথা শুনিলেন। সভার কার্য হিন্দী বা গুজরাটী ভাষায় হওয়ায় কেহ না বুঝিতে পারে এমন ছিলেন না। হিন্দী ভাষা বোঝেন না, এমন তামিল ও তেলেগু-ভাষীদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিয়মিত ভাবে প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়। সমর্থকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন শেঠ হাজি হবিব। ইনি ট্রান্সভালের খুব পুরাতন ও বহুদর্শী লোকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অতিশয় আবেগময়ী বক্তৃতা করেন। আবেগের মুখে তিনি একথাও বলেন যে আমরা যেন ঈশ্বরসাক্ষী করিয়াই এই প্রস্তাব গ্রহণ করি, আমরা যেন কখনও কাপুরুষ না হই, কখনও যেন আইনের বশ্যতা স্বীকার না করি—নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি বলেন যে, তিনি কদাপি এই আইন স্বীকার করিবেন না এবং সমবেত সকলকে ঈশ্বরসাক্ষী

করিয়া প্রতিজ্ঞা লইতে বলেন।

প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে গিয়া অন্যান্য অনেকেও তীব্র ও জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দেন। যখন হাজি হবিব বলিতেছিলেন ও প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিতেছিলেন তখনই আমি চমকিয়া উঠিলাম ও সাবধান হইলাম। তখনই আমার নিজের ও সম্প্রদায়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। আজ পর্যন্ত সম্প্রদায় অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং অধিকতর বিবেচনা করিয়া অথবা নূতন অবস্থায় তাহার পরিবর্তন করিয়াছেন। এমনও হইয়াছে যে, গৃহীত প্রস্তাব সকলে মানিয়া চলেন নাই। প্রস্তাবের পরিবর্তন, প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াও পরে অস্বীকার করা ইত্যাদি বস্তু সারা জগতেই জনসাধারণের কার্যে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল প্রস্তাবে ঈশ্বরের নাম কেহ লন না। বাস্তবিক সত্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে একটি সঙ্কল্প ও ঈশ্বরের নামে লওয়া প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। যদি কোনও বুদ্ধিমান লোক বিচার করিয়া কিছু সঙ্কল্প করেন, তবে তাহা হইতে তিনি বিচ্যুত হইতে পারেন না। তাঁহার কাছে তাঁহার সঙ্কল্পের মূল্য ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করারই তুল্য। কিন্তু জগৎ তো আর তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে চলে না। সাধারণ সঙ্কল্প ও ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞার মধ্যে সমুদ্রের মত একটা ব্যবধান রহিয়াছে। সাধারণ সঙ্কল্প পরিবর্তন করিতে লোকে লজ্জিত হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি তাহা ভঙ্গ করিলে নিজেই লজ্জিত হন, সমাজও তাঁহাকে পাপী বলিয়া গণ্য করে। এই কাল্পনিক প্রভেদ এতই গভীর ভাবে মানুষের মনে শিকড় গাড়িয়াছে যে, আইন অনুসারেও শপথ করিয়া যে কথা বলা হয় তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে শপথকারীর অপরাধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয় এবং তাঁহার কঠিন শাস্তি হয়।

প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে এই সব চিন্তা তখন আমার মনে উদিত হইতেছিল। প্রতিজ্ঞার দ্বারা যে লাভ হয় তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমার ছিল। আর সেই জন্য শেঠ হাজি হবিবের মুখে শপথের কথা শুনিয়া আমি বিমূঢ় হইয়া গেলাম। ইহার পরিণাম সম্বন্ধে আমি মুহূর্ত মধ্যেই চিন্তা করিয়া লইলাম। বিমূঢ় ভাবের স্থলে অতঃপর উৎসাহের সৃষ্টি হইল। যদিও প্রথমে আমার প্রতিজ্ঞা লইতে অথবা অপরকে লওয়াইতে ইচ্ছা ছিল না, তথাপি শেঠ হাজি হবিবের প্রস্তাব আমি সাগ্রহে সমর্থন করিলাম। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার একথাও মনে হইল যে, সকলকে এই প্রতিজ্ঞার পরিণামের কথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, প্রতিজ্ঞার

অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝা চাই এবং উহা বুঝিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন বিলক্ষণ, আর যদি না পারেন তবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে লোকে এখনও অন্তিম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন নাই। এজন্য আমি সভাপতির নিকট অনুমতি লইলাম যে, শেঠ হাজি হবিবের প্রস্তাবের তাৎপর্য বুঝাইয়া দিতে চাই। তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া আমি দাঁড়াইলাম। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার মর্ম আজ যেমন মনে আছে তেমনি লিখিতেছি :

"আমি এই সভাকে একথা বুঝাইতে চাই যে এখানে এ পর্যন্ত আপনারা যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন ও যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত আজিকার প্রস্তাবের ও প্রস্তাব গ্রহণ করার রীতির পার্থক্য আছে। আজ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা সম্পূর্ণভাবে পালন করার উপর দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। আপনাদিগের নিকট ভাইসাহেব যে প্রস্তাব গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন, তাহা যেমন গুরুতর তেমনি নূতন। আমি নিজে এইভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে প্রস্তুত হইয়া সভায় আসি নাই। এই অভিনব প্রস্তাবের কৃতিত্ব শেঠ হাজি সাহেবেরই প্রাপ্য ও ইহার দায়িত্বভারও তাঁহারই উপর পড়ে। তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার প্রস্তাবের আমি ভূয়সী প্রশংসা করি। কিন্তু যদি আপনারা এই ভাবেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার দায়িত্বেও আপনারা অংশীদার হইবেন। এই দায়িত্ব কি তাহা আপনাদের বুঝা চাই। সম্প্রদায়ের সেবক ও পরামর্শদাতা হিসাবে উহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য।

"আমরা সকলে একই ভগবানকে মানি। তাঁহাকে মুসলমান খোদা বলিয়া ডাকেন, হিন্দু তাঁহাকে ঈশ্বর নামে ডাকিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি একই। তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া, তাঁহাকে মধ্যস্থ রাখিয়া আপনাদের প্রতিজ্ঞা লওয়া যে সে কথা নহে। যদি এই প্রকার প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহা ভঙ্গ করি, তবে সম্প্রদায়ের নিকট, জগতের নিকট ও ঈশ্বরের নিকট আমরা অপরাধী হইব। আমার মত এই যে, যে ব্যক্তি বুঝিয়া-শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করে, সে মনুষ্য নামের যোগ্য নহে। যেমন তামার পয়সায় পারা ঘষিলে তাহা টাকা হয় না ও এইরকম পারা ঘষা পয়সার যেমন কোনও মূল্যই নাই এবং এই মেকী টাকার মালিক ধরা পড়িলে যেমন সাজার পাত্র হয়, তেমনি মিথ্যা প্রতিজ্ঞা যে করে তাহার যে কেবল মূল্যই থাকে না তাহা নহে, সে ইহলোক ও পরলোক

উভয় লোকেই সাজার পাত্র হয়। এইরকম গুরুতর শপথ লওয়ার কথা শেঠ হাজি হবিব বলিতেছেন। এই সভায় কোন ছেলেমানুষ বা অবোধ ব্যক্তি নাই। আপনারা সকলেই বয়স্থ ও সংসার কি তাহা জানেন। আপনাদের অনেকে ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ এবং ছোট বড় নানারকম দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। সেই জন্য এই সভার একজন লোকও 'আমি না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলাম' একথা বলিয়া পার পাইতে পারিবেন না।

"আমি জানি যে, শপথ ব্রত ইত্যাদি বিশেষ অবস্থাতেই লওয়া হইয়া থাকে এবং লওয়া উচিতও। যে ব্যক্তি যখন-তখন প্রতিজ্ঞা করে, সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া ফেলে। কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবনে যদি কোনও অবস্থা প্রতিজ্ঞা হওয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করিতে হয়, তবে ইহাই সেই অবসর। খুব সাবধানে ও দ্বিধা সহকারে এই ধরনের গুরুতর শপথ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সাবধানতা ও দ্বিধার একটা সীমা আছে। আমরা এবারে সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছি। সরকার সভ্যতার সীমা পার হইয়া গিয়াছেন। যখন আমাদের চারিদিকেই দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন যদি এই ত্যাগের ব্রত আমরা না লই, তখনও যদি কিছু না করিয়া বসিয়া থাকি, তবে আমরা অযোগ্য ও ভীরু বলিয়া গণ্য হইব। সেইজন্য এই অবস্থা যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার মত, সে বিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা লওয়ার শক্তি ও যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহা স্বয়ং স্থির করিতে হইবে। এই ধরনের প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের মত দ্বারা গ্রহণ করা চলে না। যে যে ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই কেবল শপথ দ্বারা আবদ্ধ হইবেন। লোক দেখানোর জন্য এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে নাই। এই প্রতিজ্ঞার প্রভাব এখানকার সরকার, ভারত সরকার অথবা বিলাতের সরকারের উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে ইহা কেহই যেন না ভাবেন। প্রত্যেকেই নিজের বুকে হাত দিয়া হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। আর যদি অন্তরাত্মা জবাব দেয় যে শপথ লওয়ার শক্তি আছে, তবে শপথ গ্রহণ করুন। আর তাহা হইলেই সে শপথে ফল হইবে।

"এখন পরিণাম সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিব। খুব আশা করিয়াই একথা বলা যায় যে যদি সকলে নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন, যদি ভারতীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এই প্রতিজ্ঞা লন তবে এই আইন পাস হইবে না, হইলেও শীঘ্রই রদ হইবে। সম্প্রদায়ের বেশী দুঃখ সহ্য করিতে হইবে না এমনও হইতে পারে।

এমনও হইতে পারে যে, কিছুই সহ্য করিতে হইল না। কিন্তু যাঁহারা শপথ লইবেন তাঁহাদের কর্তব্য হইবে একদিক দিয়া আশা রাখা, আর অপর দিকে কোনও আশা না থাকিলেও শপথ লইতে প্রস্তুত হওয়া। সেই জন্য এই যুদ্ধে সবচাইতে কি দুঃখদায়ক পরিণাম ঘটিতে পারে, সে চিত্রও আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে এখানে আমরা যাঁহারা উপস্থিত আছি, বেশী করিয়া ধরিলেও সেই তিন হাজার লোক প্রতিজ্ঞা লইলাম। বাকী ১০,০০০ লোক প্রতিজ্ঞা লইলেন না এমনটাও হইতে পারে। ইহাতে প্রথমেই আমরা উপহাসের পাত্র হইব। আবার এখন যতই সাবধান করি না কেন, হইতে পারে ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম পরীক্ষাতেই বসিয়া পড়িবেন। আমাদিগকে জেলে যাইতে হইবে। জেলে গিয়া অপমান সহ্য করিতে হইতে পারে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করিতে হইতে পারে, উদ্ধত জেল-দারোগাদের নিকট মার খাইতে হইতে পারে। অর্থদণ্ড হইয়া মালপত্র ক্রোক হইয়া যাইতে পারে। যদি যোদ্ধা খুব কম হইয়া যায়, তবে আজ হাতে অনেক টাকা থাকিলেও পরে কাঙ্গাল হইয়া যাইতে পারি—নির্বাসন হইতে পারে; আবার ক্ষুধায়, জেলের কষ্টে কেহ পীড়িত হইয়া পড়িতে পারেন, কেহ মারাও যাইতে পারেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যত দুঃখ আপনারা কল্পনা করিতে পারেন সে সমস্ত আমাদের সহিত হইতে পারে। বিজ্ঞের কাজ হইবে এ সমস্তই এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু সহ্য করিতে হইবে এই প্রকার মানিয়া লইয়া প্রতিজ্ঞা করা। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই যুদ্ধের অবসান কখন হইবে, কেমন করিয়া হইবে, তবে বলিব যে যদি আমরা সকলে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া এই যুদ্ধে নামিয়া পড়ি ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই তবে যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি অনেকে ঝড়ের মুখে পলাইয়া যান, তবে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। কিন্তু একথা আমি সাহস করিয়া ও নিশ্চয়পূর্বক বলিতে পারি যে, যে পর্যন্ত মুষ্টিমেয় মানুষও প্রতিজ্ঞায় স্থির হইয়া থাকিবেন সে পর্যন্ত এই লড়াইয়ের একটিমাত্র অন্তিম ফলই হইতে পারে এবং তাহা হইতেছে জয়লাভ।

"এখন আমার নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। আমি যেমন আপনাদিগকে প্রতিজ্ঞা লওয়ার বিপদের কথা বলিতেছি, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা লইতেও আহ্বান করিতেছি। ইহাতে আমার দায়িত্বও আমি পুরাপুরি বুঝিতেছি। এমন হইতে পারে যে, আজিকার আবেগে, উৎসাহে অনেক

লোক প্রতিজ্ঞা লইলেন, আর বিপদের সময় তাঁহারা দুর্বল হইয়া হটিয়া গেলেন। কেবল সামান্য সংখ্যক লোক শেষ পর্যন্ত দুঃখ-তাপ সহ্য করার জন্য রহিয়া গেলেন। তাহা হইলেও আমার চোখের সম্মুখে একটিমাত্র রাস্তা আছে—আমি মরিব তবু ঐ আইন মানিব না। আমি তো একথাও বলি যে আপনারা ধরিয়া লউন—অবশ্য এমন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবুও ধরিয়া লউন—যে সকলেই ছাড়িয়া গেলেন, আমি একাই রহিলাম। তাহা হইলেও আমার শপথ ভঙ্গ হইবে না। ইহা আমি নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারি। ইহা বলার হেতুও বুঝিয়া লইবেন। আমি অভিমানের বশে একথা বলিতেছি না। প্রধানতঃ যাঁহারা নেতৃস্থানীয়, যাঁহারা এই মঞ্চে বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে সাবধান করার জন্যই বলিতেছি। মাত্র একজনে গিয়া ঠেকিলে সঙ্কল্পে স্থির থাকিবার শক্তি থাকিবে না বলিয়া যদি আপনারা মনে করেন, তবে আপনাদের এই প্রতিজ্ঞা লওয়া উচিত হইবে না। যদি লোকের নিকট হইতে এই প্রস্তাব অনুযায়ী শপথ লওয়ানো হইতে থাকে, তবে আপনাদের অসম্মতির কথাও তাহাদিগকে জানানো হইবে এবং আপনারা নিজেরাও যেন সম্মতি না দেন। আমরা সকলে একত্র হইয়া এই প্রতিজ্ঞা লইতেছি তাহার অর্থ এমন নয় যে, সকলে যদি প্রতিজ্ঞা পালন না করেন, অনেকেই যদি ত্যাগ করেন, তবে বাকি যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা বন্ধন-মুক্ত হইয়া পড়িবেন। নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণ বুঝিয়া আলাদা আলাদা প্রতিজ্ঞা লওয়াই উচিত হইবে। অপরে যাহা খুশী করুক, তবুও নিজের মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা পালন করিব—একথা বুঝিয়া লওয়া চাই।"

এই প্রকার বলিয়া আমি বসিলাম। লোকে অতিশয় শান্তির সহিত আমার প্রতিটি শব্দ শুনিলেন। অন্য নেতারাও বক্তৃতা করিলেন। সকলেই নিজের দায়িত্ব ও শ্রোতাদের দায়িত্বের কথা বলিলেন। সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইলেন। তিনি সকলকে বুঝাইলে পরে সভায় সকলে দাঁড়াইয়া হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আইন পাস হইলেও তাহা স্বীকার না করার জন্য প্রতিজ্ঞা লইলেন। সেই দৃশ্য আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। লোকের উৎসাহের শেষ ছিল না। পরের দিন এই নাট্যশালা আকস্মিকভাবে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। তৃতীয় দিনে আমার নিকট এই সংবাদ আনিয়া দিয়া একজন বলিলেন যে নাট্যশালা পুড়িয়া যাওয়া শুভচিহ্ন। যেমন নাট্যশালা ভস্ম হইয়াছে, এই আইনও তেমনি ভস্ম হইয়া যাইবে। এই ধরনের তথাকথিত

শুভচিহ্ন আমার উপর কোনও দিন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, সেই জন্য আমি এ বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ করিলাম না। লোকের শৌর্য ও বিশ্বাস হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য এ কথার উল্লেখ করিলাম। এই উভয় গুণের অনেক পরিচয় পাঠক পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পাইবেন।

এই মহতী সভা হওয়ার পর ভারতীয়েরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। নানাস্থানে সভা হইতে লাগিল এবং সর্বত্রই সর্বসম্মতি অনুসারে শপথ লওয়া হইতে লাগিল। এখন হইতে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' প্রধান আলোচনার বিষয়ই হইল ঐ কালা কানুন। অন্য দিক দিয়া সরকারের সহিত দেখা করার জন্যও ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এই বিষয় লইয়া উপনিবেশের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ডানকানের নিকট এক প্রতিনিধি দল গেল। তাঁহাকে আমাদের শপথ ও অন্যান্য বিষয়ের কথা বলা হইল। শেঠ হাজি হবিব এই প্রতিনিধি দলের একজন সভ্য ছিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি কোনও রাজকর্মচারী আসিয়া আমার স্ত্রীর টিপসই লইতে উদ্যত হন, তবে তাহা আমার পক্ষে অসহ্য। আমি সেইখানেই তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে মরিব।" মন্ত্রী মহাশয় ক্ষণকাল শেঠজীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, "এই আইন স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইবে কিনা তাহা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু এখনই আমি দৃঢ়তা সহকারে একথা বলিতে পারি যে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে শর্তগুলি পরিত্যাগ করা হইবে। এ বিষয়ে আপনাদের মনোভাব সরকার বুঝিতে পারেন এবং তাহার সম্মানও করেন। কিন্তু আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে অন্যান্য বিষয়ে সরকার দৃঢ় হইয়া আছেন এবং থাকিবেন। আপনারা ভাল করিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া এই আইন মানিয়া লউন—ইহা জেনারেল বোথার ইচ্ছা। গোরাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সরকার এই আইন আবশ্যক বোধ করিতেছেন। এই আইন বজায় রাখিয়া উহার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে যদি কোনও কিছু প্রস্তাব থাকে, তবে সরকার তাহা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন। প্রতিনিধি দলকে আমি এই পরামর্শ দিই যে, আইন স্বীকার করিয়া লইয়া উহার খুঁটিনাটির ব্যাপারে কোন অসুবিধা থাকিলে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করুন এবং তাহা হইলেই আপনাদের হিত হইবে।" মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত যে সকল আলোচনা হইয়াছিল তাহা এখানে লিখিলাম না, কেননা সে সকল যুক্তি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। যুক্তি সেই পুরাতন, কেবল মন্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় হয়ত কিছু তারতম্য হইয়া

থাকিবে। প্রতিনিধি দল তাঁহাকে জানাইল যে তাঁহার উপদেশ সত্ত্বেও তাঁহাদের ঐ আইন স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব। স্ত্রীলোকদিগকে বাদ দেওয়া হইবে শুনিয়া সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়া প্রতিনিধি দল প্রত্যাবর্তন করিল। একথা বলা শক্ত যে স্ত্রীলোকদিগকে বাদ দেওয়ার এই কথা সম্প্রদায়ের আন্দোলনের ফল, না সরকার নিজেই দ্বিতীয়বার চিন্তা করিয়া শ্রীযুক্ত কার্টিসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক ব্যবহার পদ্ধতির পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকার-পক্ষ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সম্প্রদায়ের আন্দোলনের জন্য এ পরিবর্তন হয় নাই, স্বাধীন ভাবেই সরকার এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, সম্প্রদায় কাকতালীয় ন্যায় অনুসারে মানিয়া লইলেন যে, উহা কেবল সম্প্রদায়ের আন্দোলনেরই ফল এবং তাঁহাদের যুদ্ধের উৎসাহ বাড়িয়া গেল।

সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনকে কি নামে অভিহিত করা যায় তাহা আমি জানিতাম না। এই সময় আমি এই আন্দোলনকে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স নামে অভিহিত করিয়াছিলাম। প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের সম্পূর্ণ মর্ম আমি এই সময় জানিতাম না এবং বুঝিতাম না। একটা নূতন জিনিসের জন্ম হইয়াছে ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যুদ্ধ যতই বাড়িয়া যাইতে লাগিল ততই নাম লইয়া গোল বোধ হইতে লাগিল এবং এই মহান সংগ্রামকে ইংরাজী নামে অভিহিত করিতে আমার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এই বিজাতীয় বাক্যটি সম্প্রদায়ের মুখে চলাও কঠিন। সেইজন্য এই যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা ভাল নাম যিনি বাছিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে সামান্য কিছু পারিতোষিক দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলাম। উহাতে কতকগুলি নাম পাওয়া গেল। এই সময় এই যুদ্ধের রহস্য লইয়া আমি ভাল রকমেই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' চর্চা করিতেছিলাম। সেইজন্য সকলেই নাম দেওয়ার মত ধারণার সহিত পরিচিত ছিলেন।

মগনলাল গান্ধীও এই প্রতিযোগিতায় নামিয়াছিলেন। তিনি 'সদাগ্রহ' নামটি পাঠাইয়াছিলেন। এই শব্দ পছন্দ করা হইল এবং পছন্দ করার কারণ তাঁহাকে জানাইয়া লিখিলাম যে সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন একটা বিশেষ আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই আগ্রহ সৎ অথবা শুভ, সেইজন্য ঐ নাম পছন্দ করা হইল। আমি যুক্তির সারাংশ সংক্ষেপেই লিখিলাম। আমি এই নাম পছন্দ করিলেও আমি যাহা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছি তাহার সবটা ইহার ভিতরে

ছিল না। সেইজন্য সদ্‌-এর ‘দ্‌’কে ‘ৎ’ করিয়া তাহার সহিত একটা য-ফলা যোগ দিয়া ‘সত্যাগ্রহ’ শব্দ তৈরী করিলাম। সত্যের মধ্যে প্রেমেরও সমাবেশ রহিয়াছে। আর কোনও বস্তুর আগ্রহ করিলে তাহাতে বলও উৎপন্ন হয়। সেই হেতু আগ্রহ শব্দের ভিতর শক্তির সমাবেশ রহিয়াছে। এইভাবে ভারতীয়দের এই আন্দোলনকে আমি সত্যাগ্রহ অর্থাৎ সত্য ও প্রেম বা অহিংসা হইতে জাত শক্তি নামে অভিহিত করিলাম। প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স নামটি অতঃপর পরিত্যাগ করা হইল। এমন কি ইংরাজীতেও অনেক সময়েই প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের বদলে সত্যাগ্রহ কিংবা ঐ অর্থসূচক অন্য কোনও শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলাম। এমনি করিয়া যে আন্দোলনকে আমরা সত্যাগ্রহ বলিয়া জানি, তাহার জন্ম। আমাদের ইতিহাসের গতিপথে আর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স ও সত্যাগ্রহের প্রভেদ জানিয়া লওয়া দরকার। সেইজন্য পরের অধ্যায়ে এই পার্থক্যের আলোচনা করা যাইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সত্যাগ্রহ ও প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স

আন্দোলন যেমন বাড়িতে লাগিল তেমনি ইংরাজেরাও ইহাতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। একথাও জানানো দরকার যে, যদিও ট্রান্সভালের ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহের বেশীর ভাগই কালা কানুনের পক্ষপাতী ছিলেন ও ইংরাজদের সাহায্য করিতেন, তথাপি যদি কোন পরিচিত ভারতীয় উহাতে কোনও লেখা পাঠাইতেন, তবে তাহাও তাঁহারা আগ্রহের সহিত ছাপাইতেন। সরকারের নিকট যে সকল দরখাস্ত ভারতীয়েরা পাঠাইতেন তাহাও পুরাপুরি ছাপিতেন, অন্ততঃ একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তো বাহির করিতেনই। যখন বড় সভা করা হইত তখন কখনও কখনও তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইতেন, আর তাহা না হইলে আমরা যে রিপোর্ট পাঠাইতাম সংক্ষিপ্ত হইলে তাহাও প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের এই প্রকার সুবিবেচনা সম্প্রদায়ের খুব সহায়ক হইয়াছিল। আন্দোলন বাড়িলে অনেক গোরাও ইহাতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। এই গোরাদের মধ্যে জোহানস্‌বার্গের শ্রীযুক্ত হস্কিন নামে একজন

অধ্যাধিপতি ছিলেন। ইহার মনে প্রথম হইতেই বর্ণ-বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই ইনি ভারতীয়দের প্রশ্নে বেশী করিয়া মন দিয়াছিলেন। জার্মিস্টন নামে জোহানস্‌বার্গের শহরতলীর মত একটা পাড়া আছে। সেই স্থানের গোরারা আমার কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সভা করা হইল। শ্রীযুক্ত হস্কিন সভাপতি হইলেন, আমি বক্তৃতা করিলাম। এই সভায় শ্রীযুক্ত হস্কিন এই আন্দোলনের ও আমার পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন, "ন্যায্য অধিকার পাওয়ার অন্য সকল উপায় নিষ্ফল হওয়াতে ট্রান্সভালে ভারতীয়রা প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতীয়দের ভোটের অধিকার নাই। ইহারা সংখ্যায় কম। ইহারা দুর্বল ও ইহাদের নিকট অস্ত্র নাই। সেইজন্যই দুর্বলের অস্ত্র স্বরূপ 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' অবলম্বন করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ফলে আমার যে বক্তৃতা দিবার কথা, তাহা ভিন্ন আকার ধারণ করিল। সেখানে শ্রীযুক্ত হস্কিনের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া আমি ইহাকে আত্মিক বল বলিয়া পরিচিত করিলাম। এই সভাতেই আমি দেখিলাম যে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স শব্দের ব্যবহার দ্বারা ভয়ানক ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। এই সভাতে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স ও আত্মিক বলের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স—এই বাক্যটি ইংরাজী ভাষায় প্রথম ব্যবহার কে কখন করিয়াছিলেন তাহা আমার জানা নাই। ইংরাজদের মধ্যে যখন সংখ্যালঘু কোনও গোষ্ঠী কোনও আইনকে অপছন্দ করেন তখন তাঁহারা বিদ্রোহ না করিয়া সেই আইন না মানার জন্য 'প্যাসিভ' অর্থাৎ মৃদুতর পথ অবলম্বন করেন এবং তাহার জন্য শাস্তি লওয়া পছন্দ করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন পার্লামেন্টে শিক্ষা সম্বন্ধে আইন পাস করা হয়, তখন 'নন্‌কন্‌ফরমিস্ট' নামে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ডাক্তার ক্লিফোর্ডের নেতৃত্বে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স অবলম্বন করেন। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা ভোটের অধিকারের জন্য যে বিরাট আন্দোলন করিয়াছিলেন, উহাও প্যাসিভ-রেজিস্টান্স নামে পরিচিত। এই উভয় আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীযুক্ত হস্কিন জানান যে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স দুর্বলের এবং যাঁহাদের ভোটাধিকার নাই তাঁহাদের অস্ত্র। ডাক্তার ক্লিফোর্ডের পক্ষের ভোটাধিকার থাকিলেও পার্লামেন্টের কমন্স সভায় তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য

না থাকায় শিক্ষা আইন পাস করা তাঁহারা বন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষ সংখ্যা-শক্তিতে দুর্বল। তাঁহারা অস্ত্র ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এমন নয়, কিন্তু অস্ত্র ব্যবহারে তাঁহাদের কার্য উদ্ধার হইত না। সুব্যবস্থিত শাসনতন্ত্রের হঠাৎ প্রত্যেক সময়েই বিদ্রোহ করিয়া বসিলে কাজ উদ্ধার হয় না। আবার অস্ত্র ব্যবহারের দ্বারা কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও ডাক্তার ক্লিফোর্ডের পক্ষের কতকগুলি লোক অস্ত্র ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্ত্রীলোকদিগের আন্দোলনেও তাঁহাদের যে ভোটাধিকার ছিল না এবং তাঁহারা যে সংখ্যায় ও শারীরিক বলে দুর্বল, ইহাই শ্রীযুক্ত হস্কিনের যুক্তির পক্ষে ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোক-দিগের আন্দোলনে অস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক দল বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছিলেন ও পুরুষদিগকেও আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে কাহাকেও খুন করিতে চাহিয়াছিলেন এরূপ আমি মনে করি না। কিন্তু সুবিধা হইলে মার দেওয়া যাইতে পারে এবং এইভাবে প্রতিপক্ষকে বিরক্ত করা যাইতে পারে, এরূপ মনোভাব তাঁহাদের ছিল।

কিন্তু ভারতীয়দের এই আন্দোলনের কোথাও, কোনও অবস্থাতেই পশুবল প্রয়োগের স্থান নাই। পাঠকেরা অতঃপর দেখিতে পাইবেন যে, কঠিন দুঃখভোগ করিয়াও সত্যাগ্রহীরা শারীরিক বলপ্রয়োগ করেন নাই—যে অবস্থায় বলপ্রয়োগ করিয়া কাজ হইত, সে অবস্থাতে পড়িয়াও বলপ্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ ভারতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না ও তাঁহাদের অস্ত্রবল ছিল না, এই দুই কথা সত্য হইলেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনার সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই। অবশ্য একথা আমি বলিতে চাই না যে ভারতীয়দের মতাধিকার অথবা অস্ত্রবল থাকিলেও তাঁহারা সত্যাগ্রহ করিতেন। ভোটের অধিকার থাকিলে বেশীর ভাগ স্থানে সত্যাগ্রহের আবশ্যকতাই হয় না। আর যদি অস্ত্রবল থাকিত, তবে অপর পক্ষ অবশ্যই সাবধান হইয়া চলিতেন। সেই জন্য অস্ত্রবলে বলীয়ানের সত্যাগ্রহ করার অবকাশ কমই উপস্থিত হয়। আমার বক্তব্য এই যে, ভারতীয়দের আন্দোলনের পরিকল্পনাকালে অস্ত্রবল ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা আছে কি নাই—এ প্রকার প্রশ্ন যে আমার মনেই উঠে নাই, একথা আমি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি। সত্যাগ্রহ আত্মিক বল। যেখানে যে পরিমাণে অস্ত্রবল বা শরীরিক বল অর্থাৎ পশুবলের প্রয়োগ হয়, সেখানে সেই পরিমাণে আত্মিক বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আমার মতে এই দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তি। আন্দোলন আরম্ভ করার সময়েই একথা আমার হৃদয়ে

সম্পূর্ণরূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

আমার এই মত ঠিক কি ভুল সে কথার বিচার এখানে করিব না। আমি কেবল সত্যাগ্রহ ও প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে কি প্রভেদ তাহাই বুঝাইতে চাহিতেছি। ইহা হইতে দেখা যায় যে, উভয় শক্তির মধ্যে প্রচণ্ড ও মূলগত ভেদ রহিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই উভয়ের ভিতরের প্রভেদ না বুঝিয়া যাঁহারা নিজদিগকে 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যার' বা 'সত্যাগ্রহী' বলিয়া থাকেন এবং উভয়কেই এক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অন্যায় করেন এবং ইহার পরিণামও খারাপ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' শব্দ ব্যবহার করায় লোকে আমাদিগকে সেই সাফ্রেজিট স্ত্রীলোকদিগের মত সাহস বা আত্মত্যাগের অধিকারী বলিয়া প্রশংসা করিত না, বরঞ্চ সেই স্ত্রীলোকদিগের মত অপরের ধনপ্রাণের লোকসান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি বলিয়া মনে করিত। শ্রীযুক্ত হস্কিনের মত উদারচিত্ত অকপট মিত্রও আমাদিগকে দুর্বল মনে করিতেন। মানুষ নিজেকে যেমন মনে করে ক্রমে তাহাই হইয়া যায়, এ কথাটায় সার আছে। যদি আমরা নিজেরা একথা মনে করি ও অপরকে মনে করিতে দিই যে, আমরা দুর্বল বলিয়াই প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইলে আমাদের প্রতিরোধ দ্বারা আমরা আমাদের শক্তি বাড়াইতে পারিব না এবং যখনই সুবিধা হইবে তখনই এই দুর্বলের অস্ত্র আমরা বর্জন করিব। কিন্তু যদি আমরা সত্যাগ্রহী হই এবং নিজদিগকে সবল মনে করিয়া সত্যাগ্রহের অস্ত্র ব্যবহার করি, তাহা হইলে ইহা হইতে দুইটি পরিষ্কার ফল হইতেই হইবে। আমরা বলবান—এই বিশ্বাসে দিন দিন বল বাড়িয়া যাইতে থাকিবে এবং যেমন আমাদের শক্তি বাড়িতে থাকিবে তেমনি সত্যাগ্রহের তেজও বাড়িতে থাকিবে। আর এই শক্তি যত বাড়িবে ততই ইহা পরিত্যাগ করার পথ খুঁজিতে ইচ্ছা হইবে না। আবার 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সে' যেমন প্রেম ভাবের স্থান নাই, তেমনি সত্যাগ্রহে বৈর ভাবেরও স্থান নাই। বরঞ্চ বৈর ভাব পোষণ করাই সত্যাগ্রহে অধর্ম। প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সে সুযোগ মত অস্ত্রবল প্রয়োগ করা চলে। সত্যাগ্রহে অস্ত্র প্রয়োগের অতীব উত্তম অবকাশ উপস্থিত হইলেও তাহা সর্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য। অনেক সময় প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স অস্ত্রবল প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত করে। সত্যাগ্রহ সেভাবে ব্যবহার করাই যায় না। প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স পশুবলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। সত্যাগ্রহ অথবা আত্মিকবল এবং অস্ত্রবল একে অন্যের বিরোধী বলিয়া এই দুই বল একসঙ্গে প্রয়োগ করা যায় না। সত্যাগ্রহ একান্ত

অন্তরঙ্গ প্রীতিভাজনদের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে পারে কিন্তু প্রীতিভাজনকে বৈরী বলিয়া গণ্য না করা পর্যন্ত তাঁহার প্রতি প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স প্রয়োগ করা চলে না। প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সে বিরুদ্ধ পক্ষকে সর্বদা উত্যক্ত করার কল্পনা রহিয়াছে এবং সেই উত্যক্ত করিতে গিয়া নিজে যদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তবে তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। পক্ষান্তরে সত্যাগ্রহে বিরুদ্ধ পক্ষকে আঘাত দেওয়ার চিন্তামাত্র করারও স্থান নাই। সত্যাগ্রহে স্বয়ং দুঃখ সহ্য করিয়া, দুঃখ বহন করিয়াই বিরোধীকে জয় করার ভাব থাকা চাই।

এই দুই শক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখাইলাম। তবে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের যে সকল গুণ অথবা দোষ আমি দেখাইলাম, তাহা যে প্রত্যেক প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সেই দেখা যাইবে এমন কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের বহু নিদর্শনেই ঐ দোষগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, একথা বলিতে পারি। পাঠকদিগকে আমি একথাও জানাইতে চাই যে, যীশুখ্রীষ্টকে অনেক খ্রীষ্টান প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের আদি নেতা বলিয়া গণ্য করেন। সেস্থলে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স মানে সত্যাগ্রহই জানিতে হইবে। এই অর্থে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। টলস্টয় রাশিয়ার যে 'ডুখোবর'দিগের প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের উদাহরণ দিয়াছেন তাহা এই জাতীয় 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' বা সত্যাগ্রহ। যীশুখ্রীষ্টের পর হাজার হাজার খ্রীষ্টান যে অত্যাচার সহ্য করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় নাই। এজন্য আমি তাঁহাদের সেই সব নির্মল উদাহরণকে সত্যাগ্রহ বলিয়াই পরিচিত করাইব। আর উহাকে যদি 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের' নমুনা বলা হয়, তবে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সে ও সত্যাগ্রহে কোনও ভেদ থাকে না। এই অধ্যায়ে আমি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইংরাজী ভাষায় 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' বাক্যটি যে অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, সত্যাগ্রহ তাহা হইতে মূলতঃ ভিন্ন।

প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার সময়, যাঁহারা উহা অবলম্বন করেন তাঁহাদের প্রতি যাহাতে অবিচার করা না হয়, সেজন্য আমি সকলকে সাবধান করিয়াছি। আবার তেমনি একথাও জানানো দরকার যে, সত্যাগ্রহের গুণ বর্ণনাকালে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা সত্যাগ্রহী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই সত্যাগ্রহের বর্ণিত গুণের অধিকারী— এমন কথা আমি বলিতেছি না। একথা আমার অজ্ঞাত নয় যে যাঁহারা

সত্যাগ্রহী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেই সত্যাগ্রহের গুণাবলীর সহিত সম্পর্ক রাখেন না। অনেকেই ইহাও মনে করেন যে, সত্যাগ্রহ কেবল দুর্বলেরই অস্ত্র। অনেকের মুখ হইতে আমি একথাও শুনিয়া থাকি যে সত্যাগ্রহ অস্ত্রবলের জন্য তৈরী হওয়ার পথ মাত্র। সুতরাং আমাকে আবারও একথা বলিতে হইতেছে যে, সত্যাগ্রহীদের বর্তমান অবস্থা কেমন একথা আমি জানাইতে চাহি না। সত্যাগ্রহের কল্পনা কি এবং সেই অনুযায়ী সত্যাগ্রহীকে কেমন হইতে হইবে তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ট্রান্সভালের ভারতীয়দের আন্দোলনকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য এবং যাহাতে ইহাকে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স নামে পরিচিত শক্তির সহিত এক বলিয়া ভুল না করা হয়, সেজন্য ইহার একটি নূতন নামকরণ করিতে হয়। ঐ নামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বরূপ সে সময় কি কি আদর্শের সমাবেশ উহাতে করিতে হইয়াছিল, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিলাতে প্রতিনিধি দলে

সেই কালা কানুনের প্রতিকারের জন্য স্থানীয় সরকারের নিকট আবেদনপত্র পাঠানো ইত্যাদি ট্রান্সভালে যাহা কিছু করার দরকার ছিল তাহা করা হইয়াছিল। ট্রান্সভালের বিধানসভায় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রযোজ্য অংশ পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। বাকিটা খসড়া অর্ডিন্যান্স যেমন ছিল প্রায় সেই ভাবেই পাস হইয়া আইন হইয়া যায়। সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময় খুব সাহস ছিল। আবার ভেদভাব ভুলিয়া সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতায় একমত হইয়াছিল। এইজন্য কেহই নিরাশ হয় নাই। তাহা হইলেও প্রতিকারের যে সকল বৈধানিক উপায় ছিল তাহার কোনটাই যে বাদ দেওয়া হইবে না, পূর্বেকার সেই প্রস্তাবের অনুসরণ করাও স্থির ছিল। ট্রান্সভাল এই সময়ে 'ক্রাউন কলোনি' বলিয়া গণ্য হইত। এই উপনিবেশের আইন ও শাসন-ব্যবস্থার জন্য বিলাতের ইম্পিরিয়াল বা সম্রাটের সরকার দায়ী। এই উপনিবেশের বিধানসভায় যে সকল আইন পাস হয় তাহা রাজার সম্মতির জন্য

পাঠানো হয়। রাজার সম্মতি কেবল একটা রীতি ও নিয়মরক্ষার খাতিরেই লওয়া হইত না, মন্ত্রীমণ্ডলের পরামর্শ মত রাজা যে সকল আইন ব্রিটিশ সংবিধানের বিরোধী তাহাতে সম্মতি দিতে অস্বীকার করতে পারিতেন এবং তদ্রূপ করার দৃষ্টান্তও আছে। ইহার বিপরীত অবস্থা দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা শাসিত উপনিবেশসমূহে প্রচলিত ছিল। সেখানকার বিধানসভা যে আইন পাস করেন প্রায়শঃ তাহা কেবল নিয়মরক্ষার জন্যই সম্রাটের সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইত।

সম্প্রদায়ের নিকট আমি নিবেদন করিলাম যে বিলাতে প্রতিনিধি দল পাঠাইলে তাঁহাদের দায়িত্ব কি পরিমাণ বাড়ে তাহা সম্প্রদায়কে আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। সেইজন্য আমাদের এসোসিয়েশনের নিকট আমি তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করি। প্রথমতঃ সেদিন যে নাট্যশালার সভায় শপথ গ্রহণ করা সত্ত্বেও পুনরায় প্রধান প্রধান ভারতীয়দের সেই মর্মে ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। কাহারও মনে যদি সন্দেহ অথবা দুর্বলতা আসিয়া থাকে তবে তাহা জানা যাইবে। এই প্রস্তাব করার একটি কারণ স্বরূপ এই কথা বলিলাম যে প্রতিনিধি দল যদি সত্যাগ্রহের শক্তির সমর্থনে যায়, তাহা হইলে নির্ভয় হইবে এবং সেই নির্ভয়তার জোরেই নিজেদের শপথের কথা বিলাতের উপনিবেশ সচিব ও ভারত সচিবকে জানাইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিনিধি দলের ব্যয়নির্বাহের সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই করা চাই। তৃতীয় প্রস্তাব ছিল এই যে প্রতিনিধি দলে যত কম লোক পাঠানো যায় তাহাই ভাল। একটা ধারণা আছে যে প্রতিনিধি দলে অধিক লোক গেলে অধিক উপকার হইবে। সেইজন্যই এই প্রস্তাব করার আবশ্যকতা ছিল। এ ভাবটাও এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, প্রতিনিধি দলে যিনি যাইবেন তিনি নিজের মানের জন্য যাইতেছেন না, একাগ্রচিত্তে এই আদর্শের রূপায়ণের জন্য কাজ করিবেন বলিয়াই যাইতেছেন। তিনটি প্রস্তাবই গ্রাহ্য হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞার স্বাক্ষর লওয়া হয়। অনেকে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম যে, যাঁহারা সভায় মৌখিক শপথ লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বাক্ষর করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। যে প্রতিজ্ঞা একবার লওয়া হইয়াছে পঞ্চাশবার তাহা লইতে দ্বিধার কোন কারণ নাই। তাহা হইলেও একথা কে না জানেন যে, লোকে বিবেচনা করিয়া শপথ লওয়ার পরেও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং মুখে যে শপথ লইয়াছে তাহা লিখিয়া দিতে

সঙ্কোচ বোধ করে। প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ হয়। সবচাইতে মুশকিল হয় প্রতিনিধি নির্বাচন লইয়া। আমার নাম তো ছিলই, কিন্তু আমার সহিত আর কে যাইবেন? ইহা স্থির করিতে কমিটির অনেক সময় গেল। কয়েক রাত্রিও কাটিল এবং সমাজের মধ্যে যে সকল দোষ আছে আমরা তাহারও সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। কেহ কেহ বলিলেন যে আমি একা গেলেই সব গোল চুকিয়া যায়। আমি ইহাতে পরিষ্কারভাবে অসম্মতি জানাই। সাধারণতঃ একথা বলা যায় যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ে নামমাত্রও ভেদ ছিল না একথা বলা যায় না। তবে এই ভেদ যে বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই তাহার কতকটা কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষ পরিস্থিতি। কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা প্রধান ও নিশ্চিত কারণ হইতেছে এই যে ভারতীয়দের নেতারা একনিষ্ঠার সহিত ও অকপটে নিজেদের কর্তব্য করিতেছিলেন এবং চমৎকারভাবে সম্প্রদায়কে পরিচালিত করিতেছিলেন। আমি পরামর্শ দিলাম যে আমার সহিত একজন মুসলমান ভদ্রলোকেরও থাকা চাই এবং দুইজনের বেশী লোক যাওয়ার দরকার নাই। তখন হিন্দুদের দিক হইতে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব আসিল যে, আমি তো সমগ্র সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। সেইজন্য হিন্দুদের বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যও একজন থাকা চাই। কেহ কেহ ইহাও বলিলেন যে, প্রতিনিধি দলে একজন কোঙ্কনী মুসলমান ও মেমনদের দিক হইতে একজন আর হিন্দুদের ভিতর হইতে একজন পাটিদার ও একজন অনাভলা থাকা সঙ্গত। এই প্রকার নানা দাবি করার পর সকলে বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করিলেন এবং হাজি উজীর আলী ও আমি যথারীতি নির্বাচিত হইলাম।

হাজি উজীর আলীকে অর্ধেক মালয়ী বলিয়া ধরা যায়। তাঁহার পিতা ভারতীয় মুসলমান ও মাতা মালয়বাসী ছিলেন। তাঁহার মাতৃভাষা ডচ্ বলা যাইতে পারে। তিনি ইংরাজীও এরূপ জানিতেন যে ইংরাজী ও ডচ্ সমান বলিতে পারিতেন। তিনি ইংরাজীতে অবাধে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সংবাদপত্রে চিঠি লিখিবার কলাও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন এবং দীর্ঘদিন হইতেই জনসেবার কার্য করিতেছিলেন। হিন্দুস্থানীও খুব ভাল বলিতে পারিতেন।

আমরা দুইজনে বিলাত পৌঁছাইয়াই কাজে লাগিয়া গেলাম। মন্ত্রীর নিকট আবেদনপত্র স্টীমারেই তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলাম, উহা ছাপাইয়া ফেলিলাম।

লর্ড এলগিন উপনিবেশ সচিব ছিলেন। লর্ড মর্লি ছিলেন ভারত সচিব। আমরা গিয়া ভারতবর্ষের দাদাভাই-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহার মারফতে কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সহিত মিলিত হইলাম। কমিটিকে আমাদের মামলার কথা বলিলাম এবং জানাইলাম যে, আমরা সকল পক্ষকেই সঙ্গে লইয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। দাদাভাইও এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহা কমিটির পছন্দ হইল। এই জন্য স্যার ম্যাঞ্চরজী ভবনাগরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাদিগকে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ও দাদাভাই-এর পরামর্শ ছিল যে লর্ড এলগিনের নিকট প্রতিনিধি দল লইয়া যাইবার সময় একজন নিরপেক্ষ খ্যাতনামা ইঙ্গ-ভারতীয় যেন সেই দলে থাকিয়া আমাদের তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন। স্যার ম্যাঞ্চরজী কতকগুলি নাম দিলেন। তাহার মধ্যে স্যার লেপেল গ্রিফিনের নাম ছিল। এই সময়ে স্যার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার জীবিত ছিলেন না। তিনি বর্তমান থাকিলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা তিনি ভাল রকম জানিতেন বলিয়া তিনিই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিতেন, অথবা তিনিই লর্ডদিগের মধ্য হইতে কোন প্রতিপত্তিশালী নেতা বাছিয়া দিতেন।

আমরা স্যার লেপেল গ্রিফিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছিল, তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি খুব অনুরাগ দেখাইলেন। তিনি আমাদের প্রতিনিধি দলের প্রধান হইতে স্বীকার করিলেন। কেবল ভদ্রতার খাতিরে নয়, আমাদের আদর্শ ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থ—এই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়াই তিনি প্রস্তাবে সম্মত হন। সমস্ত কাগজপত্র পড়িয়া তিনি সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইলেন। আমরা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, কমন্স সভার সভ্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত দেখা করিলাম। লর্ড এলগিনের নিকটও প্রতিনিধি দল গেল। তিনি মনোযোগ দিয়া সব কথা শুনিলেন, তাঁহার সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার নিজের অসুবিধার কথা জানাইয়া তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। প্রতিনিধি দল লর্ড মর্লির সহিতও দেখা করিল। তিনিও সমবেদনা জানাইলেন। তাঁহার কথা আমি আন্যত্র বলিয়াছি। স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণের চেষ্টায় কমন্স সভার ভারতীয় ব্যাপার বিষয়ক কমিটির এক সভা কমন্স গৃহের ড্রইংরুমে বসে। সেখানেও আমাদের বক্তব্য যথাশক্তি বুঝাইয়া বলিলাম। এই সময় আইরিশ পক্ষের

নেতা ছিলেন মিঃ রেডমণ্ড, তাঁহার সহিতও আমরা দেখা করি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে দলমত নির্বিশেষে কমন্স সভার যে সকল সদস্যের সহিত দেখা করা যাইতে পারে তাঁহাদের সহিত আমরা দেখা করিয়াছিলাম। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সাহায্য আমরা খুব পাইয়াছিলাম। কিন্তু বিলাতের রীতি অনুসারে এই কমিটিতে বিশেষ এক দলের বিশেষ মতের লোকই ছিলেন। কিন্তু এমন অনেকেরও সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল যাঁহারা এই কমিটির সহিত যুক্ত ছিলেন না। ইহাদের সকলের সমবেত সহায়তা পাওয়া গেলে আমাদের স্বার্থরক্ষার সহায়ক হইবে বিবেচনা করিয়া আমরা একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করা স্থির করিলাম। সকল দলের লোকেরই ইহা পছন্দ হইল।

সকল প্রতিষ্ঠানই সেক্রেটারী বা সম্পাদকের উপর নির্ভর করে। সম্পাদক এমন লোক হওয়া চাই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি যাঁহার পূর্ণ আস্থা আছে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যে তিনি একরকম সমস্ত সময় দিতে প্রস্তুত থাকিবেন। ইহার সহিত অবশ্য তাঁহার কর্মক্ষমতাও থাকা চাই। শ্রীযুক্ত রিচ পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ছিলেন ও আমার অফিসে আর্টিকেল ছিলেন। ইনি এক্ষণে লণ্ডনে ব্যারিস্টারী অধ্যয়ন করিতেছিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হওয়ার সমস্ত গুণই তাঁহার ছিল। তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন আর এই কাজ করার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। সেই জন্য আমরা "সাউথ আফ্রিকা বিটিশ ইণ্ডিয়ান কমিটি" গঠন করিবার সাহস করিলাম।

বিলাত ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে একটি রীতি আছে এবং আমার মতে রীতিটি অসভ্য। সে রীতিটি এই যে খাওয়ার নিমন্ত্রণের মাধ্যমেই কোনও আন্দোলনের সূচনা করা হয়। বিলাতের প্রধানমন্ত্রী ৯ই নভেম্বর ম্যানসন হাউস নামক বড় ব্যবসায়ীদের কর্মকেন্দ্রে তাঁহার বার্ষিক কার্যসূচী ও ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। সেই জন্য উহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। লর্ড মেয়র উহাতে মন্ত্রীমণ্ডলীকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন, অপরেও নিমন্ত্রিত হন। সেখানে আহারের পর মদের বোতল খোলা হইতে থাকে। উপস্থিত সকলে ভোজদাতা ও নিমন্ত্রিতদের স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে মদ্যপান করেন আর যখন এই শুভ বা অশুভ কার্য চলিতে থাকে তখন বক্তৃতা দেওয়া হয়। সেখানে মন্ত্রীমণ্ডলের শুভকামনাও (টোস্টও) করা হয়। এই টোস্টের জবাবে প্রধান মন্ত্রীর উল্লিখিত বক্তৃতা হয়। সার্বজনিক ক্ষেত্রের মত ব্যক্তিগত

ব্যাপারেও কাহারও সহিত বিশেষ প্রয়োজনীয় আলোচনা থাকিলে ভোজনের নিমন্ত্রণ করার রীতি। কখনও বা খাইতে খাইতে, কখনও বা খাওয়ার পর আলোচনা হইয়া থাকে। আমাদের এই সময় একবার নয়, অনেকবার এই রীতি পালন করিতে হইয়াছিল। তবে কেহ একথা মনে করিবেন না যে এজন্ত আমাদিগকে মন্ত বা মাংস স্পর্শ করিতে হইয়াছে। এমনিভাবে একবার আমরা মধ্যাহ্নভোজনে সকল প্রধান সহায়কদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। প্রায় একশত জনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমাদের সহায়কদিগকে ধন্তবাদ দেওয়া, তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লওয়া এবং স্থায়ী কমিটি গঠন করার জন্তই এই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। রীতি অনুসারে বক্তৃতাও হইয়াছিল এবং কমিটির স্থাপনা হইয়াছিল। ইহাতে আমাদের আন্দোলনেরও খুব প্রচার হইয়াছিল।

প্রায় ছয় সপ্তাহ ইংলণ্ডে কাটাইয়া আমরা ফিরিলাম। ম্যাডিরা পৌছাইয়া শ্রীযুক্ত রিচের তার পাইলাম যে, লর্ড এলাগন প্রচার করিয়াছেন যে এসিয়াটিক আইন নামঞ্জুর করিবার জন্ত মন্ত্রীমণ্ডল সম্রাটকে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের আনন্দের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কি আছে? ম্যাডিরা হইতে কেপটাউন পৌছাইতে ১৪।১৫ দিন লাগে। এই কয়দিন খুব শান্তিতে কাটাইলাম এবং ভবিষ্যতে অন্ত অসুবিধাগুলি দূর করিবার আকাশ-কুসুম রচনা করিতে লাগিলাম। দৈবগতি বিচিত্র, আমাদের আকাশ-কুসুম কি করিয়া শূন্তে মিলাইয়া গেল তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে বলিব।

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে দুই-একটা পবিত্র স্মৃতির কথা না লিখিয়া পারি না। একথা বলা আবশ্যক যে, আমরা বিলাতে এক মুহূর্ত সময় অপব্যয় হইতে দিই নাই। অনেক সার্কুলার ইত্যাদি পাঠাইতে হইত। উহা এক হাতে করিয়া উঠার মত কাজ নয়—লোকের সাহায্যের খুবই আবশ্যক হইয়াছিল। টাকা খরচ করিয়া এইপ্রকার সাহায্য পাওয়া যাইত। কিন্তু শুদ্ধ-চরিত্র স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা যেমন এ কাজ হয়, অপরের দ্বারা তেমন হয় না—ইহাই আমার ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা। সৌভাগ্যবশতঃ এইপ্রকার সাহায্য আমরা পাইয়াছিলাম। অনেক ভারতীয় যুবক সেখানে পড়িতেন। তাঁহারা আমাদিগের কাছে সকালে-সন্ধ্যায় আসিতেন ও যশ বা প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া খুব সাহায্য করিতেন। যে রকমের কাজই হোক—শিরোনামা লেখা, নকল করা, টিকিট লাগানো, ডাকে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ ছোট মনে করিয়া কেহ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিচিত এক ইংরাজ যুবক যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা অপর সকলের সাহায্য ম্লান করিয়া দিয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল সাইমণ্ড। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যে, দেবতারা যাঁহাকে ভালোবাসেন তাঁহাকে শীঘ্রই লইয়া যান। এই পরদুঃখকাতর ইংরাজকে ভরা যৌবনে যমদূত লইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে পর-দুঃখকাতর-প্রাণ বলায় বিশেষ কারণ আছে। বোম্বাইতে ১৮৯৭ সালের প্লেগের সময় লোক যখন যেখানে সেখানে মরিতেছিল, তখন তিনি ভারত-বাসী রোগীদিগকে সাহায্য করেন। সংক্রামক রোগীকে সাহায্য করিতে গিয়া লেশমাত্র মৃত্যুভয় না করা তাঁহার চরিত্রের মধ্যে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার ভিতর জাতি বা বর্ণ-বিদ্বেষের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার চিত্ত অতিশয় স্বাধীন ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সত্য থাকে সংখ্যালঘুদের দিকেই। এই সিদ্ধান্তের বশীভূত হইয়াই তিনি জোহানস্‌বার্গে আমার দিকে আকৃষ্ট হন; তিনি তামাশা করিয়া অনেক সময় আমাকে বলিতেন যে, "যদি কখনও আপনার দিকে মতাধিক্য হয়, তবে তখনই আপনাকে ছাড়িব। কেননা আমি বিশ্বাস করি যে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে সত্য পড়িলেও তাহা অসত্যের রূপ লইয়া থাকে।" তিনি পড়াশুনা করিয়াছিলেন। জোহানস্‌বার্গের এক ক্রোড়পতি—স্যার জর্জ ফেরারের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন তিনি। তিনি সুদক্ষ শর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্ট ছিলেন। বিলাতে আমি উপস্থিত হইলেই তিনি আসিয়া দেখা করেন। তাঁহার কোনও খবরই আমি রাখিতাম না। কিন্তু আমি সার্বজনিক কাজে নিযুক্ত ছিলাম বলিয়া আমার নাম সংবাদপত্রে উঠিয়াছিল। সেই জন্য এই সদাশয় ইংরাজ আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করেন। তিনি আমাদিগকে যে-কোনও প্রকারে সাহায্য করার ইচ্ছা জানান। বলেন আমাকে যদি চাপরাসীর কাজ দেন তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি শর্টহ্যাণ্ড লেখার দরকার হয়, তবে আমার ন্যায় কুশলী দ্বিতীয় লোক যে খুঁজিয়া পাইবেন না তাহা তো জানেনই। আমাদের দুই রকমের সাহায্যেরই আবশ্যক ছিল। এই মহদাশয় ব্যক্তি বিনা পয়সায় আমাদের জন্য দিনরাত্রি খাটিয়াছিলেন একথা বলায় একটুও অত্যুক্তি হয় না। প্রায় প্রতিদিনই রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত তাঁহাকে টাইপ করিতে হইত। সাইমণ্ড পত্রবাহকের কাজ করিতেন, চিঠি ডাকে ফেলিতেন। তাঁহার মুখে সকল সময়েই হাসি লাগিয়া থাকিত। তাঁহার মাসিক আয় প্রায় পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড ছিল। এই টাকার প্রায় সবটাই তিনি

বন্ধু ও অন্যান্য লোককে সাহায্য করিতে ব্যয় করিতেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং অবিবাহিত জীবন কাটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কিছু অর্থ লওয়ার জন্য জেদ করি। কিন্তু তিনি তাহা লইতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, এ কার্যের জন্য টাকা লইলে তাঁহার কর্তব্যচ্যুতি ঘটিবে। আমার মনে আছে, শেষের রাত্রে যখন আমরা কার্য সমাপ্ত করিয়া জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করিতেছিলাম, তখন তিনি রাত তিনটা পর্যন্ত জাগিয়া ছিলেন। পরদিন তিনি আমাদিগকে স্টীমারে তুলিয়া দিয়া বিদায় লন। সে বিদায় বড়ই পীড়াদায়ক হইয়াছিল। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে পরোপকার করাটা কেবল আমাদের দেশের লোকেরই বিশেষ বৃত্তি নয়।

যাঁহারা ভবিষ্যতে জনসেবার কাজ করিতে চান, তাঁহাদের অবগতির জন্য একথা জানাইব যে আমরা এই প্রতিনিধি দলের খরচার হিসাব রাখিতে এত যত্ন লইতাম যে অতি ক্ষুদ্র বিষয়, যেমন স্টীমারে সোডার দাম ইত্যাদিরও রসিদ সহ হিসাব লিখিতাম। আমরা তারের রসিদগুলিও রাখিয়া দিয়াছিলাম। বিশদ হিসাব লিখিবার সময় সাধারণতঃ বিবিধ খাতে কোনও কিছুই লিখি নাই। যদি কদাচিৎ বিবিধ খাতে কিছু খরচ দেখানো হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা এমন দুই-চার আনার, খরচের বিবরণ লেখার সময় যাহা যথাযথভাবে মনে পড়িত না।

আমি এই জীবনে একথা বেশ পরিষ্কার লক্ষ্য করিয়াছি যে বিচার-বিবেচনা করার বয়স হওয়া মাত্রই আমরা ট্রাস্টি বা ন্যাসরক্ষক হইয়া পড়ি। যতদিন বাপ-মার সঙ্গে থাকি ততদিন তাঁহাদের জন্য যে ব্যয় করি বা যে কারবার করি তাহার হিসাব তাঁহাদিগকে দিতে হয়। তাঁহারা আমাদের কর্তব্যনিষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারা হিসাব না চাহিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের দায়িত্ব ঘুচে না। যখন আমরা স্বাধীন গৃহস্থ হইয়া বসি, তখন আমাদের পরিবারের প্রতি দায়িত্বের উদ্ভব হয়। আমরা যাহা সংগ্রহ করি, আমরা নিজেরাই তাহার মালিক নহি। আমাদের পরিবারও আমাদের নিজেদের সহিত উহার যৌথ অংশীদার। তাঁহাদের জন্য উপার্জনের প্রতিটি পয়সার হিসাব দেওয়া দরকার। ব্যক্তিগত জীবনেই যদি এই প্রকারের দায়িত্ব হয় তবে সার্বজনিক জীবনে দায়িত্ব আরও কত বেশী। আমি এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি যে স্বেচ্ছাসেবকেরা মনে করেন যেন প্রদত্ত টাকার বা কার্যের হিসাব দেওয়ার আবশ্যকতা নাই, কেননা তাঁহারা সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাসের যোগ্য।

এইপ্রকার যুক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। হিসাব রাখার আবশ্যকতার সহিত বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনও সম্বন্ধ নাই। হিসাব রক্ষা করা একটা স্বতন্ত্র কার্য এবং নিষ্কলঙ্ক কার্য করিতে উহা অত্যাবশ্যক। যে প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করিতেছি তাহার প্রধান কর্মীরা মিথ্যা চক্ষুলজ্জা অথবা ভয়ের জন্য আমাদের নিকট হইতে হিসাব না চাহিলে তাঁহাদেরও অপরাধ হয়। যদি কোনও বেতনভোগী ভৃত্য কাজ ও পয়সার হিসাব দিতে বাধ্য থাকে, তবে স্বেচ্ছাসেবক দ্বিগুণ বাধ্য। কেননা সেবা করার সন্তোষই স্বেচ্ছাসেবকের বেতন। ইহা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অনেক সংস্থায় এ বিষয়ে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় না বলিয়াই এখানে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কুটিল নীতি

আমরা কেপ টাউনে পৌঁছামাত্র বুঝিলাম যে আমরা ম্যাডিরাতে যে তারবার্তা পাইয়াছিলাম তাহার মূল্য অযথা বেশী মনে করিয়াছিলাম। আমরা জোহান্স্‌বার্গে গিয়া তাহা আরও বেশী বুঝিলাম। শ্রীযুক্ত রিচ্ তার পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এজন্য দায়ী ছিলেন না। এশিয়াটিক আইন নামঞ্জুর করা সম্বন্ধে তিনি যতটুকু শুনিয়াছিলেন তাহাই জানাইয়াছিলেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ট্রান্সভাল তখন 'ক্রাউন কলোনি' ছিল। 'ক্রাউন কলোনি'র একজন এজেন্ট বিলাতে থাকেন। তাঁহার কাজ হইতেছে কলোনি সম্বন্ধে স্টেট সেক্রেটারীকে সর্ববিষয়ে অবহিত রাখা। এই সময় ট্রান্সভালের খ্যাতনামা আইনব্যবসায়ী স্যার রিচার্ড সলমন এজেন্ট ছিলেন। লর্ড এলগিন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই ঐ কালা কানুনে অসম্মতি দিয়াছিলেন। ১৯০৭ সালের ১লা জানুয়ারী ট্রান্সভালকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনক্ষমতা দেওয়া হয়। লর্ড এলগিন স্যার রিচার্ডকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দায়িত্বপূর্ণ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যদি ঐ আইনই উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে রাজ-অনুমতি অস্বীকৃত হইবে না। কিন্তু ট্রান্সভাল যতক্ষণ পর্যন্ত 'ক্রাউন কলোনি' আছে ততক্ষণ ঐ ধরনের জাতি-বৈষম্যমূলক আইনে আইনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ব্রিটিশ

সরকারের উপর বর্তাইবে এবং উহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলনীতির পরিপন্থী বলিয়া মহামান্য সম্রাটের সরকার উহাতে সম্মতি দিতে পারেন না। তাই মহামান্য সম্রাটকে ঐ আইন প্রত্যাখ্যান করিতে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া তাঁহার সম্মুখে গত্যন্তর নাই।

ঐ আইনটিতে যদি নামেমাত্র অসম্মতি দেওয়া হয়, অথচ ট্রান্সভালের ইউরোপীয়দিগের নিজ ইচ্ছামত চলিবার ব্যবস্থা থাকে, তবে স্যার সলোমনের এমন সুন্দর বন্দোবস্তে আপত্তি করার কিছুই থাকিতে পারে না। আমি ইহাকে কুটিল নীতি বলিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয় ন্যায়তঃ ইহাকে এতদপেক্ষা কঠোরতর বিশেষণে অভিহিত করা যায়। মহামান্য সম্রাটের সরকার 'ক্রাউন কলোনির' আইনের জন্য সরাসরি দায়ী এবং সেই জন্য উহার শাসন-পদ্ধতিতে জাতি বা বর্ণবৈষম্যের স্থান নাই—এ উত্তম কথা। একথাও বুঝা যায় যে, দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার-প্রাপ্ত উপনিবেশের আইন মহামান্য সম্রাটের সরকার হঠাৎ রদ করিতে পারেন না। কিন্তু উপনিবেশের এজেন্টের সহিত ব্যক্তিগত-ভাবে পরামর্শ করিয়া পূর্ব হইতেই এমন আইনের জন্য রাজসম্মতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখা যাহা ব্রিটিশ সংবিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা যদি যাঁহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হইল তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিচার না হয় তবে কি? বস্তুতঃ লর্ড এলগিন তাঁহার প্রতিশ্রুতি দ্বারা ট্রান্সভালে ইউরোপীদিগকে তাঁহাদের ভারতীয় বিরোধী কর্মে উৎসাহিতই করিলেন। যদি তাহাই করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তবে প্রতিনিধি দলকে সেকথা সোজাসুজি বলাই তাঁহার উচিত ছিল। ধরিতে গেলে দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রাপ্ত উপনিবেশের ও আইনের জন্য মহামান্য সম্রাটের সরকারের দায়িত্ব হইতে মুক্তি নাই। এই সকল উপনিবেশও ব্রিটিশ সংবিধানের মূল সূত্রগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কোনও উপনিবেশই দাসপ্রথা আইন-সিদ্ধ করিতে পারেন না। যদি লর্ড এলগিন ঐ কালা কানুন অন্যায় বলিয়াই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন এবং কেবল সেই জন্যই তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার স্পষ্ট কর্তব্য ছিল স্যার রিচার্ড সলোমনকে ব্যক্তিগতভাবে এই কথা বলা যে দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার দেওয়ার পরেও এপ্রকার অন্যায় আইন ট্রান্সভাল সরকার প্রবর্তন করিতে পারেন না এবং উহা করাই যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয় তবে ট্রান্সভালকে এজাতীয় উচ্চতর অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে মহামান্য সম্রাটের সরকার পুনর্বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে। অথবা তিনি স্যার রিচার্ডকে একথাও

বলিতে পারিতেন যে ভারতীয়দের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হইলেই দায়িত্ব-পূর্ণ সরকার দেওয়া যাইতে পারিবে। এইপ্রকার সরল পথ না লইয়া লর্ড এলগিন ভারতীয়দিগের প্রতি বন্ধুত্বের একটা বাহ্য রূপ দেখাইলেন, অথচ তখনই তিনি বস্তুতঃপক্ষে ট্রান্সভাল সরকারকে গোপনে সমর্থন করিলেন এবং যে আইন তিনি স্বয়ং একবার নাকচ করিয়াছেন তাহা পুনরায় মঞ্জুর করার জন্য সরকারকে উৎসাহিত করিলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কুটিল নীতি গৃহীত হওয়ার এই প্রথম অথবা একমাত্র উদাহরণ নহে। ব্রিটিশ ইতিহাস সম্বন্ধে অগভীর জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিরাও এইরূপ আরও ঘটনার কথা বলিতে পারিবেন।

লর্ড এলগিন ও মহামান্য সম্রাটের সরকার আমাদের প্রতি যে চালাকি করিয়াছেন তাহাই জোহানসবার্গে প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। আমরা ম্যাডিরায় যেমন আনন্দিত হইয়াছিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছাইয়া আমাদের নিরাশা তেমনি গভীর হইল। তবুও এই চালাকির তৎকালীন ফল এই হইল যে সম্প্রদায় পূর্বাপেক্ষাও অধিক উৎসাহন্বিত হইল। আমাদের সকলকেই বলিলেন—আমাদের যুদ্ধ তো মহামান্য সম্রাটের সরকার কি সাহায্য করেন তাহার অপেক্ষা না রাখিয়াই চালানো হইবে; সুতরাং ভয়ের কোনও হেতু নাই। সাহায্যের জন্য আমরা কেবল নিজেদের এবং যে ঈশ্বরের নামে আমরা শপথ লইয়াছি তাঁহার দিকে চাহিব। যদি আমরা নিজেদের কাছে ঠিক থাকি তাহা হইলে সময়ে কুটিলনীতি ও সরল হইয়া যাইবে।

ট্রান্সভালে দায়িত্বপূর্ণ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। নূতন পার্লামেণ্ট প্রথমেই ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করিল। আর তাহার পরেই এসিয়াটিক আইন পাস হইল। এই আইন পূর্বের খসড়ারই অনুরূপ ছিল, কেবল সময় চলিয়া যাওয়ার জন্য একটা তারিখ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ২১শে মার্চ ১৯০৭ সালের একটি বৈঠকেই হুড়াহুড়ি করিয়া ইহা মঞ্জুর করার সকল কাজ করিয়া ফেলা হয়। পূর্বে যে রাজসম্মতি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা স্বপ্নের মত বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইল। ভারতীয়েরা যথারীতি আবেদন নিবেদন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা কে শোনে? ১৯০৭ সালের ১লা জুলাই হইতে আইন বলবৎ হওয়ার কথা। ভারতীয়দিগকে তদনুসারে ৩১শে জুলাই-এর পূর্বে রেজিস্ট্রী করিতে আদেশ দেওয়া হইল। ভারতীয়দের প্রতি দয়া করিয়া এই সময় বাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, বাধ্য হইয়াই উহা করিতে হইয়াছিল। রীতিমাফিক সম্রাটের অনুমোদন লইতে কতকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার কথা, আর আইন অনুযায়ী ফর্ম

ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে এবং বিভিন্ন স্থানে পাস দেওয়ার অফিস খুলিতেও কিছুটা সময় লাগা অপরিহার্য। তাই এই বিলম্বটা ট্রান্সভাল সরকারের নিজের সুবিধার জন্যই করা হইয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায়

আহমদ মহম্মদ কাছলীয়া

এই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে বিলাত যাওয়ার সময় আমি একজন ইংরাজের সহিত এসিয়াটিক আইন সম্বন্ধে কথা বলি। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেছিলেন। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলেন যে, তাহা হইলে আমরা কুকুরের গলার কলারটা খুলিয়া ফেলিতে বিলাত যাইতেছি। তিনি ট্রান্সভালের পাস লওয়ার আইনকে কুকুরের কলারের সহিত তুলনা করেন। তিনি ঐ কথা বলিয়া ভারতবাসীদের প্রতি অবজ্ঞা এবং তাঁহাদের অপমানে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন অথবা এ বিষয়ে তিনি যেমন তীব্রভাবে অনুভব করেন তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা আজ পর্যন্তও বুঝি নাই। কাহারও বাক্যের অর্থ করার সময় তাঁহার প্রতি অবিচার করা উচিত নয়—এই নীতি অনুসরণ করিয়া আমি ধরিয়া লইতেছি যে তিনি তাঁহার তীব্র অনুভূতি ব্যক্ত করিতেই সে কথা বলিয়াছিলেন। সে যাহা হোক্, একদিকে ট্রান্সভাল সরকার ভারতীয়দের গলায় এই কুকুরের কলার পরাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, অপরদিকে ভারতীয়েরা ট্রান্সভাল সরকারের এই দুষ্ট নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং যাহাতে ঐ কলার কোনক্রমেই পরিতে না হয় তাহার জন্য নিজ সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমরা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বন্ধুদিগকে পত্রদ্বারা এখানকার সমস্ত খবর দিতেছিলাম, যাহাতে তাঁহারা এখানকার দৈনন্দিন অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে বাহিক সাহায্যের আবশ্যক সামান্যই হয়। কেবল অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাতেই উপকার হইয়া থাকে। সম্প্রদায়ের প্রত্যেক অংশই যাহাতে যুদ্ধের উপযুক্ত হয় সেই জন্য নেতারা অধিক সময় দিতে লাগিলেন।

কোন্ প্রতিষ্ঠান এই সংগ্রাম চালাইবার মাধ্যম হইবে—ইহা আমাদের

সম্মুখে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রূপে দেখা দিল। ট্রান্সভালের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনেক সভ্য ছিল। ইহা স্থাপিত হওয়ার সময় সত্যাগ্রহের সৃষ্টি হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠান এতদিন কেবল এক-আধটা নয়, অনেকগুলি খারাপ আইনের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাকে অনুরূপভাবে লড়িতে হইবে। অন্যায় আইনের প্রতিরোধ করা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানকে আরও অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের সকল সভ্যই সত্যাগ্রহের পথে কালা কানুনের প্রতিরোধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নাই। সত্যাগ্রহের সহিত এই প্রতিষ্ঠান যুক্ত হইয়া পড়িলে ইহার উপর যে বাহ্যিক চাপ আসিয়া পড়িবে তাহার কথাও ভাবিতে হয়। সরকার যদি এই সত্যাগ্রহ-আন্দোলনকে রাজদ্রোহ বলেন ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সব কিছুকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন তাহা হইলে কি হইবে? তখন এই প্রতিষ্ঠানের যে সকল সভ্য সত্যাগ্রহী নন তাঁহাদের কি অবস্থা হইবে? তারপর, যখন সত্যাগ্রহের কথা চিন্তা করা হয় নাই তখন যে সকল অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহারই বা কি হইবে? এ সমস্তই বিশেষ ভাবে ভাবিবার বিষয়। সর্বশেষে সত্যাগ্রহীরা ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে কেহ এই যুদ্ধে বিশ্বাসের অভাব অথবা দুর্বলতা কিংবা অপর কোন কারণবশতঃ যোগ না দিলে সত্যাগ্রহীরা তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব কিছুতেই পোষণ করিবেন না। শুধু তাহাই নহে, সত্যগ্রহীরা তাঁহাদের সহিত বর্তমানের সদ্ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া সত্যাগ্রহ ভিন্ন অন্য কার্যে তাঁহাদের সহিত একযোগে কাজ করিবেন।

এই সকল কারণবশতঃ সম্প্রদায় স্থির করিলেন যে, প্রচলিত কোনও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ চালানো হইবে না। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সত্যাগ্রহ ভিন্ন অন্য সমস্ত উপায়ে এই কালা কানুনের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে। সত্যাগ্রহের জন্য "প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স এসোসিয়েশন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইল। এই ইংরাজী নাম হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে এই প্রতিষ্ঠান যখন সৃষ্ট হয় তখন সত্যাগ্রহ শব্দটি আবিষ্কৃতও হয় নাই। নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করা যে যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল কালক্রমে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার সুপ্রতিষ্ঠিত কোনও সমিতির সহিত জড়িত হইয়া কাজ করিতে গেলে সত্যাগ্রহের হয়ত ক্ষতি হইত। অনেক লোক এই নূতন সমিতির সভ্য হইলেন এবং তাঁহারা মুক্তহস্তে অর্থ দিলেন।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি এই শিক্ষা পাইয়াছি যে টাকার অভাবে কোনও

আন্দোলন থামিয়া যায় না, অথবা মন্থর-গতি হইয়া পড়ে না। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয়, যে টাকা ছাড়া কোনও ঐহিক আন্দোলন চালানো যায়। আমি কেবল এই কথা বলিতে চাই যে আন্দোলনের পশ্চাতে যদি দক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ লোক থাকেন, তবে আবশ্যকীয় অর্থ জুটিয়া যায়। পক্ষান্তরে আমি ইহাও দেখিয়াছি যে কোনও আন্দোলনে অত্যধিক অর্থের আমদানি হইলে তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। সেই জন্য যখন কোন সার্বজনিক সংস্থা জমা টাকার সুদ হইতে চালানো হয় তখন তাহাতে পাপ হয় এ কথা না বলিলেও এ কথা বলিব যে ইহা অসঙ্গত পথ। জনসাধারণই প্রতিটি সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্ক এবং যদি সাধারণে না চান তাহা হইলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের একদিনও চলা উচিত নয়। সঞ্চিত টাকার সুদে যে প্রতিষ্ঠান চলে তাহা লোকমতের উপর নির্ভর করে না এবং স্বেচ্ছাচারী ও আত্মাভিমানী হইয়া পড়ে। জমা টাকায় পরিচালিত বহু সামাজিক ও ধার্মিক প্রতিষ্ঠানে যে দুর্নীতি দৃষ্টিগোচর হয় তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে। এই ব্যাপার এতই সাধারণ যে ইচ্ছা করিলেই যে কেহ ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন।

আমরা আমাদের কথায় ফিরিয়া আসিব। আইন ব্যবসায়ী এবং ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরাই যে কেবল চুলচেরা তর্ক করিতে পারেন তাহা নহে। আমি দেখিলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক অশিক্ষিত ভারতবাসীও সূক্ষ্ম ভেদ ধরিতে ও সুন্দর বিতর্ক করিতে পারেন। কেহ কেহ বলিলেন যে সেই থিয়েটার-গৃহে যে শপথ লওয়া হইয়াছিল পুরাতন অর্ডিন্যান্স বাতিল হওয়াতেই তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ ঘটনার পরে যাঁহাদের ভিতর দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল তাঁহারা এই যুক্তির আশ্রয় লইলেন। এই যুক্তিতে জোর ছিল। কিন্তু যাঁহারা আইনের জন্য ইহার বিরোধ না করিয়া ইহার পশ্চাতে যে পাপপূর্ণ মতবাদ রহিয়াছে তাহারই প্রতিরোধকামী, তাঁহাদের নিকট ঐ যুক্তির কোন মূল্য ছিল না। তাহা হইলেও নিরাপত্তার খাতিরে পুনরায় প্রতিরোধের শপথ লওয়ার আবশ্যকতা বোধ হইল। ভারতীয় সম্প্রদায়ের জাগৃতিকে পুনরায় শক্তিশালী করিতে এবং যদি দুর্বলতা প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তাহা কি পরিমাণ তাহা বুঝিতে পারার পথ ছিল ইহাই। সেই জন্য সর্বত্র সভা করিয়া অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া হয় ও নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ করানো হয়। দেখা গেল সম্প্রদায়ের তেজ পূর্বের ন্যায়ই আছে।

এদিকে জুলাই মাস ক্রমশঃ শেষ হইয়া আসিতেছিল। ঐ মাসের শেষ

তারিখে ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়াতে আমরা ভারতীয়দের একটি বিরাট সভা আহ্বান করিব বলিয়া স্থির করি। অন্যান্য স্থান হইতেও প্রতিনিধিদিগকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রিটোরিয়ার মসজিদের প্রাঙ্গণে খোলা জায়গায় এই সভা হয়। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পরে আমাদের সভায় এত লোক হইত যে কোনও বদ্ধ গৃহে সভা হওয়ার অসম্ভব ছিল। ট্রান্সভালে সমুদয় ভারতীয়ের সংখ্যা তের হাজার-এর বেশী ছিল না। তাহার মধ্যে দশ হাজার লোক জোহানস্বার্গে বাস করিত। যেখানে সর্বসাকুল্যে দশ হাজার লোক বাস করে, সেখানে দুই হাজার লোকের উপস্থিতি যে খুবই অধিক ও সন্তোষজনক ইহা বলা যাইতে পারে। অন্য কোনও পরিস্থিতিতে সার্বজনিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালানো সম্ভবই নহে। যেখানে যুদ্ধ অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল, সেখানে সকলে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা না লইলে যুদ্ধ চালানো যায় না। সেই জন্য এই প্রকার উপস্থিতি কর্মীদিগের নিকট আশ্চর্য-জনক বলিয়া বোধ হয় নাই। প্রথম হইতেই উদ্যোক্তারা স্থির করিয়াছিলেন যে খোলা স্থানেই সভা হইবে। ইহাতে এক দিক দিয়া যেমন কোনও ব্যয় নাই, অপর দিকে তেমনি সভায় স্থানাভাববশতঃ কাহারও ফিরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা নাই। এই সমস্ত সভা সাধারণতঃ খুবই শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হইত। শ্রোতারা সমস্ত কথাই মনোযোগের সহিত শুনিতেন। যাঁহারা মঞ্চ হইতে অনেক দূরে থাকার জন্য শুনিতে পাইতেন না, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে বলার জন্য বক্তাকে অনুরোধ করিতেন। এই সকল সভায় যে চেয়ার থাকিত না, তাহা বলাই বাহুল্য। সকলেই মাটিতে বসিতেন। একটি ছোট মঞ্চ তৈয়ারী হইত। উহাতে কয়েকখানা চেয়ার বা টুল ও একটা টেবিল থাকিত। সভাপতি, বক্তা ও দুই একজন বন্ধুমাত্র সেখানে বসিতেন।

ইউসুফ ইস্‌মাইল মিঞা এই সভার সভাপতি হন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সাময়িক সভাপতি ছিলেন। কালা কানুনের দাবি মত পাস লওয়ার সময় যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ভারতীয়েরা তাঁহাদের উৎসাহ সত্ত্বেও ততই চিন্তিত হইতেছিলেন। ওদিকে ট্রান্সভাল সরকারের সমস্ত শক্তির উপর অধিষ্ঠিত হইয়া জেনারেল বোথা ও জেনারেল স্মাটস্ কিছু কম চিন্তিত ছিলেন না। একটা গোটা সম্প্রদায়কে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবনমিত করিতে কেহ চাহিবেন না। জেনারেল বোথা সেইজন্য এই সভায় আমাদিগকে উপদেশ দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত উইলিয়াম হস্কিনকে পাঠাইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী

এক অধ্যায়ে এই মহোদয়ের সহিত পাঠকের পরিচয় হইয়াছে। সভায় তিনি সাদরে আপ্যায়িত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের মিত্র। আমার এ কথা না বলিলেও চলে যে, এই বিষয়ে আমার সহানুভূতি আপনাদের দিকে। শক্তি থাকিলে আমি সানন্দে আপনাদের বিরোধীদের দ্বারা আপনাদের দাবি স্বীকার করাইতাম। আপনারা সকলেই জানেন যে ট্রান্সভালের ইউরোপীয়েরা আপনাদের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কি প্রকার বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেন। আমি জেনারেল বোথার কথায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি আমাকে দিয়া তাঁহার বক্তব্য এই সভায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি আপনাদের প্রতি সম্মানের ভাব পোষণ করেন এবং আপনাদের এ বিষয়ে অনুভূতি কি প্রকার তাহাও বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। ট্রান্সভালের সকল ইউরোপীয়ই এই প্রকার আইন চাহেন এবং তিনি নিজেও ইহার আবশ্যকতা দেখিতেছেন। ট্রান্সভাল সরকার যে কত বড শক্তিশালী তাহা ভারতীয়েরা অবশ্যই জানেন। এই আইনে আবার বিলাতের সরকারও সম্মতি দিয়াছেন। ভারতীয়েরা এক্ষেত্রে যাহা করার তাহা করিয়াছেন এবং মানুষের মত কাজ দেখাইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে যখন তাঁহাদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হইয়াছে এবং আইন পাস হইয়া গিয়াছে, তখন ভারতীয় সম্প্রদায় এই আইন মান্য করিয়া তাঁহাদের রাজভক্তি ও শান্তিপ্রিয়তার পরিচয় দিন। এই আইনের অন্তর্গত বিধিব্যবস্থায় যদি আপনারা কোনও ছোটখাটো পরিবর্তন করার প্রস্তাব করেন তবে জেনারেল স্মাটস্ তাহা খুব মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিবেন। আপনাদের নিকট আমার নিজেরও এই বক্তব্য যে, আপনারা জেনারেল বোথার ইচ্ছা পালন করুন। আমি একথা জানি যে এই আইন সম্বন্ধে ট্রান্সভাল সরকার দৃঢ়সঙ্কল্প। এই আইনের বিরুদ্ধে গেলে কেবল প্রাচীরের গায়ে মাথা ঠোকার মত হইবে। আমি চাই না যে আপনাদের সম্প্রদায় নিরর্থক প্রতিরোধ করিয়া বিনষ্ট হউক অথবা অপ্রয়োজনীয় নিগ্রহ বরণ করুন।" আমি শ্রীযুক্ত হস্কিনের বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য সভায় তরজমা করিয়া দিই। তাহার পর আমার নিজের তরফ হইতে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিই। শ্রীযুক্ত হস্কিন হর্ষধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করেন।

এইবার ভারতীয় বক্তাদের সভায় বলিবার পালা। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বর্গগত আহমদ কাছলীয়া। তিনি কেবল এই অধ্যায়ের নায়ক নহেন, সমগ্র পুস্তকটিরই নায়ক। আমার মক্কেল এবং একজন দোভাষী বলিয়া তাঁহাকে

আমি তখন জানিতাম। ইহার পূর্বে তিনি কখনও সাধারণের কাজে নেতৃত্ব করেন নাই। তিনি কাজ চালানোর মত ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। অভ্যাসের দ্বারা তিনি ইংরাজী ভাষাজ্ঞান এতটা বাড়াইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে যখন ইংরাজ উকিলদিগের নিকট লইয়া যাইতেন তখন দোভাষীর কাজ করিতেন। তবে তিনি পেশাদার দোভাষী ছিলেন না, বন্ধুদিগকে সাহায্যের জন্য তিনি ঐ কার্য করিতেন। তিনি প্রথম প্রথম কাপড় ফিরি করিতেন। তাহার পর তাঁহার ভাইকে অংশীদার করিয়া ছোট ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি সুর্তি মেমান এবং তাঁহাদের সমাজে তাঁহার খুব নাম ছিল। তিনি গুজরাটী অল্পস্বল্প জানিতেন, কিন্তু ব্যবহার দ্বারা তাহাও ভালই শিখিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার মেধা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি যাহা শুনিতেন তাহাই ধরিয়া লইতে পারিতেন। তিনি আইনের গোলমালের এত সুন্দর মীমাংসা করিতে পারিতেন যে আমারও আশ্চর্য লাগিত। তিনি উকিলদিগের সহিতও আইনের তর্ক করিতে দ্বিধা করিতেন না এবং প্রায়ই তিনি যাহা বলিতেন তাহা উকিলদিগের বিবেচনাযোগ্য হইত।

জনাব কাছলীয়ার অপেক্ষা সাহস অথবা দৃঢ়নিষ্ঠায় শ্রেয়তর একজন লোকও আমি এ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা অথবা ভারতবর্ষে দেখি নাই। সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহার সর্বস্ব তিনি উৎসর্গ করেন। কথা দিলে তিনি সব সময়েই তাহা রাখিতেন। তিনি ধর্মনিষ্ঠ গোঁড়া মুসলমান ও সুর্তি-মসজিদের তিনি একজন অছি ছিলেন। তবুও তিনি হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অন্ধভাবে মুসলমানের পক্ষ লইয়া কখনও হিন্দুর বিরোধিতা করিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়া তিনি প্রয়োজনে কখনও হিন্দু বা মুসলমানদিগকে তাঁহাদের দোষের কথা বলিতে দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার সরলতা ও নম্রতা অনুকরণীয় ছিল। তাঁহার সহিত অনেক বৎসরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পর আমার দৃঢ় মত এই যে জনাব কাছলীয়ার মত লোক যে কোনও সম্প্রদায়ে দুর্লভ।

প্রিটোরিয়ার সভায় তিনি একজন বক্তা ছিলেন। তিনি খুব অল্প কথায় বক্তৃতা শেষ করেন। তিনি বলেন, "এই কালা কানুনের কথা ও তাহার তাৎপর্য প্রত্যেক ভারতীয়ই জানেন। শ্রীযুক্ত হস্কিনের বক্তৃতা আমি মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছি। আপনারাও শুনিয়াছেন। ঐ বক্তৃতার প্রভাবে আমার প্রতিজ্ঞায় আমি আরও দৃঢ় হইয়াছি। ট্রান্সভালের সরকারের শক্তির কথা আমরা

জানি। কিন্তু এই কালা কানুন জারি করা অপেক্ষা সরকার আর কি করিতে পারেন? সরকার আমাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারেন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন অথবা নির্বাসন কিংবা ফাঁসি দিতে পারেন। এ সকলই আমরা সানন্দে সহ্য করিব কিন্তু এ আইন বরদাস্ত করিব না।" আমি লক্ষ্য করিলাম যে এই সকল কথা বলিতে বলিতে আহমদ মহম্মদ কাছলীয়া খুব উত্তেজিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গলার ও কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল, শরীর কাঁপিতেছিল। নিজের ডান হাতের আঙুলগুলি নিজের খোলা গলার উপর চালাইয়া তিনি গর্জিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি বলিতেছি যে যদি ফাঁসিতেও যাই তবুও এই আইন মানিব না। আমি আশা করি যে সভায় উপস্থিত সকলে যেন অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।" এই কথা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। তিনি যখন গলার উপর তাঁহার আঙুল চালাইয়া দেখাইয়াছিলেন তখন মঞ্চের উপর কেহ কেহ মুচ্‌কি হাসিয়াছিলেন। আমার স্মরণ আছে আমিও সেই হাসিতে যোগ দিয়াছিলাম। নিজের সাহসিকতাপূর্ণ উক্তিকে তিনি পূর্ণমাত্রায় কাজে পরিণত করিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ ছিল। অদ্যাবধি যখনই সে কথা মনে পড়িয়াছে তখনই সেদিনের সেই আশঙ্কার কথা মনে করিয়া লজ্জা পাই। এই মহাযুদ্ধে যাঁহারা নিজের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাছলীয়া তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। কোনও দিন আমি তাঁহার মধ্যে ক্লান্তি দেখি নাই।

সভার সকলে তাঁহার এই বক্তৃতায় হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময় অন্যে আমা অপেক্ষা এই অখ্যাত বীর সম্বন্ধে অধিক জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে কাছলীয়া যাহা করিতে চান তাহাই বলেন এবং যাহা বলেন তাহা করেন। আরও উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল। কিন্তু আমি কেবল কাছলীয়ার বক্তৃতার কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি, কেননা তাঁহার এই বক্তৃতা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা দিয়াছিল। যাঁহারা সেদিন গরম গরম বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেই শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত টিকেন নাই। এই মহাপুরুষ এই মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার চার বৎসর পর শেষ অবধি ভারতীয় সম্প্রদায়ের সেবা করিয়া ১৯১৮ সালে দেহত্যাগ করেন।

আমি কাছলীয়া শেঠের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব, কেননা অন্যত্র সে কথা লেখার স্থান না হইতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে

পাঠকগণ টলস্টয়-ফার্মের কথা পড়িবেন। সেখানে কতকগুলি সত্যাগ্রহী পরিবার বাস করিতেন। শেঠ তাঁহার দশ-বারো বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে সে সেখানে সরল ও সেবামূলক জীবন গ্রহণ করিয়া অপরের আদর্শ স্বরূপ হইবে। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্ত মুসলমানেরাও তাঁহাদের ছেলেদিগকে ফার্মে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আলি নম্র, প্রতিভাবান, সত্যবাদী ও সরল বালক ছিল। তাহার পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই ঈশ্বর তাহাকে লইয়া যান। যদি ঈশ্বর তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতেন, তবে সে যে যোগ্য পিতার পুত্র হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম ভাঙ্গন

১৯০৭ সালের জুলাই শেষ হইল। পাস দেওয়ার অফিসগুলি খুলিল। সম্প্রদায় স্থির করিয়াছিল যে প্রত্যেক অফিসেই প্রকাশ্যভাবে পিকেটিং করা হইবে। অর্থাৎ অফিসে যাওয়ার রাস্তায় স্বেচ্ছাসেবক থাকিবেন এবং তাঁহারা দুর্বলচিত্ত ভারতীয়গণকে সেখানে তাঁহাদের জন্য যে ফাঁদ পাতা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিবেন। প্রত্যেক সেচ্ছাসেবকেরই ব্যাজ ছিল এবং তাঁহাদিগকে স্পষ্টভাবে একথা শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে যাঁহারা পাস লইতে চাহেন তাঁহাদের সহিত যেন অভদ্র ব্যবহার না করা হয়। তাঁহারা তাঁহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিবেন আর কেহ যদি না বলেন তবে কোনমতেই বল-প্রয়োগ করিবেন না অথবা তাঁহার প্রতি রূঢ় হইবেন না। এই আইন দ্বারা কি অনিষ্ট হইবে তাহা বুঝাইয়া লেখা ছাপা প্রচার-পত্র প্রত্যেক পাস-গ্রহণার্থীকে দিবেন ও তাহাতে কি লেখা আছে স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহা বুঝাইবেন এবং পুলিসের সহিতও ভদ্র ব্যবহার করিবেন। পুলিসের দুর্ব্যবহার অসহ্য হইলে সেস্থান হইতে চলিয়া আসিবেন। পুলিস যদি গ্রেপ্তার করে তবে খুশী হইয়া গ্রেপ্তার হইবেন। জোহানস্‌বার্গে এইরূপ ঘটনা হইলে আমাকে সংবাদ দিবেন। অন্যান্য স্থানে হইলে সেই স্থানের সম্পাদককে সংবাদ দিবেন এবং তাঁহার নির্দেশমত কার্য করিবেন। প্রত্যেক দলেরই অধিনায়ক নিযুক্ত করা ছিল

এবং তাঁহাদের নির্দেশ মানিয়া চলা স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল।

সম্প্রদায়ের এই ধরনের কার্যের এই প্রথম অভিজ্ঞতা। বারো বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্ক সকলকেই পিকেটিংএর দলে লওয়া হইয়াছিল এবং ইহার ফলে বারো হইতে আঠার বৎসরের অনেক যুবক ভর্তি হইয়াছিল। স্থানীয় কর্মীর অপরিচিত কোন লোককে লওয়া হইত না। এত সাবধানতার উপরেও প্রত্যেক সভায় এবং অন্য ভাবেও একথা বুঝানো হইত যে, যে ব্যক্তি স্বার্থহানির আশঙ্কায় অথবা অন্য কারণে পাস লইতে ইচ্ছা করেন, অথচ স্বেচ্ছাসেবকদের ভয় করেন, তাঁহাকে সঙ্গে একজন স্বেচ্ছাসেবক দিয়া নেতাদের পক্ষ হইতে পাস-অফিসে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাঁহার কাজ হইয়া গেলে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে আবার নিরাপদে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। কেহ কেহ এই ব্যবস্থার সাহায্য লইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা অতিশয় উৎসাহের সহিত এই কার্য করিতেন। তাঁহারা সর্বদাই নিজের কার্যে সতর্ক ও জাগ্রত থাকিতেন। একথা বলা যায় যে সাধারণতঃ পুলিসের উৎপীড়ন বেশী ছিল না। কোথাও উৎপীড়ন হইলে স্বেচ্ছাসেবকেরা সহ্য করিয়া লইতেন।

এই কাজ করার সময় স্বেচ্ছাসেবকেরা হাসি-তামাশাও করিতেন। তাহাতে কখনও কখনও পুলিসও যোগ দিতেন। আমোদ করিয়া সময় কাটাইবার জন্য তাঁহারা নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেন। একবার রাস্তা আটকাইবার আইনে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই সত্যাগ্রহের সহিত অসহযোগ যুক্ত ছিল না, সেইজন্য আদালতে পক্ষ সমর্থনে বাধা ছিল না। সম্প্রদায়ের কার্যের জন্য উকিলের পারিশ্রমিক না দিতে হয় সে ব্যবস্থাও অবশ্য করা হইয়াছিল। এই স্বেচ্ছাসেবকদিগকে আদালত নিরপরাধ বলিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহাতে তাঁহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া যায়।

যদিও পাস লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে অপমান বা তাঁহাদের উপর বলপ্রয়োগ হইত না, তথাপি একথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে এই আন্দোলনের সময় অন্য একদল লোকের উদ্ভব হয় যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক না হইয়া যেসব লোক পাস লইতেন তাঁহাদিগকে মারপিট বা অন্য ক্ষতি করার ভয় দেখাইতেন। ইহা পরিতাপের বিষয়। সংবাদ পাইয়া ইহা বন্ধ করার জন্য কড়া উপায় গ্রহণ করা হইয়াছিল। ফলে ভয় দেখানো প্রায় বন্ধ হইলেও ব্যাপারটা নির্মূল হইল না। ধমকের ভয়টা কাজ করিতেছিল আর সেই পরিমাণে যে আমাদের আন্দোলনের ক্ষতি হইতেছিল তাহা আমি দেখিতে পাইতেছিলাম।

যাঁহাদের ভয় হইতেছিল তাঁহারা অবিলম্বে সরকারের সাহায্য চাহিলেন এবং পাইলেনও। এই ভাবে সম্প্রদায়ের ভিতর বিষ অনুপ্রবিষ্ট হইল। যাঁহারা দুর্বল ছিলেন তাঁহারা আরও দুর্বল হইলেন। ইহাতে বিষের তীব্রতা বাড়িতেই লাগিল, কেননা দুর্বলের ধর্মই হইতেছে প্রতিশোধ লওয়া।

উপরিউক্ত শাসানির অবশ্য বিশেষ প্রভাব পড়ে নাই। কিন্তু একদিকে লোকনিন্দার ভয়, অপরদিকে স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতিবশতঃ লোকের নিকট নাম প্রকাশ হওয়ার ভয় শক্তিশালী প্রতিষেধকের কাজ করিয়াছিল। এই কালা কানুন বাঞ্ছনীয়—এমন কথা কোন ভারতীয় মনে করিতেন বলিয়া আমি জানি না। দুঃখ সহ্য করিতে অপারগ অথবা আর্থিক লোকসানের আশঙ্কায় লোকে পাস লইত এবং ইহার জন্য লজ্জাও পাইত।

একদিকে যেমন লোকলজ্জার ভয়, অপরদিকে তেমনি প্রধান ব্যবসায়ীদের পক্ষে ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ার ভয়—এই দুই ভয় হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ভারতীয় পথ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাঁহারা পাসআফিসের কর্তৃপক্ষের সহিত যুক্তি করিলেন যে রাত্রি নয়টা দশটায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের বাড়িতে তাঁহারা আসিবেন এবং সেই সময় তাঁহারা পাস করাইয়া লইবেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে এরূপ করিলে তাঁহাদের পাস লওয়ার সংবাদটা অন্ততঃ কিছুদিন গোপন থাকিবে এবং তাঁহারা নেতা বলিয়া তাঁহাদের দেখাদেখি অপরেও এই আইন মানিয়া লইবেন। এইভাবে তাঁহাদের লজ্জার ভারও কম হইবে এবং পরে লোকে যখন জানিয়া যাইবে তখন সেজন্য আর বেশী কিছু চিন্তা করিতে হইবে না।

কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের দৃষ্টি এত সতর্ক ছিল যে প্রতি মুহূর্তে যাহা হইতেছে সে সংবাদ সম্প্রদায় পাইত। এসিয়াটিক দপ্তরেও এমন লোক ছিলেন যাঁহারা আসিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে সংবাদ দিতেন। আবার এমন লোকও ছিলেন যাঁহারা নিজে দুর্বল হইয়াও নেতারা যে দুর্বল হইবেন তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না এবং নেতারা যদি দৃঢ় থাকেন তবে তাঁহারাও থাকিতে পারিবেন এই ভরসায় তাঁহারা সত্যাগ্রহীদিগকে সংবাদ দিতেন। এইপ্রকার সতর্কতার জন্য সম্প্রদায় একবার সংবাদ পাইল যে অমুক রাত্রে, অমুক দোকানে, অমুক লোকেরা পাস করাইতে যাইবেন। সেইজন্য সম্প্রদায় হইতে প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হইল। তাহা ছাড়া দোকানে পাহারা বসানো হইল। কিন্তু মানুষের দুর্বলতা বেশী দিন চাপিয়া রাখা যায় না। রাত্রি

দশ-এগারোটার সময় ঐভাবেই কয়েকজন নেতা পাস করাইয়া লইলেন। এই ভাবে ভাঙ্গন ধরিল। পরদিন সম্প্রদায় ইঁহাদের নাম প্রকাশ করিয়া দিলেন। কিন্তু লজ্জাবোধেরও একটা সীমা আছে। স্বার্থ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে লজ্জা সরমে পালায় ও লোকে সত্যের সরল অথচ সঙ্কীর্ণ পথভ্রষ্ট হয়। ক্রমশঃ প্রায় পাঁচ শত লোক পাস করাইয়া লইলেন। দিনকতক এইভাবে পাস করাইবার জন্য ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কিন্তু লজ্জার ভাব কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে প্রকাশ্যভাবেই এসিয়াটিক দপ্তরে গিয়া পাস লইয়া আসিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রথম সত্যাগ্রহী কয়েদী

যখন এত চেষ্টা করিয়াও পাঁচ শতের বেশী লোককে দিয়া এসিয়াটিক বিভাগ পাস লওয়াইতে পারিল না, তখন কাহাকেও না কাহাকেও ধরিবে বলিয়া স্থির করিল। জার্মিস্টনে অনেক ভারতীয় বাস করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে রামসুন্দর পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চেহারা সাহসীর মত ছিল এবং তিনি কিছুটা বাক্‌পটুও ছিলেন। তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোকও জানিতেন। উত্তর ভারতবাসী বলিয়া তিনি তুলসী রামায়ণের কিছু দোঁহা ও চৌপাই জানিতেন। আবার নামেও পণ্ডিত হওয়ায় লোকের মধ্যে তাঁহার কিছুটা প্রতিষ্ঠা ছিল। কয়েক স্থানে তিনি ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। জারমিস্টনের কতকগুলি অনিষ্টকামী ভারতীয় এসিয়াটিক বিভাগে জানাইল যে যদি রামসুন্দর পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করা যায় তবে অনেক লোক আসিয়া পাস লইতে পারে। এই লোভে পড়িয়া রামসুন্দর পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার না করিয়া এসিয়াটিক বিভাগ কি আর থাকিতে পারেন? সুতরাং রামসুন্দর পণ্ডিত গ্রেপ্তার হইলেন। এই জাতীয় গ্রেপ্তারের ঘটনা এই প্রথম বলিয়া সরকার এবং সম্প্রদায় উভয়ের মধ্যেই খুব চাঞ্চল্য দেখা দিল। যে রামসুন্দর পণ্ডিতকে কেবল জার্মিস্টন জানিত, এক মুহূর্তেই তিনি সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় বিখ্যাত হইলেন। তিনি সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হইয়া উঠিলেন—যেন কোন মহাপুরুষের বিচার আরম্ভ

হইয়াছে। শান্তিরক্ষার কোনও আয়োজন করার দরকার না থাকিলেও সরকার সে ব্যবস্থা করিলেন। রামসুন্দর যেন সামান্ত অপরাধী নন—ভারতীয় সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি এইভাবে আদালত তাঁহার মর্যাদা দিলেন। উৎসুক ভারতীয়দের দ্বারা আদালত ভরিয়া গেল। রামসুন্দরের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। তাঁহাকে জোহানস্‌বার্গের জেলে রাখা হইল। তাঁহার জন্ত ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে আলাদা কামরা দেওয়া হইল। জনসাধারণ অবাধে তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিতেন। বাহির হইতে খাদ্য দেওয়া চলিত বলিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রত্যহ তাঁহাকে উত্তম খাদ্য পাক করিয়া পাঠানো হইত। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই পাইতেন। তাঁহার জেল হওয়ার দিন সম্প্রদায় খুব ধুমধাম করে। কেহ হতাশ না হইয়া বরঞ্চ উৎসাহিতই হইয়াছিলেন। জেলে যাওয়ার জন্ত শত শত লোক প্রস্তুত হইলেন। এসিয়াটিক বিভাগের আশা সফল হইল না। এমন কি জার্মিস্টনের এক ব্যক্তিও পাস লইতে গেল না। সম্প্রদায়েরই লাভ হইল। শীঘ্রই এক মাস পূর্ণ হইল, গান-বাজনা ও শোভাযাত্রা সহকারে রামসুন্দরকে সভাস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। উৎসাহের সহিত বক্তৃতা হইল। রামসুন্দরকে ফুলের মালায় বোঝাই করিয়া ফেলা হইল। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁহার সম্মানার্থে এক ভোজ দিলেন। এই রকম জেলে যাইতে পারিলে কী মজাই হইত ভাবিয়া শত শত ভারতীয় মনে মনে রামসুন্দরের সৌভাগ্যের ঈর্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু রামসুন্দর যে অচল পয়সা তাহা ধরা পড়িয়া গেল। এক মাসের জন্ত জেলে না গিয়া তাঁহার উপায় ছিল না, কেননা তাঁহাকে হঠাৎ ধরা হয়। বাহিরে যে বাবুগিরি তিনি করিতে পারিতেন না, জেলে তাঁহার সে-সকল জুটিয়াছিল। কিন্তু রামসুন্দরের মত ব্যসনাসক্ত কুঅভ্যাসের দাস ব্যক্তির নিকট কারা-জীবনের নিঃসঙ্গতা ও সংযম বড় বেশী বলিয়া মনে হইল। জেল-কর্মচারী ও সম্প্রদায়ের এত আদরেও জেল তাঁহার কষ্টকর লাগিয়াছিল। ট্রান্সভাল এবং সত্যাগ্রহকে নমস্কার করিয়া তিনি তাই স্থায়ীভাবে চলিয়া গেলেন। সব সম্প্রদায়েই এবং প্রত্যেক আন্দোলনেই খেলোয়াড় লোক থাকেন, আমাদেরও ছিল। ইহারা রামসুন্দরকে হাড়ে হাড়ে জানিতেন। কিন্তু তাঁহার দ্বারা সম্প্রদায়ের কিছু উপকার হইবে এই বিশ্বাসে তিনি উধাও হওয়ার পূর্বে তাঁহার গুপ্ত ইতিহাস আমাকে কেহ জানিতে দেন নাই। পরে জানিলাম যে রামসুন্দর গিরমিটিয়া, চুক্তির কাল পূর্ণ না করিয়াই পলাইয়া আসিয়াছেন। গিরমিটিয়া

হওয়ায় কোন পাপ নাই। পাঠকেরা শেষদিকে দেখিবেন যে গিরমিটিয়ারা এই আন্দোলনে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করার ব্যাপারে একটা বড় অবদান ছিল তাঁহাদের। চুক্তির মেয়াদ শেষ না করিয়া আসা অবশ্যই রামসুন্দরের অন্যায় হইয়াছিল।

রামসুন্দরের এত কথা তাঁহার দোষ দেখাইবার জন্য লিখি নাই, এই ঘটনা হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা জানাইবার জন্যই লিখিয়াছি। যাহাতে কেবল শুদ্ধ যোদ্ধা যুদ্ধে যোগদান করেন, তাহা দেখা প্রতিটি শুদ্ধ আন্দোলনের নেতাদের কর্তব্য। তবে নেতৃবৃন্দের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও অশুদ্ধ লোকের অনুপ্রবেশ আটকাইয়া রাখা যায় না। কিন্তু আন্দোলনের নেতৃবর্গ যদি নির্ভীক ও খাঁটি হন, তবে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অশুদ্ধ লোক প্রবেশ করিলেও শেষ অবধি আন্দোলনের ক্ষতি হয় না। যখন রামসুন্দরের আসল পরিচয় পাওয়া গেল, তখন তিনি নগণ্য হইয়া গেলেন। সম্প্রদায় তাঁহাকে ভুলিয়া গেল। এমন কি তাঁহার মাধ্যমেও আন্দোলনে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল। আমাদের আদর্শের জন্য তিনি যে কারাদণ্ড ভুগিয়া গেলেন তাহা আমাদের সপক্ষে গেল। তাঁহার জেলে যাওয়ার যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা স্থায়ী হইয়া গেল। আর তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অন্য দুর্বল লোক স্বয়ং যুদ্ধ হইতে সরিয়া পড়িলেন। আন্দোলনে আরও এইপ্রকার দুর্বলতার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, একথা ঠিক। তবে তাহাদের বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। তাহাতে কোনও প্রয়োজনও সাধিত হইবে না। সম্প্রদায়ের শক্তি এবং দুর্বলতার সঠিক মূল্যায়নের জন্য একথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে একজন নহে, অনেক রামসুন্দর ছিলেন। তবে একথা আমি বলিব যে আন্দোলন তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে কেবল সুবিধাই পাইয়াছে।

পাঠক যেন রামসুন্দরের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ না করেন। সকল লোকই অসম্পূর্ণ. কিন্তু যখন কাহারও মধ্যে অপরের অপেক্ষা অধিক অপূর্ণতা দেখা যায় তখন লোকে তাহাকে দেখাইয়া দোষ দিয়া থাকে। কিন্তু ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। রামসুন্দর তো ইচ্ছা করিয়া দুর্বল হন নাই। মানুষ নিজের স্বভাবের পরিবর্তন করিতে পারে, স্বভাবের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণরূপ অন্য ভাবাপন্ন কে করিতে পারে? জগদীশ্বর এতটা স্বাধীনতা মানুষকে দেন নাই। বাঘের পক্ষে নিজের গায়ের ডোরা বদলানো সম্ভব হইলে বোধ হয় মানুষের নিজের পক্ষে আপন আধ্যাত্মিক চারিত্র্যধর্মের বৈচিত্র্য

বদলানো সম্ভব। পলাইয়া গেলেও নিজের দুর্বলতার জন্য রামসুন্দরের ভিতরে কতটা অনুতাপ হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? তিনি যে পলাইলেন, ইহাও তাঁহার অনুতাপের একটা বিশেষ প্রমাণ বলিয়াই বা কেন গণ্য হইবে না? নির্লজ্জ হইলে তো তাঁহার পলাইবার প্রয়োজনই থাকিত না। পাস করাইয়া লইলে তো তাঁহাকে আর জেলে যাইতে হইত না। আরও কিছু গুরুতর কার্যও তিনি করিতে পারিতেন, এসিয়াটিক বিভাগের দালাল হইয়া অপরকে ভুলাইতে পারিতেন এবং এইভাবে সরকারের নিকট গণ্যমান্য একজন হইতে পারিতেন। এই সকল না করিয়া তিনি দুর্বলতার জন্য সম্প্রদায়ের কাছে মুখও দেখাইতে চাহিলেন না এবং এতদ্বারা সম্প্রদায়ের যে সেবা করিলেন—এই প্রকার উদার ভাবে কেন তাঁহার বিচার করিব না?

ঊনবিংশ অধ্যায়

ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন

সত্যাগ্রহ যুদ্ধের সকল আন্তরিক ও বাহ্য অস্ত্রের পরিচয় পাঠককে দেওয়া হইতেছে বলিয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে যে সাপ্তাহিক এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে, তাহার সহিত এবার পাঠককে পরিচিত করাইব। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বাহির করার সম্মান মদনজিৎ ব্যবহারিক নামে এক গুজরাটী মহোদয়ের প্রাপ্য। কয়েক বৎসর ধরিয়া কষ্টেস্বষ্টে একটি ছাপাখানা চালাইবার পর ইনি একখানা সংবাদপত্র বাহির করিতে মনস্থ করেন। তিনি স্বর্গগত মনসুখলাল নাজর ও আমার পরামর্শ লন। সংবাদপত্র ডারবান হইতে প্রকাশিত হইল। মনসুখলাল নাজর অবৈতনিক সম্পাদক হইলেন। সংবাদপত্রে প্রথম হইতেই লোকসান হইতেছিল। অবশেষে একটি গোলাবাড়ী কিনিয়া লইয়া ইহার কর্মীদের অংশীদারের মত করিয়া সেখানে সেই সকল লোকের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সেইস্থান হইতেই কাগজ চালানো স্থির করিলাম। এই স্থান ডারবান হইতে তের মাইল দূরে একটি সুন্দর পাহাড়ের উপর অবস্থিত। নিকটবর্তী স্টেশন 'ফিনিক্স' হইতে উহা তিন মাইল দূরে। সংবাদপত্রের নাম

প্রথম হইতেই "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" আছে। প্রথমে উহা ইংরাজী, গুজরাটী, তামিল ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইত। তামিল ও হিন্দী অংশ শেষকালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উহা নানাকারণে ভার-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। ফিনিক্সে থাকিতে চান এমন কোনও তামিল বা হিন্দী কম্পোজিং জানা কর্মী এবং লেখক পাওয়া যাইতেছিল না। আর পাওয়া গেলেও সে লেখার উপর তত্ত্বাবধান রাখার ব্যবস্থা ছিল না। যখন সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন ইংরাজী ও গুজরাটীতে ইহা চলিতেছিল। ঐস্থানের বাসিন্দাদের মধ্যে গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, তামিল ও ইংরাজ প্রভৃতি ছিলেন। মনসুখলাল নাজরের অকালমৃত্যুর পর হার্বার্ট কিচিন নামে এক ইংরাজ মিত্র সম্পাদক হইলেন। তাহার পর হেনরী পোলক দীর্ঘকাল ইহার সম্পাদনা করেন এবং আমরা কারারুদ্ধ হইলে সদাশয় পাদ্রী ডোক কিছুদিন এই দায়িত্ব পালন করেন। এই সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রতি সপ্তাহে ভাল করিয়া সমস্তখবর সম্প্রদায়কে দেওয়া যাইত। যে-সকল ভারতীয় গুজরাটী জানিতেন না ইংরাজীর সাহায্যেও তাঁহারা সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কতকটা শিক্ষালাভ করিতেন। ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজদিগের নিকট ইংরাজী 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সাপ্তাহিক সংবাদের সূত্র হইয়া উঠিল। আমি বিশ্বাস করি যে আভ্যন্তরীণ বলের উপর নির্ভরশীল যুদ্ধ সংবাদপত্র ব্যতীতও চালানো যায়। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইবে যে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' থাকার জন্য যে সুবিধা হইয়াছিল, সম্প্রদায়কে সহজে যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইতেছিল, পৃথিবীতে যেখানে যেখানে ভারতবাসী আছেন সেখানে যেমন ইহা দ্বারা আমাদের আন্দোলনের কথা প্রচার হইতেছিল, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ছাড়া অন্য উপায়ে তাহা কখনও হইতে পারিত না। সেইজন্য একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে এই যুদ্ধে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' খুব উপযুক্ত ও শক্তিশালী অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

এই যুদ্ধের জন্য এবং যুদ্ধকালে সম্প্রদায়ের মত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'রও পরিবর্তন হইতেছিল। এই সংবাদপত্রে প্রথমে বিজ্ঞাপন লওয়া হইত এবং ছাপাখানাতেও বাহিরের কাজ লওয়া হইত। আমি দেখিতে পাইলাম যে এই দুই কাজে আমাদের সবচাইতে ভাল ভাল কর্মীদের লাগিয়া থাকিতে হয়। বিজ্ঞাপন পাওয়া গেলে কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য আর কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য নহে তাহা স্থির করিতে প্রায়ই ধর্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইত। কোন বিজ্ঞাপন হয়ত লওয়ার উপযুক্ত নয়, অথচ সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রেরিত

হওয়ায় তাঁহার মনে আঘাত দেওয়ার ভয়ে সেই আপত্তিকর বিজ্ঞাপন লইতে বাধ্য হইতে হইত। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে ও তাহার পয়সা আদায় করিতে ভাল ভাল লোকের সময় যায়। তাহা ছাড়া খোশামুদি তো করিতে হয়ই কারণ বিজ্ঞাপনদাতারা ইহা তাঁহাদের অধিকার বলিয়া মনে করেন। এই সকল কথার সহিত ইহাও ভাবিতে লাগিলাম যে এই সংবাদপত্র যখন অর্থ রোজগারের জন্য নহে, সম্প্রদায়ের সেবার জন্য তখন এই সেবা জবরদস্তি করিয়া সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপানো ঠিক নহে। যদি সম্প্রদায় ইচ্ছা করে তবেই ইহা চালানো উচিত। সম্প্রদায়ের ইহা চালাইবার ইচ্ছার খাঁটি প্রমাণ হইবে এত অধিক সংখ্যায় ইহার গ্রাহক হওয়া যে ইহা স্বাবলম্বী হইতে পারে। অবশেষে আমাদের মনে হইল যে কয়েকজন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের লাভে সেবার নামে তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে যাওয়া অপেক্ষা সম্প্রদায়ের সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদপত্র সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নিজ কর্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া সকলের পক্ষেই সর্বতোভাবে মঙ্গলজনক। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা বিজ্ঞাপন লওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। ইহার সুফল এই হইল যে যাঁহারা বিজ্ঞাপনের কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারা এখন কাগজখানির উন্নতির জন্য সময় দিতে লাগিলেন। সম্প্রদায় অচিরাৎ বুঝিতে পারিল যে তাঁহারাই পত্রিকাটির মালিক এবং তাই ইহা চালাইবার দায়িত্বও তাঁহাদেরই। এই ব্যাপারে পত্রিকার কর্মীদের যাবতীয় উদ্বেগ দূর হইল। কর্মীদের এখন একমাত্র চেষ্টা রহিল সম্প্রদায় পত্রিকাটি চালাইতে চাহিলে তাহার জন্য পুরাপুরি খাটিয়া খালাস হওয়া। সকলকেই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র গ্রাহক হওয়ার জন্য বলিতে আর কোন লজ্জাও রহিল না। বরঞ্চ ঐ প্রকার বলাই কর্তব্য বলিয়া বোধ হইল। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র আন্তরিক বল ও চারিত্র্যধর্মের একটা পরিবর্তন হইয়া গেল এবং উহা একটা প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হইল। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা সাধারণতঃ বারো শত হইতে পনের শত ছিল। অতঃপর দিন দিন গ্রাহক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। চাঁদাও বাড়াইতে হইয়াছিল। তবুও যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোর চলিতেছিল তখন ইহার ৩৫০০ হাজার গ্রাহক হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পড়িতে সক্ষম ভারতীয়দের সংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশী ছিল না। সেইজন্য তিন হাজারের উপর পত্রিকার কাটতি খুবই সন্তোষজনক বলিতে হইবে। সম্প্রদায় কাগজখানাকে এমনি আপনার করিয়া লইয়াছিল যে সময়মত কখনো জোহানস্‌বার্গে উহা

আসিয়া না পৌঁছাইলে আমাকে রাশি রাশি অভিযোগ শুনিতে হইত। সাধারণতঃ রবিবার প্রাতে কাগজখানা জোহানসবার্গে পৌঁছাইত। আমি এমন অনেকের কথা জানি যাঁহাদের হাতে কাগজখানা পড়িলেই গুজরাটী অংশটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া তবে ছাড়িতেন। একজন পড়িতেন আর সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া শুনিতেন। যাঁহারা পড়িতে চাহিতেন তাঁহারা সকলে চাঁদা দিতে পারিতেন না, এজন্য কয়েকজনে মিলিয়া উহার গ্রাহক হইতেন।

বিজ্ঞাপন লওয়া বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছাপাখানায় বাহিরের কাজ লওয়াও অনুরূপ কারণেই বন্ধ করিলাম। কম্পোজিটারদের হাত কতকটা ফাঁকা হইল। এই সময়টা পুস্তক প্রকাশের জন্য দিতে পারা গেল। এখানেও পুস্তক বিক্রয় করিয়া লাভের আশা রাখা হয় নাই এবং এই যুদ্ধের সাহায্যকারী পুস্তক ছাপা হইত বলিয়া পুস্তকগুলির কাটতিও খুব হইত। এইভাবে কাগজ ও ছাপাখানা দুই-ই এই যুদ্ধে তাহাদের দেয় সাহায্য করিয়াছিল। আবার এদিকে সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যাগ্রহের ভাবও যেমন বদ্ধমূল হইতেছিল কাগজ এবং ছাপাখানারও তেমনি সত্যাগ্রহের দৃষ্টিতে নৈতিক উন্নতি হইতেছিল।

বিংশ অধ্যায়

ধরপাকড়

রামসুন্দরকে জেলে দিয়া সরকারের কোনও সুবিধা হয় নাই—ইহা আমরা দেখিয়াছি। উপরন্তু সরকার দেখিলেন যে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উৎসাহ দ্রুত বাড়িতেছে। এসিয়াটিক বিভাগের কর্মচারীরা মনোযোগের সহিত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পড়িতেন। এই আন্দোলন হইতে গোপনীয়তা ইচ্ছা করিয়া বর্জন করা হইয়াছিল। মিত্র, বিরোধী ও নিরপেক্ষ নির্বিশেষে যে কেহ সম্প্রদায়ের শক্তি ও দুর্বলতা কতখানি তাহা যদি জানিতে চাহেন তবে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ছিল তাঁহার কাছে খোলা পুস্তক। কর্মীরা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, এই আন্দোলনে গোপনীয়তার কোনও স্থান নাই। কেননা এই আন্দোলনে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবে না, ইহাতে কপট আচরণ বা চালাকির স্থান নাই এবং

ইহাতে জয়ের একমাত্র ভিত্তিই হইতেছে আভ্যন্তরীণ শক্তি। সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্যই ইহা একান্ত আবশ্যক ছিল যে যদি দুর্বলতার রোগ দূর করিতে হয়, তবে সর্বাগ্রে যথাযথভাবে উহা নির্ণয় করিতে হইবে এবং তাহার পর ভাল ভাবে উহার প্রচার করিতে হইবে। কর্মচারীরা যখন দেখিলেন যে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' চালাইবার ইহাই মূল নীতি তখন এই পত্রিকা তাঁহাদের ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রকৃত অবস্থার চিত্র পাওয়ার সহায়ক হইয়া উঠিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে যতক্ষণ কতকগুলি নেতা জেলের বাহিরে আছেন ততক্ষণ এই আন্দোলনের শক্তি কোনও ক্রমেই খর্ব করা যাইবে না। সেইজন্য নেতাদের মধ্যে কয়েকজনের উপর ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার আদালতে উপস্থিত হইবার হুকুম দিলেন। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে এই নোটিশ দিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা ভদ্রতাই দেখাইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিয়া নেতা কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া নোটিশ দেওয়া তাঁহাদের ভদ্রতার পরিচায়ক। ইহা তাঁহাদের এই বিশ্বাসেরও দ্যোতক যে নেতারা গ্রেপ্তার হইতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত। ১৯০৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ছিল শনিবার। সেইদিন নেতারা নোটিশ অনুযায়ী আদালতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, যেহেতু তাঁহারা আইনের নির্দেশমত এতাবৎ পাস লন নাই, সেই হেতু তাঁহাদিগের প্রতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রান্সভাল ত্যাগ করার হুকুম কেন দেওয়া হইবে না তাহার কারণ দেখাইতে হইবে।

ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কুইন নামে জোহানস্‌বার্গের চীনাদের একজন নেতা ছিলেন। এখানে প্রায় ৩০০।৪০০ শত চীনা ছিলেন যাঁহাদের অধিকাংশই ব্যবসাদার অথবা কৃষক। ভারতবর্ষ কৃষিকার্যের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু আমার মনে হয় যে কৃষিবিদ্যায় আমরা ভারতবর্ষে চীনাদের মত উন্নতি করিতে পারি নাই। আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে আধুনিক কৃষির উন্নতির বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা সেখানে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রহিয়াছে। এদিকে চীন ভারতবর্ষের মতই পুরাতন দেশ, সেইজন্য ভারতবর্ষের সহিত চীনের তুলনা করিলে উহা হইতে শিক্ষালাভ করা যাইবে। আমি জোহানস্‌বার্গের চীনাদের কৃষি-কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনাও করিয়াছি। আর তাহা হইতে আমার এই বিশ্বাস

হইয়াছে যে চীনারা আমাদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান এবং অধিকতর কর্মকুশল। আমরা অনেক সময় জমি পতিত রাখি, মনে করি উহাতে কোনও কাজ হইবে না। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের জমি সম্বন্ধে চীনাদের সূক্ষ্ম জ্ঞানবশতঃ সেই জমিতেই তাঁহারা ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে পারেন।

এই কালা কানুন চীনাদের উপরও প্রযোজ্য ছিল বলিয়া তাঁহারাও সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তবুও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই দুই সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ একত্র মিশাইয়া ফেলিতে দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র সংস্থার ভিতর দিয়া কাজ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার শুভ ফল এই হইয়াছিল যে যতক্ষণ দুই সম্প্রদায়ই নিজ কর্তব্য পালন করিয়া যাইবেন ততক্ষণ একে অপরকে সাহায্য করিতে পারিবেন। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কোনও এক দল যদি যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে অপর দলের মনোবল ক্ষুণ্ণ হইবে না এবং অন্ততঃ একেবারে বসিয়া পড়া হইতে তাঁহারা বাঁচিয়া যাইবেন। চীনাদের নেতা তাঁহার অনুগামীদের প্রতারণা করার পরেই তাঁহাদের অনেকে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি অবশ্য এই আপত্তিকর আইনের নিকট নতি স্বীকার করেন নাই। তথাপি একদিন প্রাতে একজন আসিয়া সংবাদ দিলেন যে চীনাদের নেতা চাইনীজ অ্যাসোসিয়েশনের খাতাপত্র ও টাকাপয়সার হিসাব না দিয়াই পলাইয়া গিয়াছেন। নেতার অভাবে অনুবর্তীগণের যুদ্ধ চালানো সর্বদাই কঠিন। তারপর নেতা যদি অপমানজনক কার্য করিয়া থাকেন তবে আঘাত আরও গুরুতর হয়। তবে ধরপাকড় আরম্ভ হওয়ার সময় চীনাদের মনোবল অটুট ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনও পাস লন নাই। সেইজন্যই ভারতীয় নেতাদের সহিত শ্রীযুক্ত কুইনের উপরও হাজির হওয়ার হুকুম আসিয়াছিল। কিছুকালের জন্য অন্ততঃ শ্রীযুক্ত কুইন ভালই কাজ করিয়াছিলেন।

প্রথম দলে যে সকল সত্যাগ্রহী নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম থাম্বি নাইডু। তাঁহার সহিত আমি পাঠকের এখন পরিচয় করিয়া দিব। থাম্বি নাইডুর বাড়ি তামিল দেশে, সেখান হইতে তাঁহার বাপ-মা মরিসাসে আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। স্কুল-কলেজের কোনও বিদ্যাই তিনি শিখেন নাই। কিন্তু দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা তাঁহার শিক্ষকের কাজ করিয়াছিল। তিনি বেশ ভালই ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তবে তাঁহার ব্যাকরণে হয়ত ভুল হইত। তেমনি করিয়াই তিনি তামিল ভাষাও শিখিয়াছিলেন। তিনি হিন্দী

বুঝিতে ও বলিতে পারিতেন এবং তেলেগুও কিছু কিছু জানিতেন। এই সকল ভাষায় তাঁহার অক্ষর-পরিচয় ছিল না। তারপর মরিসাস্ দ্বীপে ক্রিয়োল বলিয়া একরকম বিকৃত ফরাসী ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাও তিনি বেশ ভালরকম জানিতেন আর নিগ্রোদের ভাষা তো তিনি জানিতেনই। এতগুলি ভাষার সহিত কাজ চলার মত পরিচয় রাখা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নিকট নূতন কিছু নহে। শত শত ভারতবাসী সেখানে এই সকল ভাষার সহিত পরিচয় দাবি করিতে পারিতেন। এই সকল লোক প্রায় বিনা প্রয়াসেই বহু ভাষাবিৎ হইয়া যাইতেন। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া তাঁহাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে নাই, তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ রহিয়া গিয়াছে। যাঁহারা ঐ সকল ভাষা বলেন তাঁহাদের সহিত কথা বলিয়া ও অপরকে বলিতে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা এই সকল ভাষা শিখিতেন। ইহাতে তাঁহাদের মাথায় বিশেষ চাপ পড়ে না, বরং এই সহজ মানসিক অনুশীলনের ফলে তাঁহাদের বুদ্ধির বিকাশ হয়। থাম্বি নাইডুর বেলায় ইহাই হইয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রখর ছিল। নূতন বিষয় তিনি খুব সহজেই ধরিতে পারিতেন। তাঁহার বাক্‌পটুতা গুণ বিলক্ষণ ছিল। তিনি কখনো ভারতবর্ষ দেখেন নাই, তথাপি তাঁহার স্বদেশের প্রতি অপার প্রেম ছিল। তাঁহার রক্তের কণায় কণায় দেশপ্রেম প্রবাহিত হইত। তাঁহার মনের দৃঢ়তার ছাপ তাঁহার মুখের উপরও পড়িয়াছিল। তাঁহার শরীর ছিল খুবই সুগঠিত এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করার শক্তি তাঁহার ছিল। তাঁহাকে সভাপতির কার্য করিয়া জনসাধারণের নেতৃত্ব করিতে হোক অথবা মুটের কাজ—তিনি উহা সমান দক্ষতার সহিত করিতে পারিতেন। রাস্তায় মোট বহিয়া লইতে তাঁহার লজ্জা ছিল না। কোন কার্য হাতে লইলে তিনি দিনরাত কাহাকে বলে জানিতেন না। সম্প্রদায়ের জন্য নিজের সর্বস্ব বলি দিতেও তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন। হঠকারী না হইলে এবং ক্রোধ-বিমুক্ত হইলে কাছলীয়ার অবর্তমানে বীরপুরুষ থাম্বি নাইডু সহজেই ট্রান্সভালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতা হইতেন। ট্রান্সভালের যুদ্ধ চলাকালীন তাঁহার ক্রোধ অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে নাই, তাঁহার নানা সদ্‌গুণ মণি-মুক্তার ন্যায় জলজল করিত। কিন্তু আমি শুনিয়াছিলাম যে পরবর্তীকালে হঠকারিতা ও ক্রোধ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়া তাঁহার সদবৃত্তিগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সে যাহাই হউক, থাম্বি নাইডুর নাম দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে চিরকালই সর্বাগ্রবর্তী দলের সঙ্গেই থাকিবে।

ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যেক মামলা আলাদা করিয়া বিচার করিলেন এবং সকলকেই ট্রান্সভাল ত্যাগ করার হুকুম দিলেন। কাহাকেও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, কাহাকেও ৭ দিন, কাহাকেও বা ১৪ দিনের মধ্যে।

এই সময় ১০ই জানুয়ারী উত্তীর্ণ হওয়ায় আমরা দণ্ডাদেশ গ্রহণ করার জন্য আদালতে উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইলাম।

আমাদের কাহাকেও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম ছিল যে আমাদিগকে নির্দিষ্ট দিনে হয় ট্রান্সভাল ত্যাগ করিতে হইবে, নয়তো পাস দেখাইতে হইবে। সে হুকুম মানি নাই বলিয়া সকলেই অপরাধ স্বীকার করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

আমি একটি ছোট বিবৃতি দাখিল করিতে চাই এবং অনুমতি পাইয়া বলি যে, আমার মোকদ্দমা আর আমার পরে যাঁহাদের মোকদ্দমা হইবে তাহার মধ্যে একটা পার্থক্য করার আবশ্যকতা আছে। আমি সেইমাত্রই শুনিয়াছিলাম যে প্রিটোরিয়াতে আমার সহকর্মীদিগকে ম্যাজিস্ট্রেট তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং মোটারকম অর্থদণ্ডের সাজা দিয়াছিলেন। এই অর্থ অনাদায়ে আরও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে খুব কঠিন দণ্ড দিতে অনুরোধ করিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট আমার অনুরোধ রাখিলেন না। আমাকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। যে আদালত-গৃহে আমি বহুবার ব্যারিস্টার হিসাবে উপস্থিত হইয়াছি সেইখানেই আসামী হিসাবে উপস্থিত হওয়ায় আমার একটু কেমন-কেমন লাগিতেছিল। কিন্তু আমার বেশ স্মরণ আছে যে, মনে মনে আমি ব্যারিস্টাররূপে হাজির হওয়া অপেক্ষা সেদিনকার অপরাধী হিসাবে উপস্থিত অধিকতর সম্মানজনক ভাবিয়াছি। আর সেই জন্যই কয়েদীদের কাঠগড়ায় প্রবেশ করিতে আমি এতটুকুও দ্বিধা বোধ করি নাই।

আদালত-গৃহে তখন আমার সম্মুখে শত শত ভারতীয় ও সমব্যবসায়ী ভাই উপস্থিত ছিলেন। দণ্ডাদেশ হওয়ার পরমুহূর্তেই আমাকে হাজতে লইয়া যাওয়া হইল। আমি সম্পূর্ণ একাকী হইয়া পড়িলাম। পাহারাওয়ালা সেখানে কয়েদীদের বসিবার একটা বেঞ্চে আমাকে বসিতে বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমার মন কিছুটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি গভীর চিন্তায় ডু বিয়া গেলাম। আমার বাড়ি, যেখানে ব্যারিস্টারী করিয়াছি সেই আদালত-

গৃহ এবং জনসভা—এ সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। এখন আমি বন্দী। এই দুই মাস কালে কি হইবে? আমাকে কি এই পুরা সময়টাই জেলে থাকিতে হইবে? যদি লোকে অধিক সংখ্যায় নিজেদের প্রতিশ্রুতি মত জেলে আসিতে আরম্ভ করেন, তবে পুরা দুই মাস জেলে থাকিতে হইবে না। কিন্তু যদি তাঁহারা জেলে না আসেন তবে এই দুই মাস কালই দুই যুগ বলিয়া মনে হইবে। এসকল কথা উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহার শতভাগের একভাগের মধ্যে আমার মনের উপর দিয়া এই সকল চিন্তাপ্রবাহ বহিয়া গেল। তারপরই আমার লজ্জা হইল। কী মিথ্যাভিমান! এই আমিই না লোককে কারাগৃহকে সরকারের হোটেল বলিয়া মনে করিতে বলিয়াছি? আমিই না এই কালা কানুন অমান্যের জন্য দুঃখভোগকে সম্পূর্ণ আনন্দময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, আর এই আইনের প্রতিরোধের জন্য সর্বস্ব এবং এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করা পরম আনন্দ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি? এসকল জ্ঞান এখন কোথায় গেল? এই দ্বিতীয় চিন্তাস্রোত আমার উপর তেজস্কর ঔষধের ন্যায় ক্রিয়া করিল এবং নিজের নির্বুদ্ধিতায় আমি হাসিতে লাগিলাম। আমার সহকর্মীদের কি রকমের জেল দিবে, তাঁহাদিগকে কি আমার সঙ্গেই রাখিবে—এই সকল ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় দরজা খুলিয়া গেল, পুলিস আসিয়া আমাকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলিল। আমি চলিতে আরম্ভ করিলে সে আমাকে তাহার আগে আগে চলিতে বলিল এবং সে পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। সে আমাকে কয়েদীদের বন্ধগাড়ির নিকট লইয়া গিয়া উহাতে বসিতে বলিল। তারপর আমাকে জোহানস্বার্গ জেলের দিকে লইয়া চলিল।

জেলে লইয়া আমাকে আমার কাপড় খুলিয়া ফেলিতে বলিল। আমি জানিতাম যে জেলে লইয়া কয়েদীদের উলঙ্গ করা হয়। আমরা সকলেই স্থির করিয়াছিলাম যে আত্মসম্মান এবং ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী না হইলে সত্যাগ্রহী হিসাবে আমরা কারাগারের যাবতীয় বিধিবিধান স্বেচ্ছায় পালন করিব। পরার জন্য যে কাপড় দেওয়া হইল সেগুলি বড়ই ময়লা এবং উহা পরিতে মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। পরিতে দুঃখ হইলেও এখন কতকটা ময়লা সহ্য করিতে হইবে ভাবিয়া মনকে বশে আনিলাম। নামধাম লিখিয়া আমাকে একটা বড় সেলে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে কিছুক্ষণ থাকিতেই আমার সাথীরা হাসিতে হাসিতে ও গল্প করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি চলিয়া আসার পর মোকদ্দমা কেমন চলিয়াছিল ও কি

হইয়াছিল সে সকল কথা তাঁহারা আমাকে শুনাইলেন। আমার মোকদ্দমা হইয়া গেলে ভারতীয়েরা কালো নিশান হাতে লইয়া এক শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। পুলিস শোভাযাত্রা আক্রমণ করিয়া দুই-চারজনকে মার দিয়াছিল ইহাও জানিতে পারিলাম। আমাদের সকলকে একই জেলে ও সেলে রাখা হইবে ভাবিয়া আমরা খুব সন্তুষ্ট হইলাম।

প্রায় ছয়টার সময় সেলের দরজা বন্ধ হইল। দরজায় গরাদ দেওয়া ছিল না—ইহা ছিল নিরেট। দেওয়ালের গায়ে খুব উঁচুতে হাওয়া আসার জন্য একটি ফোকর ছিল। আমাদের মনে হইল যেন আমাদিগকে সিন্দুকে ভর্তি করা হইয়াছে।

জেলের কর্মচারীরা রামসুন্দরের সহিত যেমন সুন্দর ব্যবহার করিয়াছিলেন আমাদের সহিত তাহা করেন নাই। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। রামসুন্দর প্রথম সত্যাগ্রহী কয়েদী ছিলেন বলিয়া কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে কর্তৃপক্ষ তখনও তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। আমাদের দল বেশ বড় ছিল এবং সরকারের আরও গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য আমাদিগকে নিগ্রো ওয়ার্ডে রাখা হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে দুইটি বিভাগ ছিল—গোরাদের এবং কালা অর্থাৎ নিগ্রোদের। ভারতীয় কয়েদীদিগকে নিগ্রোদের সামিল ধরা হইত।

আমার সাথীদিগের আমারই মত বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। পরদিন সকালে জানিতে পারিলাম যে বিনাশ্রমে দণ্ডিত কয়েদীদের নিজের কাপড় পরার অধিকার আছে। আর যদি কেহ তাহা না পরিতে চান তবে তাঁহাদের জন্য যে স্বতন্ত্র পোশাক আছে তাহাই দেওয়া হয়। আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে বাড়ির কাপড় পরা ঠিক নয়, জেলের কাপড় পরাই ভাল। আমি কর্তৃপক্ষকে ইহা জানাইয়া দিলাম। তখন আমাদিগকে বিনাশ্রম নিগ্রো কয়েদীদের পোশাক দেওয়া হইল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে বহুল সংখ্যক বিনাশ্রমের নিগ্রো কয়েদী কখনই থাকিতেন না, সেইজন্য যখন আরও বিনাশ্রম দণ্ডপ্রাপ্ত সত্যাগ্রহী কয়েদী আসিতে লাগিলেন তখন সেরূপ কাপড় ফুরাইয়া গেল। এই ব্যাপার লইয়া ভারতীয় কয়েদীদের বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা ছিল না। সেই জন্য সশ্রম কয়েদীদের পোশাক পরিতে আপত্তি করি নাই। পরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ

এই পোশাকের বদলে নিজেদের পোশাকই পরিয়াছিলেন। আমার ইহা সঙ্গত বোধ হয় নাই। কিন্তু ইহা লইয়া পীড়াপীড়ি করার দরকার বোধ করি নাই।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন হইতে সত্যাগ্রহী কয়েদীতে জেল পূর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই ছিলেন ফেরিওয়ালা। দক্ষিণ আফ্রিকায় গোরা বা কালা সকল ফেরিওয়ালাকেই পাস লইতে হয়। উহা সকল সময়ই সঙ্গে রাখিতে হয় ও পুলিস দেখিতে চাহিলে দেখাইতে হয়। ইহাদের কাছে সাধারণতঃ প্রতিদিনই পুলিস পাস দেখিতে চায় এবং যাঁহাদের পাস না থাকে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া পাঠায়। আমাদের গ্রেপ্তারের পর সম্প্রদায় স্থির করিল যে জেল ভরিয়া ফেলিবে। এই কার্যে ফেরিওয়ালারা অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের গ্রেপ্তার হওয়া সহজ ছিল। তাঁহারা পাস দেখাইতে অস্বীকার করিলেই গ্রেপ্তার হইতেন। এইভাবে ধরায় এক সপ্তাহের ভিতর এক শতের বেশী কয়েদী হইয়া গেল। প্রতিদিনই কিছু কিছু কয়েদী আসিতেছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রের অভাব তাঁহারাই মিটাইতে ছিলেন। বহু সংখ্যক সত্যাগ্রহী ধরা পড়িতে আরম্ভ করায় সকলকেই বিনাশ্রমের বদলে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। সম্ভবতঃ বিচারকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার ফলে অথবা উপর হইতে ঐরূপ হুকুম আসায় কারণ সাজায় এই পার্থক্য হইতে লাগিল। আজও আমার বিশ্বাস যে আমাদের দ্বিতীয়োক্ত অনুমানই ঠিক। কারণ প্রথম কয়েকজন ছাড়া পরবর্তী কালে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে সকলকেই সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এমন কি স্ত্রীলোকদিগকেও রেহাই দেওয়া হয় নাই। কর্তৃপক্ষের এক ধরনের কোনও আদেশ না পাওয়া সত্ত্বেও সকল স্থানের সকল ম্যাজিস্ট্রেটেরই প্রত্যেককে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়াটা যদি একটা আকস্মিক ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাহা একটা আশ্চর্য ব্যাপার বলিতে হইবে।

জোহানস্‌বার্গ জেলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীরা সকালবেলায় মকাইয়ের আটার জাউ খাইতে পাইতেন। উহাতে লবণ মিশাইয়া দেওয়া হইত না, প্রত্যেক কয়েদীকে আলাদা করিয়া একটু লবণ দেওয়া হইত। দ্বিপ্রহরে দুই ছটাক ভাত, দুই ছটাক পাউরুটি, আধ ছটাক ঘি আর একটু লবণ দেওয়া হইত। সন্ধ্যাবেলায় মকাইয়ের জাউ আর তাহার সহিত তরকারি হিসাবে সাধারণতঃ দুইটি বা বড় হইলে একটি আলু। এই খোরাকে কাহারও পেট ভরিত না। ভাত নরম করিয়া ফেলা হইত। আমরা জেলের ডাক্তারের কাছে

কিছু মশলা চাহিলাম, ভারতীয় জেলে দেওয়া হয় বলিলাম। কড়া জবাব পাইলাম, এটা ভারতবর্ষের জেল নয়—কয়েদীরা খাওয়ার আস্বাদ পাওয়ার জন্য এখানে আসে না, মশলা দেওয়া হইবে না। আমাদের জন্য ডাল চাহিলাম, কেননা যে খাদ্য দেওয়া হইত উহাতে পেশীগঠনকারী কিছু ছিল না। তাহাতে ডাক্তার বলিলেন, "কয়েদীর চিকিৎসাশাস্ত্র লইয়া তর্ক করার প্রয়োজন নাই। পেশীগঠন-কারী খাদ্য অবশ্যই দেওয়া হয়, কেননা সপ্তাহে দুইবার মকাইয়ের পরিবর্তে সিমসিদ্ধ দেওয়া হয়।" যদি আট দিন অথবা পনের দিনে বিভিন্ন খোরাক হইতে মানুষের পাকস্থলী একসঙ্গে আবশ্যকীয় সার অংশ গ্রহণ করিতে পারিত, তবে ডাক্তারের যুক্তিটা ঠিক হইত। আসল কথা আমাদের কোন সুবিধা দিবার ইচ্ছা ডাক্তারের ছিল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদিগকে রান্না করিয়া লওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা থাম্বি নাইডুকে প্রধান পাচক করিয়া লইলাম। রান্না লইয়া তাঁহাকে প্রায়ই আমাদের হইয়া ঝগড়া করিতে হইত। তরকারি ওজনে কম দেওয়া হইলে তিনি পুরা চাহিতেন। সপ্তাহে যে দুই দিন তরকারী দেওয়া হইত সেই দুই দিন দুই বেলা রান্না হইত। অন্যান্য দিন কেবল একবার রাঁধা হইত। আমাদের হাতে রান্না আসার পর খাদ্য কতকটা সন্তোষজনক হইয়াছিল।

এই সকল সুবিধা পাই আর নাই পাই, আমরা প্রত্যেকে স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে সম্পূর্ণ সুখ ও শান্তিতে জেলে দিন কাটাইব। বাড়িতে বাড়িতে সত্যাগ্রহী কয়েদীদের সংখ্যা দেড় শত হইয়া গেল। আমাদের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ছিল বলিয়া এক ঘর সাফ্ করিয়া রাখা ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। আমরা কাজ চাহিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "যদি আপনাদিগকে কাজ দিই, তবে তাহা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। আমি এ বিষয়ে নিরুপায়। আপনাদের যতটা ইচ্ছা ঝাঁটপাট দিয়া সময় কাটাইতে পারেন।" ড্রিল ইত্যাদি ব্যায়ামের কথা বলিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম যে নিগ্রো সশ্রম কয়েদীদিগকে তাঁহাদের কাজের উপরন্তু ড্রিল করানো হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জবাব দিলেন, "আপনাদের ওয়ার্ডার যদি আপনাদিগকে ড্রিল করান তাহাতে আপত্তি করিব না, কিন্তু এরূপ করিতে তাঁহাকে আমি আদেশও দিব না। কারণ তাঁহার কাজ এমনিতেই বেশী আর অপ্রত্যাশিতভাবে আপনারা বিপুল সংখ্যায় আসিয়া পড়ায় তাঁহার কাজ আরও বাড়িয়াছে।"

আমাদের ওয়ার্ডার বড় ভালমানুষ ছিলেন; তাঁহার ঐটুকু অনুমতিরই

আবশ্যকতা ছিল। আনন্দের সহিত তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমাদিগকে ড্রিল করাইতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের কামরার সামনের ছোট্ট আঙ্গিনাটিতেই ড্রিল করিতে হইত। উহা কতকটা নাগরদোলার মতন হইত। ওয়ার্ডার শিক্ষা দিয়া চলিয়া গেলে নবাব খাঁ নামে একজন পাঠান আমাদিগকে শিখাইতে থাকিতেন। তাঁহার ইংরাজী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ আমাদের হাসির খোরাক যোগাইত। 'স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ'কে তিনি বলিতেন 'সাণ্ড্ লিজ'। দিনকতক তো আমরা বুঝিতেই পারি না যে ওটা কি রকম হিন্দী শব্দ। পরে বুঝিতে পারিলাম যে উহা নবাবখানী ইংরাজী।

একবিংশ অধ্যায়

প্রথম মিটমাট

এইভাবে দিন পনের কাটার পর নূতন কয়েদী হইয়া যাঁহারা আসিতেছিলেন তাঁহাদের নিকট সংবাদ পাওয়া গেল যে সরকারের সহিত মিটমাটের কথাবার্তা চলিতেছে। দুই-তিন দিন পরে 'ট্রান্সভাল লিডার' নামক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড কার্টরাইট আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন।

তখন জোহানস্বার্গে সকল দৈনিক পত্রিকার মালিকানাই সেখানকার সোনার খনির মালিকদের ছিল। খনির মালিকদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় ভিন্ন সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বিষয়েই সম্পাদকেরা অবাধে মত প্রকাশ করিতে পারিতেন। খুব বিদ্বান ও খ্যাতনামা ব্যক্তিরাই সম্পাদক হইতেন। যেমন 'স্টার' নামক দৈনিকপত্রের সম্পাদক একসময় লর্ড মিলনারের একান্ত সচিব ছিলেন। পরে তিনি বিলাতে 'টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাক্‌লের স্থলাভিষিক্ত হন। 'ট্রান্সভাল টাইম্‌সে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কার্টরাইট যেমন উদার, তেমনি যোগ্য ব্যক্তি। তিনি সাধারণতঃ সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভারতীয়দের পক্ষেই লিখিতেন। তাঁহার সহিত আমার গাঢ় স্নেহের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমি জেলে আসিলে তিনি জেনারেল্ স্মাট্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেনারেল স্মাট্‌স্ তাঁহার মধ্যস্থতা সানন্দে স্বীকার করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত কার্টরাইট ভারতীয় নেতাদের সহিত দেখা করেন।

তাঁহারা বলেন, আইনের গণ্ডগোলের কথা আমরা কিছু বুঝি না, গান্ধী যতক্ষণ জেলে আছেন ততক্ষণ মিটমাটের কথা চলিতে পারে না। আমরা মিটমাট চাই। যদি গান্ধী জেলে থাকিতে সরকার মিটমাট করিতে চাহেন তবে আপনি জেলে গান্ধীর সহিত দেখা করুন। গান্ধী যে শর্ত স্বীকার করিবেন আমরা সকলেই তাহা মানিয়া লইব।

শ্রীযুক্ত কার্টরাইট সেইজন্য আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি সঙ্গে জেনারেল স্মাট্সের দেওয়া অথবা অনুমোদিত মিটমাটের শর্ত আনিয়াছিলেন। আমি সেই শর্তগুলির অনির্দিষ্ট ভাষা পছন্দ করি নাই, তবুও একটি পরিবর্তন করিয়া ঐ শর্তে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি শ্রীযুক্ত কার্টরাইটকে জানাইলাম যে জেলের বাহিরে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মত আছে তাহা না হয় ধরিয়া লইব। কিন্তু জেলের ভিতরে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সহিত কথা না বলিয়া তো স্বাক্ষর করিতে পারি না।

শর্তগুলির ভাবার্থ এই ছিল যে, ভারতীয়েরা স্বেচ্ছায় তাঁহাদের নাম রেজিস্ট্রী করিবেন। কোনও আইনের বলে এই কাজ করা হইতেছে বলিয়া ধরা হইবে না। পাসে কি কি লেখা থাকিবে তাহা ভারতীয়দের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার স্থির করিবেন। অধিকাংশ ভারতীয় স্বেচ্ছায় নাম রেজিস্ট্রী করিলে সরকার কালা কানুন রদ করিবেন ও ঐ স্বেচ্ছামূলক রেজিস্ট্রীকে আইনসঙ্গত করিয়া লইবেন। শ্রীযুক্ত কার্টরাইট যে খসড়া আনিয়াছিলেন তাহাতে এ কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না যে সরকার কখন কিভাবে কালা কানুন প্রত্যাহার করিবেন। আমি তাই আমার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ইহাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য খসড়ায় কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে বলি।

এই সামান্য পরিবর্তনও আলবার্ট কার্টরাইটের পছন্দ হয় না। তিনি বলিলেন, "জেনারেল স্মাট্স্ ইহাকে অন্তিম খসড়া বলিয়া মনে করেন। আমার নিজের ইহা পছন্দ হইয়াছে আর আমি আপনাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, যদি আপনারা সকলেই স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী করেন, তবে কালা কানুন অবশ্যই রদ করা হইবে। আমি জবাব দিলাম, "মিটমাট হোক বা না হোক আপনার সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য আমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিব। খসড়ায় আমি কোনও অনাবশ্যক পরিবর্তনই করিতে চাই না। সরকারের মর্যাদা বজায় রাখার উপযুক্ত ভাষা ব্যবহারেরও আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু যেখানে উহার অর্থ সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে সেখানে পরিবর্তনের কথা

আমাকে বলিতেই হইবে। আর যদি সত্যসত্যই নিষ্পত্তি করিতে হয়, তবে দুই পক্ষেরই খসড়ায় পরিবর্তন করার অধিকার থাকা চাই। 'ইহাই অন্তিম শর্ত' এই কথা বলিয়া জেনারেল স্মাট্‌স্‌ আমাদের চরমপত্র দিলে চলিবে না। ভারতীয়দের সম্মুখে তিনি তো কালা কানুনের বন্দুক তুলিয়া ধরিয়াই আছেন। নূতন করিয়া আর কি ভয় দেখাইবেন ?" শ্রীযুক্ত কার্টরাইট আমার এই যুক্তির উত্তরে কিছু বলিতে পারিলেন না। আমার প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি তিনি জেনারেল স্মাট্‌সের নিকট পেশ করিবেন বলিলেন।

বন্দী সাথীদিগের সহিত পরামর্শ করিলাম। তাঁহাদেরও খসড়ার ভাষা পছন্দ হইল না। তবে যদি জেনারেল স্মাট্‌স্‌ পরিবর্তিত খসড়া গ্রহণ করেন তবে মিটমাট করা যায় বলিলেন। বাহির হইতে যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়া আসিলেন, তাঁহাদের দ্বারা নেতারা সংবাদ দিলেন যে তাঁহাদের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া আমি যেন উপযুক্ত শর্তে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলি। পরিবর্তিত খসড়ায় শ্রীযুক্ত কুইন, থাম্বি নাইডু ও আমার—এই তিনজনের স্বাক্ষর লইয়া তাহা শ্রীযুক্ত কার্টরাইটকে দিই।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে ১৯০৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে জোহানসবার্গের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে প্রিটোরিয়াতে জেনারেল স্মাট্‌সের নিকট লইয়া গেলেন। আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হইল। শ্রীযুক্ত কার্টরাইটের সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা তিনি বলিলেন। আমি জেলে আসার পরেও যে সম্প্রদায় দৃঢ় আছে সেজন্য আমাকে অভিনন্দন জানাইয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদের সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রতি আমার কদাচ বিরূপ ভাব নাই। আমিও ব্যারিস্টার তাহা আপনি জানেন। আমার সহিত কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রও ব্যারিস্টারী পড়িতেন। কিন্তু আমাকে আমার কর্তব্য করিতেই হইবে। গোরারা এই আইন চাহিতেছে। আমার সহিত আপনিও নিশ্চয় ইহাও স্বীকার করিবেন যে ইহাদের ভিতর বুয়ার অপেক্ষা ইংরাজই বেশী। খসড়ায় আপনি যে পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। জেনারেল বোথার সহিতও আমি কথাবার্তা বলিয়া লইয়াছি। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে অধিকাংশ ভারতীয় স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী করিলেই এসিয়াটিক আইন রদ করা হইবে। স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী আইনসঙ্গত করার একটা আইনের খসড়া তৈরী হইলে আপনার অভিমতের জন্য তাহার একটি নকল আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

আবার যে এরূপ ব্যাপার হয় তাহা আমি চাই না এবং আপনার স্বদেশবাসীর মনোভাবকে শ্রদ্ধা করিতে চাই।"

এই কথাবার্তার পর জেনারেল স্মাট্‌স্ উঠিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আমাকে কোথায় যাইতে হইবে? আর আমার সাথী অন্য কয়েদী-দেরই বা কি হইবে?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি তো এখন হইতেই মুক্ত। আপনার সাথীদিগকে কাল সকালেই মুক্ত করার জন্য টেলিফোন করিয়া দিব। কিন্তু আমার অনুরোধ যে আপনারা যেন বেশী সভাসমিতি ও হৈ-চৈ না করেন। তাহা হইলে সরকার বিরক্ত হইবে।"

আমি বলিলাম, "কেবল সভা করার উদ্দেশ্যে একটি সভাও করা হইবে না, সে বিষয়ে আপনাকে কথা দিতেছি। কিন্তু মিটমাট কিভাবে হইল, ইহার স্বরূপ কি, এক্ষণে ভারতীয়দের দায়িত্ব কত বাড়িল এ সমস্ত বুঝাইবার জন্য তো আমাকে সভা করিতেই হইবে।"

জেনারেল স্মাট্‌স্ বলিলেন, "এজাতীয় সভা যত ইচ্ছা করিবেন। এ ব্যাপারে আমি কি চাই তাহা যে আপনি বুঝিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট।"

সন্ধ্যা সাতটা বাজিয়া গিয়াছিল। আমার কাছে একটি পয়সাও ছিল না। জেনারেল স্মাট্‌সের সেক্রেটারী আমাকে জোহানস্‌বার্গে যাওয়ার ভাড়া দিলেন। প্রিটোরিয়ায় থাকিয়া সেখানকার ভারতীয়দের কাছে এই মীমাংসার সংবাদ প্রকাশ করার আবশ্যকতা ছিল না। নেতৃবৃন্দ সকলেই জোহানস্‌বার্গে থাকিতেন এবং আমাদের সদর দপ্তরও ঐস্থানে ছিল। জোহানস্‌বার্গের শেষ গাড়ি তখনও ছাড়ে নাই এবং আমি সেই গাড়ি ধরিতে সমর্থ হইলাম।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মিটমাটে বিরোধ ও আক্রমণ

আমি রাত্রি নয়টায় জোহানসবার্গে পৌঁছিয়া সোজা সভাপতি শেঠ ইউসুফ মিঞার বাড়িতে গেলাম। আমাকে যে প্রিটোরিয়াতে লওয়া হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেন। সেই জন্য আমি আসিব এ প্রকার কতকটা আশা করিয়াছিলেন। তবুও পাহারাওয়ালা ছাড়াই আমাকে আসিতে দেখিয়া তিনি ও তাঁহার সাথীরা আনন্দজনক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব তখনই একটি সভা আহ্বান করা আবশ্যক। সভাপতি ও অন্যান্য সকলে আমার কথায় সম্মত হইলেন। ভারতীয়েরা অধিকাংশই এক পাড়ায় থাকিতেন বলিয়া সভার সংবাদ দেওয়ার অসুবিধা ছিল না। সভাপতির বাড়ি মসজিদের নিকটেই ছিল। মসজিদের প্রাঙ্গণেই সাধারণতঃ সভা হইত। সভার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ কিছু করার ছিল না। সভামঞ্চের উপর একটি আলো হইলেই চলিয়া যাইবে। সেই রাত্রেই এগারটা-বারোটার সময় সভা হয়। এত রাত্রে এবং তাড়াহুড়া করিয়া সভা আহ্বান করা সত্ত্বেও সভায় প্রায় এক হাজার লোক হইয়াছিল।

সভা বসিবার পূর্বে আমি মিটমাটের শর্ত নেতাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ মিটমাটের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আমার বক্তব্য শুনিয়া সকলেই অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তবে সকলেরই মনে কিন্তু একটি সন্দেহ ছিল, "জেনারেল স্মাট্‌স্‌ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন! কালা কানুন কার্যতঃ প্রযুক্ত না হইলেও আমাদের মাথার উপর খাঁড়ার ন্যায় ঝুলিয়া থাকিতে পারে। ইতিমধ্যে যদি আমরা স্বেচ্ছায় নাম রেজিস্ট্রী করি তবে জ্ঞাতসারে শত্রুর হাতে গিয়া পড়া হইবে এবং কালা কানুনের প্রতিরোধ করার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র সমর্পণ করা হইবে। আগে ঐ আইন রদ করিয়া পরে আমাদের স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী করিতে বলা মিটমাটের সঙ্গত পন্থা হইত।"

এই যুক্তি আমারও মনে ধরিয়াছিল। এই যুক্তির প্রবক্তাদের তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধি ও নির্ভীকতায় আমি গর্বানুভব করিয়াছিলাম। সত্যাগ্রহীদের এই রকমই হওয়া চাই। এই যুক্তির উত্তরে আমি বলিলাম, "আপনাদের

বক্তব্য যথার্থ ও গভীরভাবে বিচার করার যোগ্য। কালা কানুন রদ করার পর স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী করা অপেক্ষা ভাল আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই ব্যবস্থাকে আপস আখ্যা দেওয়া চলে না। আপসের অর্থ হইল মূলনীতির প্রশ্ন না থাকিলে উভয় পক্ষকেই যথেষ্ট ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমাদের মূলনীতি হইতেছে এই যে আমরা কালা কানুন মানিয়া লইব না এবং সেই জন্য অন্য দিক দিয়া বিবেচনা করিলে যেসব কাজ অন্যায় তাহাও করিব না। এই নীতি আমাদিগকে সর্বতোভাবে বজায় রাখিতেই হইবে। সরকারের নীতি হইতেছে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের অবৈধ প্রবেশ বন্ধ করার জন্য বহুলসংখ্যক ভারতীয়দের দ্বারা দৈহিক সনাক্তকরণের চিহ্নের উল্লেখযুক্ত হস্তান্তরের অযোগ্য পাস লওয়ানো। ইহাতে গোরাদেরও সব রকমের ভয় দূর হইবে। এই নীতি সরকার ত্যাগ করিতে পারে না। সরকারের এই নীতি আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের আচরণের দ্বারা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সেইজন্য উহা আমাদের ভাল না লাগিলেও নূতন কোনও হেতু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত উহার বিরোধ করা উচিত হইবে না। আমাদের যুদ্ধ সরকারের ঐ নীতি পরিবর্তন করার জন্য নয়। ঐ আইনের মাধ্যমে আমাদের উপর যে হীনতার লাঞ্ছনা আরোপ করার প্রয়াস হইয়াছে—আমাদের আন্দোলন তাহার বিরুদ্ধে। আমরা সত্যাগ্রহী বলিয়া আমাদের মধ্যে যে নূতন ও প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে একটি নূতন অধিকার লাভের জন্য প্রয়োগ করা সমীচীন হইবে না। ইহাতে সত্য ম্লান হইবে। সেইজন্য বাস্তবিকপক্ষে আমরা এই মীমাংসার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। যতক্ষণ ঐ আইন রদ না হইতেছে ততক্ষণ আমাদের অস্ত্র ত্যাগ করা উচিত হইবে না—এই যুক্তির উত্তর সহজ। সত্যাগ্রহী ভয়কে চিরবিসর্জন দিয়াছেন। সেইজন্য তিনি বিরোধীকেও বিশ্বাস করিতে কখনো ডরান না। বিরুদ্ধ পক্ষ বিশবার তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকিলে একুশবারের বারও তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কারণ মানব-স্বভাবের প্রতি অবিচল আস্থাই তাঁহার নীতির সারমর্ম। যদি একথা বলা হয় যে সরকারকে বিশ্বাস করিলে আমরা তাহার হাতের মুঠোর ভিতর পড়িব, তবে তাহা সত্যাগ্রহের মূল নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। ধরিয়া লওয়া যাক যে আমরা স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী করিলাম এবং তাহার পরও সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন ও কালা কানুন রদ করার তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না। কিন্তু তাহা হইলে তখন কি আমরা

আর সত্যাগ্রহ করিতে পারিব না? পাস লইয়াও যদি আবশ্যক হইলে উহা দেখাইতে অস্বীকার করি তবে পাসের কোন মূল্য থাকিবে না। গুপ্তভাবে ট্রান্সভালে প্রবেশকারী ভারতীয় ও আমাদের মধ্যে সরকার তখন আর পার্থক্য করিতে পারিবে না। সেইজন্য আইন থাকুক আর যাক, আমাদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে সরকার আমাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। আইনের মানে তো মাত্র এই যে, সরকার যে সকল বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে চান আমরা তাহা স্বীকার না করিলে আমাদিগকে সাজা দেওয়া হইবে। সাধারণতঃ লোক সাজার ভয়েই আইন মানিয়া চলে। কিন্তু সত্যাগ্রহী এই সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে। তিনি যদি কোনও আইন মানিয়া চলেন, তবে সাজার ভয়ে নহে—তাহা মানিয়া চলাতেই লোকের কল্যাণ এই বিশ্বাসে চালিত হইয়া স্বেচ্ছায় আইন মানিয়া চলেন। এই পাস করিয়া লওয়া সম্বন্ধেও আমাদের এই অবস্থা। সরকার যতই বিশ্বাসঘাতকতা করুন না কেন, এই অবস্থা বদলাইতে পারিবেন না। আমরাই এই অবস্থার স্রষ্টা এবং আমরাই ইহার পরিবর্তন করিতে পারি। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যাগ্রহের অস্ত্র আমাদের হাতে আছে ততক্ষণ আমরা স্বাধীন ও নির্ভীক। আর যদি কেহ মনে করেন যে সম্প্রদায়ের আজকের শক্তি পরে আর থাকিবে না, তবে আমি বলিব যে তিনি সত্যাগ্রহী নহেন এবং সত্যাগ্রহ কি তাহা জানেন না। একথা বলার অর্থই এই যে সম্প্রদায়ের বর্তমান শক্তি খাঁটি নহে, উহা নেশার মত্ততার ন্যায় মিথ্যা ও ক্ষণিক। যদি তাহাই সত্য হয় তবে আমাদের জেতা উচিত নহে আর যদিও বা জিতিও তবে জেতার ফল হস্তচ্যুত হইবে। ধরিয়া নিন যে সরকার কালা কানুন রদ করিলেন এবং তাহার পর আমরা স্বেচ্ছায় পাস করাইলাম। তাহার পরও সরকার আবার ঐ আইনই পুনঃপ্রবর্তন করিয়া আমাদের রেজেস্ট্রী করানো বাধ্যতামূলক করিলে কে আর তখন সরকারকে আটকাইবে?

আর আজ যদি আমাদের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের মনেই আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলেও আমরা একই দুর্দশাতে পড়িব। এইজন্য যেদিক দিয়া ইচ্ছা মীমাংসার শর্তাবলী আলোচনা করুন না কেন, একথা বলা যায় যে এই মিটমাট দ্বারা সম্প্রদায়ের কোনও ক্ষতি হইবে না, বরঞ্চ লাভই হইবে। আমি তো ইহাও মনে করি যে, আমাদের বিরোধীরা আমাদের নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিলে পরে বিরোধ ত্যাগ করিবেন অথবা কম বিরোধ করিবেন।"

এইভাবে সেই ছোট দলের মধ্যে যে দুই-একজন বিরোধী ছিলেন

তাঁহাদিগকে ভাল করিয়াই ব্যাপারটা বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু মধ্যরাত্রের সেই সভাতে যে তুমুল কাণ্ড ঘটিবে স্বপ্নেও আমি তাহার কথা ভাবি নাই। সমস্ত মিটমাটের কথা সভায় বুঝাইয়া আমি বলিলাম:

"এই মিটমাটের জন্য সম্প্রদায়ের দায়িত্ব খুব বাড়িয়া গেল। আমরা ফাঁকি দিয়া অথবা লুকাইয়া একজনকেও ট্রান্সভালে আনিতে চাই না, ইহাই দেখানোর জন্য স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী করাইয়া লওয়া দরকার। কেহ যদি রেজিস্ট্রী না করেন, তবে বর্তমানে তাঁহার শাস্তি হইবে না। তবে তাহার অর্থ এই হইবে যে সম্প্রদায় মিটমাট মানিতেছে না। আপনারা এক্ষণে হাত তুলিয়া মিটমাটে সম্মতি দিন, ইহা আবশ্যক। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, আরও কিছু করিতে হইবে। রেজিস্ট্রী করার ব্যবস্থা হওয়া মাত্রই যাঁহারা হাত তুলিতেছেন তাঁহারা গিয়া নাম রেজিস্ট্রী করিয়া পাস লইবেই। আজ পর্যন্ত যাহাতে কেহ পাস না লন তাহা বুঝাইবার জন্য আপনারা যেমন স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিয়াছেন, এখন হইতে যাহাতে সকলে পাস লন তাহা বুঝাইবার জন্য আপনাদের স্বেচ্ছাসেবক হইতে হইবে। এইভাবে আমাদের করণীয় অংশ পূর্ণ করিলেই আমাদের জয়ের পরিপূর্ণ ফল ঠিক মত দেখিতে পাইব।

আমার বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্রই জনৈক পাঠান ভাই দাঁড়াইয়া আমার প্রতি প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন:

"এই মিটমাটের ফলে আমাদিগকে কি দশ আঙুলের টিপ দিতে হইবে?"

"হাঁ এবং না দুই-ই। আমার পরামর্শ যে সকলেই বিন্দুমাত্র আপত্তি না করিয়া দশ আঙুলের ছাপ দিবেন। কিন্তু বিবেক অথবা মর্যাদার দিক দিয়া যাহার আপত্তি আছে, তিনি যদি টিপ না দেন তবুও চলিবে।"

"আপনি নিজে কি করিবেন?"

"আমি দশ আঙুলের টিপ দেওয়াই স্থির করিয়াছি। আমি নিজে না দিয়া অপরকে দিতে বলিব, এ কার্য আমার দ্বারা হওয়ার নয়।"

"আপনি দশ আঙুলের টিপ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। টিপসহি অপরাধীর নিকট হইতে লওয়া হয়, ইহা আপনিই শিখাইয়াছেন। দশ আঙুলের টিপের জন্যই এই যুদ্ধ—একথা আপনিই বলিয়াছিলেন। সে সকল কথা আজ কোথায় গেল?"

"দশ আঙুলের টিপ সম্বন্ধে অতীতে যাহা যাহা লিখিয়াছি আজও আমি তাহা সমর্থন করি। আজও আমি বলিতেছি ভারতবর্ষে আঙুলের টিপ কেবল

অপরাধপ্রবণ উপজাতীয়গণের নিকট হইতে লওয়া হয়। কালা কানুনের ক্ষেত্রে দশ আঙুলের টিপ কেন, সহি দেওয়াও পাপ—ইহা আজও বলিতেছি। আমি দশ আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে অনেক জোর দিয়াছিলাম। উহা করিয়া সুবিবেচনার কার্যই করিয়াছিলাম বলিয়া এখনো মনে করি। কালা কানুনের অন্তর্ভুক্ত ছোটখাটো অন্যায় যাহার নিকট আমরা ইতিমধ্যেই নতিস্বীকার করিয়াছি, তাহার উপর জোর দেওয়া অপেক্ষা দশ আঙুলের ছাপের মত নূতন ও বিচিত্র দিকের উপর জোর দিয়া সমাজকে জাগ্রত করা সহজ এবং আমার অভিজ্ঞতায় দেখিতেছি যে উহা করা ভালই হইয়াছিল। ব্যাপারটি সম্বন্ধে সম্প্রদায় অবিলম্বে অবহিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ পরিস্থিতির পরিবর্তন হইয়াছে। যাহা করায় তখন জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ হইত, আজ তাহা করাই ভদ্রতার লক্ষণ—একথা আমি জোর দিয়াই বলিতে পারি। আপনি যদি আমাকে দিয়া জোর করিয়া নমস্কার করাইতে চাহেন, আর আমি তাহা করি তাহা হইলে জনসাধারণ, আপনাদের এবং আমার নিজের নিকটও আমি খাটো হইয়া যাইব। কিন্তু যদি আপনাকে ভাই বা সমান সমান গণ্য করিয়া স্ব-ইচ্ছায় সেলাম করি, তবে তাহাতে আমার নম্রতা ও ভদ্রতাই প্রকাশ পায়। আর ঈশ্বরের দরবারেও এই ঘটনা আমার সদাচারের নজির হিসাবে নথিভুক্ত হইয়া থাকে। এই যুক্তিতেই আমি সম্প্রদায়কে দশ আঙুলের ছাপ দিতে বলিতেছি।

"আমরা শুনিয়াছি যে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জেনারেল স্মাট্‌সের নিকট হইতে পনের হাজার পাউণ্ড লইয়া সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিক্রয় করিয়াছেন। আমরা কখনও দশ আঙুলের ছাপ দিব না এবং কাহাকেও দিতে দিব না। আল্লার নামে শপথ লইয়া আমি বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি রেজিস্ট্রীর জন্য এসিয়াটিক অফিসে যাওয়ায় অগ্রণী হইবেন আমি তাঁহাকে খুন করিব।"

"পাঠান ভাইদের মনোভাব আমি বুঝিতে পারিতেছি। ঘুষ খাইয়া আমি সম্প্রদায়ের বিক্রয় করিব, একথা অপর কেহ মনে করেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। দশ আঙুলের টিপ না দিতে যিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে না, একথা আমি প্রথমেই বলিয়াছি। প্রত্যেক পাঠান বা আর কেহ আঙুলের টিপ না দিয়া যদি পাস করাইতে চান, তবে তাঁহাকে তাহা করিতে আমি সাহায্যই করিব। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে আঙুলের টিপ না দিয়া এবং বিবেকের বিরুদ্ধে না গিয়াই তাঁহারা স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী করিতে পারিবেন। বন্ধুটির মারিয়া ফেলার ধমক আমার কাছে ভাল লাগে

নাই, একথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। খোদার নামে কাহাকেও মারিয়া ফেলার প্রতিজ্ঞা করা উচিত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। তাই ধরিয়া লইতেছি যে সাময়িক ক্রোধের বশেই এই ভাই মারিয়া ফেলার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তিনি কার্য করুন আর নাই করুন, এই মিটমাটের জন্য প্রধানতঃ আমিই দায়ী বলিয়া সম্প্রদায়ের সেবক হিসাবে আমার একান্ত কর্তব্য হইল সর্বাগ্রে আঙুলের ছাপ দিয়া রেজিস্ট্রী করানো। ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি যে তিনি যেন ঐ কার্য আমাকেই প্রথমে করিতে দেন। মৃত্যু সকল জীবের বিধিলিপি। রোগ বা ঐরূপ কোনও কারণে মরা অপেক্ষা নিজের কোনও ভাইয়ের হাতেই মৃত্যুবরণ করায় আমার দুঃখ নাই। আর সে সময়ও যদি আমার আততায়ীর প্রতি ক্রোধ বা দ্বেষ না থাকে তাহা হইলে আমার পরম গতিই হইবে এবং যিনি মারিবেন, তিনিও পরে বুঝিবেন যে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।”

এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার হেতু ব্যাখ্যা করা দরকার। যাঁহারা ঐ কালা-কানুন মানিয়া লইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ না থাকিলেও তাঁহাদের কাজের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় সভাসমিতিতে ও ‘ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে’ বলা হইত। এইজন্য তাঁহাদের জীবন দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা কখনো ভাবেন নাই যে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ঠিক থাকিবেন ও সরকারের উপর এমন চাপ দিবেন যে, সরকারকে মিটমাট করিতে হইবে। ১৫০ জনের বেশী সত্যাগ্রহী জেলে যাওয়ার পর যখন মিটমাটের কথা চলিতে লাগিল, তখন যাঁহারা আইন মানিয়া লইয়াছিলেন তাঁহাদের আরও খারাপ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ ছিলেন যাঁহারা মিটমাট হউক তাহা চাহিতেন না। মিটমাট হইলে উহা ভাঙিয়া ফেলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ট্রান্সভালে খুব অল্পসংখ্যক—সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশজনের অনধিক পাঠানই থাকিতেন। ট্রান্সভালে যুদ্ধের সময় যে সকল গোরা ও ভারতীয় সিপাহী আসিয়াছিলেন তাঁহারা যেমন এখানেই থাকিয়া গিয়াছিলেন, পাঠান সিপাহীদের মধ্যেও অনেকে তেমনি সেখানেই থাকিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার মক্কেলও ছিলেন। অন্যভাবেও আমিও তাঁহাদের সহিত অন্তরঙ্গ হইয়াছিলাম। তাঁহারা স্বভাবতই সাদাসিধা ও ভোলা ধরনের। তবে তাঁহারা খুবই সাহসী, কাহাকেও মারা ও মরা তাঁহাদের কাছেসামান্য ব্যাপার। কাহারও উপর

ক্রুদ্ধ হইলে তাহাকে মারপিট করা অথবা সময় সময় মারিয়া ফেলিতে তাঁহাদের বাধে না। এ বিষয়ে তাঁহাদের আপন-পরের জ্ঞান নাই। সহোদর ভাই-এর সহিতও তাঁহারা ঐ ব্যবহার করিবেন। ট্রান্সভালে তাঁহারা সংখ্যায় এত অল্প হইলেও তাঁহাদের মধ্যে একটা কলহ হইলেই মারপিট করিতেন। আমাকে সে সময় বহুক্ষেত্রে শান্তিস্থাপনার কাজ করিতে হইয়াছে। পাঠানেরা যখন কাহাকেও বিশ্বাসঘাতক মনে করেন, তখনই তাঁহাদের ক্রোধ দুর্দমনীয় হয়। তাঁহাদের ন্যায়বিচারের রীতিই হইতেছে মার লাগানো। ট্রান্সভালের এই পাঠানেরা সম্পূর্ণভাবেই সত্যাগ্রহ-যুদ্ধে ভাগ লইয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই কালা কানুন মানিয়া লন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করাও সহজ ছিল। আঙ লের টিপ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করা সম্ভবপর ছিল। "যদি ঘুষ না খাইয়া থাকি তবে আঙ লের টিপ দিতে বলিব কেন?"—এই একটা কথাই তাঁহাদের মন বিগড়াইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ট্রান্সভালে আর একটা দল ছিল। যাঁহারা গোপনে বা জাল পাস লইয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহারা অপরকেও ঐ ভাবে গোপনে অথবা জাল পাসের সহায়তায় আনাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতেন। এই দলও জানিত যে মিটমাট হইলে তাঁহাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবে। যুদ্ধ চলাকালীন কাহাকেও তো আর পাস দেখাইতে হইবে না। এইজন্য এই দল যুদ্ধ চলাকালীন জেলে যাওয়া এড়াইয়া নির্ভয়ে ঐ ব্যবসা চালাইতে পারিবে। যত বেশীদিন এই যুদ্ধ চলে ততই তাঁহাদের পক্ষে ভাল। এই দলও হয়ত পাঠানদিগকে উত্তেজিত করিয়া থাকিবে। এবার পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে হঠাৎ পাঠানেরা কেন এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐ পাঠানের প্রশ্ন সভায় কোনও প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আমি সভাস্থ সকলকে মিটমাটের বিষয়ে ভোট দিতে বলিলাম। সভাপতি ও অন্যান্য নেতারা ঠিক ছিলেন। পাঠানের সহিত এই কথা কাটাকাটির পর সভাপতি মহাশয় মিটমাটের শর্তাবলী ব্যাখ্যা করিয়া এবং সকলের তাহা স্বীকার করিয়া লওয়ার আবশ্যকতা বুঝাইয়া বক্তৃতা দেন। তাহার পর তিনি সভার মত গ্রহণ করেন। দুইজন পাঠান ব্যতীত আর সকলে একমত হইয়া মিটমাটের শর্তাবলী অনুমোদন করেন।

বাড়ি পৌঁছাইতে রাত দুইটা-তিনটা হইয়া গেল। খুব প্রত্যুষে উঠিয়াই

অপর সকলকে খালাস করার জন্য আমাকে জেলে যাইতে হইবে বলিয়া আর ঘুমানো গেল না। সকাল ৭টায় আমি জেলে উপনীত হই। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টেলিফোনে আবশ্যকীয় নির্দেশ পাইয়াছিলেন। তিনি কেবল আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সত্যাগ্রহী বন্দীরা মুক্ত হইলেন। সভাপতি ও অন্যান্য সকলে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। জেল হইতে আমরা সকলে সভাস্থলে যাই এবং তখন আবার একটি সভা হয়। সেদিন ও পরবর্তী দুই-চারদিন ভোজ ইত্যাদিতে ও লোককে মীমাংসার শর্তাবলী বুঝাইতে কাটিয়া গেল। যত দিন যাইতে লাগিল একদিকে যেমন লোকে মিটমাটের তাৎপর্য বুঝিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি আবার অবুঝের দলও বাড়িতে লাগিল। ভুল বোঝাবুঝির প্রধান প্রধান কারণ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়া জেনারেল স্মাট্‌সের নিকট লিখিত আমাদের পত্রেও ভুল বুঝিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সত্যাগ্রহ চলাকালীন যত না মুস্কিল হইত তদপেক্ষা অধিক মুস্কিল হইল এখন যেসব নানাপ্রকারের আপত্তি উঠিতেছিল তাহার জবাব দিতে গিয়া। যুদ্ধকালে বিরোধী পক্ষই কেবল আমাদিগকে কষ্ট দিয়া থাকেন। তাহা জয় করা সহজ, কেননা তখন অভ্যন্তরীণ সমস্ত দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ মুলতুবী থাকে আর নচেৎ সাধারণ বিপদের সম্মুখে উহার তীব্রতা কমিয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলে অভ্যন্তরীণ ঈর্ষা ও দ্বেষ পুনরায় পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠে। বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপস হইলে অনেকেই তাহাতে খুঁত ধরার ন্যায় সহজ ও প্রীতিকর কার্যে লাগিয়া যান। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে ছোট বড় সকলেরই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এই জাতীয় পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি অথবা আত্মকলহের সময় লোকে যে শিক্ষালাভ করে, শত্রুর সহিত যুদ্ধকালেও সে শিক্ষালাভ করা যায় না। বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত যুদ্ধ করায় একপ্রকার নেশা, একপ্রকার উল্লাস আছে। কিন্তু মিত্রদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বা মনান্তর অসাধারণ ঘটনা এবং তাই সর্বদাই দুঃখদায়ক। তাহা হইলেও ইহাই হইতেছে মানুষের পরীক্ষার সময়। আমি বরাবর এইরূপই দেখিয়া আসিয়াছি এবং আমার মনে হয় যে এই প্রকার অবস্থায় পড়িয়াই আমি আমার যাবতীয় আন্তরিক সম্পদকে সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যুদ্ধ চলার সময়ও ইহার প্রকৃত স্বরূপ যাঁহারা বুঝেন নাই মিটমাটের সময় ও মিটমাটের পরে তাঁহারা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গুরুতর

বিরুদ্ধতা কেবল পাঠানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এসিয়াটিক রেজিস্ট্রার স্বেচ্ছায় পাস গ্রহণ করার ব্যবস্থা অনুযায়ী সার্টিফিকেট বা পাস দিতে শীঘ্রই প্রস্তুত হইলেন। সার্টিফিকেট কেমন ধরনের হইবে তাহা সত্যাগ্রহী নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার ঠিক করিয়াছিলেন এবং উহা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপের হইল।

১৯০৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারীর সকালে আমরা কয়েকজন সার্টিফিকেট লইতে প্রস্তুত হইলাম। সার্টিফিকেট লওয়ার কাজটা যে তাড়াতাড়ি শেষ করা বিশেষ প্রয়োজন একথা সম্প্রদায়কে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাও স্থির করা হইয়াছিল যে নেতারা সকলেই প্রথম দিনেই গিয়া সার্টিফিকেট লইয়া আসিবেন। ইহাতে লোকের সঙ্কোচ ভাব ভাঙিবে, তাহা ছাড়া এসিয়াটিক দপ্তরের আমলারা সৌজন্যমূলক আচরণ করেন কিনা তাহা দেখা যাইবে এবং সমস্ত ব্যবস্থাটা কেমন চলিতেছে তাহাও বুঝা যাইবে।

আমার দপ্তরেই সত্যাগ্রহ এসোসিয়েশনেরও দপ্তর ছিল। আমি দপ্তরে পৌঁছাইয়া দেখি মীর আলম কয়েকজন সঙ্গী লইয়া দপ্তরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। মীর আলম আমার পুরানো মক্কেল, তাঁহার সকল কার্যেই তিনি আমার পরামর্শ লইতেন। মীর আলম ঘাস বা ছোবড়ার মাদুর তৈরি করাইয়া বিক্রয়ের ব্যবসা করিতেন। অনেক পাঠানই ঐ কাজ করিতেন। উহাতে বেশ লাভ ছিল। মীর আলম লম্বায় ছিলেন ছয় ফুটের উপর, আর তাঁহার শরীর বিশাল ও বলিষ্ঠ ছিল। এই প্রথম আমি মীর আলমকে দপ্তরের ভিতরে না বসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। তাঁহার চক্ষুর সহিত আমার দৃষ্টি মিলিলেও এই প্রথমবার আমাকে সেলাম করা তাঁহার বাদ পড়িল। আমি তাঁহাকে সেলাম করায় তিনি অবশ্য প্রত্যভিবাদন করিলেন। আমার রীতি অনুযায়ী আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছেন?" আমার মনে হয় তিনি যেন 'ভাল আছি' কি এমনি একটা কিছু জবাব দিলেন। কিন্তু অন্য দিনের মত আজ তাঁহার মুখের ভাব হাস্যময় ছিল না। দেখিলাম তাঁহার চোখ রোষে ভরা। মনে মনেই আমি উহা জানিয়া লইলাম। কিছু একটা ঘটিবে বলিয়া মনে হইল। আমি দপ্তরে প্রবেশ করিলাম। সভাপতি জনাব ইউসুফ মিঞা ও অন্যান্য মিত্রেরা আসিয়া পৌঁছাইলেন। আমরা এসিয়াটিক দপ্তর অভিমুখে রওনা হইলাম। মীর আলম ও তাঁহার সঙ্গীরাও আমাদের অনুসরণ করিলেন। আমার দপ্তর হইতে এসিয়াটিক দপ্তরের দূরত্ব এক

মাইলের কম। সেখানে যাইতে বড় রাস্তা ধরিয়া যাইতে হয়। সেখানে পৌঁছাইতে আর মিনিট তিনেকের পথ আছে এমন সময় মীর আলম আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছেন?"

আমি বলিলাম, "আমি দশ আঙুলের ছাপ দিয়া রেজিস্ট্রী সার্টিফিকেট আনিতে যাইতেছি। আপনি যদি আমার সহিত আসেন তবে কেবল আপনার দুই অঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিয়া পাস পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিব। প্রথমে আপনার রেজিস্ট্রী করাইয়া পরে দশ আঙুলের ছাপ দিয়া আমি করিব।"

আমি এই কথা বলিয়া শেষ করিয়াছি কি না করিয়াছি এমন সময় পিছন দিক হইতে আমার মাথায় লাঠির এক ঘা পড়িল। আমি "হা রাম" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম, পরে কি হইল জানি না। শুনিলাম মীর আলম ও তাঁহার সঙ্গীরা আমাকে আরও লাঠিপেটা করে এবং লাথি মারে। ইউসুফ মিঞা ও থাম্বি নাইডু কিছু মার আটকান। তাঁহাদের দুইজনের উপরও সেই জন্য কিছু মার পড়ে। তারপর গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। ইহাতে পথচারী গোরাদের কয়েকজন দাঁড়াইয়া যান। মীর আলম ও তাঁহার সঙ্গীরা পলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু গোরারা তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফেলেন। ইতিমধ্যে পুলিস আসিয়া পড়ে ও তাঁহাদের আটক করে। নিকটেই শ্রীযুক্ত গিবসন নামক এক-জন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের দপ্তর ছিল। আমাকে সেখানে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। আমার জ্ঞান হইলে দেখি যে রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত ডোক আমার মাথার কাছে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন এখন?"

আমি জবাব দিলাম, "ভাল আছি, তবে আমার দাঁত ও পাঁজরায় ব্যথা আছে।" তারপরেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মীর আলম কোথায়?"

"তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গের লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

"উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

"সে সব পরে হইবে। এখানে আপনি অপর এক ভদ্রলোকের দপ্তরে পড়িয়া আছেন। আপনার ঠোঁট ও গাল কাটিয়া গিয়াছে। পুলিস আপনাকে হাসপাতালে লইয়া যাইতে প্রস্তুত। কিন্তু যদি আপনি আমার ওখানে যান তবে শ্রীমতী ডোক ও আমি আমাদের সাধ্যমত সেবা করিতে পারি।"

"আমাকে আপনার ওখানে লইয়া চলুন। পুলিসকে ধন্যবাদ দিবেন, তাঁহাদিগকে বলিবেন—আপনার ওখানে যাওয়াই আমি পছন্দ করি।"

ইতিমধ্যে এসিয়াটিক দপ্তরের কর্তা শ্রীযুক্ত চামনী উপস্থিত হইলেন। এই সজ্জন পাত্রী একটি গাড়ী করিয়া আমাকে তাঁহার ওখানে লইয়া গেলেন। ডাক্তার ডাকা হইল। শ্রীযুক্ত চামনীকে আমি বলিলাম, "আমার আশা ছিল আপনার দপ্তরে গিয়া দশ আঙুলের ছাপ দিয়া সার্টিফিকেট লইব। ঈশ্বর সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না। কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি এইখানেই কাগজপত্র লইয়া আসুন ও আমার নাম রেজিস্ট্রী করুন। আমি আশা করি আমার পূর্বে আর কাহাকেও রেজিস্ট্রী করিবেন না।"

"এত তাড়াহুড়া কিসের? এখনি ডাক্তার আসিবেন। আপনি সুস্থ হোন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। অপরকে সার্টিফিকেট দিলেও আপনার নামের জন্ম উপরে ফাঁক রাখিয়া দিব।"

"এরূপ করিলে চলিবে না। কারণ আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে যদি জীবিত থাকি এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয় তবে আমিই সর্বপ্রথম সার্টিফিকেট লইব। সেইজন্মই আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনি এইখানেই কাগজপত্র লইয়া আসুন।"

অতঃপর তিনি কাগজপত্র আনিতে গেলেন।

ইহার পর আমার দ্বিতীয় কাজ হইল এটর্নী-জেনারেল ও সরকারী উকীলকে তার করিয়া জানানো যে মীর আলম ও তাঁহার সঙ্গীরা আমাকে যে মারপিট করিয়াছেন সেজন্ম আমি তাঁহাদিগকে অপরাধী মনে করি না এবং আমি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা চালাইতে চাই না। আমার আশা আছে যে আমার খাতিরে আপনারা উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন।

এই তারবার্তার উত্তরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে জানানো হইল।

কিন্তু জোহানস্‌বার্গের গোরারা এটর্নী-জেনারেলকে এক কড়া পত্র লিখিয়া জানান যে অপরাধীর শাস্তিদান বিষয়ে গান্ধীর মত যাহাই হোক্, এ মুল্লুকে তাহা চলিতে পারে না। অপরাধীরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া এই আক্রমণ করে নাই। প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁহারা এই অপরাধ করিয়াছেন। কয়েকজন ইংরাজও এই ঘটনার সাক্ষী। অপরাধীদিগের বিরুদ্ধে মামলা করা চাই। এই আন্দোলনের ফলে সরকারী উকীল মীর আলম ও তাঁহার একজন সাথীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করেন ও তাঁহাদের তিন মাস করিয়া কারাদণ্ড হয়। কেবল আমাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয় নাই।

এইবার আমার রোগশয্যার কথা। শ্রীযুক্ত চামনী কাগজপত্র আনিতে

গেলেন, এই অবসরে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছাইলেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং আমার উপরের ওষ্ঠ ও গালের যেখানে কাটিয়া গিয়াছিল তাহা সেলাই করিয়া দিলেন। পাঁজরা ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন আর সেলাই না খোলা পর্যন্ত কথা বলিতে মানা করিলেন। তরল পদার্থ ছাড়া আর কিছু খাওয়াইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে কোথাও সাংঘাতিক আঘাত লাগে নাই। সপ্তাহকালের মধ্যেই শয্যাত্যাগ করিয়া আমি স্বাভাবিক কাজকর্ম করিতে পারিব, তবে দুই-একমাস বেশী শারীরিক শ্রম যেন না করি—এই উপদেশ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কথা বলা এইভাবে বন্ধ হইলেও আমি তখনও হাত চালাইতে পারিতাম। সভাপতির হাতে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে একটি ছোট চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম এবং প্রকাশনার্থ তাহা সংবাদপত্রেও দিলাম :

আত্মীয়প্রতিম শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ডোক-এর তত্ত্বাবধানে আমি ভালই আছি। শীঘ্রই আমি আমার কর্তব্যে হাত দিতে পারিব আশা করিতেছি।

যাঁহারা আমাকে মারিয়াছেন তাঁহারা না বুঝিয়াই এই কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে আমি অন্যায় কার্য করিয়াছি। তাই সেই কল্পিত অন্যায়ের প্রতিকারের যে একমাত্র পন্থা তাঁহারা জানিতেন তাহার শরণ লইয়াছেন। তাই আমার অনুরোধ যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার আবশ্যকতা নাই।

এক বা একাধিক মুসলমান আমাকে প্রহার করিয়াছেন বলিয়া হিন্দুরা হয়ত ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। ইহা যদি সত্য হয় তবে হিন্দুরা পৃথিবী এবং তাঁহাদের স্রষ্টার চক্ষে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন। তাই আজ যে রক্তপাত হইয়াছে তাহা যেন উভয় সম্প্রদায়কে স্থায়ী সখ্যডোরে আবদ্ধ করে—ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ঈশ্বর যেন এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

মার খাই বা না খাই আমার পরামর্শ অপরিবর্তিতই থাকিবে। বিপুল সংখ্যক এসিয়াবাসীর আঙুলের ছাপ দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে যাঁহাদের বিবেকের বাধা আছে সরকার তাঁহাদের রেহাই দিবেন। ইহার অধিক আশা করা শিশুসুলভ ব্যাপার হইবে।

সত্যাগ্রহের তত্ত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকিলে মানুষ ঈশ্বর ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিবে না। অতএব বিপুল সংখ্যক সুবিবেচক ভারতবাসীকে কোন রকম ভীরুতামূলক ভয় নিজ কর্তব্য সম্পাদন হইতে প্রতিনিবৃত্ত

করিতে পারিবে না। স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী করিলে কালা কানুন প্রত্যাহৃত হইবে বলিয়া যখন প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে তখন সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করা প্রতিটি সৎ ভারতবাসীর পবিত্র কর্তব্য।

শ্রীযুক্ত চামনী কাগজপত্রসহ ফিরিয়া আসিলেন। আমি ব্যথার মধ্যেই আঙুলের টিপ দিলাম। এই সময় আমি লক্ষ্য করিলাম যে তাঁহার চক্ষে জল। তাঁহার বিরুদ্ধে আমাকে কড়া কথাও লিখিতে হইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে লোকের হৃদয় কেমন নরম হয় তাহার নিদর্শন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম।

পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে এই সকল কাজ সম্পূর্ণ হইতে কয়েক মিনিটের বেশী লাগে নাই। শ্রীযুক্ত ডোক ও তাঁহার সাধ্বী পত্নীর ইচ্ছা ছিল যে এই আক্রমণের পরে আমি যেন সম্পূর্ণ শান্ত ও সুস্থ হইয়া থাকি। তাই আক্রমণের পর মানসিক কাজ করিতে দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইলেন। উহাতে আমার পীড়া বাড়িতে পারে বলিয়া তাঁহাদের ভয় হইতেছিল। এইজন্য তাঁহারা ইশারা করিয়া ও অন্য উপায়ে আমার খাটের নিকট হইতে সকলকে সরাইয়া লইয়া গেলেন এবং আমাকে লিখিতে অথবা অন্য কিছু করিতে নিষেধ করিলেন। আমি লিখিয়া অনুরোধ জানাইলাম যে আমি যাহাতে শান্ত হইয়া শুইয়া পড়িতে পারি তাহার জন্য শুইবার পূর্বে তাঁহাদের ছোট্ট কন্যা অলিভ যেন আমার প্রিয় ইংরাজী ভজন "আলোয় নিয়ে চল প্রভু অন্ধকারের মাঝ হতে" (Lead kindly light) গায়।

আমার এই অনুরোধ শ্রীযুক্ত ডোকের খুব ভাল লাগিল এবং মধুর হাস্যে তিনি আমার অনুরোধে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অলিভকে ইশারা করিয়া ডাকিয়া দরজার পাশে দাঁড় করাইয়া তিনি তাহাকে মৃদুস্বরে ভজনটি গাহিতে বলিলেন। এই কথা লিখিবার সময় এখনও সমগ্র দৃশ্যটি আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে এবং অলিভের মিষ্টি স্বরের ঝঙ্কার যেন কানে আসিতেছে।

এই অধ্যায়ে এমন অনেক কথা লেখা হইয়াছে যাহা পাঠক এবং আমি উভয়েই অবান্তর মনে করি। তবুও আর একটি কথা না লিখিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যায় না। এই সময়কার সকল স্মৃতিই এত পবিত্র যে আমি তাহা বাদ দিতে পারি না। ডোক পরিবারের সেবার বিবরণ আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব?

জোসেফ ডোক ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের পাদরী ছিলেন। সে-সময় তাঁহার

বয়স ৪৬ বৎসর। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার পূর্বে নিউজিল্যাণ্ডে ছিলেন। এই আক্রমণের ঘটনার মাস ছয়েক পূর্বে তিনি আমার আপিসে আসিয়া কার্ড পাঠান। কার্ডে নামের পূর্বে "রেভারেণ্ড" দেখিয়া আমি মিছামিছি ভাবিয়াছিলাম যে, ইনি হয়ত কোনও পাদরী হইবেন—আরও কোন কোন পাদরীর মত যিনি আমাকে খ্রীষ্টান করার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। অথবা হয় সত্যাগ্রহ যুদ্ধ বন্ধ করার পরামর্শ দিবেন আর নয়ত মুরুব্বির মত এই যুদ্ধে আমাদের প্রতি সমবেদনা জানাইবেন। শ্রীযুক্ত ডোক প্রবেশ করার পর তাঁহার সহিত কয়েক মিনিট কথাবার্তা বলিতেই আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম। দেখিলাম যে যুদ্ধ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত যাবতীয় বিবরণের সহিত তিনি পরিচিত। তিনি বলিলেন, "এই যুদ্ধে আপনি আমাকে আপনাদের মিত্র বলিয়া জানিবেন। সাধ্যমত আপনাদের কোনও সেবা করা আমি আমার ধর্মীয় কর্তব্য মনে করি। যীশুর জীবন হইতে আমি যদি কিছু শিখিয়া থাকি তবে তাহা এই যে, দুঃখীর দুঃখের অংশ লইয়া তাঁহার ভার লাঘব করিতে হইবে।" আমাদের পরিচয় এইভাবে আরম্ভ হইল এবং প্রতিদিনই আমাদের ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা বাড়িতে লাগিল। শ্রীযুক্ত ডোকের নাম পাঠক পরে অনেকবার পাইবেন। তবে ডোক পরিবারের নিকট হইতে আমি যে দরদী সেবা পাইয়াছি তাহা বর্ণনা করিবার পূর্বে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল।

দিবারাত্র কেহ না কেহ আমার নিকট হাজির থাকিতেন। যতদিন আমি তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম ততদিন উহা যেন ধর্মশালা হইয়া গিয়াছিল। পরনে ময়লা কাপড়-চোপড়, হাঁটুসমান ধূলি, পোঁটলা-পুঁটলি সমেত ফেরিওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া নাতাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি সহ সকল শ্রেণীর ভারতবাসী আমার সংবাদ লইতে তাঁহাদের বাড়ীতে সমবেত হইতেন। পরে ডাক্তার দেখা করিবার অনুমতি দেওয়ায় দেখাও করিতেন। সকলকেই তিনি সমান আদরের সহিত নিজের বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইতেন। যতদিন সেখানে ছিলাম ততদিন হয় আমার পরিচর্যা, নয়ত আমার দর্শনার্থী শত শত লোককে অভ্যর্থনার কার্যেই তাঁহাদের সারাদিন কাটিয়া যাইত। রাত্রিতেও শ্রীযুক্ত ডোক দুই-তিনবার আমার কামরায় আসিয়া চুপে চুপে উঁকি মারিয়া দেখিয়া যাইতেন। তাঁহাদের স্নেহ-প্রীতির ছত্রচ্ছায়ায় থাকার সময় কখনও মনে হয় নাই যে ইহা আমার বাড়ী নয়, অথবা আমার নিকটতম আত্মীয়ও আমাকে ইহা

অপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে পারিতেন।

পাঠক মনে করিবেন না যে ভারতীয় সম্প্রদায়কে এইরূপ প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করা অথবা আমাকে তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁহাকে কোন কষ্টই সহ্য করিতে হয় নাই। ব্যাপটিস্ট-পন্থী গোরাদের এক গীর্জার তিনি ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহার জীবিকা ঐ পন্থী লোকেদের নিকট হইতেই আসিত। তাঁহাদের সকলেরই মন উদার ছিল না। ভারতীয়দের প্রতি সাধারণ অপ্রীতি তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অন্যান্য ইউরোপীয়দের-মতই ছিল। শ্রীযুক্ত ডোক তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। আমাদের পরিচয়ের প্রথমেই আমি এই বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করি। তিনি বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, যীশুর ধর্মকে আপনি কি মনে করেন? যে মানুষ নিজের ধর্মের জন্য সানন্দে ক্রুশে চড়িয়াছিলেন, যাঁহার প্রেম জগতের মতই বিশাল, আমি তাঁহারই দীন অনুগামী। যে গোরারা আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন তাঁহাদের নিকট যীশুর অনুগামী হিসাবে যদি আমি দাঁড়াইতে চাই তাহা হইলে আমার এই যুদ্ধে প্রকাশ্যভাবেই যোগ দেওয়া দরকার। আর যদি সেজন্য আমার মণ্ডলী যদি আমাকে ত্যাগ করে তবে তাহার জন্য আমি কোন অনুযোগই করিব না। আমার জীবিকা তাঁহারাই যোগান একথা সত্য, তবে একথা আপনি মনে করিবেন না যে জীবিকার জন্যই আমি তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছি অথবা তাঁহারাই আমার অন্নদাতা। আমার অন্ন ঈশ্বরই দিতেছেন। তাঁহারা নিমিত্ত মাত্র। তাঁহাদের সহিত আমার একটি অকথিত শর্ত আছে যে আমার ধর্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতায় তাঁহারা কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাই দয়া করিয়া আমার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করিবেন না। ভারতীয়দের উপর দয়া করিয়া নয়, কর্তব্যজ্ঞানে আমি এই যুদ্ধে আপনাদের পাশে দাঁড়াইতে চাই। তবে আমার ডীনের (গীর্জার প্রধান) সহিত আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া লইয়াছি।"

তাঁহাকে আমি বিনয়ের সহিত জানাইয়াছি যে ভারতীয়দের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা যদি তাঁহার পছন্দ না হয় তবে তিনি আমাকে বিদায় দিয়া অন্য পাদরী নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাকে কেবল নিশ্চিন্তই করেন নাই উপরন্তু উৎসাহও দিয়াছেন। তাহা ছাড়া একথা মনে করিবেন না যে সকল গোরাই আপনাদিগকে একই রকম বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে। আপনাদের প্রতি অনেক গোরার যে প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আছে আপনি তাহা না জানিতে পারেন, কিন্তু আমার স্থান হইতে আমার যে সে অভিজ্ঞতা

আছে সেকথা আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

এইপ্রকার স্পষ্ট আলোচনার পর এ বিষয়ে আর কোনও দিন কথা বলি নাই। ইহার পরে যখন আমাদের যুদ্ধ চলিতেছিল তখন শ্রীযুক্ত ডোক তাঁহার পবিত্র কার্যে রোডেসিয়ায় গিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার গীর্জায় ব্যাপটিস্ট-পন্থীরা তাঁহার স্মৃতিসভা করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বর্গীয় কাছলিয়া ও অন্য ভারতীয় সহ আমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমাকে সেখানে কিছু বলিতেও অনুরোধ করা হয়।

দিনদশেক পরে আমি একরকম চলাফেরা করার মত শক্তি সঞ্চয় করি। অতঃপর এই প্রেমময় পরিবারের নিকট হইতে বিদায় লই। আমাদের উভয়ের পক্ষেই এই বিচ্ছেদ দুঃখদায়ক হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গোরা সহায়কবর্গ

এই যুদ্ধে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গোরা প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া একস্থানে তাঁহাদের সকলের পরিচয় দেওয়া মন্দ নয়। পরে যখন যথাস্থানে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইবে তখন তাঁহা-দিগকে পাঠকের অপরিচিত বলিয়া মনে হইবে না এবং আমাকেও বক্তব্যের মাঝখানে তাঁহাদের পরিচয় দিতে হইবে না। নামগুলি একের পর এক করিয়া যেভাবে সাজানো হইয়াছে তাহাতে যেন পাঠক একথা মনে না করেন যে, উহা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার বা সাহায্যের ক্রম অনুসারে করা হইয়াছে। যাঁহার সহিত যখন পরিচয় অথবা আন্দোলনের যে কার্যে তাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গের ক্রম অনুসারে তাঁহাদের নাম সাজানো হইয়াছে।

প্রথম হইতেছেন শ্রীযুক্ত এলবার্ট ওয়েস্ট। এই যুদ্ধের পূর্ব হইতেই ভারতীয় সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। আমার সহিত পরিচয় তাহারও পূর্বে। যখন আমি জোহানসবার্গে দপ্তর খুলি তখন আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলেন না। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯০৩ সালে একটি তারবার্তা পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া আসি। তখন

আশা ছিল যে এক বৎসরের মধ্যেই ফিরিয়া যাইব। যে নিরামিষ ভোজনাগারে আমি প্রত্যহ দুই বেলা ভোজন করিতাম, শ্রীযুক্ত ওয়েস্টও সেইখানেই খাইতে যাইতেন। আমরা এইভাবে পরস্পরের সহিত পরিচিত হই। তিনি তখন জনৈক ইউরোপীয়ের সহিত একযোগে একটি ছাপাখানা চালাইতেছিলেন। ১৯০৪ সালে জোহানস্‌বার্গের ভারতীয়দের মধ্যে প্লেগের ভীষণ মড়ক দেখা দেয়। আমি সব সময়ই রোগীদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতাম বলিয়া হোটেলে আসা অনিয়মিত হইয়া পড়ে। যাহাতে আমার নিকট হইতে রোগের সংক্রমণ না হয়, সেইজন্য যখন হোটেলে লোক থাকিত না সেই সময় গিয়া খাইয়া আসিতাম। দুই দিন আমাকে উপর্যুপরি দেখিতে না পাইয়া ওয়েস্ট শঙ্কিত হইয়া পড়েন। তিনি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলেন যে আমি প্লেগ রোগীদের শুশ্রূষা করিতেছি। তৃতীয় দিন ছয়টার সময় আমি যখন হাতমুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতেছি তখনই ওয়েস্ট আসিয়া আমার দরজায় ঘা দিলেন। আমি দরজা খুলিতেই ওয়েস্টের হাসিমুখ সম্মুখে দেখিলাম!

সানন্দে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনাকে ভোজনাগারে না দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইয়াছিলাম। আমার দ্বারা যদি কোনও সাহায্য হইতে পারে তবে তাহা আমাকে বলিবেন।"

আমি ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রোগীর শুশ্রূষা?"

"নয় কেন? আমি প্রস্তুত আছি।"

ইতিমধ্যে আমি আমার পরিকল্পনা স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। আমি তাই বলিলাম, "আপনার নিকট হইতে অন্য কোনও উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারি নাই। কিন্তু শুশ্রূষার জন্য আমার সঙ্গে যথেষ্ট লোক আছেন। আপনার নিকট হইতে উহা অপেক্ষাও দুরূহ কাজের প্রত্যাশা করি। মদনজিৎ এখানে প্লেগ রোগীদের সেবার কার্যে রহিয়াছেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর ছাপাখানা দেখার কেহ নাই। আপনি ডারবানে গিয়া প্রেসের ভার লইলে যথার্থই খুব বড় সাহায্য করা হইবে। তবে আপনাকে আমি সামান্যই অর্থ দিতে পারিব। এই ধরুন, মাসে দশ পাউণ্ড এবং ছাপাখানা হইতে কোন লাভ হইলে তাহার অর্ধেক।"

"কাজটা কিছু শক্ত বটে। আমার অংশীদারের অনুমতি লইতে হইবে। কিছু টাকা পাওনা আছে, কিন্তু সেজন্য চিন্তা নাই। আজকার সন্ধ্যা পর্যন্ত কি আপনি আমাকে সময় দিবেন?"

"হ্যাঁ, ছয়টার সময় পার্কে আপনার সহিত দেখা হইবে।"

সেই অনুসারে আমাদের দেখা হয়। তিনি অংশীদারের সম্মতি লইয়াছিলেন। দেনাদারদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের ভার আমার উপরে অর্পিত হইল। পরের দিন সন্ধ্যার ট্রেনে তিনি রওনা হন। এক মাসের মধ্যে তাঁহার রিপোর্ট আসিল, "এই ছাপাখানা হইতে লাভ তো হয়ই না, অনেক লোকসান হয়। অনেক টাকা ধার পড়িয়া আছে, খাতাপত্রও ঠিক নাই। গ্রাহকদের সকলের নাম নাই, ঠিকানা নাই। আরও অনেক অব্যবস্থা রহিয়াছে। অভিযোগ হিসাবে এসব কথা আমি লিখিতেছি না। লাভের জন্য আমি এখানে আসি নাই। সেই জন্য একাজ যে ছাড়িব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। কিন্তু এ কথা আপনাকে জানাইয়া দিতেছি যে, আপনাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া পত্রিকার জন্য লোকসান দিয়া যাইতে হইবে।"

মদনজিৎ জোহানস্‌বার্গে আসিয়াছিলেন। পত্রিকার গ্রাহক করা ও আমার সহিত ছাপাখানার ব্যবস্থা লইয়া কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্য ছিল। প্রতি মাসেই আমাকে কিছু না কিছু লোকসান দিতে হইত। কিন্তু কত দিতে হইবে সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে বলিলাম। পাঠকেরা জানেন যে, প্রথম হইতেই মদনজিতের ছাপাখানার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্য তাঁহার সহিত একজন অভিজ্ঞ লোক দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। ইতিমধ্যে প্লেগ আরম্ভ হইল। এই ধরনের সেবাকার্যে তিনি খুব কুশল ও অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এখানে আটকাইয়া রাখিলাম। ওয়েস্ট যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে যাইতে স্বীকার করিলেন, তখন তাঁহাকে এই প্লেগের সময়টার জন্যই যাইতে না বলিয়া বরাবরের জন্যই যাইতে হইবে একথা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। আর সেইজন্যই পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপরোক্ত রিপোর্ট তিনি পাঠাইয়াছিলেন।

পরে সংবাদপত্র ও ছাপাখানা দুই-ই ফিনিক্সে লওয়া হয়, সে কথা পাঠক জানেন। সেখানে ওয়েস্ট বেতন হিসাবে দশ পাউণ্ডের পরিবর্তে তিন পাউণ্ড লইতেন। এই সমস্ত পরিবর্তনেই তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। কি করিয়া জীবিকা উপার্জন হইবে সে সম্বন্ধে কোনদিন চিন্তা ছিল না। তিনি ধর্মপুস্তকাদি অধ্যয়ন না করিলেও তাঁহাকে আমি অতিশয় ধার্মিক বলিয়া জানি। তিনি ছিলেন অতিশয় স্বাধীনচেতা। যাহা যেমন দেখিতেন তেমনই বলিতেন। কালোকে কৃষ্ণবর্ণ না বলিয়া কালোই বলিতেন। তাঁহার জীবনযাত্রা অতিশয় সরল ছিল। আমার সহিত যখন পরিচয় হয় তখন পর্যন্ত তিনি অবিবাহিত

ছিলেন এবং আমি জানি যে তাঁহার চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক। কিছুকাল পরে তিনি বিলাতে পিতামাতাকে দেখিতে যান এবং বিবাহ করিয়া ফিরেন। আমার পরামর্শমত স্ত্রী, শাশুড়ী ও কুমারী ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত সরলভাবে ফিনিক্সে ছিলেন এবং সব রকমেই ভারতীয়দিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। কুমারী ওয়েস্টের বয়স এখন ৩৫ বৎসর, এখনও বিবাহ করেন নাই এবং অতিশয় পবিত্র জীবনযাপন করিতেছেন। তাঁহার দ্বারাও কম সেবা হয় নাই। ফিনিক্সের শিশুদিগকে দেখাশুনা করা, তাহাদিগকে ইংরাজী শেখানো, সার্বজনিক পাকশালায় রান্না করা, বাড়ী পরিষ্কার রাখা, খাতাপত্র রাখা, ছাপাখানায় কম্পোজ ইত্যাদি কাজ করা—এ সমস্তই এই মহিলা বিনা দ্বিধায় করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি ফিনিক্সে নাই। আমি চলিয়া আসার পর তাঁহার যে সামান্য ব্যক্তিগত খরচার প্রয়োজন ছিল, তাহাও ছাপাখানা দিয়া উঠিতে পারিত না। ওয়েস্টের শাশুড়ীর বয়স এখন আশির উপর। তিনি সেলাইয়ের কাজ খুব ভাল জানিতেন। এই বৃদ্ধা এই দিক দিয়া খুব সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে সকলেই ঠাকুরমা বলিয়া ডাকিত ও সেইরকমই মনে করিত। শ্রীমতী ওয়েস্টের সম্বন্ধে কিছুই বলার আবশ্যকতা নাই। যখন ফিনিক্সের সকলেই জেলে চলিয়া গেলেন তখন ওয়েস্ট পরিবার মগনলাল গান্ধীর সহিত ফিনিক্সের সমস্ত কার্য পরিচালনা করিতেন। সংবাদপত্র ও ছাপাখানার সমস্ত কার্যই ওয়েস্ট করিতেন। আমার অথবা অন্যের অনুপস্থিতিতেও গোখলেকে ভারবান হইতে যে তারবার্তা পাঠাইতে হইত, তাহা তিনি পাঠাইতেন। অবশেষে ওয়েস্টকেও যখন গ্রেপ্তার করিল তখন গোখলে বিচলিত হইয়া এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনকে পাঠাইয়া দিলেন। ওয়েস্ট অবশ্য শীঘ্রই ছাড়া পাইয়াছিলেন।

আর একজন হইতেছেন শ্রীযুক্ত রিচ। তাঁহার সম্বন্ধে আমি পূর্বেই লিখিয়াছি। তিনি যুদ্ধের পূর্বে আমার দপ্তরে যোগদান করেন। আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের কাজের ভার লইবেন বলিয়া ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন। লণ্ডনের সাউথ আফ্রিকান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কমিটির সকল দায়িত্বই তাঁহার উপরে ছিল।

তৃতীয় ব্যক্তি শ্রীযুক্ত পোলক। তাঁহার সহিতও ওয়েস্টেরই মত ভোজন-গৃহে আপনাআপনি পরিচয় হয়। তিনিও মুহূর্তের মধ্যে 'ট্রান্সভাল ক্রিটিক' নামক পত্রের সহকারী সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র কার্য

গ্রহণ করেন। সকলেই জানেন যে এই যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি কিভাবে বিলাত ও সারা ভারতে ভ্রমণ করিয়াছেন। রিচ বিলাত যাওয়ার পরে তাঁহাকে ফিনিক্স হইতে জোহানস্‌বার্গে আমার দপ্তরে লইয়া আসি। সেখানে প্রথমে তিনি আর্টিকল থাকেন এবং পরে উকিল হন ও বিবাহ করেন। শ্রীমতী পোলককেও ভারতবাসীরা জানেন। তিনি তাঁহার স্বামীকে লড়াইয়ের কার্যে খুব সাহায্য করিতেন। তিনি কোনও দিন স্বামীর কার্যে বাধা দেন নাই। ভারতবর্ষের অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে পোলকদম্পতির আমাদের সহিত মতবিরোধ ছিল। তথাপি তাঁহারা যথাশক্তি ভারতবর্ষের সেবা করিতেছেন।

তারপর শ্রীযুক্ত হার্মন কলেনবেক। যুদ্ধের পূর্বেই ইঁহার সহিত পরিচয় হয়। তিনি জাতিতে জার্মান। ইংরাজ-জার্মান যুদ্ধ না হইলে তিনি আজ ভারতবর্ষে থাকিতেন। তাঁহার হৃদয় উদার ও শিশুর ন্যায় সরল। তাঁহার অনুভূতি অতিশয় তীব্র। পেশায় তিনি স্থপতি। তবে এমন কোন কাজই ছিল না যাহা করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন। জোহানস্‌বার্গের বাড়ী ছাড়িয়া দিবার পর তাঁহারই সহিত একত্র থাকিতাম। তিনি আমার খরচা যোগাইতেন। বাড়ী তো তাঁহার নিজেরই ছিল। খাওয়া-দাওয়ার খরচ দেওয়ার কথা বলিলে তিনি রুষ্ট হইয়া বলিতেন যে ব্যয়বাহুল্য করিয়া টাকা উড়াইয়া দেওয়া হইতে তাঁহাকে আমিই বাঁচাইয়া দিয়াছি। কথাটা বলার হেতু ছিল। সে যাহা হোক গোরাদের সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বর্ণনা করার স্থান ইহা নহে। জোহানস্‌বার্গের সত্যাগ্রহী বন্দীদের পরিবার-পরিজনবর্গকে যখন এক জায়গায় রাখা স্থির করি কলেনবেক তখন তাঁহার বিরাট খামারবাড়ী বিনা ভাড়ায় আমাদের দেন। তবে পরে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিব। গোখলে আসিলে সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কলেনবেকের বাংলোতেই রাখা হইয়াছিল। তাঁহার এই বাড়ীটি গোখলের অতিশয় পছন্দ হইয়াছিল। তিনি আমার সহিত জাঞ্জীবার পর্যন্ত গোখলেকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন। পোলকের সঙ্গেই তিনি গ্রেপ্তার হইয়া জেলভোগ করেন। অবশেষে যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা পরিত্যাগ করিয়া গোখলের সহিত ইংলণ্ডে দেখা করিতে যাই, তখন কলেনবেক আমার সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধের জন্য তাঁহাকে আমার সহিত ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য জার্মানদের সঙ্গে তাঁহাকেও ইংলণ্ডে নজরবন্দী রাখা হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে কলেনবেক দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাঁহার ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করেন।

এক্ষণে একজন মহদাশয়া বালিকার সহিত পাঠকের পরিচয় করাইব। তাঁহার নাম কুমারী সোঞ্জা শ্লেসিন। গোখলে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন পাঠকদিগকে তাহা শুনাইয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। গোখলের লোক চিনিবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। আমি তাঁহার সহিত ডেলা গোয়া বে হইতে জাঞ্জীবার পর্যন্ত যাই। এই সমুদ্রযাত্রা-কালে আমাদের নিরিবিলি কথাবার্তা বলার সুন্দর অবকাশ মিলে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রধান প্রধান লোকের সহিত গোখলের পরিচয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধ-নাটকের প্রধান প্রধান অভিনেতাদের চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি প্রধান স্থান কুমারী শ্লেসিনকে দেন—একথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। "কুমারী শ্লেসিনের ন্যায় এমন পবিত্র, কার্যের প্রতি এমন একনিষ্ঠ অনুরক্ত এবং এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। তিনি কোনও পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া ভারতীয়দের স্বার্থে তাঁহার সর্বস্ব যেভাবে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছি। এতদুপরি তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও কার্যকুশলতার কথা ভাবিলে তাঁহাকে তোমাদের এই আন্দোলনের এক অমূল্য সম্পদ বলিয়া ধরিতে হয়। আমার একথা বলাই বাহুল্য; তবুও বলিতেছি যে তুমি অবশ্যই তাঁহার পালন-পোষণ করিবে।" কুমারী ডিক্ নাম্নী এক স্কচদেশীয় বালিকা আমার টাইপিস্টের কাজ করিত। তিনি বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। আমার জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছি, কিন্তু তেমনি অনেক উদার-চরিত্র ইউরোপীয় ও ভারতবাসীকে সঙ্গীরূপে পাওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছি। কুমারী ডিকের বিবাহ হওয়ায় তিনি আমার কাজ ছাড়িয়া দিয়া যান। তাহার পর শ্রীযুক্ত কলেনবেক কুমারী শ্লেসিনকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি বলেন, "এই বালিকার মা ইহাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। এ খুব বুদ্ধিমতী ও সৎ, কিন্তু বড় দুষ্টু ও উদ্দাম প্রকৃতির—হয়ত বা কিছুটা উদ্ধতও হইবে। দেখুন যদি ইহাকে দিয়া আপনার কাজ চলে। কেবল বেতনের জন্য আমি ইহাকে আপনার কাছে দিতেছি না।" একজন ভাল টাইপিস্টকে আমি মাসিক কুড়ি পাউণ্ড করিয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু কুমারী শ্লেসিনের কর্মকুশলতার সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। শ্রীযুক্ত কলেনবেক বলিলেন যে তাঁহাকে প্রথম প্রথম মাসিক ছয় পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত হইলাম। কুমারী শ্লেসিনের ভিতরে যে দুষ্টামি ছিল শীঘ্র তাহার পরিচয় তিনি দিলেন। কিন্তু এক

মাসের মধ্যেই তিনি আমার হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন। দিনে-রাত্রে সকল সময়েই তিনি কাজের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার পক্ষে কোনও কাজই শক্ত বা অসম্ভব ছিল না। তাঁহার বয়স তখন মোটে ষোল বছর। কিন্তু আমার মক্কেলদিগকে ও সত্যাগ্রহী সহকর্মীদিগকে তিনি তাঁহার অকপটতা ও সেবার আগ্রহে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শীঘ্রই এই বালিকা কেবল আমার দপ্তরের ভিতরই নহে, সমগ্র সত্যাগ্রহ-সংগ্রামেরও নৈতিকতার রক্ষয়িত্রী ও প্রতিপালিকা হইয়া পড়িলেন। যে কাজ করিতে যাওয়া হইতেছে তাহার নৈতিক যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যখনই তাঁহার কোনও সন্দেহ হইত, তখনই তিনি খোলাখুলিভাবে তাহা আমার সহিত আলোচনা করিয়া সন্তোষ না পাওয়া পর্যন্ত থামিতেন না। যখন একমাত্র শেঠ কাছলীয়া ছাড়া আর সকল সত্যাগ্রহী নেতৃবৃন্দ জেলে, তখন কুমারী শ্লেসিনের হাতে বহু টাকা ব্যয় করার ও তাহার হিসাব রক্ষার ভার পড়িল। নানা ধরনের স্বভাববিশিষ্ট কর্মীর সহিত তাঁহার কাজ করিতে হইত। কাছলীয়াও সময় সময় তাঁহার শরণ ও পরামর্শ লইতেন। আমরা সকলে জেলে গেলে শ্রীযুক্ত ডোক্ 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'এর ভার লইলেন। কিন্তু তাঁহার মত শুভ্রকেশ ও বহুদর্শী ব্যক্তিও 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র জন্য যাহা লিখিতেন তাহা এই বালিকাকে দেখাইয়া অনুমোদন করাইয়া লইতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "কুমারী শ্লেসিন না থাকিলে তিনি নিজেকেই নিজের কার্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। তিনি যে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার মূল্যায়ন করা দুরূহ। অনেক সময়েই আমার রচনায় তিনি যে সকল পরিবর্তন ও সংযোজন করিয়াছেন উপযুক্ত বিবেচনায় সেগুলি আমি গ্রহণ করিয়াছি।" পাঠান, প্যাটেল, ভূতপূর্ব গিরমিটিয়া ইত্যাদি সকল শ্রেণী ও বয়সের ভারতীয় তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিতেন, তাঁহার পরামর্শ লইতেন এবং তদনুসারে কাজ করিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণতঃ গোরারা ভারতীয়দের সহিত এক গাড়ীতে বসেন না। ট্রান্সভালে তো এক গাড়ীতে চড়া নিষিদ্ধই। সত্যাগ্রহীর রীতি অনুসারে তিনি কিন্তু ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিতেন। গার্ড ইহাতে বাধা দিলে তিনি প্রতিরোধ পর্যন্ত করিতেন। আমার ভয় হইত কখন কুমারী শ্লেসিন গ্রেপ্তার হইয়া যান। তিনি কিন্তু গ্রেপ্তার হইতেই চাহিতেন। কিন্তু ট্রান্সভাল সরকার তাঁহার শক্তি, আন্দোলনের কৌশল সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এবং সত্যাগ্রহীদের হৃদয়ের উপর তাঁহার প্রভাব সম্বন্ধে জানিলেও, কুমারী শ্লেসিনকে গ্রেপ্তার না

করার নীতিতে অবিচল থাকিয়া সৌজন্যজ্ঞানের পরিচয় দেন। কুমারী শ্লেসিন তাঁহার মাসিক ছয় পাউণ্ড হাতখরচার বেশী কখনও চান নাই বা আশাও করেন নাই। তাঁহার কতকগুলি অভাবের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আমি মাসিক দশ পাউণ্ড করিয়া দিতে আরম্ভ করি। দ্বিধার সহিত তিনি ইহা গ্রহণ করিলেও ইহার অতিরিক্ত লইতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। "ইহার অতিরিক্ত আমার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু লইলে যে আদর্শের টানে আপনার নিকটে আসিয়াছি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।" এই জবাব পাইয়া আমি চুপ করিয়া গেলাম। কুমারী শ্লেসিনের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে। কেপ ইউনিভারসিটির ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দ্রুতলেখনে প্রথম বিভাগের ডিপ্লোমা পাইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হইয়া ট্রান্সভালের কোনও সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হন।

হার্বার্ট কিচন ছিলেন একজন ইংরাজ। তিনি বিদ্যুতের কাজ জানিতেন। তাঁহার হৃদয় ছিল স্ফটিকস্বচ্ছ। বুয়ার যুদ্ধে তিনি আমার সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র সম্পাদকতাও করেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

উপরে যাঁহাদের কথা বলিলাম তাঁহারা কার্যপ্রসঙ্গে আমার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। তাঁহাদের কাহাকেও ট্রান্সভালের গোরাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বলা চলে না। তবে নেতৃস্থানীয় শ্বেতাঙ্গদের নিকট হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইত। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বণিকসভার ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত হস্কেন। তিনি ট্রান্সভাল বিধানসভার সভ্যও ছিলেন। ইতিপূর্বেই পাঠকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে। তাঁহাদের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ যুদ্ধের সহায়ক গোরাদের এক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালন করা হয়। আন্দোলন যখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে তখন স্থানীয় সরকার সত্যাগ্রহীদের মধ্যে সরাসরি কথাবার্তার আর প্রশ্নই উঠে না। সত্যাগ্রহীর অবশ্য সরকারের সহিত সরাসরি বার্তালাপে কোন নীতিগত বাধা নাই। কিন্তু সরকার স্বভাবতই আইনভঙ্গকারীদের সহিত শলাপরামর্শ করিতে পারেন না। সেই সময় সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে গোরাদের সমিতিই মধ্যস্থতার কাজ করিতেন।

শ্রীযুক্ত আলবার্ট কার্টরাইটের সহিত আমি পূর্বেই পাঠকের পরিচয় করাইয়া

দিয়াছি। তারপর রেভারেণ্ড চার্লস ফিলিপসের কথা উল্লেখ করিব। ইনি ডোকের মতই আমাদের সহিত যোগ দেন ও সাহায্য করেন। রেভারেণ্ড ফিলিপস অনেক দিন হইতে গির্জার সাধারণ প্রার্থনায় পাদরীর কার্য করিতেন। তাঁহার গুণবতী স্ত্রীও আমাদের খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। আর একজন পাদরী সহায়ক ছিলেন শ্রীযুক্ত ডিউডনে ড্রু। ইনি পাদরীর কার্য ত্যাগ করিয়া ব্লুমফনটেনের দৈনিক 'ফ্রেণ্ড' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপীয়দের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহার কাগজে ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করিতেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন। এই রকমই আর একজন অযাচিত সহায়ক ছিলেন শ্রীযুক্ত ভেরেস্টেণ্ট। তিনি 'প্রিটোরিয়া নিউজের' সম্পাদক ছিলেন। একসময়ে প্রিটোরিয়ার টাউনহলে ইউরোপীয়দের এক সাধারণ সভা হয়। উদ্দেশ্য ছিল কালা কানুনকে সমর্থন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে নিন্দা করা। সেই সভায় বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বিরোধীদের মধ্যে তিনি একা প্রতিবাদ করিতে দাঁড়ান এবং সভাপতি কর্তৃক আদিষ্ট হইলেও বসিতে অস্বীকার করেন। ইউরোপীয়েরা তাঁহার গায়ে হাত তুলিবে বলিয়া ভয় দেখায়। তবুও তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া অবিচলিত রহিলেন। অবশেষে প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়াই সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

এমন গোরাও ছিলেন যাঁহারা কোনও সমিতির সহিত যুক্ত না হইয়াও সুবিধা পাইলেই ভারতীয়দিগকে সাহায্য করিতে ছাড়িতেন না। এমন অনেক গোরার নাম আমি দিতে পারি। তবে এক্ষণে আমি মাত্র তিনজন মহিলার কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন লর্ড হবহাউসের কন্যা কুমারী হবহাউস। বুয়ার যুদ্ধের সময় এই মহিলা লর্ড মিল্‌নারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ট্রান্সভালে আসেন। লর্ড কিচেনার তাঁহার বিখ্যাত বা কুখ্যাত আটক-শিবির স্থাপনা করিয়াছিলেন। সেখানে বুয়ার স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখা হইত। এই মহিলা তখন একাকী বুয়ার স্ত্রীলোকদিকের মধ্যে ঘুরিতেন, তাহাদিগকে সাহস দিতেন ও লর্ড কিচেনারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় হইয়া থাকিতে উপদেশ দিতেন। এই বুয়ার যুদ্ধে ইংরাজেরা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি তাহা সর্বতোভাবে অধর্মোচিত মনে করিতেন। তিনি সেইজন্য স্বর্গগত শ্রীযুক্ত স্টেডের ন্যায় চাহিতেন ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন যে, এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের যেন পরাজয় হয়। বুয়ারদিগকে এইভাবে সেবা করার পর তিনি শুনিলেন যে, সেই বুয়ারেরাই যাঁহারা অল্প কিছুদিন

পূর্বেই সর্বশক্তি লইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল এখন অজ্ঞ অন্ধ সংস্কারবশে নিজেরাই ভারতীয়দের প্রতি একটা অন্যায় করিতে চলিয়াছেন। বুয়ারেরা তাঁহাকে খুব প্রীতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিত। জেনারেল বোথার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঐ কালা কানুন প্রত্যাহারে বুয়ারদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁহার যাহা সাধ্য তাহা করেন।

অপর মহিলার নাম কুমারী অলিভ শ্রাইনার। তাঁহার কথা পূর্বেই এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত শ্রাইনার পরিবারের বিদুষী কন্যা। শ্রাইনার নাম এতই বিখ্যাত ছিল যে ইনি যখন বিবাহ করেন তখন ইঁহার স্বামীই শ্রাইনার নাম লন—উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রাইনার পরিবারের সহিত যে তাঁহার সম্পর্ক আছে একথা সেখানকার গোরারা যেন বিস্মৃত না হন। তাঁহার তুচ্ছ আত্মাভিমান ছিল না। এই মহিলার সরলতা ও নম্রতা তাঁহার বিদ্যার ন্যায়ই তাঁহার ভূষণ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গতা ঘটার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নিগ্রো চাকর ও নিজের মধ্যে কোনও প্রভেদ করিতেন না। 'ড্রিম্‌স্' এবং অন্যান্য পুস্তকের বিদুষী লেখিকা হওয়া সত্ত্বেও নিজের হাতে রান্না করিতে, বাসন মাজিতে ও ঘর ঝাড়ু দিতে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তিনি একথা স্বীকার করিতেন যে এইপ্রকার প্রয়োজনীয় কায়িক শ্রম তাঁহার লেখার শক্তি হ্রাস না করিয়া বরঞ্চ বাড়াইয়া তুলিত এবং ইহার ফলে তাঁহার রচনার ভাবধারা ও ভাষায় পরিমিতি বোধ ও ভালমন্দ বিচারের শক্তি স্পষ্ট হইত। দক্ষিণ আফ্রিকার গোরাদের উপর তাঁহার সমস্ত প্রভাবই এই প্রতিভাময়ী মহিলা ভারতীয়দিগের পক্ষে নিয়োগ করেন।

তৃতীয় মহিলা কুমারী মোল্‌টিনো। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাতন মোল্‌টিনো বংশোদ্ভবা বয়স্কা নারী ছিলেন। তিনিও যথাশক্তি ভারতীয়দের সাহায্য করেন।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে শ্বেতাঙ্গদের এত সব সাহায্যের ফল কি হইয়াছিল? তাঁহাদের সহানুভূতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা করিবার জন্য এই অধ্যায় লিখিত হয় নাই। উপরে কোন কোন মিত্রের যে সকল কার্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেই ফল পাওয়ার আংশিক প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে। সত্যাগ্রহের প্রকৃতিই এই যে যুদ্ধ করাতেই যুদ্ধ করার ফল থাকে। স্বাবলম্বন, স্বার্থত্যাগ ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার উপর সত্যাগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ আফ্রিকায়

সত্যাগ্রহের ইতিহাসে গোরা সহায়কদিগের নাম দেওয়ার একটি কারণ হইল তাঁহাদের প্রতি সত্যাগ্রহীদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা। ইহার উল্লেখ না থাকিলে এ ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সকল গোরা সহায়কেরই নাম আমি দিই নাই। বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিবার জন্য যাঁহাদের নাম নির্বাচন করিয়াছি তাঁহাদের মাধ্যমেই যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে ভারতীয়দের ধন্যবাদ দিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ সত্যাগ্রহী হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যে শুদ্ধচিত্তে কোনও কার্য করিলে চোখে দেখা যাক বা না যাক, তাহার পরিণাম শুভ হয়। সর্বশেষে উল্লেখ করিলেও আর একটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন আপনাআপনিই শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ সহায়ককে আকৃষ্ট করে। এ পর্যন্ত সেকথা স্পষ্ট না হইয়া থাকিলে স্পষ্ট করিয়া বলিব যে সত্যাগ্রহের যুদ্ধ সত্যের প্রকাশের জন্য। এই সত্যের প্রকাশের জন্য প্রয়াস ব্যতীত, গোরাদের সাহায্য লওয়ার আর কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াই ইউরোপীয় বন্ধুরা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আরও আভ্যন্তরীণ অসুবিধা

একবিংশতি অধ্যায়ে ভিতরের কতকগুলি অসুবিধার কথা বলিয়াছি। যখন আমার উপর আক্রমণ হয় তখন আমার পরিবার ফিনিক্সে ছিল। আক্রমণের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হইলেই অমনি রেলভাড়া দিয়া তাঁহাদের ফিনিক্স হইতে জোহানস্বার্গে আসা সম্ভবপর ছিল না। ভাল হওয়ার পর সেই জন্য আমারই যাওয়া উচিত ছিল।

কাজের জন্য আমাকে নাতাল ও ট্রান্সভালের মধ্যে যাতায়াত করিতেই হইত। মিটমাট লইয়া নাতালেও খুব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে একথা আমার ও অপরের নামে যেসব পত্র আসিত উহা হইতেই জানিতাম। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'ও মীমাংসার শর্তাবলীর বিরোধিতা করিয়া অনেক পত্র গিয়াছিল। তাহার এক তাড়া আমার নিকট ছিল। যদিও এ পর্যন্ত কেবল ট্রান্সভালেই

সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল, তথাপি নাতালের ভারতীয়দের সম্মতি ও সহানুভূতির প্রয়োজনীয়তা ছিল। ট্রান্সভালের ভারতীয়েরা শুধু ট্রান্সভালের জন্য নহে, সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের হইয়াই লড়িতেছিলেন। সেই হেতু নাতালের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যও আমার সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই আমি ডারবানে গেলাম।

ডারবানে ভারতীয়দের সাধারণ সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। কয়েকজন মিত্র আমাকে প্রথম হইতেই জানাইয়াছিলেন যে আমার উপর আক্রমণের আশঙ্কা আছে। সেইজন্য হয় আমি যেন সভায় যাওয়া বন্ধ রাখি, আর নচেৎ যেন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রাখি। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে একটিও আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। সেবককে মালিক ডাকা সত্ত্বেও সেবক যদি ভয়ে না যায়, তাহা হইলে তাহার সেবা-ধর্ম নষ্ট হয়। আর মালিকের সাজাকে যে ভয় করে, সে কেমন সেবক?

সেবার জন্যই জনসেবা করা তরবারির ধারের উপর দিয়া চলার মত কঠিন কাজ। জনসেবক যদি প্রশংসা লইতে প্রস্তুত থাকেন তবে নিন্দার হাত হইতে কেমন করিয়া পলাইবেন? আমি এইজন্য নির্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইলাম। মিটমাট কিভাবে হইল সে বিষয়ে আমি বলিলাম, শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশ্নেরও জবাব দিলাম। রাত্রি আটটা আন্দাজ সময়ে এই সভা হইতেছিল। কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় জনৈক পাঠান একটি বড় লাঠি লইয়া দ্রুতপদে মঞ্চের উপর আসিলেন। সেই সময় বাতিও নিভিয়া গেল। পরিস্থিতির তাৎপর্য অবিলম্বে আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম। সভাপতি শেঠ দাউদ মহম্মদ টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া জনসাধারণকে শান্ত করিতে লাগিলেন। আমাকে বাঁচাইবার জন্য মঞ্চোপরিস্থ কয়েকজন আমাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। যে সকল বন্ধু আক্রমণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পকেটে রিভলভার লইয়াই আসিয়াছিলেন এবং তিনি একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ইতিমধ্যে পার্শী রুস্তমজী আক্রমণের আভাস পাইয়া বিদ্যুৎবেগে দৌড়াইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডারকে খবর দিলেন। তিনি একদল পুলিস পাঠাইয়া দিলেন। এই গণ্ডগোলের মধ্যে পুলিস রাস্তা করিয়া আমাকে মাঝখানে রাখিয়া পার্শী রুস্তমজীর বাড়ীতে লইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে পার্শী রুস্তমজী ডারবানের পাঠানদের একত্র করিলেন

ও আমার বিরুদ্ধে তাঁহাদের যত অভিযোগ আছে তাহা বলিতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের সহিত দেখা করিলাম এবং তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে আমি সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। সন্দেহের এই বিষ দূর না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করা বৃথা। সন্দেহের প্রতিকার যুক্তি বা ব্যাখ্যা দ্বারা করা যায় না।

সেইদিনই ডারবান হইতে রওনা হইয়া ফিনিক্সে পৌছাইলাম। যে মিত্রেরা আমাকে পূর্বরাত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাকে একা পাঠাইতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা আমার সহিত ফিনিক্সে যাইবেন বলিলেন। আমি বলিলাম, "আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনারা যদি ফিনিক্সে আসেন তবে আমি আপনাদিগকে ঠেকাইতে পারি না। সেখানে তো জঙ্গল। আর সেখানকার বাসিন্দারা যদি আপনাদিগকে খাইতে পর্যন্ত না দেন তবে কি করিবেন?" জনৈক বন্ধু জবাব দিলেন, "ইহাতে আমরা ভয় পাইব না। আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করিয়া লইব। যতক্ষণ আমরা সিপাহীর কাজ করিতেছি, ততক্ষণ আপনাদের ভাঁড়ার ঘর লুণ্ঠন করা ঠেকাইবে কে?" এই ভাবে আমোদ-প্রমোদ করিতে করিতে আমরা ফিনিক্সে গেলাম।

আমার স্বতঃনিযুক্ত এই পাহারাদারদের দলের প্রধান ছিলেন জ্যাক মুডালী নামে ভারতীয়দের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি তামিল পিতামাতার সন্তান, নাতালেই জন্মিয়াছেন। মুষ্টিযুদ্ধে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীরা মনে করিতেন যে জ্যাক মুডালীকে হারাইতে পারে এমন গোরা অথবা কালো লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু বৎসর যাবৎ আমি এক বর্ষাকাল ছাড়া বরাবরই খোলা জায়গায় শুইতাম। সেদিনও সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। সেইজন্য স্ব-নিয়োজিত রক্ষকদল রাত্রে আমাকে পাহারা দেওয়া স্থির করিলেন। যদিও এই দলের উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্রূপ করিয়াছি তথাপি আমার এই দুর্বলতা স্বীকার করিতে হইবে যে, যখন তাঁহারা পাহারা দিতেছিলেন তখন মন অধিকতর নির্ভয় হইয়াছিল এবং মনে হইয়াছিল যে যদি ইঁহারা না আসিতেন তবে কি সত্যই এতটা নির্ভয় হইয়া শুইতে পারিতাম? আমার মনে হয় কোনও আওয়াজ হইলে আমি নিশ্চয়ই চমকিয়া উঠিতাম; আমি মনে করি যে ঈশ্বরের উপর আমার অবিচল শ্রদ্ধা আছে। অনেক বৎসর

হইতে আমার বুদ্ধি একথা মানিয়া লইয়াছে যে মৃত্যু একটা বড় পরিবর্তন মাত্র এবং যখনই আসুক উহা সমাদরে বরণ করার যোগ্য। হৃদয় হইতে মৃত্যুভয় সহ যাবতীয় ভয় দূর করিবার জন্য আমি মহাপ্রযত্ন করিয়াছি।

তবুও আমার জীবনে এমন একাধিক মুহূর্তের কথাও স্মরণ হয় যখন মৃত্যুর আগমনের সম্ভাবনায় বহুদিনের হারানো বন্ধুর দেখা পাইলে লোকে যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনভাবে আনন্দিত হইতে পারি নাই। মানুষ বলবান হওয়ার শতবিধ চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনেকসময় দুর্বল রহিয়া যায়। যে জ্ঞান কেবল বুদ্ধিতে আছে, হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে নাই, জীবনের সঙ্কট-মুহূর্তে তাহা বিশেষ কোন কাজে লাগে না। আবার লোকে যখন বাহুবলের আশ্রয় পায় ও তাহা স্বীকার করিয়া লয়, তখন নিজের অন্তরের বল বেশীর ভাগ স্থলেই খোওয়াইয়া বসে। সত্যাগ্রহীর এই ধরনের প্রলোভন হইতে সর্বদাই সতর্ক থাকা চাই।

ফিনিক্সে থাকাকালীন আমি একটা কাজ করিলাম। মীমাংসার শর্তাবলী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাবলী দূর করিবার জন্য খুব লিখিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যে ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের জন্য সম্পাদক ও সন্দিগ্ধ পাঠকের মধ্যে একটা কল্পিত কথোপকথনও ছিল। মীমাংসার শর্তাবলী সম্বন্ধে যত আশঙ্কার কথা ও সমালোচনা আমি শুনিয়াছিলাম তাহার বিশদ আলোচনা উহাতে করিলাম। ইহার পরিণাম ভাল হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। ট্রান্সভালের ভারতীয়দের মধ্যে মীমাংসার শর্তাবলী সম্বন্ধে সন্দেহের ভাব থাকিয়া গেলে তাহার ফল সত্য-সত্যই বিপজ্জনক হইত। দেখা গেল তাঁহাদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি দীর্ঘস্থায়ী হইল না। মিটমাট স্বীকার করা বা না করা কেবল ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়দের ব্যাপার। সেইখানে কার্যতঃ তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নেতা ও সেবক হিসাবে আমার পরীক্ষা হইতেছিল। শেষ অবধি কদাচিৎ এমন কোন ভারতীয় ছিলেন যিনি স্বেচ্ছায় সার্টিফিকেট লন নাই। নাম রেজিস্ট্রী করার জন্য এত ভিড় হয় যে এ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলারা কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয়গণ মিটমাটের শর্তের তাঁহাদের পালনীয় অংশ পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সরকারকেও একথা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমি দেখিয়াছিলাম যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস উগ্ররূপ ধারণ করিলেও তাহার ক্ষেত্র খুব সঙ্কীর্ণ ছিল। কয়েকজন পাঠান নিজের হাতে আইন লইয়া বলপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে অবশ্যই মহাচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যকে

বিশ্লেষণ করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, তাহার কোনও ভিত্তিই নাই এবং প্রায়শঃ ইহা ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। তবুও জগতে আজ এইভাবে বলপ্রকাশ করা একটা শক্তি বলিয়া গণ্য। কারণ খুনখারাপি দেখিলে আমরা বিচলিত হইয়া উঠি। কিন্তু ধৈর্যের সহিত এ সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই। ধরুন মীর আলম ও তাঁহার সঙ্গীরা কেবল আমার শরীর জখম না করিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিল। ধরুন তারপরও সম্প্রদায় সজ্ঞানে অবিচলিত ও শান্ত থাকিল এবং এই ভাবিয়া মীর আলম ও তাঁহার সঙ্গীদের ক্ষমা করিল যে তাঁহাদের জ্ঞান-বুদ্ধিমত তাঁহারা অন্য কিছুই করিতে পারেন না। এই জাতীয় মহান দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি না হইয়া বরং প্রভূত লাভই হইত। সকল সন্দেহ দূর হইত এবং মীর আলম ও তাঁহার সঙ্গীদের চোখ খুলিয়া যাইত ও তাঁহারা নিজেদের পন্থার অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারিতেন। আমারও পুরাপুরি লাভই হইত। কেননা সত্যাগ্রহী যদি সত্যের প্রতি আগ্রহ রক্ষা করিয়া সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়ায় না চাওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুলাভ করেন, তবে তাহা অপেক্ষা ভাল আর কিছুই হইতে পারে না। উপরের যুক্তি সত্যাগ্রহের ন্যায় যুদ্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে, যেখানে বৈরভাবের স্থান নাই। আত্মশক্তি অথবা স্বাবলম্বনই এই যুদ্ধপদ্ধতির একমাত্র মন্ত্র। এ যুদ্ধে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে না। ইহাতে নেতা কেহ নাই বলিয়া অনুগামী কেহ নহে। বলিতে গেলে সকলেই নেতা, সকলেই অনুগামী। সেইজন্য যত বড়ই হোক একজন যোদ্ধার মৃত্যুতে যুদ্ধে শৈথিল্য আসে না। পক্ষান্তরে উহা যুদ্ধকে বেগবান করে।

ইহাই সত্যাগ্রহের শুদ্ধ ও মূল স্বরূপ। তবে কাজের বেলায় আমরা এমনটি দেখি না, কেননা সকলেই বৈর ত্যাগ করে না। বাস্তব ক্ষেত্রে সকলেই সত্যাগ্রহের রহস্য বুঝেন না। অল্প লোকেই সত্যাগ্রহের স্বরূপ দেখিতে পান, বাদবাকী অধিকাংশ তাঁহাদের অন্ধ অনুকরণ করেন। তাহা ছাড়া টলস্টয়ের এই কথা সত্য যে ট্রান্সভালের সংগ্রাম সত্যাগ্রহের মূলনীতিকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োগের প্রথম প্রয়াস। শুদ্ধ গণ-সত্যাগ্রহের কোন ঐতিহাসিক উদাহরণ আমি পাই নাই। আমার ইতিহাসের জ্ঞান সীমিত বলিয়া এই বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না। তবে বাস্তবিকপক্ষে ঐতিহাসিক নজিরের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। সত্যাগ্রহের নীতি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে দিনের পর যেমন রাত্রি হয় তেমনি উহার

যে পরিণাম হওয়ার কথা আমি বলিয়াছি, তাহাই হইবে। প্রয়োগ করা কঠিন বা অসম্ভব—একথা বলিয়া এই অমূল্য শক্তিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অস্ত্রবলের পরীক্ষা তো হাজার হাজার বৎসর ধরিয়াই পৃথিবীতে হইয়াছে। মানবজাতি ইহার যে কুফল ভোগ করিতেছে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। আর ভবিষ্যতেও তাহা হইতে মধুর পরিণাম হওয়ার আশা আছে বলা যায় না। অন্ধকার হইতে যদি আলোর সৃষ্টি সম্ভবপর হয় তবেই কেবল বৈরভাব হইতে প্রেমভাব উৎপন্ন হইতে পারে।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

জেনারেল স্মাট্‌সের বিশ্বাসঘাতকতা (?)

পাঠকেরা অভ্যন্তরীণ অসুবিধা সম্বন্ধে কিছুটা জানিয়াছেন। উহা অনেকটা আমার জীবন-কাহিনীই হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা অনিবার্য, কেননা সত্যাগ্রহের ব্যাপারে আমার অসুবিধা সমভাবে সত্যাগ্রহীদেরও অসুবিধা হইয়া উঠে। এক্ষণে আমরা বাহ্য পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করিব।

এই অধ্যায়ের শীর্ষক এবং বিষয়বস্তু লিখিতে আমার লজ্জা হয়, কেননা ইহাতে মানুষের স্বভাবের বক্রতারই বর্ণনা রহিয়াছে। ১৯০৮ সালে জেনারেল স্মাট্‌স্ দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। আজও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং এমন কি সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতি-বিশারদদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতীব উচ্চে। তাঁহার সুউচ্চ কোটির যোগ্যতার বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যেমন বুদ্ধিমান উকিল, তেমনি দক্ষ সেনাপতি এবং তেমনি বিচক্ষণ প্রশাসক। ১৯০৭ সাল হইতে অনেক রাজনীতি-বিশারদ আসিয়াছেন ও গিয়াছেন। কিন্তু সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাজ্যপরিচালনার চাবিকাঠি প্রত্যুত এই ভদ্রলোকের হাতের মুঠার ভিতরে রহিয়াছে। আজও সেদেশে তাঁহার অদ্বিতীয় মর্যাদা। আমি আজ নয় বৎসর হইল দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়াছি। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার লোক জেনারেল স্মাট্‌সকে কোন্ শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধনে ডাকেন জানি না। তবে তাঁহার নিজ নাম হইতেছে জন্। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা তাঁহাকে 'স্লিম জনী' বলিত।

আমাকে অনেক ইংরাজ মিত্র জেনারেল স্মাট্‌স-এর সম্বন্ধে সাবধান থাকার কথা বলিয়াছিলেন। কারণ তিনি ভারী চালাক লোক, পিছলাইয়া পলাইতে তাঁহার আটকায় না। তাঁহার কথার অর্থ কেবল তিনিই বুঝিতে পারেন। সময় সময় তিনি এমনভাবে কথা বলেন যে উভয়পক্ষই তাঁহার বাক্যের অর্থ নিজের অনুকূলে করিয়া থাকে। কিন্তু সুযোগ আসিলেই তিনি এই দুই পক্ষের ভাষ্যই একধারে রাখিয়া তৃতীয় এক অর্থ উপস্থাপিত করিয়া তদনুযায়ী কার্য করিয়াছেন এবং নিজের সমর্থনে এমন সকল যুক্তি দিয়াছেন যে, তখনকার মত দুই পক্ষকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে যে তাঁহাদেরই ভুল হইয়াছিল এবং জেনারেল স্মাট্‌স ঠিকই বলিয়াছেন। আমি যে বিষয়ে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করিতে যাইতেছি সে বিষয়ে কিন্তু তৎকালেই আমরা তাঁহার কার্যকে বিশ্বাস-ঘাতকতা বলিয়াই মানিয়াছিলাম ও বলিয়াছিলাম। আজও আমি ভারতীয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ হইতে সেই ঘটনাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই গণ্য করি। তাহা হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশ্বাসঘাতক বিশেষণে আমি যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রয়োগ করিতেছি তাহার কারণ বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার কাজটা হয়ত স্বেচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না। বিশ্বাসঘাতকতার অভিসন্ধি না থাকিলে তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় না। ১৯১৩-১৪ সালে জেনারেল স্মাট্‌সের কার্য আমার নিকট তিক্ত বলিয়া বোধ হয় নাই। এবং আজ এতদিন পরে যখন আমার পক্ষে আরও নিরপেক্ষভাবে অতীত ঘটনা বিচার করা সম্ভব তখনও উহা তিক্ত মনে হইতেছে না। খুবই সম্ভব যে তাঁহার ১৯০৮ সালের ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার জ্ঞানকৃত বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপার নাও হইতে পারে।

তাঁহার প্রতি ন্যায়বিচার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামের সহিত বিশ্বাস-ঘাতক বিশেষণ যোগ করার জন্য আমি যাহা বলিতে যাইতেছি তাহা বলার জন্য এই প্রস্তাবনা আবশ্যক ছিল।

গত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয়েরা ট্রান্সভাল সরকারের সন্তুষ্টি-বিধান করিয়া কিভাবে স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রি করিয়াছিলেন। অতঃপর সেই কালা কানুন রদ করা সরকারের কর্তব্য। সরকার উহা করিলেই সত্যাগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে ইহার মানে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যত সব আইন আছে সে সকলই রদ হইয়া যাওয়া অথবা ভারতীয়দের সকল অভিযোগের নিরসন। তাহা দূর করার জন্য ভারতীয়দের নিজ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। সত্যাগ্রহ কেবল ঐ কালা কানুন রূপী নূতন ও অশুভ

মেঘপুঞ্জকে দিক্‌চক্রবাল হইতে অপসারিত করার জন্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। ঐ আইন স্বীকার করিয়া লইলে ভারতীয়দের মাথায় অসম্মানের পসরা চাপিত এবং প্রথমে ট্রান্সভাল হইতে ও পরে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাঁহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইত। কিন্তু ঐ কালা কানুন রদ করিবার পরিবর্তে জেনারেল স্মাট্‌স আর এক পা অগ্রসর হইলেন। কালা কানুন বহাল রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার নূতন এক আইনের খসড়া প্রকাশ করিলেন। ইহার বিধানের মারপ্যাচের ফলে স্বেচ্ছায় যাঁহারা রেজিস্ট্রি করিয়া পাস লইয়াছিলেন তাঁহাদের নূতন করিয়া আর এক দফা রেজিস্ট্রির প্রয়োজনীয়তা হইবে।

ইহা পড়িয়া আমি তো স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এখন ভারতীয় সম্প্রদায়কে আমি কি জবাব দিব! যে পাঠান ভাই মধ্যরাত্রির সেই সভায় আমার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন তাঁহার কি চমৎকার সুযোগ জুটিল? কিন্তু আমি বলিতে চাই যে এই আঘাত সত্যাগ্রহের উপর আমার বিশ্বাস শিথিল করার পরিবর্তে আরও বাড়াইয়া দিল। আমি কমিটির সভা আহ্বান করিয়া নূতন পরিস্থিতির কথা সদস্যবর্গকে বুঝাইলাম। কেহ কেহ আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "এখন হইল তো! আমরা তো আপনাকে বলিয়াই আসিতেছি যে, আপনি সহজেই গলিয়া যান। কেহ কিছু বলিলেই আপনি তাহা বিশ্বাস করেন। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এইপ্রকার ভালমানুষি করিলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু সার্বজনীক ব্যাপারে এইপ্রকারের অতি-বিশ্বাসে সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়। জনসাধারণের মধ্যে অতীতের উৎসাহ আবার ফিরাইয়া আনা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমরা, ভারতীয়রা কোন্ ধাতুতে গড়া তাহা আপনি জানেন। আমাদের সাময়িক উদ্দীপনার বন্যার অবকাশেই যতটুকু সম্ভব করিয়া লওয়া চাই। এই সাময়িক বন্যার উচ্ছ্বাসকে যদি কাজে না লাগান তো সব গেল।"

এই সকল শব্দ-বাণের মধ্যে বিষ ছিল না। অন্য ব্যাপারেও আমাকে এইরূপ শুনিতে হইয়াছে। আমি হাসিয়া জবাব দিলাম, "যাহাকে আপনারা ভালমানুষি বলিতেছেন তাহা আমার সত্তার অঙ্গ। ইহা ভালমানুষি নহে, বিশ্বাস। সকল মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখা আমার ও আপনাদের সকলেরই কর্তব্য। আর যদি আমার ত্রুটিই হয় তবে আমার গুণের মত এই ত্রুটিসহ-ই আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সম্প্রদায়ের উৎসাহ যে ক্ষণস্থায়ী একথা আমি মানি না। মনে রাখিবেন সম্প্রদায়ে আপনারাও আছেন, আমিও আছি।

আমার উৎসাহকে এইরূপ মনে করিলে অবশ্যই আমি তাহা অপমানজনক বলিয়া মনে করিব। আর আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে আপনারা যে সাধারণ বিধানের কথা বলিতেছেন আপনারা স্বয়ং নিজেদের তাহার ব্যতিক্রম বলিয়া মনে করেন। আর তাহা যদি না করেন তাহা হইলে সম্প্রদায়ের আর সকলকে আপনাদের মত দুর্বল মনে করিয়া সম্প্রদায়ের উপর অবিচার করিতেছেন। আমাদের এই সংগ্রামের মত মহাযুদ্ধে তো জোয়ার-ভাটা আসিবেই। প্রতিপক্ষের সহিত যতই সাফ্ বোঝাপড়া করুন না কেন, বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাঁহার বাধা কোথায়? আমাদের মধ্যেই এরূপ অনেকে আছেন, যাঁহারা প্রমিসারী নোটের উপর টাকার দাবি উশুল করিতে আমার নিকট আসেন। নিজের দস্তখৎ দিয়া যে কড়ার করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা স্পষ্ট স্বীকৃতি আর কি হইতে পারে? তাহা হইলেও তাঁহাদের নামে নালিশ করিতে হয় এবং তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধতা করেন ও নিজের সপক্ষে অনেক কথা বলেন। অবশেষে ডিক্রি পাওয়া যায় ও ক্রোকের পরোয়ানা জারি হয়। অনেক সময় নষ্ট করিয়া ও বহু প্রয়াসে উহাকে কার্যকরী করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ অঘটন আর যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য কি সাবধানতা লইতে পারেন? সেই জন্য যে ঘটনা ঘটিয়াছে ধৈর্যের সহিত তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিব। আবার নূতন করিয়াই লড়িতে হইলে আমাদের কি করিতে হইবে —অর্থাৎ অপরে কি করে সে ভাবনা না ভাবিয়া প্রত্যেক সত্যাগ্রহীর কি করা উচিত—তাহাই বিবেচনা করা দরকার। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে আমরা যদি খাঁটি থাকি তাহা হইলে অপরেও খাঁটি থাকিবে। আর যদি কেহ দুর্বলতার পরিচয় দেন তাহা হইলে আমাদের উদাহরণ তাঁহাদের বলশালী করিবে।"

আমার মনে হয় যাঁহারা লড়াই চালানোর শক্তি সম্বন্ধে যথার্থই সন্দেহ জাগায় সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে কাছলীয়া শেঠের ভিতরে যে কত বড় শক্তি আছে তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি আগুয়ান হইলেন। সব ব্যাপারেই তিনি খুব কম কথায় নিজের সুবিবেচিত অভিমত ব্যক্ত করিতেন ও অতঃপর নিজ সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিতেন। তিনি দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন অথচ অন্তিম পরিণাম সম্বন্ধে সংশয় ব্যক্ত করিয়াছেন—এমন একটি ঘটনার কথাও আমার মনে পড়ে না। এমন একসময় আসিয়াছিল যখন ইউসুফ মিঞা উত্তাল সমুদ্রে সত্যাগ্রহ-

নৌকার হাল ধরিতে আর রাজী হইলেন না। সে-সময়ে আমরা সকলেই একবাক্যে কাছলীয়া শেঠকে কর্ণধার করি এবং সেই হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার গুরুদায়িত্ব পালন করেন। যে কষ্ট লোকে বড় একটা সহ্য করিতে পারে না, কাছলীয়া শেঠ তাহা নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে সহ্য করিয়াছেন। লড়াই-এর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা সময় আসিয়াছিল যখন জেলে গিয়া বসিয়া থাকা অনেকের পক্ষেই খুব সহজ ছিল। কাহারও কাহারও নিকট ইহা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্য বিশ্রামেরও অবকাশ হইত। পক্ষান্তরে বাহিরে থাকিয়া প্রতিটি বিষয় সূক্ষ্মভাবে দেখা ও তাহার ব্যবস্থা করা এবং নানা ধরনের লোক লইয়া চলা অপেক্ষাকৃত দুরূহ কার্য।

পরবর্তীকালে এমন দিন আসিল যখন গোরা পাওনাদারেরা কাছলীয়াকে ফাঁদে ফেলিলেন। বহু ভারতীয় ব্যবসায়ীর ব্যবসা পূর্ণতঃ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল। তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকার মাল কেবল কথার উপর ভারতীয়দিগকে ধার দেন। ভারতীয়েরা যে ইউরোপীয়দের এইপ্রকার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক সাধুতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এইরূপে অনেক ইউরোপীয় ব্যবসাদার কাছলীয়া শেঠের সহিত ধারে কারবার করিতেন। সরকারের সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ প্ররোচনায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা কাছলীয়ার নিকট হইতে পাওনা টাকা অবিলম্বে ফেরত চাহিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে এই আভাসও দিলেন যে তিনি যদি সত্যাগ্রহের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন তাহা হইলে অবিলম্বে পাওনা টাকা ফেরত পাইবার জন্য তাঁহার উপর চাপ দিবেন না। কারণ তিনি যদি সত্যাগ্রহের সম্পর্ক ত্যাগ না করেন তবে যে কোন মুহূর্তে সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হইতে পারেন এবং সে অবস্থায় তাঁহাদের পাওনা টাকা মারা যাইতে পারে। তাই তাঁহারা অবিলম্বে নগদ টাকায় তাঁহাদের পাওনা মিটাইয়া দিবার দাবি জানাইতেছেন। বীরের ন্যায় শ্রীযুক্ত কাছলীয়া জবাব দিলেন যে ভারতীয়দের সংগ্রামে যোগদান করা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। উহার সহিত তাঁহার ব্যবসার কোনও সম্বন্ধ নাই। তিনি মনে করেন যে তাঁহার ধর্ম, তাঁহার স্বজাতীয়ের মর্যাদা ও নিজ আত্মসম্মান এই লড়াই-এর সহিত যুক্ত। এযাবৎকাল তাঁহার মহাজনেরা যেভাবে তাঁহার সহিত সহায়তা করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সহায়তা অথবা এমন কি তাঁহার নিজের ব্যবসাকেও অহেতুক গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করিলেন। তবে তাঁহাদের অর্থ তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ

নিরাপদে আছে এবং যতদিন তিনি জীবিত আছেন যে কোন উপায়ে তিনি তাহার কড়াক্রান্তি শোধ করিবেন। তবে তাঁহার যদি কিছু হয় তাহা হইলে তাঁহার মালপত্র ও পাওনাদারের হিসাবের খাতাপত্র তাঁহাদের নিকট রহিয়াছে। সুতরাং তিনি চান যে এতদিন যখন তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন তখন আজও তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন।" এই যুক্তি যদিও সম্পূর্ণ ন্যায্য ছিল এবং কাছলীয়ার দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহার পাওনাদারদের আরও বিশ্বাস হওয়ার কথা, কিন্তু সেইবার তাহা হইল না। ঘুমন্ত লোককে জাগানো যায়, কিন্তু জাগিয়া থাকিয়া ঘুমের ভান করিলে তাঁহাকে জাগানো যায় না। গোরা ব্যবসায়ীদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। তাঁহারা কাছলীয়াকে অন্যায়ভাবে চাপ দিতে চাহিতেছিলেন। তাঁহাদের পাওনা টাকার সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই ছিল না।

১৯০৯ সালের দোসরা জানুয়ারী আমার দপ্তরে পাওনাদারদের সভা হইল। তাঁহাদিগকে আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম যে শ্রীযুক্ত কাছলীয়ার উপর তাঁহারা যে চাপ দিতেছেন, তাহা রাজনৈতিক—ব্যবসায়ীদের ওরূপ করা শোভা পায় না। তাঁহারা একথায় উল্টা ক্রুদ্ধ হইলেন। শেঠ কাছলীয়ার আয়-ব্যয় পত্রক তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া আমি প্রমাণ করিলাম যে তাঁহারা তাঁহাদের ষোল আনা পাওনা পাইতে পারেন। আর পাওনাদারেরা যদি তাঁহার ব্যবসা কাহাকেও বিক্রয় করিতে চাহেন তাহা হইলেও শেঠ কাছলীয়া তাঁহার বাজারের পাওনা ও দোকানের দ্রব্যাদি সমস্তই সেই ক্রেতাকে দিতে প্রস্তুত আছেন। পাওনাদারেরা ইহাতে রাজী না হইলে ক্রয়মূল্যে তাঁহার দোকানের সমস্ত মাল উঠাইয়া লইতে পারেন এবং তাহাতেও যদি সব দেনা শোধ না হয় তবে বাকী টাকা কাছলীয়ার অধমর্ণদিগের নিকট হইতে দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পাঠকেরা দেখিবেন যে এই ধরনের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে গোরা ব্যবসায়ীদের কোনই ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। আমার কোন কোন মক্কেলের দুর্দিনে তাঁহাদের পাওনাদারের সহিত আমি এই ধরনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখিলাম যে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের ন্যায্য দাবি পাইতে উৎসুক নহেন। কাছলীয়াকে দমাইতে তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু কাছলীয়া দমিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার দায়-দায়িত্বের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হইল।

এই দেউলিয়া হওয়া কাছলীয়ার কলঙ্ক না হইয়া তাঁহার ভূষণ স্বরূপ হইল। সম্প্রদায়ের ভিতর তাঁহার প্রতিষ্ঠা বাড়িল এবং তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহসের জন্য সকলে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিলেন। তবে এই ধরনের বীরত্ব অসাধারণ ব্যাপার। দেউলিয়া হওয়া যে বস্তুতঃ দেউলিয়া হওয়া নয়, নিন্দার কারণ না হইয়া বরঞ্চ উহা যে সম্মান ও প্রশংসার বিষয়—সাধারণ লোকে ইহা ধরিতে পারে না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কাছলীয়ার নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। অনেক ব্যবসায়ী এই দেউলিয়া হওয়ার ভয়েই ঐ কালা কানুনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কাছলীয়া ইচ্ছা করিলেই দেউলিয়া হওয়া হইতে বাঁচিতে পারিতেন। সংগ্রামের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নহে—সে কথা উঠিতেই পারে না। কাছলীয়ার অনেক ভারতীয় মিত্র ছিলেন। এই দুর্দিনে সানন্দে তাঁহারা তাঁহাকে টাকা ধার দিতে পারিতেন। কিন্তু এইভাবে ব্যবসা বাঁচাইয়া রাখা তাঁহার উপযুক্ত কাজ হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। যে কোন সত্যাগ্রহীর মত তাঁহারও যখন তখন জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য কোনও সত্যাগ্রহীর নিকট হইতে টাকা লইয়া গোরা পাওনাদারদিগকে দেওয়া তাঁহার পক্ষে শোভন হইত না। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেক দলত্যাগী ছিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যও পাওয়া যাইতে পারিত। প্রত্যুত তাঁহার এইরূপ দুই-একজন মিত্র সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেনও। কিন্তু তাঁহাদের সাহায্য লওয়ার মানে ঐ আপত্তিকর আইনের কাছে নতি স্বীকার করা বিজ্ঞের কাজ—ইহা মানিয়া লওয়া। সেই জন্য ঐ ধরনের সাহায্য লইব না বলিয়া আমরা স্থির করিলাম।

ইহা ছাড়া আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে কাছলীয়া দেউলিয়া হওয়ায় অন্য সত্যাগ্রহী ব্যবসায়ী দেউলিয়া হওয়া হইতে বাঁচিয়া যাইবেন। দেউলিয়া হইলে সমস্ত পাওনাদার না হোক্ শতকরা নব্বই জন পাওনাদারই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। শতকরা ৫০ টাকা পাইলেই তাঁহারা খুশী হন, আর শতকরা ৭৫ টাকা পাইলে তো পুরা টাকা পাইয়াছেন মনে করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ শতকরা সোয়া ছয় টাকা লাভ করেন না, শতকরা ২৫ টাকাই লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্য যদি শতকরা ৭৫ টাকা ফেরত পান তবে ক্ষতি হয় নাই বলিয়াই গণনা করেন। আর দেউলিয়া হইলে পুরাপুরি টাকা পাওয়া যায় না বলিয়া কোনও পাওনাদার খাতককে দেউলিয়া করিতে চান না।

এইজন্য কাছলীয়া দেউলিয়া হওয়াতে গোরারা আর তাঁহাদের খাতক অন্য সত্যাগ্রহী ব্যবসায়ীকে ধমক দিবেন বলিয়া মনে হইতেছিল না। কার্যক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। গোরাদের ইচ্ছা ছিল হয় কাছলীয়াকে ভয় দেখাইয়া সত্যাগ্রহ হইতে দূরে সরান, আর না হয় শতকরা একশ টাকাই নগদ আদায় করা। এই দুই-এর একটিও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ ইহার ফল বিপরীত হইল। একজন সম্মানভাজন ভারতীয় ব্যবসায়ী এই প্রথমবার খুশী মনে দেউলিয়া হইতেছেন দেখিয়া গোরা ব্যবসায়ীরা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং অতঃপর তাঁহারা তাই শান্ত হইয়া গেলেন। এক বৎসরের ভিতর কাছলীয়া শেঠের মাল হইতেই গোরা পাওনাদারদের শতকরা একশত টাকা আদায় হইয়া গেল। দেউলিয়ার সম্পত্তি হইতে পুরা টাকা পাওয়ার ঘটনা আমার জানার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই প্রথম। এইজন্য সত্যাগ্রহ চলিতে থাকিলেও গোরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাছলীয়ার সম্মান খুব বাড়িয়া গেল। তিনি সংগ্রামের নেতৃত্ব করিলেও তাঁহারা কাছলীয়াকে যত ইচ্ছা টাকার মাল ধারে দিতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে কাছলীয়ার শক্তি প্রতিদিনই বাড়িতে লাগিল। লড়াই-এর রহস্যও তিনি ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় বুঝিতে লাগিলেন। লড়াই যে কত দিন ধরিয়া চলিবে একথা বলার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। সেইজন্য কাছলীয়া শেঠের বিরুদ্ধে দেউলিয়া করার মামলা শুরু করার পর আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে যতদিন লড়াই চলিবে ততদিন তিনি ব্যাপকভাবে ব্যবসা করিবেন না। গরীবভাবে সংসার চালাইবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু রোজগার করার মত ব্যবসা করিবেন। সেইজন্য গোরারা তাঁহাকে যে সুবিধা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তিনি লন নাই।

বলা বাহুল্য এই সকল ঘটনা কাছলীয়া শেঠের জীবনে পূর্বোক্ত কমিটির সভাও এর পরমুহূর্তেই হয় নাই। বর্ণনায় ধারাবাহিকতা থাকিবে মনে করিয়া এইখানেই উহার উল্লেখ করিলাম। আন্দোলনের পুনরারম্ভ (১৯০৮ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর) হইবার কিছুদিন পর শেঠ কাছলীয়া সভাপতি হন এবং তাহার পাঁচ মাস পর তাঁহার দেউলিয়া হইবার ঘটনা ঘটে।

এক্ষণে সেই কমিটির সভার কি পরিণাম হইয়াছিল সে কথা বলিব। এই সভার পর আমি জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে পত্র দিই যে তাঁহার প্রস্তাবিত নূতন আইনের দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হইতেছে। মিটমাটের এক সপ্তাহের মধ্যে রিচমণ্ডে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। সেই

বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতীয়দের দ্বিতীয় বক্তব্য হইল এই যে আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তাঁহারা কিছুতেই নাম রেজিস্ট্রী করিবেন না।...তিনি তাঁহাদের বলিয়াছেন যে যতদিন পর্যন্ত রেজিস্ট্রী না করা একজনও এসিয়াবাসী এদেশে থাকিবেন ততদিন আইন প্রত্যাহার করা হইবে না।" রাজনৈতিক নেতৃবর্গ অসুবিধাজনক প্রশ্নের উত্তর দেন না। উত্তর দিলেও ঘুরাইয়া কথা বলেন। জেনারেল স্মাট্‌স্ এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাকে যতই পত্র লিখুন অথবা যতই বক্তৃতা দিন, কিন্তু জবাব দেওয়ার ইচ্ছা না থাকিলে সে বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে সাড়াশব্দ পাওয়া যাইবে না। পত্র পাইলে তাহার উত্তর দেওয়ার সাধারণ ভদ্রতার ধার তিনি ধারিতেন না। সেইজন্য আমার পত্রসমূহের কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না।

আমাদের মধ্যস্থ আলবার্ট কার্টরাইটের সহিত আমি দেখা করিলাম। তিনি স্তম্ভিত হইলেন, ও আমাকে বলিলেন, "সত্যসত্যই আমি এই লোকটিকে আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার পরিষ্কার স্মরণ আছে যে তিনি এসিয়াটিক আইন রদ করার কথা দিয়াছিলেন। আমার দ্বারা যতদূর হয় আমি করিব, কিন্তু আপনি তো জানেন যে এই ব্যক্তি একবার কোন সঙ্কল্প করিলে তাহা হইতে তাঁহাকে কিছুতেই নড়ানো যায় না। সংবাদপত্রে কি লেখা হয় তাহা তিনি গ্রাহ্যই করেন না। তাই আশঙ্কা হয় যে আমার সাহায্য আপনাদের কোনও কাজে আসিবে না।" শ্রীযুক্ত হস্কিন ইত্যাদির সহিতও দেখা করিলাম। তাঁহারাও জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে পত্র দিলেন। কিন্তু তাহার খুব অসন্তোষজনক জবাব পাইলেন। 'বিশ্বাসঘাতকতা' শীর্ষক দিয়া আমি "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে" প্রবন্ধ লিখিলাম। কিন্তু জেনারেল স্মাট্‌স্-এর তাহাতে কি যায় আসে? দার্শনিক অথবা নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে যে কোন নিষ্ঠুর অভিধায় ভূষিত করা যাক না কেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই যায় আসে না। তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবমত কাজ করিয়া যান। উক্ত দুইটি বিশেষণের মধ্যে জেনারেল স্মাট্‌সের সম্বন্ধে কোনটি প্রযোজ্য তাহা আমি ঠিক জানি না। তবে তাঁহার আচরণের মধ্যে একটা দার্শনিকতা আছে, ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার নিকট চিঠিপত্র লেখার সময় ও সংবাদপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে লেখার সময় তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সেটা লড়াইয়ের প্রথম দিক অর্থাৎ লড়াইয়ের দ্বিতীয় বৎসর। তবে লড়াই আট বৎসর চলিয়াছিল এবং তাহার মধ্যে তাঁহার সহিত অনেকবার আমার দেখা হইয়াছে। পরে আমাদের কথাবার্তা হইতে

মনে হইয়াছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার চালাকি সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা আছে তাহা খুব যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে দুইটি বিষয় সম্বন্ধে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। প্রথমতঃ তাঁহার রাজনীতিতে কতকগুলি মূলনীতি আছে যাহা আত্যন্ত নীতিবিগর্হিত নহে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার রাজনীতিতে চালাকি এবং আবশ্যক হইলে সত্যের বিকৃতিরও স্থান আছে।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি

একদিকে জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে যেমন তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছিল, অপর দিকে তেমনি আমরা সম্প্রদায়কে জাগ্রত করার জন্য উৎসাহভরে চেষ্টা করিতেছিলাম। আমরা দেখিতে পাইলাম যে সর্বত্রই লোকে লড়াই পুনরারম্ভ করিতে ও জেলে যাইতে প্রস্তুত। সমস্ত স্থানেই সভা করিয়া সরকারের সহিত যে চিঠিপত্র চলিতেছিল তাহা বুঝানো হইতেছিল। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' প্রতি সপ্তাহেই সপ্তাহের দৈনিক ঘটনাগুলি প্রকাশ করা হইতেছিল। স্বেচ্ছাকৃত রেজিস্ট্রেশন নিষ্ফল হইতে চলিতেছে এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা হইতেছিল এবং কালা কানুন প্রত্যাহৃত না হইলে তাঁহাদের স্বেচ্ছায় লওয়া পাস পোড়াইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হইতেছিল। ইহাতে সরকার বুঝিতে পারিবেন যে, সম্প্রদায় নির্ভীক ও অটল আছে ও জেলে যাইতে প্রস্তুত। সার্টিফিকেটের বহ্ন্যুৎসব করার জন্য সমস্ত স্থান হইতেই উহা সংগ্রহ করা হইতেছিল।

সরকারের দিক হইতে ট্রান্সভালের বিধানসভায় আইন পাস করার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ভারতীয়দের তরফ হইতে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হইল, কিন্তু তাহার ফল কিছুই হইল না। অবশেষে সত্যাগ্রহীরা সরকারকে "চরমপত্র" দিলেন। শব্দটি সম্প্রদায় ব্যবহার করে নাই। সম্প্রদায়ের সঙ্কল্প জানাইয়া যে পত্র দেওয়া হয় জেনারেল স্মাট্‌স্‌ উহাকে চরমপত্র আখ্যা দেন। ব্যবস্থাপক সভাকে তিনি জানান, সরকারকে যাঁহারা এই রকম ধমক দেন সরকারের শক্তির সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান নাই। দুঃখের কথা এই যে জনকতক আন্দোলনকারী

(এজিটেটার) গরীব ভারতীয়দিগকে উস্কাইতে চেষ্টা করিতেছে এবং তাহারা যদি তাঁহাদের খপ্পরে পড়েন তবে ধ্বংস হইয়া যাইবেন।" সংবাদপত্র এই প্রসঙ্গের বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিল যে বিধানসভায় অনেক সভ্য "চরমপত্রের" কথা শুনিয়া ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়া সর্বসম্মতিতে ও সোৎসাহে জেনারেলের আইনের খসড়া পাস করিলেন।

ঐ তথাকথিত চরমপত্রে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহার সারমর্ম নিম্নরূপ: "জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত ভারতীয়দের যে আপস রফা হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট শর্ত ছিল এই যে ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় নাম রেজিস্ট্রী করিয়া লইলে তাহা আইনসিদ্ধ করা হইবে। এবং এসিয়াটিক আইন রদ করার জন্য তিনি বিধানসভায় আইনের খসড়া উপস্থাপিত করিবেন। ইহা সকলেই জানেন যে ভারতীয়েরা সরকারের পক্ষে সন্তোষজনক রূপেই স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রী করাইয়াছে। সেইজন্য এক্ষণে এসিয়াটিক আইন রদ করা উচিত। সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে অনেক পত্র দিয়াছে। আইন অনুযায়ী যাহা করণীয় সে সকলই করিয়াছে, কিন্তু সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছে। বিধানসভায় প্রস্তাবিত আইনের খসড়া যখন গৃহীত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে তখন এ ব্যাপারে ভারতীয়দের মধ্যে যে অসন্তোষ ও তীব্র বিরোধের ভাব রহিয়াছে তাহার কথা সম্প্রদায়ের নেতাদের সরকারকে জানাইয়া দেওয়া কর্তব্য। দুঃখের সহিত আমরা জানাইতেছি যে শর্ত অনুযায়ী যদি এসিয়াটিক আইন রদ করা না হয় এবং এতদ্‌সম্পর্কিত সরকারের সিদ্ধান্ত যদি একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সম্প্রদায়কে জানানো না হয় তবে সম্প্রদায় কর্তৃক সংগৃহীত সমস্ত সার্টিফিকেট পোড়াইয়া ফেলা হইবে এবং তজ্জন্য যে দুঃখ-কষ্ট সম্প্রদায়ের উপর আসিবে সম্প্রদায় তাহা বিনম্র অথচ দৃঢ়তাসহকারে সহ্য করিবে।"

এই পত্রকে চরমপত্র মনে করিবার অন্যতম কারণ হইল ইহাতে জবাব দিবার সময় নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর একটি কারণ হইল গোরারা সাধারণতঃ ভারতীয়দিগকে একটি অসভ্য সম্প্রদায় মনে করিয়া থাকেন। গোরারা ভারতীয়দিগকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করিলে এই পত্র যে আদ্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং অতীব গুরুত্ব সহকারে ইহার বক্তব্য সম্বন্ধে বিচার করিতেন। কিন্তু গোরারা ভারতীয়দিগকে অসভ্য মনে করেন বলিয়া ভারতীয় সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া ঐ পত্র লিখিতে হইয়াছিল। সম্প্রদায়ের সম্মুখে দুইটি রাস্তা ছিল। হয় নিজেদের বর্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া

বর্বরদের যেভাবে নির্যাতন করা হইয়া থাকে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া অথবা অসভ্যতার অভিযোগ অস্বীকার করার জন্য সক্রিয় উপায় গ্রহণ করা। এই পত্র এইজাতীয় কার্যের প্রথম সূচনা। পত্রটির পিছনে যদি উহার বক্তব্যকে কার্যান্বিত করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প না থাকিত তবে এই পত্রকে উদ্ধত বলা যাইতে পারিত এবং ভারতীয় সম্প্রদায় বিচারবুদ্ধিবিহীন মূর্খ জাতি বলিয়া প্রমাণিত হইত।

পাঠকেরা বলিতে পারেন যে ১৯০৬ সালে সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প গ্রহণ করার সময়ই বর্বরতার অভিযোগ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে এই পত্রে এমন কি নূতনত্ব আছে যাহার জন্য ইহাকে আমি এত গুরুত্ব দিতেছি এবং এই পত্রের সময় হইতেই অসভ্যতা অস্বীকার করা হইল একথা কেন বলিতেছি? এই প্রকার যুক্তি কতকাংশে সত্য কিন্তু একটু গভীর ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে বাস্তবিকপক্ষে বর্বরতার অপবাদ অস্বীকার করা আরম্ভ হইয়াছে এই পত্র পাঠানো হইতেই। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে সত্যাগ্রহের শপথ লওয়ার ব্যাপারটা একরকম আকস্মিকভাবেই আসিয়া পড়িয়াছিল। আর তাহার পরবর্তী জেলে যাওয়া ইত্যাদি উহার অনিবার্য পরিণাম। এই সকল ঘটনায় সম্প্রদায়ের মর্যাদা সকলের অজ্ঞাতসারে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু এই পত্র লেখার সময় সম্প্রদায়ের মনুষ্যত্ববোধ ও উচ্চ মর্যাদার জন্য সচেতনভাবে দাবি জানানো হইয়াছিল। পূর্বের ন্যায় এখনও উদ্দেশ্য ছিল এসিয়াটিক আইন রদ করা। এবারে কিন্তু ভাষার ধরন কার্যপদ্ধতি এবং অন্যান্য ব্যাপারে পরিবর্তন হইয়াছিল। কৃতদাস মনিবকে নমস্কার করে, আবার মিত্রও মিত্রকে নমস্কার করে। উভয়ই নমস্কার হইলেও উভয়ের ভিতর এমন বিরাট পার্থক্য থাকে যে কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি একনজরে একজনকে ভৃত্য ও অপরজনকে মিত্র বলিয়া চিনিতে পারিবেন।

চরমপত্র পাঠাইবার সময় আমাদের মধ্যে খুবই আলোচনা হইয়াছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব চাওয়া কি একটা অবিনয় বলিয়া গণ্য হইবে না? উহা লেখার জন্যই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হয়ত সরকার আমাদের দাবি স্বীকার করিবেন না। সম্প্রদায়ের সঙ্কল্প একটু ঘুরাইয়া সরকারকে জানানোই কি যথেষ্ট নয়? এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা সকলে একমত হইয়া স্থির করি যে আমরা যাহা সত্য ও উচিত বলিয়া অনুভব করিতেছি তাহাই করা যাক্। আমাদের বিরুদ্ধে দুর্বিনীতের অভিযোগ উঠুক অথবা মিথ্যা ক্রোধ

চালিত হইয়া আমাদিগকে যাহা দেওয়ার তাহা না দেওয়া হউক। এ সম্ভাবনাও আমরা মাথায় করিয়া লইব। মানুষ হিসাবে আমরা কাহারও অপেক্ষা খাটো নহি একথা যদি আমরা মানি ও যদি আমরা বিশ্বাস করি যে দীর্ঘ দিন যাবৎ যত দুঃখই আসুক তাহা সহ্য করার শক্তি আমাদের আছে তবে আমাদের কোন দ্বিধা বিনা সোজা পথ গ্রহণ করা উচিত।

এক্ষণে হয়ত পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে এখনকার সঙ্কল্পের মধ্যে একটা নূতনত্ব ও বিশেষত্ব ছিল। এই পত্রের ঘাত-প্রতিঘাত বিধানসভা ও তাহার বাহিরের গোরাদের মধ্যেও গিয়া পৌঁছিয়াছিল। কেহ কেহ ভারতীয়দের সাহসের প্রশংসা করিলেন, কেহ বা খুব রাগ করিলেন ও ভারতীয়দের এই উচ্ছ্বাসের জন্য পুরাপুরি শিক্ষা দেওয়া দরকার এমন রবও তুলিলেন। তবে উভয় পক্ষই ভারতীয়দের এই নূতন পদক্ষেপের অভিনবত্ব স্বীকার করিলেন। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ায় লোকে দেখিয়াছিলেন যে ইহা একটি নূতন জিনিস। কিন্তু এই পত্রে তদপেক্ষা অধিক আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার সময় সম্প্রদায়ের শক্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই। তাই সেই প্রাথমিক পর্যায়ে এই ধরনের পত্র অথবা ইহার ভাষা শোভা পাইত না। এখন কিন্তু সম্প্রদায়ের অল্প-বিস্তর অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সকলেই দেখিয়াছেন যে সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিবিধানকল্পে দুঃখ সহ্য করার শক্তি আছে এবং সেইজন্যই "চরমপত্রের" এই ভাষা স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হইয়াছিল—সেই পরিস্থিতিতে উহাতে অশোভন কিছু ছিল না।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

গৃহীত সার্টিফিকেটের বহ্ন্যুৎসব

যেদিন দ্বিতীয় এসিয়াটিক আইন পাস হইবে সেইদিনই চরমপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার দুই-একঘণ্টা পরে প্রকাশ্যভাবে সার্টিফিকেট পোড়াইয়া ফেলার জন্য এক জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। সত্যাগ্রহ কমিটি ইহাও ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে সময়-

মত অনুকূল জবাব পাওয়া যায় তাহা হইলেও সভা ব্যর্থ হইবে না কেন না তাহা হইলে সেই সভাতেই সরকারের অনুকূল সিদ্ধান্তের কথা সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার করিয়া দেওয়া যাইবে।

কমিটি অবশ্য মনে করিতেন যে সরকার এই চরমপত্রের কোনও জবাবই দিবেন না। আমরা অনেক পূর্বেই সভার স্থানে পৌঁছাইয়া গিয়াছিলাম। যদি সরকারের নিকট হইতে কোনও তার আসে তাহাও তৎক্ষণাৎ সভায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলাম। জোহানস্‌বার্গের হামিদিয়া মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট বেলা চারঘটিকায় সভা আহুত হইয়াছিল। সভাস্থল ভারতীয়দিগের দ্বারা একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ওখানকার নিগ্রোরা চার পায়া যুক্ত একরকম লোহার কড়াই ভোজনপাত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সার্টিফিকেট পোড়াইবার জন্য নিকটবর্তী দোকান হইতে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকারের ঐ রকম একটি কড়াই আনা হইয়াছিল। কড়াইটি এক কোণে উচ্চ বেদীর উপর বসানো হইয়াছিল।

সভার কার্য আরম্ভ করা হইবে এমন সময় একজন স্বেচ্ছাসেবক বাইসাইকেলে আসিয়া পৌঁছাইলেন। তাঁহার হাতে সরকার কর্তৃক প্রেরিত একটি তারবার্তা। সরকার জানাইয়াছেন যে তাঁহারা সম্প্রদায়ের সঙ্কল্পের জন্য দুঃখিত এবং সরকার নিজ কর্মপদ্ধতি বদলাইতে অক্ষম। এই তার সভায় পড়িয়া শুনানো হইল। শুনিয়া সকলে হর্ষ প্রকাশ করিলেন। রকমটা যেন এই যে সরকার যদি চরমপত্রের দাবি স্বীকার করিতেন তাহা হইলে সার্টিফিকেট দহন করার শুভকার্য হাত হইতে ফস্কাইয়া যাইত! এই হর্ষোল্লাস উচিত কি অনুচিত ইহা স্থির করা মুশকিল। যাঁহারা হাতে তালি দিয়া হর্ষপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে কোন্ মনোভাবচালিত হইয়া ইহা করিয়াছিলেন, তাহা না জানা পর্যন্ত সে কথা বলা যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে সভায় যে উৎসাহ বর্তমান ছিল, এই হর্ষপ্রকাশ তাহার একটা সুন্দর নিদর্শন। ভারতীয়রা এবার নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হইয়াছিলেন।

সভা আরম্ভ হইল। সভাপতি সকলকে সাবধান করিলেন ও সমস্ত অবস্থা বুঝাইলেন। উপযুক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। দীর্ঘস্থায়ী আলোচনার একের পর এক ধাপ আমি সকলকে বুঝাইয়া বলিলাম, "ভারতীয়দের মধ্যে কেহ যদি সার্টি-ফিকেট পোড়াইয়া ফেলিতে চাওয়ার পর ফেরত পাইতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহা ফিরাইয়া লইতে পারেন। সার্টিফিকেট পোড়াইয়া ফেলাই

অপরাধ নহে। যাঁহারা জেলে যাইতে চাহেন এই কার্যের ফলেই তাঁহারা সে সুযোগ পাইবেন না। সার্টিফিকেট পোড়াইয়া আমরা এই কথা ঘোষণা করিতে চাই যে, এসিয়াটিক আইন না মানিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই কার্যের দ্বারা আমরা এমন কি সার্টিফিকেট দেখাইবার অধিকারও নিজের কাছে রাখিতেছি না। কিন্তু আজ যে সার্টিফিকেট ভস্মসাৎ করা হইতেছে কাল যে-কেহ গিয়া তাহার নকল লইয়া আসিতে পারেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন যদি কেহ থাকেন যিনি এই জাতীয় ভীরুতামূলক কার্য করিতে ইচ্ছুক অথবা যাঁহার মনে আশঙ্কা আছে যে এ জাতীয় অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই তাহা হইলে এখনই তাঁহার সার্টিফিকেট ফিরাইয়া লওয়া উচিত ও তাঁহাকে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। সার্টিফিকেট এখন ফেরত লইতে লজ্জা নাই, বরঞ্চ উহাতে এক রকম সৎসাহস আছে। কিন্তু ইহার পরে গিয়া সার্টিফিকেটের নকল লওয়া কেবল লজ্জাজনক নহে, সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী কার্যও বটে। পুনরায় আমরা যেন একথা বুঝিয়া লই যে এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইতে যাইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে ইতিমধ্যেই আমাদের কতকজন যুদ্ধে হার মানিয়াছেন। আর সেইজন্য যাঁহারা এখনও সেনাবাহিনীতে আছেন তাঁহাদের কাজ আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা যেন এই সকল কথা বিচার করিয়া আজকার এই প্রস্তাবিত কাজে যোগদান করেন।"

আমার বক্তৃতাকালেই সভা হইতে রব উঠিতেছিল, "আমরা সার্টিফিকেট ফিরাইয়া লইব না, উহা পোড়াইয়া ফেলুন।" সর্বশেষে আমি প্রস্তাব করিলাম যে যদি কেহ এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে বলিতে চাহেন তবে তিনি যেন আগাইয়া আসেন। কিন্তু কেহই উঠিয়া দাঁড়াইলেন না। এই সভায় মীর আলমও হাজির ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন যে আমাকে মারা তাঁহার ভুল হইয়াছে ও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রবল আনন্দধ্বনির মধ্যে তাঁহার আসল সার্টিফিকেটখানি পোড়াইতে দিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় সার্টিফিকেট লন নাই। আমি মীর আলমের হাত আমার হাতে লইলাম ও আনন্দে উহা চাপিয়া ধরিলাম। আমি তাঁহাকে আবারও জানাইলাম যে আমার মনে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন দিনই কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় নাই।

পোড়াইবার জন্য দুই হাজারের উপর সার্টিফিকেট কমিটির নিকট আসিয়াছিল। সেগুলি সমস্ত ঐ কড়াই-এ ফেলিয়া উহার উপরে কেরোসিন

ঢালিয়া ইউসুফ মিঞা উহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। সার্টিফিকেটগুলি যতক্ষণ জ্বলিতেছিল সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাততালি দিয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়া ময়দান ফাটাইয়া ফেলিতেছিলেন। এখনও পর্যন্ত যাঁহাদের কাছে সার্টিফিকেট রাখা ছিল তাঁহারা মঞ্চের উপর আসিয়া তাহা জমা করিতে লাগিলেন এবং উহাও পোড়াইবার জন্য আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। এ পর্যন্ত কেন সার্টিফিকেট দেন নাই জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলিলেন, "আগুন জ্বলিয়া উঠিলে দিতে ভাল লাগে ও অপরের উপর ইহার বেশী প্রভাব হয় বলিয়া ইতিপূর্বে দিই নাই।" অপর একজন সোজাসুজি স্বীকার করিলেন যে ইতিপূর্বে তাঁহার সাহস হয় নাই। শেষ পযন্ত সার্টিফিকেট পোড়ানো হইবে না মনে হইতেছিল। কিন্তু এই বহ্ন্যুৎসব দেখার পর তিনি আর সম্ভবতঃ স্থির থাকিতে পারেন নাই। আর সকলের যাহা হইবে, আমারও তাহাই হইবে মনে করিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছেন। এইরূপ খোলাখুলি কথা এই যুদ্ধের মধ্যে শুনিবার অনেক অবকাশ হইয়াছিল।

এই সভায় ইংরাজী সংবাদপত্রের যেসব সংবাদদাতা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের উপর এই সমস্ত দৃশ্যের গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল। তাঁহারা নিজ নিজ কাগজে সভার হুবহু বর্ণনা দিয়াছিলেন। বিলাতের 'ডেলি মেল'-এর জোহানস্‌বার্গের সংবাদদাতা ঐ কাগজে এই সভার বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন। এই বিবরণে তিনি ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার চিহ্ন স্বরূপ জাহাজে উঠিয়া আমেরিকা-বাসী কর্তৃক চায়ের বাক্সগুলি সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়ার ঘটনার সহিত সার্টি-ফিকেটের বহ্ন্যুৎসবের তুলনা করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনায় একদিকে সর্ববিষয়ে কুশল লক্ষ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান এবং অপরদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি ছিল। আর বর্তমান ঘটনায় ছিল একদিকে নিরুপায় সর্বসামর্থ্যশূন্য ১৩০০০ হাজার ভারতীয় এবং অপরদিকে প্রবল ট্রান্সভাল রাজ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অবস্থা তুলনা করিয়া ঐ বিবরণে ভারতীয়দের পক্ষে কোনও অতিশয়োক্তি করা হইয়াছিল বলিয়া মনে করি না। ভারতীয় সম্প্রদায়ের একমাত্র অস্ত্র ছিল নিজেদের দাবির যথার্থতা ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস। শ্রদ্ধাপরায়ণের পক্ষে এই অস্ত্রই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভিতর এই বোধের সঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত নিরস্ত্র তের হাজার ভারতীয়ের সহিত আমেরিকার সমগ্র ইউরোপীয়দের তুলনা অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বর নির্বলের বল। সেইজন্যই জগৎ যে তাহাকে দুর্বল মনে করে এ কথাও ঠিক।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

নূতন বিষয় আনার অভিযোগ

যে বৎসর কালা কানুন পাস হয় সেই বৎসরই জেনারেল স্মাটস্ বিধানসভায় আর একটি নূতন আইনের খসড়া দাখিল করেন। উহার নাম ছিল "ট্রান্সভাল ইমিগ্রেশন রেস্ট্রিক্‌শন্ অ্যাক্ট"। যাঁহারা এ দেশে নূতন ভাবে আসিয়া বসবাস করিতে চান ইহা তাঁহাদিগের প্রতি প্রযোজ্য হইবার উদ্দেশ্যে করা হইতেছিল। বাহ্যতঃ ইহা সর্বসাধারণের উপর প্রযোজ্য, কিন্তু ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করা। এই আইন নাতালের তৎকালের এই ধরনের আইনের অনুরূপ। তবে তাহার উপর আর একটু বেশী ছিল এই যে 'এশিয়াটিক অ্যাক্ট' অনুযায়ী যাহারা রেজেস্ট্রী হইতে পারিতেন না অথচ শিক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও এই আইন প্রয়োগ হইবে। প্রকারান্তরে এই আইনের সাহায্যে আর একটিও নূতন ভারতীয় যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করা হইতেছিল।

নিজেদের অধিকার সঙ্কোচনের এই নূতন প্রয়াসের প্রতিবাদ করাও সম্প্রদায়ের নিকট অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িল। তবে উহাও সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কিনা ইহাই ছিল প্রশ্ন। কখন অথবা কোন্ বিষয় লইয়া সত্যাগ্রহ করা হইবে তাহার জন্য সম্প্রদায় কাহারও নিকট কোনও শর্তে বদ্ধ ছিল না। সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিচারবুদ্ধির উপরই তাহা নির্ভর করে। কথায় কথায় সত্যাগ্রহ করিলে উহা সত্যাগ্রহ না হইয়া দুরাগ্রহ হয়। কেহ যদি নিজের শক্তি না বুঝিয়া সত্যাগ্রহ করেন এবং হারিয়া যান তাহা হইলে তিনি নিজেই কেবল দুর্নামের ভাগী হন না, এই অতুলনীয় অস্ত্রকে পর্যন্ত কলঙ্কিত করেন।

সত্যাগ্রহ কমিটি দেখিলেন যে ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ কেবল কালা কানুনের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইতেছে। এই আইন রদ হইলে উপরে যে ইমিগ্রেশন আইনের উল্লেখ করা হইয়াছে উহাও নির্বিষ হইয়া পড়ে। তথাপি যদি সম্প্রদায় এই ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন যে কালা কানুন রদ হইলে ইমিগ্রেশন আইনের বিরুদ্ধে আর নূতন আন্দোলন দরকার হইবে না, তবে নূতন

ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা সম্বন্ধে ভারতীয়দের কোনও আপত্তি নাই—ইহাই স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। সুতরাং ঐ আইনেরও প্রতিবাদ করা চাই। তবে উহা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কিনা ইহাই একমাত্র প্রশ্ন। কমিটির অভিমত ছিল এই যে সত্যাগ্রহ চলাকালীন সম্প্রদায়ের অধিকারের উপর নূতন কোনও আক্রমণ হইলে তাহার প্রতিরোধও সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া কর্তব্য। সম্প্রদায়ের এরূপ করার শক্তি নাই মনে করা অবশ্য ভিন্ন কথা। নেতারা ঠিক করিলেন যে, শক্তির অভাব অথবা অল্পতার অছিলায় ইমিগ্রেশন আইনকে অগ্রাহ্য করা চলিবে না, উহাও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

এই হেতু ইহা লইয়াও সরকারের সহিত পত্র ব্যবহার করা হইল। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে কোন পরিবর্তন করার ব্যাপারে জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে রাজী করানো গেল না। বরঞ্চ ইহাকে উপলক্ষ করিয়া জেনারেল স্মাট্‌স্‌ সম্প্রদায়—বিশেষ করিয়া আমাকে লোকচক্ষে হেয় করার এক নূতন সুযোগ পাইলেন। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ জানিতেন যে আমাদের প্রকাশ্যভাবে সাহায্যকারী গোরাদিগকে বাদ দিলেও এমন আরও বহুসংখ্যক গোরা আছেন যাঁহাদের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ভারতীয়দিগের দিকেই। সুতরাং স্বভাবতই তিনি চাহিতেন যে সম্ভব হইলে এই সহানুভূতি যেন নষ্ট হয়। তিনি আমার বিরুদ্ধে নূতন বিষয় উত্থাপনের অভিযোগ করিলেন। এবং আমাদের সমর্থকদের তিনি মৌখিক ও লিখিতভাবে জানাইলেন যে তিনি আমাকে যতটা চিনিয়াছেন তাঁহারা ততটা চিনিতে পারেন নাই। গান্ধীকে বসিতে দিলে শোয়ার জায়গা চাহিয়া বসিবে। সেইজন্যই তিনি এশিয়াটিক আইন রদ করিতেছেন না। সত্যাগ্রহ শুরু করার সময় নূতন লোক আনা সম্বন্ধে কোনও কথা বলা হয় নাই। এখন যখন ট্রান্সভালের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি নূতন ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য আইন করিতেছেন তখন ইহার বিরুদ্ধেও গান্ধী সত্যাগ্রহ করিবার কথা বলিতেছেন। এই রকম "চালাকি" তাঁহার পক্ষে আর বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। গান্ধীর যাহা শক্তি আছে করুন, প্রতিটি ভারতীয়ও যদি ধ্বংস হন তাও ভাল। তবুও তিনি এই আইন রদ করিবেন না এবং ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে ট্রান্সভাল সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করা হইবে না। এই ন্যায়-সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সরকার প্রত্যেক ইউরোপীয়েরই সমর্থন পাইবার অধিকারী।

একটু বিচার করিলেই উপরোক্ত যুক্তি যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অনৈতিক তাহা

দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন বাসিন্দাদের আগমন বন্ধ করার আইন জারি করার পূর্বেই ভারতীয়েরা অথবা আমি কি করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিব? জেনারেল স্মাট্‌স্‌ আমার "চালাকি" অনেক দেখিয়াছেন বলিয়াছেন। কিন্তু নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি তাহার একটিরও দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় এত বৎসর থাকা সত্ত্বেও কখনও চালাকির ব্যবহার করিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না। আরও একটু অগ্রসর হইয়া এপর্যন্তও বলিতে আমার আটকায় না যে সারাজীবনে আমি কখনও চালাকির সহায়তা লই নাই। আমার বিশ্বাস চালাকি কেবল অনৈতিক নহে রাজনৈতিক দিক হইতেও অসুবিধাজনক। সেই জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ হইতেও আমি সর্বদাই উহার ব্যবহার অপছন্দ করি। নিজের সাফাইএর জন্য এতটা লেখার প্রয়োজন ছিল না। যে জাতীয় পাঠক-দিগের জন্য আমি ইহা লিখিতেছি তাঁহাদের নিকট আমার নিজের সাফাই করিতেও লজ্জা বোধ হয়। আমার ভিতরে চালাকি নাই একথা এতদিনেও যদি তাঁহারা অনুভব না করিয়া থাকেন তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে যতই লিখি না কেন, তাঁহাদের বিশ্বাস উদ্রেক করিতে পারিব না। উপরে যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহার হেতু এই যে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে কত কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল পাঠকেরা তাহা যেন বুঝিতে পারেন। ভারতীয়েরা তাঁহাদের ঋজু অথচ সঙ্কীর্ণ পথ হইতে এতটুকুও বিচলিত হইলে কি বিপদে পড়িতেন তাহাও যাহাতে পাঠকেরা জানিতে পারেন, সেজন্যও উহার উল্লেখ করিলাম। শূন্যে দড়ির উপর দিয়া চলার সময় বাজিকরকে দড়ির উপরই একাগ্রভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। তাহার দৃষ্টি একটু চঞ্চল হইলে ডাহিনে বা বামে যেদিকেই পড়ুক, তাহার মৃত্যু অবধারিত। সম্ভব হইলে সত্যাগ্রহীর তদপেক্ষাও অধিক একাগ্র হওয়া দরকার—ইহা আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় আট বৎসরের সত্যাগ্রহের শিক্ষা। যে সকল মিত্রের নিকট জেনারেল স্মাট্‌স্‌ আমার বিরুদ্ধে ঐ সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাকে ভাল রকমই জানিতেন এবং তাই তাঁহাদের উপর উহার বিপরীত প্রভাব হইয়াছিল। তাঁহারা আমাকে ও যুদ্ধকে যে কেবল ত্যাগ করিলেন না তাহাই নহে, বরঞ্চ তাঁহাদের আরও বেশী করিয়া সাহায্য করিবার ইচ্ছা হইল। ভারতীয়রাও পরে বুঝিলেন যে ঐ নূতন আইনটিকেও যদি সত্যাগ্রহের আওতায় আনা না হইত তাহা হইলে তাঁহাদের ভারি মুশকিলে পড়িতে হইত।

আমার অভিজ্ঞতা আমাকে শিখাইয়াছে যে আমরা যাহাকে ক্রমবৃদ্ধির নিয়ম

বলি, প্রত্যেক শুদ্ধ যুদ্ধেই তাহা খাটে। তবে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে এই নিয়মকে আমি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করি। গঙ্গা যখন সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন দুই দিক হইতে অপর নদী আসিয়া তাহাতে যোগ দেয় এবং অবশেষে মোহানার নিকটে আসিয়া এমন হয় যে ডাইনে বামে আর কূল দেখা যায় না। কোথায় যে গঙ্গার শেষ আর সমুদ্রের শুরু কোনও যাত্রী তখন তাহা ধরিতে পারেন না। অনুরূপভাবে সত্যাগ্রহ যুদ্ধ চলাকালীন উহার মধ্যে আরও অনেক বিষয় আসিয়া পড়িয়া ইহার প্রবাহের বেগ বর্ধিত করে এবং ইহা যে লক্ষ্যাভিমুখী ক্রমাগত তাহা প্রাপ্তির পথ পুষ্ট হয়। ইহা যথার্থই অনিবার্য এবং সত্যাগ্রহের প্রথম তত্ত্বের মধ্যেই ইহার হেতু বিদ্যমান। কারণ সত্যাগ্রহে সর্বাপেক্ষা কমই সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহা এত কম যে ইহা হইতে আর কিছুই কমানো যায় না এবং তাই এক্ষেত্রে পিছু ফেরার আর অবকাশ থাকে না। এই ক্ষেত্রে সম্মুখগতিই একমাত্র গতি। অন্যপ্রকার যুদ্ধ—এমন কি তাহা শুদ্ধ হইলেও তাহাতে দাবি কমানোর পথ প্রথম হইতেই রাখা হয়। সেইজন্য ক্রমবৃদ্ধির নিয়ম তাহাদের কোনটির প্রতিই প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু সত্যাগ্রহের মত যেখানে ন্যূনতমই উচ্চতম সেখানে ক্রমবৃদ্ধির বিধান কি করিয়া খাটিতে পারে তাহা বুঝাইতেছি। উপনদীর সন্ধানে গঙ্গা নিজের প্রবাহ-পথ ত্যাগ করে না। সত্যাগ্রহীও তেমনি তাঁহার তলোয়ারের ন্যায় সূক্ষ্মধার পথ ত্যাগ করেন না। গঙ্গা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপনদীসমূহ যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে নিজের জল আনিয়া গঙ্গায় ঢালিয়া দেয়, সত্যাগ্রহরূপী নদীর ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। নূতন ইমিগ্রেশন আইনকে সত্যাগ্রহের আওতাভুক্ত করায় সত্যাগ্রহের নীতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ভারতীয়েরা ট্রান্সভালের তাবৎ ভারতীয় বিরোধী আইনকে সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে সত্যাগ্রহ চলাকালীনই ট্রান্সভাল, নাটাল, কেপকলোনি ও অরেঞ্জ-ফ্রী-স্টেটের যাবতীয় ভারতীয়দের সংগঠিত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিটি ভারতীয় বিরোধী আইনের বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ করা উচিত। উভয় পন্থাই সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্তের বিরোধী। আমি তাঁহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে সত্যাগ্রহ আরম্ভের সময় যে দাবি ছিল না এক্ষণে সুবিধা দেখিয়া তাহা গ্রহণ করা অসাধুতার দ্যোতক হইবে। আমাদের যতই শক্তি থাকুক না কেন, বর্তমান লড়াই যে দাবির জন্য শুরু করা হইয়াছে তাহা স্বীকৃত হইলেই শেষ করা হইবে। এই নীতি আমরা স্বীকার করিয়া না লইলে জয়ের পরিবর্তে

আমাদের পরাজয় হইত—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু আমরা যে সহানুভূতি পাইতেছিলাম তাহাও হারাইয়া বসিতাম। কিন্তু সংগ্রাম চলাকালীন প্রতিপক্ষ স্বয়ং আমাদের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করিলে স্বভাবতঃই তাহা সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়। সত্যাগ্রহী যখন তাঁহার নির্দিষ্ট পথে চলিতেছেন তখন যে বাধা তাঁহার সম্মুখে আসে সত্যাগ্রহ-ধর্ম বিচ্যুত না হইয়া তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। প্রতিপক্ষ সত্যাগ্রহী নহেন—সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ অসম্ভব—সেইজন্য ন্যূনতম বা উচ্চতম দাবির বন্ধনে তিনি আবদ্ধ নহেন। তাই নূতন কোন বিষয়ের অবতারণা করিয়া সত্যাগ্রহীকে ভীত করার অভিলাষী হইলে তিনি তাহা করিতে পারেন। কিন্তু সত্যাগ্রহী তো সকল ভয় বিসর্জন দিয়াছেন এবং সেইজন্য সত্যাগ্রহের সহায়তায় পুরাতন ও নূতন—সকল বিপদেরই সম্মুখীন হন ও এই বিশ্বাস রাখেন যে যতই বাধা আসুক না কেন, তিনি তাঁহার স্বধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিবেন। সেইহেতু সত্যাগ্রহ যতই দীর্ঘস্থায়ী হয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষ তাহাকে যত দীর্ঘস্থায়ী করেন, নিজের ভূমিকার জন্য প্রতিপক্ষের ততই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ও সত্যাগ্রহীর সম্ভাবনা লাভবান হওয়ার। এই নিয়ম মূর্ত হওয়ার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আমরা এই যুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাসে দেখিতে পাইব।

ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়

সোরাবজী শাপুরজী আড়াজনীয়া

এখন নূতন লোকের প্রবেশাধিকারের বিষয়ও সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শিক্ষিত ভারতীয়দের ট্রান্সভালে প্রবেশাধিকার আছে কিনা তাহার পরীক্ষাও সত্যাগ্রহীর করিতে হয়। যে কোনও ভারতীয়ের দ্বারা এই পরীক্ষা করা সঙ্গত নয় বলিয়া কমিটি স্থির করিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এ কার্যের জন্য এমন কোন ভারতীয়ের নির্বাচন করা যিনি প্রস্তাবিত নূতন আইনের সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত ভাষ্য অনুযায়ী কোনক্রমেই ট্রান্সভালে প্রবেশের অযোগ্য নহেন। এইরূপ কোন ব্যক্তিকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করাইয়া কারাদণ্ড ভোগ করাইতে আমরা মনস্থ করিলাম। সত্যাগ্রহ এমন একটি শক্তি যাহার ভিতর ক্রমবর্ধমান আত্ম-

সংযমের বীজ আছে—ইহার দ্বারা আমরা একথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলাম। এই নূতন আইনের একটি ধারায় বলা হইয়াছিল যে ইউরোপীয় কোনও ভাষার জ্ঞান না থাকিলে নূতন করিয়া আগমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে আসিতে দেওয়া হইবে না। কমিটি সেইজন্য স্থির করিলেন যে পূর্বে ট্রান্সভালে বাস করেন নাই এমন ইংরাজী জানা ভারতীয়কে ট্রান্সভালে পাঠাইতে হইবে। কয়েকজন ভারতীয় যুবক ইহার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে সোরাবজী শাপুরজী আড়াজনীয়াই নির্বাচিত হইলেন।

সোরাবজী ছিলেন পার্শী। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় পার্শীর সংখ্যা একশতের বেশী ছিল না। ভারতবর্ষে পার্শীদের সম্বন্ধে যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছি দক্ষিণ আফ্রিকার পার্শীদের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। সমস্ত পৃথিবীতে এক লক্ষের বেশী পার্শী নাই। সংখ্যার এই স্বল্পতা হইতেই তাঁহাদের উচ্চ চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝা যায়। তাঁহারা দীর্ঘকাল নিজ প্রতিষ্ঠা ও নিজের ধর্ম বজায় রাখিয়াছেন এবং বদান্যতার ক্ষেত্রে তাঁহারা পৃথিবীর কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তবে সোরাবজী রত্নবিশেষ বলিয়া দেখা গেল। সত্যাগ্রহে যোগ দিবার সময় তাঁহার সহিত আমার অল্পই পরিচয় ছিল। সত্যাগ্রহে যোগ দিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া লিখিত তাঁহার পত্র পড়িয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে ভাল ধারণা হয়। পার্শীদের সদ্‌গুণাবলীর আমি যেমন পূজক, সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহাদের কয়েকটি দোষ তেমনি আমার অজানা নয়। সোরাবজী তাই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমার সন্দেহের বিপরীত কথা বলিলে নিজের সংশয়ের উপর গুরুত্ব না দেওয়াই আমার স্বভাব। সেইজন্য সোরাবজী পত্রে নিজের দৃঢ়তার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা মানিয়া লওয়ার উপদেশ আমি কমিটিকে দিলাম। পরবর্তীকালে সোরাবজী নিজেকে প্রথম শ্রেণীর সত্যাগ্রহী বলিয়া প্রমাণ করেন। তিনি যে কেবল সর্বাপেক্ষা দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগকারীদের অন্যতম তাহাই নহে, সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি এমন উচ্চাঙ্গের অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যে তাঁহার এতদ্‌সম্পর্কিত অভিমত সকলেই শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিতেন। তাঁহার পরামর্শে সর্বদাই দৃঢ়তা, বিবেক, উদারতা ও বিবেচনাশক্তি ইত্যাদি গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া কোনও অভিমত গঠন করিতেন না, আবার একবার তাহা করিলে হঠাৎ ত্যাগ করিতেন না। তিনি যতটা পার্শী ছিলেন ততটাই ছিলেন ভারতীয়।

সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ তাঁহার মধ্যে ছিল না। সত্যাগ্রহ শেষ হইলে সত্যাগ্রহীদের মধ্যে যোগ্য একজনকে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিস্টার করিয়া আনার জন্য ডাক্তার মেহ্‌তা একটি বৃত্তি দিয়াছিলেন। নির্বাচনের দায়িত্ব আমার উপর পড়ে। দুই তিন জন উপযুক্ত প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু সকল বন্ধুরাই একবাক্যে বলেন যে বিচারশক্তি ও জ্ঞানের পরিপক্কতার দিক হইতে কেহই সোরাবজীর ধারে কাছে যাইতে পারেন না এবং তাই তিনিই ইহার জন্য নির্বাচিত হন। বিলাতে পাঠাইবার হেতু ছিল এই যে তিনি ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়া আমার স্থান লইয়া সম্প্রদায়ের সেবা করিবেন। সম্প্রদায়ের আশীর্বাদ লইয়া সোরাবজী বিলাত গিয়াছিলেন ও ব্যারিস্টার হইয়াছিলেন। গোখলের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তাঁহার দেখা হয়, কিন্তু বিলাতে সে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি গোখলের মন হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। গোখলে ভারতবর্ষে ফিরিয়া সোরাবজীকে তাঁহার 'সার্ভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে' যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সোরাবজী ছাত্রদিগের মধ্যে অতিশয় প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি সকলের দুঃখেই সমবেদনা বোধ করিতেন এবং বিলাতের জীবনের ভোগবিলাস ও কৃত্রিমতা তাঁহার মনকে এতটুকুও প্রভাবিত করিতে পারে নাই। বিলাতে যাওয়ার সময় সোরাবজীর বয়স ত্রিশের উপর ছিল। ইংরাজী তাঁহার খুব ভাল জানা ছিল না। কিন্তু অধ্যবসায়ীর নিকট এ সকল অসুবিধা দাঁড়াইতে পারে না। সেখানে খাঁটি ছাত্রজীবন যাপন করিয়া পর পর পরীক্ষাগুলিতে তিনি উত্তীর্ণ হন। আমার সময় ব্যারিস্টারী পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। আজকাল ব্যারিস্টারীর জন্য তদপেক্ষা অনেক বেশী পড়িতে হয়। কিন্তু পরাজয় কি তাহা সোরাবজী জানিতেন না। বিলাতে যুদ্ধের সময় যে সেবকবাহিনী (এম্বুলান্স কোর) সংগঠিত হয় তিনি ছিলেন তাহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ বাহিনীতে ছিলেন। এই সেবকদলকেও সত্যাগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সে সময় অনেক সত্যাগ্রহী মাঝপথে বসিয়া পড়িলেও অপরাজেয় সত্যাগ্রহীদের পুরোভাগে ছিলেন সোরাবজী। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে ঐ সত্যাগ্রহের জয় হইয়াছিল।

ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সোরাবজী ইংলণ্ড হইতে জোহানস্‌বার্গে প্রত্যাবর্তন করেন। সেইখানেই ব্যারিস্টারী করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্প্রদায়ের সেবা করা আরম্ভ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমি যেসব চিঠিপত্র পাইতাম তাহার প্রতিটিই সোরাবজীর গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ থাকিত: "তাঁহার

আচার ব্যবহার চিরদিনের মত এখনও অতীব অনাড়ম্বর—অহমিকার তিলমাত্র স্পর্শ নাই। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সহিত তিনি মেলামেশা করেন।" তবে মনে হয় ঈশ্বর যতটা করুণাময় ততটাই আবার নিষ্ঠুর। সোরাজীর রাজযক্ষ্মা হইল এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন—পিছনে রাখিয়া গেলেন তাঁহার জন্য শোকরত ভারতীয় সম্প্রদায়। এইভাবে অত্যল্পকালের মধ্যে ঈশ্বর ভারতীয়দের মধ্য হইতে কাছালিয়া ও সোরাবজী—এই দুই জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে লইয়া গেলেন।

ইঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে বিশেষ করিয়া বাছিতে বলিলে আমি বিভ্রান্ত হইয়া যাইব। প্রত্যুত ইঁহাদের উভয়েই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর কাছালিয়া যেমন একজন আদর্শ মুসলমান এবং সমপরিমাণ আদর্শ ভারতীয় ছিলেন, সোরাবজীও সেইরূপ একজন আদর্শ পার্শী ও সমপরিমাণ আদর্শ ভারতীয় ছিলেন।

এই ভাবে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ট্রান্সভালে তাঁহার থাকার অধিকার আছে কি না পরীক্ষা করার জন্য সরকারকে পূর্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি দিয়া সোরাবজী ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলেন। সরকার ইহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না এবং তাই সোরাবজীকে লইয়া কি করিবেন হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। সোরাবজী ইতিমধ্যে প্রকাশ্য ভাবে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলেন। বহিরাগত নিয়ন্ত্রণকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সোরাবজীকে চিনিতেন। সোরাবজী তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি ইচ্ছা করিয়াই, তাঁহার অধিকার আছে কি না পরীক্ষা করার জন্য ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতেছেন। তাই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিজের অভিরুচি অনুযায়ী হয় তাঁহার ইংরাজীর জ্ঞানের পরীক্ষা লইতে পারেন আর নচেৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। কর্মচারীটি উত্তর দিলেন যে তিনি সোরাবজীর ইংরাজী ভাষার জ্ঞান সম্বন্ধে জানেন, সুতরাং তাহার পরীক্ষা লইবার আর আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করারও কোন হুকুম পান নাই। তাই সোরাবজী ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে পারেন এবং সরকার ইচ্ছা করিলে তিনি যেখানেই থাকুন সেখান হইতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবেন।

এই ভাবে আমাদের আশঙ্কাকে ব্যর্থ করিয়া সোরাবজী জোহানস্‌বার্গে উপনীত হইলেন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের মধ্যে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলাম। কেহই আশা করেন নাই যে সরকার তাঁহাকে সীমান্তের ভোকস্রস্ট

শহর হইতে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে দিবেন। প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে আমরা যখন জ্ঞাতসারে ও নির্ভীকতা সহকারে কোন পদক্ষেপ করিয়াছি সরকার আর আমাদের বিরোধিতা করিতে প্রস্তুত হন নাই। ইহার কারণ সরকারের চারিত্র্যধর্মের মধ্যে নিহিত। সরকারী কর্মচারীরা সাধারণতঃ তাঁহাদের বিভাগের সহিত এতটা মানসিক সাযুজ্য স্থাপন করেন না যাহাতে পূর্বাহ্নে সকল ব্যাপারে নিজের মতামত স্থির করিয়া লইতে পারেন ও তদনুযায়ী প্রস্তুতি করেন। তাহা ছাড়া পদস্থ কর্মচারীদের একটি নয়, বহু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয় এবং তাঁহাদের মনও নানা দিকে বিক্ষিপ্ত থাকে। তৃতীয়তঃ তাঁহারা ক্ষমতার মদে মত্ত থাকেন বলিয়া কর্তব্যে অবহেলা করিতে বাধ্য। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে যে-কোন আন্দোলন সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তৃপক্ষের নিকট ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছু নহে। পক্ষান্তরে জনসেবক কিন্তু নিজের লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার পন্থাসম্বন্ধে সচেতন। তাঁহার পরিকল্পনা যেমন সুনির্দিষ্ট, তাহার রূপায়নের জন্যও তিনি তদ্রূপ প্রস্তুত এবং দিবারাত্র নিজের কাজই তাঁহার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। তাই তিনি যদি বিচার বিবেচনা পূর্বক যথার্থ পদক্ষেপ করেন, সরকার হইতে তিনি সর্বদাই আগাইয়া থাকিবেন। সরকারের অসাধারণ ক্ষমতা থাকে বলিয়া নহে, নেতৃবৃন্দের ভিতর পূর্বোক্ত গুণাবলীর অভাবের কারণ বহু আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

যাহা হউক সরকারের ঔদাসীন্য অথবা ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনা—যে-কোন কারণের জন্য সোরাবজী জোহানস্‌বার্গ পর্যন্ত উপনীত হইলেন এবং এজাতীয় ঘটনায় তাঁহার কর্তব্য কি এ সম্বন্ধে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিজের কোন ধারণা ছিল না অথবা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তিনি এ ব্যাপারে কোন নির্দেশও পাইলেন না। সোরাবজীর উপস্থিতিতে আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল এবং কিছু সংখ্যক যুবক মনে করিল যে সরকারের পরাভব ঘটিয়াছে ও শীঘ্রই কর্তৃপক্ষকে একটা আপস রফা করিতে হইবে। অবশ্য শীঘ্রই তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল। তাহারা হয়ত ইহাও উপলব্ধি করিল যে বহু যুবকের আত্মবিস্মৃত নিষ্ঠার বিনিময়েই কেবল আপস রফা করা সম্ভবপর।

সোরাবজী জোহানস্‌বার্গের পুলিস সুপারিনটেনডেণ্টকে তাঁহার আগমনের সংবাদ জানাইলেন। তিনি ইহাও জানাইলেন যে নূতন বহিরাগত নিয়ন্ত্রণকারী আইন অনুসারে তাঁহার ট্রান্সভালে থাকার অধিকার আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। কারণ ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার মোটামুটি জ্ঞান আছে এবং

কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে তিনি ইহার পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। তাঁহার এই চিঠির কোন জবাব আসিল না—অথবা ইহার জবাবে কয়েক দিন পরে আদালতের পরোয়ানা আসিল বলাই সঙ্গত।

১৯০৮ সনের ৮ই জুলাই সোরাবজীর মামলা আদালতে উঠিল। আদালত-গৃহ ভারতীয় দর্শকে পরিপূর্ণ। মামলা শুরু হইবার পূর্বে আমরা আদালত-প্রাঙ্গণে উপস্থিত ভারতীয়দের একটি সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। সেই সভায় সোরাবজী ওজস্বিনী ভাষায় একটি বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে সম্প্রদায়ের বিজয়ের জন্য যতবার প্রয়োজন তিনি কারাবরণে প্রস্তুত এবং সাহসিকতা সহকারে যাবতীয় বিপদ ও ঝুঁকির সম্মুখীন হইবেন। ইতিমধ্যে সোরাবজীর সহিত আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল এবং মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সোরাবজী সম্প্রদায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। ম্যাজিস্ট্রেট যথাসময়ে মামলার বিচার আরম্ভ করিলেন। আমি সোরাবজীর পক্ষ সমর্থন করিলাম এবং সমনে ত্রুটি থাকার জন্য অবিলম্বে তাঁহার মুক্তি দাবি করিলাম। সরকারী উকিলও তাঁহার বক্তব্য পেশ করিলেন। কিন্তু ৯ই তারিখে আদালত আমার বক্তব্য স্বীকার করিয়া লইয়া সোরাবজীকে খালাস করিয়া দিলেন। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে পরদিবস অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই শুক্রবার তাঁহাকে আবার আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

১০ই তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট সোরাবজীকে এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রান্সভাল পরিত্যাগ করার হুকুম দিলেন। আদালতের হুকুম জারি হইবার পর সোরাবজী পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট ভারনন্‌কে জানাইলেন ট্রান্সভাল ত্যাগ করিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আবার ২০শে তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অমান্য করার অভিযোগে তাঁহাকে আদালতে হাজির করা হইল। এবং তাঁহাকে এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। তবে সরকার স্থানীয় ভারতীয়দের গ্রেপ্তার করে নাই। কারণ সরকার দেখিতে পাইতেছিল যে ভারতীয়দের যতই গ্রেপ্তার করা হইতেছিল তাহাদের মনোবলও ততই বাড়িতেছিল। তাহা ছাড়া আইনের মারপ্যাচের জন্য সময় সময় গ্রেপ্তার হইবার পরও ভারতীয়রা ছাড়া পাইতেছিলেন এবং ইহার ফলেও সম্প্রদায়ের মনোবল দ্বিগুণিত হইতেছিল। সরকার যেসব আইন চাহিতেন বিধান সভায় তাহা পাস করাইয়াছিলেন। বহু ভারতীয় তাঁহাদের সার্টিফিকেট পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন একথা ঠিক। কিন্তু নাম রেজিস্ট্রী করার জন্য তাঁহাদের সে দেশে থাকার অধিকার হইয়া

গিয়াছিল। সুতরাং কেবল তাঁহাদের জেলে পাঠাইবার জন্য সরকার স্থানীয় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা নিরর্থক মনে করিলেন। কর্তৃপক্ষ মনে করিলেন যে সরকারের এই বিরাট নিষ্ক্রিয়তার ফলে কর্মীদের উৎসাহ বহিঃপ্রকাশের কোন রাস্তা না পাইয়া আপনি শীতল হইয়া যাইবে। ভারতীয়েরা তাই সরকারের ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্য নূতন পদক্ষেপ করিলেন এবং শীঘ্রই সরকারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

ত্রিংশৎ অধ্যায়

শেঠ দাউদ মহম্মদ প্রভৃতির যোগদান

ভারতীয়রা যখন দেখিলেন যে, শ্লথগতিতে চলিয়া তাঁহাদের ক্লান্ত করিয়া দেওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য, তখন নূতন কোনও দিক দিয়া আক্রমণের রাস্তা খুঁজিয়া লইতে হইল। সত্যাগ্রহীর যতক্ষণ পর্যন্ত দুঃখ সহ্য করার শক্তি থাকে ততক্ষণ তাঁহারা শ্রান্ত হন না। ভারতীয়েরা সেইজন্য সরকারের হিসাব বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

নাতালে এমন কতক ভারতীয় ছিলেন যাঁহাদের ট্রান্সভালে বাস করার অধিকার পূর্ব হইতে ছিল। ব্যবসা করার জন্য তাঁহাদের ট্রান্সভালে যাওয়ার আবশ্যকতা হইত না, কিন্তু তাঁহাদের প্রবেশের অধিকার আছে বলিয়া সম্প্রদায় গণ্য করিত। তাঁহারা অল্পস্বল্প ইংরাজীও জানিতেন। তাহা ছাড়া সোরাবজীর মত ইংরাজী জ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়দের ট্রান্সভাল প্রবেশে সত্যাগ্রহের নীতি ভঙ্গ হয় না। সেইজন্য দুই শ্রেণীর ভারতীয়কে ট্রান্সভালে প্রবেশ করানো স্থির হইল —যাঁহাদের পূর্ব হইতে বসবাসের অধিকার আছে, আর যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত।

ইহাদের মধ্যে শেঠ দাউদ মহম্মদ ও পার্শী রুস্তমজী প্রভৃতি বড় বড ব্যবসায়ী ছিলেন। আর সুরেন্দ্ররায় মেঢ়, প্রাগজী খণ্ডুভাই দেশাই, হরিলাল গান্ধী ইত্যাদি ছিলেন "শিক্ষিতবর্গের" অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রী মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও শেঠ দাউদ অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

শেঠ দাউদ মহম্মদের পরিচয় দিতেছি। তিনি নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের

সভাপতি ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় আগত প্রাচীনতম ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তিনি অন্যতম। তিনি সুরাটের সুন্নি বোরা ছিলেন। কুশল বুদ্ধিতে তাঁহার সমান ভারতীয় আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় খুব কম দেখিয়াছি। তাঁহার বোধশক্তি খুব উচ্চমানের ছিল। তাঁহার লেখাপড়া বেশী জানা ছিল না, কিন্তু ইংরাজী ও ডচ ভাল ভাবেই বলিতে পারিতেন। ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সহিত তিনি চমৎকার ভাবে কাজকর্ম চালাইতেন। তাঁহার দানশীলতার বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রায় জনা পঞ্চাশ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি প্রতিদিনই তাঁহার বাড়িতে ভোজন করিতেন। সম্প্রদায়ের জন্য চাঁদা দিতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। অমূল্য রত্নের ন্যায় গুণবান তাঁহার এক পুত্র ছিল। তাহার চরিত্র পিতা অপেক্ষাও মহান। তাহার হৃদয় স্ফটিকের মত নির্মল ছিল। পুত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষায় দাউদ শেঠ কখনও বিঘ্ন ঘটান নাই। নিজের এই পুত্রকে শেঠ দাউদ পূজা করিতেন বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। তাঁহার কোন দোষও যেন পুত্রে না বর্তায়—এই ছিল তাঁহার ইচ্ছা এবং শিক্ষালাভের জন্য তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। এ হেন পুত্ররত্নকে শেঠ দাউদ ভরা যৌবনে হারান। হুসেনকে ক্ষয়রোগ আক্রমণ করে ও তাহার প্রাণ হরণ করে। শেঠ দাউদের এই ক্ষত আর কখনো শুকায় নাই। হুসেনের সহিত ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিরাট এক আশারও ভরাডুবি হয়। হুসেন অতীব সত্যনিষ্ঠ বালক ছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান ছিল যেন তাহার দক্ষিণ ও বাম চক্ষু। আজ শেঠ দাউদও নাই। কাল কাহাকে না কবলিত করে?

পার্শী রুস্তমজীর পরিচয় আমি পূর্বেই দিয়াছি। অনেক পাঠকই তাঁহার নাম জানেন। আমি কোনও কাগজপত্রের সাহায্য না লইয়াই এই অধ্যায় লিখিতেছি বলিয়া 'এসিয়াবাসীদের অভিযানে' যোগদানকারী অনেক মিত্রের নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আশা করি, তাঁহারা আমাকে মাফ করিবেন। কাহাকেও অমর করার জন্য এই অধ্যায়গুলি লিখিতেছি না। সত্যাগ্রহের রহস্য বুঝাইবার জন্য, কেমন করিয়া ইহা বিজয়ী হইয়াছিল, কোন্ কোন্ বাধা ইহার পথে আসিয়াছিল এবং কেমন করিয়াই বা সেসব বিঘ্ন দূর করা হইয়াছিল তাহা বলিবার জন্যই আমি এই অধ্যায়গুলি লিখিতেছি। যেখানে যেখানে আমি কাহারও নাম উল্লেখ করিয়াছি সেখানে আমার উদ্দেশ্য ইহা দেখান যে নিরক্ষর রূপে বিবেচিত ব্যক্তিরাও দক্ষিণ আফ্রিকায় কেমন পরাক্রম দেখাইয়াছেন। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি কি করিয়া সেখানে একসাথে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া ব্যবসায়ী, 'শিক্ষিত ব্যক্তি' ও অন্যান্যেরা

নিজেদের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন তাহা দেখানও আমার উদ্দেশ্য। যেখানেই আমি গুণীর পরিচয় করাইয়াছি সেখানে ব্যক্তির নয়, তাঁহার গুণেরই স্তুতি করিয়াছি।

এইভাবে যখন দাউদ শেঠ নিজের সত্যাগ্রহী 'বাহিনী' লইয়া ট্রান্সভাল সীমান্তে পৌঁছাইলেন তখন ট্রান্সভাল সরকার প্রস্তুত ছিলেন। এই রকম বিরাট একটি দলকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে দিলে সরকার উপহাসের পাত্র হইবেন, সেইজন্য ইহাদিগকে গ্রেপ্তার না করিয়া উপায় ছিল না। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। তিনি তাঁহাদের সাত দিনের মধ্যে ট্রান্সভাল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা সে আদেশ অমান্য করেন এবং ২৮শে প্রিটোরিয়াতে তাঁহাদের পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া বিনাবিচারে ট্রান্সভাল হইতে বহিষ্কার করা হয়। ৩১শে তাঁহারা আবার ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন এবং শেষ অবধি ৮ই সেপ্টেম্বর ভোকস্রস্ট আদালতে ৫০ পাউণ্ড জরিমানা অথবা অনাদায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বলা বাহুল্য তাঁহারা কারাদণ্ডই বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

ইহাতে ট্রান্সভালের ভারতীয়দের উৎসাহ খুবই বাড়িয়া যায়। নাতাল হইতে সাহায্য করিতে আগত স্বদেশবাসীদের মুক্ত যদি বা না-ই করা গেল, নিজেরা তো তাঁহাদের কারাজীবনের সাথী হইতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা জেলে যাইবার রাস্তা খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনের অভিলাষ চরিতার্থ করার অনেক রাস্তা ছিল। বাস করার সার্টিফিকেট না দেখাইলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভারতীয়েরা ব্যবসা করার লাইসেন্স পাইবেন না। এই লাইসেন্স না লইয়া ব্যবসা করিলে আইন ভঙ্গ করা হয়। নাতাল হইতে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে হইলে সার্টিফিকেট দেখাইতে হয়, দেখাইতে না পারিলেই গ্রেপ্তার করা হয়। সার্টিফিকেট তো পূর্বেই পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল, সেই-জন্য রাস্তা সাফই ছিল। ভারতীয়েরা উভয় পন্থাই গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বিনা লাইসেন্সে ফেরি করিতে গিয়া এবং কেহ বা বিনা সার্টিফিকেটে সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার হইতে লাগিলেন।

আন্দোলন এবার পূর্ণোদ্যমে চলিল। প্রত্যেকের অগ্নিপরীক্ষা শুরু হইল। নাতালের অন্যান্য ভারতীয় শেঠ দাউদ মহম্মদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। জোহানস্‌বার্গেও বহু ধরপাকড় হইল। অবস্থা এমন হইল যে যাঁহার ইচ্ছা তিনিই

গ্রেপ্তার হইতে পারেন। জেল ভরিয়া উঠিল। নাতাল হইতে আগত 'আক্রমণ-কারীদের' তিন মাসের এবং ট্রান্সভালের ফেরীওয়ালাদের চার দিন হইতে তিন মাস পর্যন্ত সাজা হইল।

যাঁহারা এইভাবে ধরা পড়িলেন তাঁহাদের মধ্যে ইমাম সাহেব বাওয়াজীর ছিলেন। তাঁহার চারিদিনের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বিনা লাইসেন্সে ফিরি করিয়া তিনি ধরা পড়েন। তাঁহার শরীর এমন অশক্ত ছিল যে লোকে তাঁহার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা শুনিয়া হাসিত। কতজন আমাকে আসিয়া বলিয়াছেন যে, ইমাম সাহেবকে এ ব্যাপারের সহিত না জড়ানই ভাল। কারণ তিনি হয়ত সম্প্রদায়ের দুর্নামের কারণ হইবেন। আমি এই সাবধানতার কথায় কান দিই নাই। ইমাম সাহেবের শক্তির বিচার করার আমি কে? ইমাম সাহেব কখনও খালি পায় বাহির হন নাই। তিনি শৌখীন লোক ছিলেন, তাঁহার পত্নী ছিলেন মালয়ী। তাঁহার সুসজ্জিত ঘর-গৃহস্থালী ছিল এবং গাড়ীঘোড়া ছাড়া তিনি কোথাও চলিতেন না। এ সকলই সত্য, কিন্তু তাঁহার মনের খবর তিনি ছাড়া আর কে জানে? এই ইমাম সাহেবই প্রথম দফায় চারদিনের জেল খাটিয়া আসিয়া পুনর্বার জেলে গেলেন। জেলে তিনি আদর্শ কয়েদী ছিলেন, কঠিন পরিশ্রমের পরই আহার গ্রহণ করিতেন। যাঁহার নিত্য নূতন খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস, জেলে মকাই-এর আটার জাউকেই তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলিয়া মানিতেন। তিনি তো হার মানিলেনই না, বরঞ্চ সাদাসিধা জীবন গ্রহণ করিলেন। কয়েদী হইয়া তিনি পাথর ভাঙ্গিতেন, ঝাড়ু দিতেন এবং অন্য কয়েদীদিগের সহিত এক সারিতে দাঁড়াইতেন। অবশেষে যখন তিনি ফিনিক্সে আসিলেন তখন জল তোলা ও ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজও করিতেন। ফিনিক্সে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কম্পোজিটারের কাজ শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক ছিল। ইমামসাহেব যথাশক্তি কম্পোজিটারের কাজ শিখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া নিজের শক্তি অনুযায়ী দেশের সেবা করিতেছেন।

এমনি করিয়া আরও অনেকে জেলের মধ্যে শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। জোসেফ রায়পন ছিলেন ব্যারিস্টার ও কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েট। নাতালের গিরমিটিয়া পিতামাতার ঘরে জন্মিয়া তিনি পুরামাত্রায় সাহেব হইয়া গিয়াছিলেন ও বাড়িতে তিনি জুতা না পরিয়া চলিতেন না। ইমাম সাহেবকে ওজু করার সময় পা ধুইতে হইত, নামাজ পড়ার সময় খালি পা হইতে হইত। বেচারা

রায়পনকে তাহাও করিতে হয় নাই। ব্যারিস্টারী ত্যাগ করিয়া তরীতরকারীর ঝোড়া লইয়া তিনি বাহির হইলেন এবং লাইসেন্স বিহীন ফেরিওয়ালা হিসাবে গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহাকেও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। রায়পন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকেও কি রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে হইবে?" আমি জবাব দিলাম, "আপনি যদি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যান, তবে কাহাকে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে বলিব? জেলে আপনাকে ব্যারিস্টার বলিয়া কে চিনিবে?" জোসেফ রায়পনের পক্ষে এই জবাবই যথেষ্ট ছিল।

ষোল বৎসরের বহু বালক জেলে গেল। মোহনলাল মাঞ্জী ঘেলানী নামে একজন চৌদ্দ বৎসরের ছেলেও এদের মধ্যে ছিল।

জেলের কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের হয়রান করার কোন চেষ্টাই বাকী রাখেন নাই। তাঁহাদের পায়খানা সাফ করার কাজ দেওয়া হয়। ভারতীয় কয়েদীরা হাসিমুখে তাহা করিতেন। তাঁহাদের পাথর ভাঙ্গিতে দিত। আল্লার বা রাম নাম লইতে লইতে তাঁহারা পাথর ভাঙ্গিতেন। তাঁহাদের পুষ্করিণী খুঁড়িতে দিয়াছে, পাথুরে মাটি কোপাইতে হইয়াছে। এইসব কাজ করিতে তাঁহাদের হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বা অসহ্য কষ্টে মূর্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু কেহ হার মানেন নাই।

জেলের ভিতর মধ্যে মধ্যে যে ঝগড়া ও দ্বেষ ভাব দেখা দিত না তাহা নয়। খাওয়া লইয়া তো চিরকাল বিবাদ ঘটিয়া থাকে; তবে আমরা তাহা হইতে সাফল্য সহকারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।

আমিও দ্বিতীয়বার ধৃত হইলাম। ভোকস্রস্ট জেলে এক সময় আমরা ৭৫ জন পর্যন্ত কয়েদী ছিলাম। আমাদের পাক করার ভার নিজেদের হাতে লইয়াছিলাম। আহার্যের বরাদ্দ লইয়া পরস্পরবিরোধী দাবির সালিশী করার কাজ একমাত্র আমিই করিতে পারিতাম বলিয়া রান্নার ভারও আমিই লইলাম। আমার প্রতি প্রেমের বশে আমার হাতের সিদ্ধ অসিদ্ধ জাউ গুড় ছাড়াই সাথীরা খাইয়া যাইতেন।

সরকার ভাবিলেন যে, আমাকে আলাদা করিয়া ফেলিলে আমারও কিছু সাজা হয় আর অন্য কয়েদীদিগকেও জব্দ করা যায়। আমাকে তাই প্রিটোরিয়ায় লইয়া গেলেন। সেখানে বিপজ্জনক কয়েদীদের রাখার নির্জন কক্ষে আমাকে রাখা হইল। মাত্র দুইবার ব্যায়ামের জন্য আমাকে বাহিরে আনা হইত। ভোকস্রস্টে ঘি দেওয়া হইত, এখানে তাহাও দেওয়া হইত না। কিন্তু সেখানকার

জেলের কষ্টের কথা আমি এখানে বলিতে চাই না। কৌতূহলী পাঠক আমার "দক্ষিণ আফ্রিকার জেলের অভিজ্ঞতা" নামক বইখানা যেন পড়েন।

এত করিয়াও ভারতীয়দিগকে হার মানান যায় নাই। সরকার হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। জেলে আর কত ভারতীয় পাঠান যায়? ইহাতে সরকারের খরচাও বাড়িয়া যায়। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকার অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশৎ অধ্যায়

নির্বাসন

সেই বহু নিন্দিত এসিয়াটিক্ আইনে তিন প্রকার সাজার ব্যবস্থা ছিল—অর্থদণ্ড, জেল ও নির্বাসন। এই তিন প্রকারের সাজাই এক সঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের ছিল এবং সকল শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে এই আইনের বিধান অনুসারে সর্বোচ্চ সাজা দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম দিকে নির্বাসনের অর্থ ছিল ট্রান্সভালের সীমা পার হইয়া নাতাল, ডেলাগোয়া বে অথবা অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের সীমার মধ্যে 'অপরাধীকে' রাখিয়া আসা। উদাহরণ স্বরূপ যাঁহারা নাতালের দিক হইতে প্রবেশ করেন তাঁহাদিগকে ভোক্‌স্রস্ট স্টেশনের সীমার বাহিরে লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এইজাতীয় নির্বাসন নিছক প্রহসন। কারণ ইহাতে সীমার বাহিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও অসুবিধা ছিল না। ফলে ভারতীয়রা হতোদ্যম হইবার পরিবর্তে অধিকতর উৎসাহী হইতেন।

স্থানীয় সরকারকে সেইজন্য ভারতীয়দের হয়রান করিবার নূতন পথ খুঁজিতে হইল। জেলে আর জায়গা ছিল না। সরকার ভাবিল যে ইহাদিগকে যদি সমুদ্র পার করিয়া ভারতবর্ষে ফেলিয়া আসা যায়, তাহা হইলে পুরামাত্রায় ভয় পাইয়া যাইবে ও বশ্যতা স্বীকার করিবে। সরকারের এই প্রকার মনে করার কতকটা হেতুও ছিল। ভারতীয়দের একটা বড় দলকে এইভাবেই সরকার ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। এই প্রকারে বহিষ্কৃত লোকগুলির খুবই দুর্গতি হইয়াছিল। সরকার দয়া করিয়া যাহা বরাদ্দ করিয়াছিলেন তাহা ছাড়া স্টীমারে তাঁহাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সকলকে ডেকে পাঠান হইয়াছিল।

ইঁহাদের মধ্যে কতজনের দক্ষিণ আফ্রিকায় জমি-জিরাত, ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। অনেকের নিজের পরিবার ছিল এবং কাহারও বা দেনা ছিল। এইভাবে সব-কিছু খোয়াইয়া দেউলিয়া হইতে বিশেষ কেহ প্রস্তুত হইবেন না।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বহু ভারতীয় সম্পূর্ণ দৃঢ় থাকিলেন। আবার অনেকে দমিয়াও গেলেন এবং গ্রেপ্তার হওয়া বন্ধ করিলেন। তাঁহারা অবশ্য পোড়ানো সার্টিফিকেটের নকল চাহিয়া লওয়া পর্যন্ত নামেন নাই। তবু কয়েকজন ভয়ে ভয়ে নূতন করিয়া সার্টিফিকেট করাইলেন।

তবুও বহুসংখ্যক বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন যাঁহাদের সাহসের তুলনা হয় না। আমার বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতেও যাইতে পারিতেন—ধন-সম্পত্তির মায়া তো তাঁহারা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

যাঁহাদিগকে ভারতবর্ষে ফেরত পাঠান হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গরীব ও সরল স্বভাবের লোক ছিলেন, যাঁহারা কেবল বিশ্বাসের বলে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপর এই প্রবল অত্যাচার দেখিয়া স্থির থাকা কঠিন। তাঁহাদিগকে কোন রকমে সাহায্য করারও উপায় ছিল না। টাকাও যথেষ্ট ছিল না। আর পয়সা দিয়া সাহায্য করা মানে সত্যাগ্রহ যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে হারিয়া যাওয়ার আশঙ্কা। উহাতে টাকার লোভে লোকে যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাহার প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দিবে। সেইজন্য একজন লোককেও পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। তবে আমরা অনুভব করিলাম যে নির্বাসিতদের আমাদের সহানুভূতি দ্বারা সাহায্য করা কর্তব্য।

অভিজ্ঞতায় আমি ইহা দেখিয়াছি যে, সহানুভূতি, মিষ্টিকথা, সহৃদয় দৃষ্টির মূল্য অর্থের চেয়েও বেশী। অর্থলোভী কোন ব্যক্তি যদি কাহারও নিকট পয়সা পাইয়াও তাঁহার সহানুভূতি না পায় তবে শেষ অবধি সে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। কিন্তু প্রেমের দ্বারা যাঁহাকে জয় করা হইয়াছে সে যাঁহার প্রেম পাইয়াছে তাঁহার সহিত অন্তহীন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে পারে।

সেইজন্য এই বহিষ্কৃতদের যতটা সম্ভব সহানুভূতি দিয়া সাহায্য করাই আমরা ঠিক করিলাম। তাঁহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে, ভারতবর্ষে তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইবে। পাঠকেরা জানেন যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই গিরমিট-মুক্ত ভারতীয় ছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহাদের কোন আত্মীয়-স্বজন ছিলেন না। কেহ কেহ তো দক্ষিণ আফ্রিকাতেই জন্মিয়াছিলেন। সকলের নিকটে ভারতবর্ষ ছিল বিদেশ। তাঁহাদের এইরূপ অবস্থায় লোকগুলিকে

ভারতবর্ষের তটভূমিতে ফেলিয়া শুকাইয়া মারা নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সেইজন্য তাঁহাদিগের জন্য ভারতবর্ষে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

কিন্তু এই ব্যবস্থাও যথেষ্ট নহে। তাঁহাদের সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে যতক্ষণ না একজন থাকিতেছেন ততক্ষণ তাঁহারা ভরসা পাইবেন না। দেশ-বহিষ্কৃতের এই প্রথম দল যাইতেছিলেন। স্টীমার ছাড়ার অল্প সময়ই বাকী ছিল। পছন্দ করিয়া লোক নির্বাচন করার সময় ছিল না। আমার একজন সহকর্মী পি. কে. নাইডুর কথা আমি চিন্তা করিলাম ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম:

"তুমি কি এই হতভাগ্য ভাইদের সঙ্গী হইয়া ভারতবর্ষে যাইতে পারিবে?"

"পারিব না কেন?"

"কিন্তু স্টীমার যে এখনই ছাড়িবে।"

"ছাড়ুক না।"

"কিন্তু, তোমার কাপড-চোপড ও খাওয়ার কি হইবে?"

"কাপড যাহা পরিয়া আছি তাহাতেই চলিবে। আর ভাত তো স্টীমারে গিয়া খাইব।"

আমার যেমন আনন্দ হইল, তেমনি আশ্চর্য হইলাম। পার্শী রুস্তমজীর বাড়িতে এই কথা হইতেছিল। সেইখানেই নাইডুর জন্য কয়েকখানা কাপড ও কম্বল যোগাড করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

"সাবধানে থাকিও ও রাস্তায় এই ভাইদের দিকে নজর রাখিও। আমি মাদ্রাজে শ্রীযুক্ত নটেশনের নিকট তার করিতেছি। তিনি যেমন বলেন, তেমনি করিবে।"

"আমি খাঁটি সৈন্য হওয়ার চেষ্টা করিব।" এই বলিয়া সে রওনা হইয়া গেল। আমি মনে মনে ভাবিলাম যে যেখানে এমন বীর-পুরুষ আছে, সেখানে জয় অবশ্যম্ভাবী। নাইডুর জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং তিনি কখনও ভারতবর্ষ দেখেন নাই। তাঁহার নিকট শ্রীযুক্ত নটেশনের নামে পরিচয়-পত্র দিলাম। তাঁহাকে তারও করিলাম।

ভারতবর্ষে এই সময় সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত নটেশনই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যাটা বুঝিবার জন্য যত্ন লইতেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে বুঝিয়া শুনিয়া সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে

লিখিতেন। তাঁহার সহিত আমার নিয়মিত পত্র ব্যবহার চলিত। বহিষ্কৃত ভাইয়েরা মাদ্রাজে পৌছিলে শ্রীযুক্ত নটেশন তাঁহাদের পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করিয়াছিলেন। নাইডুর মত একজন যোগ্য ব্যক্তি নির্বাসিতদের সঙ্গে থাকাতে শ্রীযুক্ত নটেশনের কাজও সহজ হইয়াছিল। নাইডু স্থানীয় লোকেদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়াছিল এবং এই ভাইদিগকে বুঝিতেই দেয় নাই যে তাঁহারা দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছেন।

ট্রান্সভাল সরকার কর্তৃক এইভাবে ভারতীয়দের নির্বাসন দেওয়া যেমন বে-আইনী তেমনি নিষ্ঠুর কার্য হইয়াছিল। সাধারণতঃ লোকে খবর রাখে না যে, সরকার অনেক সময় ইচ্ছাপূর্বক নিজের আইন নিজেই ভঙ্গ করে। জরুরী অবস্থায় সরকারের নূতন আইন রচনা করার সময় থাকে না। সরকার তখন আইন ভঙ্গ করিয়া যথেচ্ছ কাজ করে। পরে হয় নূতন আইন করে, নয়তো জনসাধারণ যাহাতে পূর্বের আইন ভঙ্গের কথা ভুলিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করে।

ভারতীয়দের দিক হইতে স্থানীয় সরকারের এই বে-আইনী কার্যের বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভারতবর্ষেও ইহার তীব্র বিরোধ করা হইল। ট্রান্সভাল সরকারের পক্ষে এইভাবে হতভাগ্য ভারতীয়দের সে দেশের বাহির করিয়া দেওয়া ক্রমশঃ অধিকতর কঠিন হইয়া পড়িল। ভারতীয়েরা সম্ভাব্য সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন ও অবশেষে কর্তৃপক্ষকে ভারতবর্ষে নির্বাসন দেওয়ার প্রথা বন্ধ করিতে হইল।

কিন্তু এই নির্বাসন দেওয়ার নীতির প্রভাব সত্যাগ্রহী 'সৈন্যদের' উপরও পড়িল। তাঁহাদের সকলেই ভারতবর্ষে নির্বাসিত করিবার ভয় জয় করিতে পারেন নাই। অনেকে দূরে সরিয়া গেলেন এবং কেবল পাকা যোদ্ধারাই আমাদের সহিত রহিয়া গেলেন।

সত্যাগ্রহীদিগকে ভগ্নোদ্যম করার জন্য সরকার এই একটি মাত্র পদক্ষেপ করেন নাই। গত অধ্যায়ে আমি বলিয়াছি যে সত্যাগ্রহী কয়েদীদিগকে জেলে হয়রান করিতে সরকার কম চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদিগকে দিয়া পাথর ভাঙ্গান সহ সর্ববিধ কঠিন কাজ করাইয়া লইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট নহে। প্রথমে সমস্ত কয়েদীকে একসঙ্গে রাখিতেন; এখন তাঁহাদিগকে আলাদা আলাদা রাখার নিয়ম করিলেন ও প্রত্যেক জেলেই খুব পীড়ন করিতে লাগিলেন। ট্রান্সভালে শীতের প্রকোপ খুব। এত ঠাণ্ডা যে প্রাতঃকালে কাজ করিতে গেলে হাত জমিয়া যায়। শীতকালটা কয়েদীদের পক্ষে সেইজন্য খুবই

ক্লেশকর হইল। এই অবস্থায় কতকগুলি কয়েদীকে এমন এক সড়ক তৈরী করার চাউনি-জেলে রাখা হইল যেখানে কেহ গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখাও করিতে পারে না। এই দলে স্বামী নাগাপ্পন নামে আঠার বৎসর বয়স্ক এক সত্যাগ্রহী যুবক ছিল। সে জেলের নিয়ম পালন করিত ও নির্দিষ্ট কাজ করিত। প্রাতঃকালে তাহাকে রাস্তার কাজ করিতে লইয়া যাইত। তাহাতে তাহার কঠিন নিউমোনিয়া রোগ হয় ও এই অবস্থায় খালাস হওয়ার পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তাহাতেই সে প্রাণত্যাগ করে। তাহার সাথীরা বলেন যে, শেষ সময় পর্যন্ত সে কেবল সত্যাগ্রহের কথা চিন্তা করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করে। জেলে যাওয়ার জন্য তাহার অনুশোচনা হয় নাই। দেশের জন্য এই মৃত্যুকে সে বন্ধুর মতই আলিঙ্গন করে। আমাদের মানদণ্ড অনুযায়ী এই নাগাপ্পন 'নিরক্ষর'। সে ইংরাজী ও জুলু প্রভৃতি ভাষা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে শিখিয়াছিল সম্ভবতঃ সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী লিখিতেও পারিত। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাকে বিদ্বান বলা যায় না। তবুও তাহার সহিষ্ণুতা. ধৈর্য, দেশপ্রেম ও মরণ পর্যন্ত তাহার দৃঢ়তার কথা বিচার করিলে তাহার কোনও গুণের অভাব ছিল বলিয়া দেখা যায় না। বিপুল সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান না করা সত্ত্বেও সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্য সহকারে চলিতেছিল। কিন্তু নাগাপ্পনের মত সিপাহী না হইলে কি সত্যাগ্রহ যুদ্ধ চলিতে পারিত?

নাগাপ্পন যেমন জেলের কষ্টে মারা যায় তেমনি (১৬ই অক্টোবর ১৯১০ খ্রীঃ) নারায়ণ স্বামী নির্বাসনের ক্লেশে মারা যান। তবুও সম্প্রদায় অবিচলিত ছিল এবং কেবল দুর্বলরাই সরিয়া পড়েন। তবে তাঁহারাও যথাশক্তি দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমরা যেন অবহেলা না করি। অগ্রগামীরা সাধারণতঃ পশ্চাৎপদদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন ও নিজদিগকে বীর মনে করেন। সময় সময় বাস্তবিক ব্যাপার ইহার বিপরীত হয়। যাঁহার পঞ্চাশ টাকা দেওয়ার শক্তি আছে, তিনি যদি পঁচিশ টাকা দিয়া বসিয়া পড়েন, আর যাঁহার পাঁচ টাকা দেওয়ার শক্তি আছে তিনি পাঁচ টাকাই দিয়া দেন, তাহা হইলে যিনি পাঁচ টাকা দিয়াছেন তাঁহাকেই বড় দাতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, যদিও অপর জন তাঁহার তুলনায় পাঁচগুণ বেশী দিয়াছেন। অথচ প্রায়ই পঁচিশ টাকা দানকারীকে এই ভ্রান্ত ধারণার পরবশ হইয়া অনর্থক মাত্রাতিরিক্ত স্তুতি করা হয় যে তিনি পাঁচ টাকা দানকারী অপেক্ষা বড়। যে ব্যক্তির শক্তি অল্প সে যদি তাহার যতটা শক্তি আছে সমস্তই দিয়া দেয়, আর একজন যদি নিজের শক্তি

কম করিয়া দিয়াও পরিমাণে উহা অপেক্ষা বেশী দেয় তাহা হইলে যে শক্তি চুরি করিয়া রাখিল, তদপেক্ষা প্রথমোক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠতর। সেইজন্য ইহাও জানিয়া রাখা দরকার যে, যুদ্ধ কঠিন হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারাও দেশ-সেবা করিয়াছেন। ক্রমে এমন সময় আসিয়া পড়িল যখন অধিকতর সহ্যশক্তি, অধিকতর সাহসের প্রয়োজন। তাহাতেও টান্সভালের ভারতীয়েরা পশ্চাৎপদ হন নাই। যুদ্ধ চালাইতে যত বীরপুরুষের আবশ্যক তাহা ছিলই।

এইভাবে দিনে দিনে ভারতীয়দের অগ্নি-পরীক্ষার তীব্রতা বাড়িয়া চলিল। ভারতীয়েরা যতই অধিক শক্তি দেখাইতে লাগিলেন, সরকারও ততই হিংস্র হইয়া উঠিলেন। সকল দেশেই দুর্দান্ত কয়েদী অথবা যাহাদিগকে বিশেষ করিয়া সায়েস্তা করিতে হইবে তাহাদের জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র জেল থাকে, ট্রান্সভালেও ছিল। 'ডায়কলুফ' তেমনি একটি জেল—সেখানকার জেলার কঠোর, সেখানকার খাটুনিও কঠিন। তৎসত্ত্বেও সেখানকার ভারতীয় কয়েদীরা সাফল্য সহকারে তাঁহাদের নির্দিষ্ট কাজ করিয়া চলিলেন। তাঁহারা খাটিতে প্রস্তুত থাকিলেও অপমান সহ্য করিতে রাজী ছিলেন না। জেলার তাঁহাদিগকে অপমান করায় তাঁহারা উপবাস আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে যে পর্যন্ত জেলারকে বদলি অথবা তাঁহাদিগকে অন্য জেলে পাঠানো না হয়, সে পর্যন্ত তাঁহারা আহার করিবেন না। এই অনশন ধর্মঘট ছিল অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। ধর্মঘটীরা অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে লুকাইয়া খাওয়ার লোক কেহ ছিলেন না। পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, এই প্রকার উপবাসে ভারতবর্ষে আজকাল যেমন সোরগোল হইয়া থাকে ট্রান্সভালে সে রকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাহা ছাড়া জেলের নিয়মকানুনও বিশেষ ভাবে কঠিন ছিল। এ জাতীয় ঘটনা ঘটিলেও বাহিরের লোকদের কয়েদীদের দেখিতে যাওয়ার প্রথা ছিল না। সত্যাগ্রহীরা একবার জেলে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের নিজের উপরেই নির্ভর করিতে হইত। লড়াই ছিল গরীবদের ও লড়াই গরিবী চালেই চলিতেছিল। সেইজন্য অনশন ধর্মঘটীরা এইভাবে যে প্রতিজ্ঞা লন তাহাতে খুবই বিপদের সম্ভাবনা ছিল। তাহা হইলেও সত্যাগ্রহীরা দৃঢ় ছিলেন এবং সাতদিনের উপবাস করার পর তাঁহাদিগকে অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হইল। সে যুগে অনশন ধর্মঘট বিরল ব্যাপার ছিল বলিয়া বন্দী হিসাবে সেই সময়কার (নভেম্বর ১৯১০) সত্যাগ্রহীরা বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইবার যোগ্য।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

পুনরায় প্রতিনিধিদলে

এই প্রকারে সত্যাগ্রহীদিগকে জেলে পাঠানো অথবা নির্বাসন দেওয়া হইতেছিল। ইহাতে জোয়ার-ভাটাও অবশ্য ছিল। তবে উভয় পক্ষই কতকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সরকার দেখিলেন যে জেলে পাঠাইয়া সত্যাগ্রহের পুরোধাবর্গকে অবদমিত করিতে পারিবেন না। আর নির্বাসন দিবার নীতি সরকারকে কেবল বিব্রত অবস্থাতেই ফেলিয়াছে। এই জাতীয় কতকগুলি মোকদ্দমায় আদালতে সরকারেরই হার হইয়াছিল। এদিকে ভারতীয়েরাও আর জোরালো ভাবে লড়াই করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইহার জন্য আর যথেষ্ট সংখ্যক সত্যাগ্রহী পাওয়া যাইত না। কিছু সংখ্যক ভারতীয় রণক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কতক বা হার মানিয়াছিলেন। তাঁহারা তাই কট্টর সত্যাগ্রহীদের মূর্খ বলিতেছিলেন। এই "মূর্খেরা" কিন্তু নিজদিগকেই বিজ্ঞ মনে করিয়া ঈশ্বর, নিজেদের আদর্শ এবং গৃহীত পন্থার সততার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অবিচল বিশ্বাস ছিল যে সত্য মহান এবং অন্তিমে সত্যেরই জয় হইবে।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই উপমহাদেশের সবগুলি উপনিবেশকে সংযুক্ত করিয়া স্বদেশের জন্য উচ্চতর মর্যাদা লাভ করিবার জন্য বোয়ার ও ইংরেজ উভয়ের মনেই আগ্রহ জাগিয়াছিল। জেনারেল হার্টযোগ ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করার সপক্ষে ছিলেন। আর সকলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত কেবল নামমাত্র সম্বন্ধ রাখায় পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজরাও সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিন্ন হইতে দেওয়া কখনও সহ্য করিবেন না। তাই তাঁহাদের মতে উচ্চতর অধিকার পাইতে হইলে তাহা পাইতে হইবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাধ্যমে। এই অবস্থায় বোয়ার ও ব্রিটিশেরা ঠিক করিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একটি প্রতিনিধিদল বিলাতে গিয়া সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডলের সহিত কথাবার্তা বলিবে।

ভারতীয়েরা দেখিলেন যে সব উপনিবেশগুলি যদি যুক্ত হয় তবে তাঁহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে। সকল উপনিবেশগুলিই সর্বদা ভারতীয়দিগের উপর

অধিকাধিক মাত্রায় চাপ দিতে চাহিত। তাই তাঁহাদের ভারতীয় বিরোধী চাল-চলন হইতে একথা প্রতীয়মান হয় যে যুক্ত হইলে তাঁহারা ভারতীয়দের প্রতি আরও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিবেন। ব্রিটিশ ও বোয়ার সিংহের গর্জনে ভারতীয়দের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবিয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কোন চেষ্টাই যাহাতে বাদ না পড়ে তাহার জন্য ভারতীয়েরা ঠিক করিলেন যে বিলাতে এক প্রতিনিধি দল পাঠানো হইবে। এইবার প্রতিনিধি দলে আমার সহিত পোরবন্দরের মেনন শেঠ হাজী হবিবকে পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহার ট্রান্সভালের ব্যবসা অনেক দিনের পুরাতন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতাও ছিল সুদূর-প্রসারী। ইংরাজী শিক্ষা না পাইলেও তিনি ইংরাজী, ডচ, জুলু ইত্যাদি ভাষা সহজেই বুঝিতে পারিতেন। সত্যাগ্রহীদের উপর তাঁহার সহানুভূতি ছিল কিন্তু তাঁহাকে পুরামাত্রায় সত্যাগ্রহী বলা যায় না। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যে স্টীমারে রওনা হইয়াছিলাম (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন) তাহার সহযাত্রী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ্ মেরিম্যান। ইউনিয়ন অর্থাৎ উপনিবেশগুলির সংযুক্তির জন্য তিনি যাইতেছিলেন। জেনারেল স্মাট্‌স্ প্রভৃতিও পূর্বেই গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। নাতালের ভারতীয়দের তরফ হইতে আর একটি পৃথক প্রতিনিধি দলও তাঁহাদের বিশেষ অভাব অভিযোগ সমূহের নিরাকরণের দাবি লইয়া এই সময় গিয়াছিলেন।

এই সময় লর্ড ক্রু ছিলেন উপনিবেশ সচিব এবং লর্ড মর্লি ভারত সচিব ছিলেন। অনেক আলোচনা হইল এবং আমরা অনেকের সহিত দেখা করিলাম। যাঁহার সহিত দেখা করা সম্ভব এমন কোন সাংবাদিক অথবা পার্লামেন্টের উভয় সভার সদস্য কাহারও সহিত দেখা করা আমরা বাদ দিই নাই। লর্ড এম্পথিল আমাদের অমূল্য সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত মেরিম্যান, জেনারেল বোথা প্রভৃতির সহিত দেখা করিতেন এবং একদিন জেনারেল বোথার নিকট হইতে এক সমাচার লইয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, "জেনারেল বোথা এ ব্যাপারে আপনাদের মনোভাব বুঝিতে পারেন এবং আপনাদিগের ছোটখাটো প্রার্থনা পূরণ করিতেরাজী আছেন। কিন্তু এসিয়াটিক আইন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ করার আইন পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত নহেন। ট্রান্সভালের আইনে যে বর্ণবৈষম্য স্বীকৃতি পাইয়াছে তাহাও তিনি দূর করিতে রাজী নহেন। বর্ণ বৈষম্য বজায় রাখা জেনারেল বোথার স্থিরসিদ্ধান্ত। তিনি ইহা রদ করিতে চাহিলেও দক্ষিণ আফ্রিকার গোরারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবেন

না। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ও জেনারেল বোথারই মত মনে করেন। তাঁহারা উভয়েই বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাই তাঁহাদের অন্তিম সিদ্ধান্ত এবং তাঁহাদের শেষ কথা। ইহা অপেক্ষা বেশী চাহিলে আপনার এবং আপনার সম্প্রদায়েরই দুঃখ হইবে। সুতরাং বোয়ার নেতৃবৃন্দের এই মনোভাব সম্বন্ধে সম্যক বিচার-বিবেচনা করিয়া আপনারা যাহা করিবার করিবেন। জেনারেল বোথা আমাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন এবং আপনাকে আপনার দায়িত্ব বুঝিতে বলিয়াছেন।"

এই সমাচার দিয়া লর্ড এম্পথিল বলিলেন, "দেখুন কার্যতঃ আপনার সকল দাবিই জেনারেল বোথা স্বীকার করিতেছেন। আর এই বাস্তব দুনিয়ায় আমাদের সর্বদা এমনি ভাবে কিছুটা লইয়া কিছুটা ছাড়িয়া চলিতে হয়। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সবটুকু পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই আমার নিজের ঐকান্তিক পরামর্শ এই যে তাঁহাদের কথা আপনি মানিয়া নিন্‌। নীতিগত কারণে যদি লড়িতে চান তবে পরে লড়িবেন। শেঠ এবং আপনি এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করিয়া আপনার সুবিধামত জবাব দিবেন।"

ইহা শুনিয়া আমি শেঠ হবিবের দিকে তাকাইলাম। তিনি বলিলেন, "আমার হইয়া আপনি উঁহাকে বলুন যে, আমি মিটমাট-প্রার্থী দলের পক্ষ হইয়া জানাইতেছি যে, আমরা জেনারেল বোথার কথায় স্বীকৃত আছি। প্রস্তাবিত সুবিধা সমূহ তিনি যদি দেন তাহা হইলে আমরা এখনকার মত সন্তুষ্ট হইব এবং পরে নীতি লইয়া লড়াই করিব। আমাদের সম্প্রদায় আরও নিগ্রহ বরণ করিবে ইহা আমার কাম্য নহে। যে পক্ষের হইয়া আমি কথা বলিতেছি সেই পক্ষই সংখ্যায় অধিক এবং সেই পক্ষের টাকাও অধিক।"

আমি এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে তর্জমা করিয়া দিলাম এবং পরে সত্যাগ্রহীদের দিক হইতে বলিলাম, "আপনি যে কষ্ট করিয়াছেন সেজন্য আমরা উভয়েই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আমার সাথী ঠিকই বলিয়াছেন যে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বিত্তশালী অংশের প্রতিনিধি। আমি যে সকল ভারতীয়দের হইয়া বলিতেছি তাঁহারা অর্থে ও সংখ্যায় দরিদ্র। কিন্তু তাঁহারা মৃত্যু পণ করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল ব্যবহারিক সুবিধার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন না, তাঁহাদের লড়াই নীতির জন্যও বটে। ব্যবহার ও নীতি এই দুইয়ের মধ্যে কোন একটিকে যদি তাঁহাদের ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ব্যবহারিক সুবিধা ত্যাগ করিয়া নীতির জন্যই লড়িবেন। জেনারেল বোথার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা আছে। কিন্তু আমাদের শপথকে আমরা উহা হইতেও শক্তিশালী মনে করি।

সেই জন্য ইহার নিমিত্ত আমরা ধ্বংস হইতেও রাজী আছি। এই বিশ্বাস সম্বল করিয়া আমরা ধৈর্য ধারণ করিব যে আমরা যদি আমাদের পবিত্র সঙ্কল্পে অবিচল থাকি তাহা হইলে যে ঈশ্বরের নামে আমরা শপথ লইয়াছি তিনিই তাহা পূরণ করাইবেন।

"আপনার অবস্থা আমি পুরাপুরি বুঝি। আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে যদি মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীর উপর হইতে আপনি সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লন তাহা হইলে আমরা কিছু খারাপ মনে করিব না। আপনার কৃত উপকারও ভুলিব না। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনার পরামর্শ গ্রহণ না করিতে পারার জন্য আপনি আমাদের মাফ করিবেন। শেঠ ও আমি কিভাবে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি একথা অবশ্যই আপনি জেনারেল বোথাকে বলিবেন। তাঁহাকে ইহাও জানাইবেন যে সত্যাগ্রহীরা অল্পসংখ্যক হইলেও প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিবেন এবং তাঁহারা আশা রাখেন যে তাঁহাদের দুঃখ সহ্য করার শক্তি অবশেষে তাঁহাদের হৃদয়কে দ্রবীভূত করিবে এবং এসিয়াটিক আইন প্রত্যাহার করিতে তিনি অনুপ্রাণিত হইবেন।"

লর্ড এম্পথিল উত্তর দিলেন, "আপনি ধরিয়া লইবেন না যে আমি আপনাদিগকে ত্যাগ করিব। আমাকেও অবশ্যই ভদ্রলোকের কর্তব্য পালন করিতে হইবে। ইংরাজেরা হাতের কাজ এত সহজে ছাড়ে না। আপনাদের যুদ্ধ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আপনারা শুদ্ধ উপায়ের সহায়তায় লড়িতেছেন। তাই কেমন করিয়া আমি আপনাদিগকে ছাড়ি? কিন্তু আমার অবস্থাও নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন। দুঃখ ভোগ করিতে হইলে তাহা আপনাদিগকে একাই ভুগিতে হইবে। কিন্তু কোনও রকমে বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি কিছু মিটমাট সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিতে বলা আমার কর্তব্য। তবে আপনাদের মত যাঁহাদের নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে তাঁহারা যদি আদর্শের জন্য যে কোন রকম কৃচ্ছ্রবরণের জন্য প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে আমি যে শুধু আপনাদের পথের বাধা হইব না তাহাই নহে, আমি আপনাদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিব। আমি তাই আপনাদের কমিটির সভাপতি রূপে কাজ করিয়া যাইব এবং আমার দ্বারা যতটা হয় আপনাদের সাহায্য করিব। তবে আপনাকে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, লর্ডসভায় আমি একজন নবীন সভ্য মাত্র এবং আমার খুব একটা প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই। তাহা

হইলেও আপনি নিঃসন্দেহ থাকিবেন যে আমার সেই স্বল্প প্রভাবই আপনাদের জন্য ক্রমাগত প্রযুক্ত হইবে।”

এই প্রকার উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া আমরা উভয়েই সন্তুষ্ট হইলাম।

পাঠকেরা এই কথোপকথনের একটা প্রীতিকর অঙ্গ হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পূর্বেই আমি বলিয়াছি যে শেঠ হাজি হবিব ও আমার মধ্যে মতভেদ ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের মধ্যে এত মধুর সম্পর্ক ছিল এবং বিশ্বাসভাব ছিল যে, শেঠ হাজি হবিব তাঁহার ভিন্নমতও আমাকে দিয়া বলাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাহার এ বিশ্বাস ছিল যে, আমি তাঁহার কথা ঠিকমত লর্ড এম্পথিলকে বলিব।

এই অধ্যায় শেষ করার পূর্বে আমি কিছুটা অবান্তর একটি বিষয়ের অবতারণা করিব। ইংলণ্ডে প্রবাসকালে অনেক ভারতীয় বিপ্লববাদীর সহিত আমার কথাবার্তা হইয়াছিল। ‘হিন্দ স্বরাজ্য’ নামে পুস্তকখানা ফিরিবার সময় ‘কিলডোনান ক্যাস্‌ল’ নামক জাহাজে বসিয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লেখা। বহিখানা তারপরেই ‘ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন’ কাগজে প্রকাশ করা হইয়াছিল। সেই সব বিপ্লববাদীদের এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় যাঁহারা অনুরূপ মত পোষণ করিতেন, তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্যই ঐ পুস্তক লেখা। আমি ঐ পুস্তকের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি লর্ড এম্পথিলের সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। ইহার কারণ এই যে, তিনি যেন এক মুহূর্তের জন্যও একথা মনে না করেন যে আমি আমার রাজনৈতিক মত গোপন করিয়া আমার দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে তাঁহার নাম ও সাহায্যের অপব্যবহার করিয়াছি। লর্ড এম্পথিলের সহিত এই আলোচনা আমার মনে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার পরিবারের লোকের অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমার সহিত দেখা করার সময় করিয়া লইতেন। ‘হিন্দ স্বরাজ্য’ পুস্তিকায় ব্যক্ত আমার অভিমত স্বীকার না করিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব বরাবর বজায় ছিল।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

টলস্টয় ফার্ম—১

প্রতিনিধি দল এবার বিলাত হইতে কোনও সুসংবাদ লইয়া ফিরিতে পারে নাই। লর্ড এম্পথিলের সহিত আমাদের কথাবার্তার প্রভাব সম্প্রদায়ের উপর কি হইবে তাহা লইয়া আমার দুশ্চিন্তা ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাহারা আমার সঙ্গে থাকিবেন তাহা আমি জানিতাম। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমার ধারণা ইতিমধ্যে পরিষ্কার হইয়াছিল। সত্যাগ্রহের ব্যাপকতা ও চমৎকারিত্বও আমি বুঝিয়াছিলাম। তাই আমি সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া রহিলাম। 'হিন্দ স্বরাজ্য' সত্যাগ্রহের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্যই লিখিত হয় এবং এই পুস্তকখানা সত্যাগ্রহের কার্যকারিতার প্রতি আমার শ্রদ্ধার যথার্থ পরিমাপসূচক। আর সেইজন্য কতজন লোক আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে তাহার প্রতি আমার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

কিন্তু টাকার ব্যাপারে আমি উদ্বেগশূন্য হইতে পারি নাই। অর্থ ছাড়া দীর্ঘ দিন ধরিয়া যুদ্ধ চালানো সত্যসত্যই কঠিন। আজিকার মত তখনও আমি একথা এত স্পষ্ট করিয়া বুঝি নাই যে, পয়সা ছাড়াই লড়াই করা চলে ও অনেক সময় টাকাপয়সা ধর্ম-যুদ্ধকে কলুষিত করে এবং ঈশ্বর সত্যাগ্রহী ও মুমুক্ষুকে নিছক আবশ্যকতার অতিরিক্ত কিছু দেন না। কিন্তু আমি আস্তিক ছিলাম এবং তিনি তখনও আমার সঙ্গ পরিহার করেন নাই। তিনি আমাকে হতাশার পঙ্ককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিলেন। একদিকে যেমন জাহাজ হইতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয়দের আমাদের ব্যর্থতার সংবাদ দিতে হইল, অন্যদিকে ঈশ্বর আমাকে আর্থিক অনটন হইতে অব্যাহতি দিলেন। কেপটাউনে নামিতেই বিলাত হইতে তার পাইলাম যে, শ্রীযুক্ত (পরবর্তীকালে স্যার) রতন টাটা সত্যাগ্রহের অর্থভাণ্ডারে ২৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। আমাদের তাৎকালীক প্রয়োজনের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ছিল এবং আমরা আগাইয়া চলিলাম।

সত্যাগ্রহ হইতেছে সত্যের তরফে যুদ্ধ এবং আত্মশুদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা ইহার প্রধান উপাদান সেইজন্য এই টাকা অথবা যত টাকাই আসুক না কেন, তাহা দিয়া এ যুদ্ধ চালানো যায় না। চরিত্রবলরূপী পুঁজি ব্যতিরেকে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালানো অসম্ভব। মনুষ্যপরিত্যক্ত মনোরম হর্ম্যও যেমন একটা ধ্বংসাবশেষ

বলিয়া মনে হয়, ভৌতিক সম্পদ সত্ত্বেও চরিত্রহীন মানুষ তেমনি। সত্যাগ্রহীরা এবারে বুঝিতে পারিলেন যে, লড়াই এখন কত দিন চলিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। একদিকে জেনারেল স্মাট্‌স্ ও জেনারেল বোথার প্রতিজ্ঞা তাঁহারা এক চুলও নড়িবেন না, আর অপরদিকে মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীর সঙ্কল্প যে মৃত্যু অথবা বিজয় পর্যন্ত লড়াই চালাইয়া যাইবে। ইহা হাতীর সহিত পিঁপড়ার যুদ্ধের মত। হাতী এক পা ফেলিয়া অসংখ্য পিঁপড়া পিষিয়া ফেলিতে পারে। সত্যাগ্রহীদের পক্ষে তাঁহাদের সত্যাগ্রহের সময় সীমা বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। লড়াই এক বৎসরই চলুক অথবা বহু বৎসর, তাঁহাদের কাছে সবই সমান। তাঁহাদের নিকট লড়াই করাতেই জিত। লড়াই করার অর্থ জেলে যাওয়া, নির্বাসিত হওয়া। ইতিমধ্যে পরিবারের কি অবস্থা হইবে? যে কেবল জেলে যায় তাহাকে কে চাকুরি দিবে? জেল হইতে বাহির হইলে সে নিজে কি খাইবে আর পরিবার-পরিজনকেই বা খাওয়াইবে কি? কোথায় সে থাকিবে আর বাড়ি ভাড়াই বা কোথা হইতে দিবে? দৈনন্দিন আহার না জোটার জন্য কোন সত্যাগ্রহীর হৃদয় যদি বেদনা-বিষণ্ণ হয় তাহা হইলে সে ক্ষমার পাত্র। নিজে ক্ষুধায় মরিয়া, আপনজনদিগকে বাধ্য হইয়া সেই ক্ষুধায় মারিয়া যুদ্ধ করিবার মত লোক জগতে বেশী থাকিতে পারে না।

এ পর্যন্ত যেসব সত্যাগ্রহী জেলে যাইতেছিলেন তাঁহাদের পরিবারের খোরাকীর টাকা আবশ্যকতা মত যোগানো হইতেছিল। সকলকে এক সমান টাকা দিলে চলিবে না। যাহার পাঁচটি ছেলেমেয়ে আছে, আর যে ব্রহ্মচারীর কোনই পোষ্য নাই এ দুইজনকে কি এক পংক্তিতে ফেলা যায়? আর আমাদের 'বাহিনীর' জন্য কেবল ব্রহ্মচারী লওয়াও সম্ভব নহে। নিয়ম ছিল এই যে, প্রত্যেক পরিবারকে কমপক্ষে কত হইলে তাহাদের চলে জিজ্ঞাসা করা হইত এবং সেই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া টাকা দেওয়া হইত। ইহাতে দুর্নীতির যথেষ্ট অবকাশ ছিল এবং কিছুসংখ্যক কপটাচারী লোকের পক্ষে এই সুবিধার অপব্যবহার করার আশঙ্কা ছিল। আবার অপরে সৎস্বভাব হইয়াও তাহারা যে চালে থাকিতেন তদনুরূপ অর্থের প্রত্যাশা করিতেন। আমি দেখিলাম যে, এইভাবে দীর্ঘদিন লড়াই চালানো অসম্ভব। যোগ্য ব্যক্তির প্রতি অবিচার করার এবং অসাধু ব্যক্তি কর্তৃক অন্যায় সুযোগ লওয়ার আশঙ্কা সর্বদাই ছিল। এই অসুবিধা হইতে পরিত্রাণের একটিমাত্র উপায় ছিল এবং তাহা হইতেছে এই যে, সবগুলি পরিবার একত্র থাকিবে এবং সহযোগিতামূলক সমবায় বলিতে যাহা বুঝায়

সকলে তাহার সদস্য হইবে। ইহাতে প্রতারণা অথবা কাহারও উপর অবিচার হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। ইহাতে জনসাধারণের অর্থব্যয় কম হইবে এবং সত্যাগ্রহীর পরিবার সকলের সহিত একত্র বাস করিয়া সাদাসিধা নূতনভাবে জীবনযাপন করিতে শিখিবে। এইভাবে বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন ধর্মের ভারতবাসীরা একত্র থাকার একটা সুযোগ পাইবে।

কিন্তু এ জাতীয় উপনিবেশ স্থাপনা করার উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যায় কোথায়? শহরে থাকার অর্থ ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রয়। শুধু বাড়ি ভাড়াই হয়ত খাওয়ার খরচের সমান হইবে। তাহা ছাড়া শহরের নানাবিধ আকর্ষণের মধ্যে সাদাসিধাভাবে থাকা সহজ নহে। তাহা ছাড়া শহরে এমন জায়গাও পাওয়া অসম্ভব যেখানে অনেকগুলি পরিবার একত্র থাকিয়া কিছু রোজগার করিতে পারিবে।

সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে এমন স্থান ঠিক করিতে হইবে যাহা শহর হইতে অধিক দূরেও না হয় আবার অধিক নিকটেও না হয়। ফিনিক্স তো ছিলই, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সেখানে ছাপা হইত এবং সেখানে কিছু চাষবাসের কাজও ছিল। সেখানে অন্যান্য কতকগুলি সুবিধাও ছিল। কিন্তু ফিনিক্স ছিল জোহানস্‌বার্গ হইতে তিন শত মাইল দূরে—ত্রিশ ঘণ্টার রাস্তার ব্যবধান। পরিবারগুলিকে এতদূরে লইয়া যাওয়া ও ফেরত আনা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাহা ছাড়া লোকেরা হয়ত নিজেদের বাড়িঘর ছাড়িয়া এতদূর যাইতে প্রস্তুত নাও হইতে পারে। আর তাঁহারা সম্মত হইলেও পরিবার ও জেল হইতে মুক্ত সত্যাগ্রহীকে এতদূরে পাঠানো সম্ভব নহে।

সেইজন্য জায়গা চাই ট্রান্সভালের মধ্যে এবং জোহানস্‌বার্গের কাছেই। শ্রীযুক্ত কলেনবেকের সহিত ইতিপূর্বেই পাঠকের পরিচয় হইয়াছে। তিনি ৩৩০০ বিঘার খামারবাড়ি কিনিয়া বিনামূল্যে ও বিনাখাজনায় সত্যাগ্রহীদিগকে ব্যবহারের জন্য দিলেন (৩০শে মে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ)। সে জমিতে প্রায় হাজার খানেক ফলের গাছ ছিল ও ছোট একটি পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচ-সাতজন লোক থাকিবার উপযুক্ত ছোট একটি বাড়ি ছিল। দুইটি কূয়া ও একটি ঝরনা হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। স্টেশন সেখান হইতে মাইলখানেকের পথ এবং জোহানস্‌বার্গ ছিল ২১ মাইল দূরে। এই জমির উপর ঘর তুলিয়া আমরা সত্যাগ্রহী পরিবারগুলিকে সেখানে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে মনস্থ করিলাম।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়

টলস্টয় ফার্ম—২

খামারবাড়ির ফলের বাগিচায় এই পরিমাণে কমলালেবু, এপ্রিকট, কুল ইত্যাদি হইত যে, মরশুমে কেবল তাহা খাইয়া লোকে পেট ভরানোর পরও ফল উদ্বৃত্ত হইত।

থাকার স্থান হইতে ঝরনা প্রায় পাঁচ শত গজ দূরে ছিল এবং বাঁকে করিয়া জল আনিতে হইত।

এখানে আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, বাড়ির কাজই হোক্ আর ঘর বাঁধার কাজ—আমরা চাকর বা বেতনভোগী লোক দিয়া যথাসম্ভব কোন কাজই করাইব না। সেইজন্য পায়খানা সাফ হইতে রান্না পর্যন্ত সমস্তই আমরা নিজেদের হাতেই করিতাম। পরিবারগুলিকে রাখার ব্যাপারে প্রথম হইতেই স্থির হইয়াছিল যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা আলাদা থাকিবে। সেইজন্য ঘরগুলিও ভিন্নস্থানে দুই সারিতে উঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। দশজন স্ত্রীলোক ও ষাটজন পুরুষ থাকিতে পারে আপাতত এমন বাড়ি তৈয়ারী করা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল। শ্রীযুক্ত কলেনবেকের জন্য একটি আলাদা ঘর ও তাহার সংলগ্ন একটি স্কুল করা স্থির হইল। ইহা ছাড়া কারখানার ছুতারের কাজ, মুচির কাজ প্রভৃতি করার জন্য একটি কারখানা-ঘরও করা হইল।

এইস্থানের বাসিন্দারা গুজরাত, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিলেন। ধর্মে তাঁহারা ছিলেন হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খ্রীষ্টান। প্রায় চল্লিশজন যুবক, দুই-তিনজন বৃদ্ধ, পাঁচজন স্ত্রীলোক ও পঁচিশ-ত্রিশজন ছেলে-পিলের মধ্যে চারজন বালিকা ছিল।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা খ্রীষ্টান এবং অপর লোকেদেরও মাংসাহারের অভ্যাস ছিল। শ্রীযুক্ত কলেনবেক ও আমার মনে হইল যে এখানে মাংসাহারের ব্যবস্থা না করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যাঁহাদের মাংস খাইতে বাধে না, যাঁহারা জন্ম হইতেই উহা খাইতে অভ্যস্ত এবং বিপদে পড়িয়া যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, এমন কি সাময়িকভাবে তাঁহাদিগকে মাংসাহার ত্যাগ করিতে কি করিয়া বলা যায়? কিন্তু মাংসের ব্যবস্থা করিতে হইলেই তো খরচ বাড়িবে। আবার

যাঁহাদের গো-মাংস খাওয়া অভ্যাস তাঁহাদিগকে কি তাহা দিতে হইবে? সে অবস্থায় কতগুলি পাকশালা চালানো হইবে? সুতরাং আমার কর্তব্য কি? এই পরিবারদিগকে যখন ভরণপোষণের জন্য অর্থ দিয়াছি তখনই তো মাংস এবং এমন কি গো-মাংসাহারে সহায়তা করিয়াছি। যদি এখন নিয়ম করি যে, মাংসাহারীদের সাহায্য করা হইবে না তাহা হইলে আমাকে কেবল নিরামিষাহারী দ্বারাই সত্যাগ্রহ যুদ্ধ চালাইতে হয়। ইহা অসম্ভব কথা। কারণ সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের তরফ হইতে আন্দোলন শুরু করা হইয়াছিল। এমতাবস্থায় আমার ধর্ম স্পষ্টভাবে দেখিতে আমার বেশী সময় লাগে নাই। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ভাইয়েরা গোমাংস চাহিলেও তাঁহাদের তাহা না দিয়া উপায় নাই। তাঁহাদিগকে খামারবাড়িতে আসিতে নিষেধ করার কথাই উঠিতে পারে না।

কিন্তু যেখানে প্রেম সেইখানেই ঈশ্বর। মুসলমান বন্ধুরা আমাকে কেবল নিরামিষ পাকশালা রাখার অনুমতি পূর্বেই দিয়াছিলেন। এখন খ্রীষ্টান ভগ্নীদের সহিতই আমার বোঝাপড়া বাকী ছিল। তাঁহাদের অনেকেরই স্বামী ও ছেলেরা জেলে ছিলেন। যেসব খ্রীষ্টান বন্ধু তখন জেলে ছিলেন তাঁহাদের অনেকের সহিত ইতিপূর্বে আমি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলাম এবং অনুরূপ অবস্থায় তাঁহারা নিরামিষ আহারে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে তাঁহাদের পরিবারের লোকজনদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিবার অবকাশ এই প্রথম। ভগ্নীদিগকে আমি নিঃসঙ্কোচে এখানকার গৃহাদির অসুবিধা, খরচার সমস্যা ও এ ব্যাপারে আমার গভীরমূল সংস্কারের কথা—সবই বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, তাঁহারা গোমাংস চাহিলে তাহাও পাইবেন। ভগ্নীগণ প্রেমবশতঃ মাংসের আবশ্যকতা নাই বলিলেন। রান্নার ব্যবস্থা তাঁহাদের হাতেই ছাড়িয়া দিলাম। তাঁহাদের সাহায্য করার জন্য আমি নিজে সহ মাঝে মাঝে আর একজন পুরুষকে নির্দিষ্ট করিলাম। আমার উপস্থিতিতে ছোটখাটো বাদ-বিসংবাদ আর ঘটিতে পারিত না। রান্নায় সাদাসিধার চূড়ান্ত করা হইয়াছিল। খাওয়ার সময় ও কয়বার ভোজ্য পাওয়া যাইবে তাহা নির্ধারিত ছিল। পাকশালা ছিল একটাই এবং সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন। সকলকেই নিজ নিজ বাসন মাজিয়া লইতে হইত। সাধারণ ব্যবহারের বাসনও পালা করিয়া মাজা হইত। একথা বলা প্রয়োজন যে সত্যাগ্রহীরা টলস্টয় ফার্মে দীর্ঘদিন থাকিলেও কেহই

মাংসাহার করিতে চান নাই। মদ, তামাক ইত্যাদি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।

আমি পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বাড়ি তৈয়ারীর ব্যাপারেও যথাসম্ভব আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া আমাদের লক্ষ্য ছিল। স্থপতি তো শ্রীযুক্ত কলেনবেকই ছিলেন। তিনি একজন ইউরোপীয় রাজমিস্ত্রী যোগাড় করিলেন। নারায়ণ-দাস দামানিয়া নামক একজন গুজরাটী ছুতার বিনা পয়সায় কাজ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং তিনি তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজনকে অল্প বেতনে কাজ করিতে সম্মত করাইলেন। মজুরের কাজ বসতি স্থাপনকারীরা স্বয়ং নিজেদের হাতে করিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের হাত-পা কমজোর তাঁহারা তো কাজ করিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিলেন। বিহারী নামক জনৈক চমৎকার সত্যাগ্রহী একাই ছুতারের কাজের অর্ধেক করিয়া ফেলিতেন। সাফাই ও জোহানস্‌বার্গ শহরে গিয়া মালপত্র আনার কাজ সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী থাম্বি নাইডুর উপরে ছিল।

এই দলে প্রাগজী খাণ্ডুভাই দেশাইও ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও এই সমস্ত অসুবিধা সহ্য করেন নাই। এখানে তাঁহাকে প্রচণ্ড শীত, গ্রীষ্মের জ্বালা ও প্রবল বর্ষা বরদাস্ত করিতে হইত। ঘর তৈরী না হওয়া পর্যন্ত প্রথম দুই মাস আমরা তাঁবুতেই বাস করিতাম। ঘরগুলি ঢেউ খেলানো টিন দিয়া ছাওয়া হয় বলিয়া তুলিতে বেশী সময় লাগে নাই। মাপ মতই সমস্ত কাঠ পাওয়া যাইত। তাহাদের কেবল টুকরা করিয়া লওয়াই আমাদের প্রধান কাজ ছিল। দরজা জানালা বড় বেশী তৈরী করিতে হয় নাই। সেইজন্যই এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি ঘর তৈরী করা সম্ভবপর হইয়াছিল। তবে এই সব কাজের জন্য প্রাগজীর শরীরের উপর খুব ধকল পড়িত। খামারের কাজে জেল অপেক্ষা কঠিন খাটুনী ছিল। একদিন তো ক্লান্তি ও গরমে প্রাগজী অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তবে পরাজয় স্বীকার করার লোক তিনি ছিলেন না। তিনি এইখানেই ভাল করিয়া শরীর গড়িয়া লইলেন এবং অবশেষে খাটুনীতে আমাদের সর্বাপেক্ষা সেরা কর্মীর সমান হইলেন।

এমনি আর একজন ছিলেন শ্রীযুক্ত জোসেফ রায়প্পন। ব্যারিস্টার হইলেও তিনি ব্যারিস্টারীর অভিমান রহিত ছিলেন। তিনি কঠিন পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ট্রেন হইতে বোঝা নামানো, গাড়ি বোঝাই করা ইত্যাদি কাজ তিনি পারিতেন না। তবে তিনি যথাশক্তি কাজ করিতেন।

টলস্টয় ফার্মে দুর্বল সবল হইলেন এবং পরিশ্রম করা সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষে উন্নতিকারক হইয়াছিল।

সকলকেই কোনও না কোনও কাজে জোহানস্‌বার্গে যাইতে হইত। ছেলেরা কেবল মজা করার জন্য যাইতে চাহিত। আমাকেও কাজের জন্য যাইতে হইত। আমরা নিয়ম করিলাম যে, আমাদের এই ছোট্ট সমবায়মূলক উপনিবেশের কাজে গেলে ট্রেনে যাওয়া চলিবে। আর তৃতীয় শ্রেণীর ভিন্ন তো টিকিট লওয়াই হইত না। শখ করিয়া যাঁহাদের শহরে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের হাঁটিয়া যাইতে হইবে। এবং পথে খাওয়ার জন্য বাড়ীর তৈয়ারী খাদ্য লইয়া যাইতে হইবে। শহরে গিয়া খাওয়ার জন্য কেহ কিছু খরচ করিতে পারিবেন না। এই কঠিন নিয়ম না করিলে সুদূর পল্লীতে বাস করিয়া যে পয়সা বাঁচিত তাহা রেল ভাড়া ও শহরে গিয়া খাওয়াদাওয়া করিতেই উড়িয়া যাইত। শহরে যাইবার সময় যে খাবার লইয়া যাওয়া হইত তাহাও ছিল খুবই সাদাসিধা। বাড়ীতে পেষাই করা গমের আটা হইতে বাড়ীতে তৈয়ারী পাঁউরুটি, তাহার উপর কতকটা ঘরে ভাজা চীনা-বাদামের মাখন আর কমলালেবুর খোসার মোরব্বা। গম পেষাই করার জন্য আমরা একটা হাতে চালানো লোহার জাঁতাকল কিনিয়াছিলাম। চীনাবাদাম ভাজিয়া পিষিয়া লইয়া মাখন হইত এবং এই মাখনের দাম দুধের মাখনের চার ভাগের এক ভাগ পড়িত। কমলা-লেবু তো ফার্মেই প্রচুর হইত। গাইয়ের দুধ ফার্মে আমরা কদাচিৎ ব্যবহার করিতাম। দরকার হইলে কৌটোর দুধ ব্যবহার করিতাম।

এখন শহরে যাতায়াতের কথা বলি। শখের জন্য কেহ জোহানস্‌বার্গে যাইতে চাহিলে সপ্তাহে সে একদিন কি দুইদিন পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে পারিত। তবে যেদিন যাইবে সেই দিনেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। পূর্বেই জানাইয়াছি যে ফার্ম জোহানস্‌বার্গ হইতে ২১ মাইল দূরে ছিল। পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার এই এক নিয়ম হইতেই শত শত টাকা বাঁচিয়া গিয়াছিল। যাঁহারা এইভাবে হাঁটিয়া যাইতেন তাঁহারাও খুব লাভবান হইতেন। কয়েক-জনের নূতন হাঁটার অভ্যাস হইল। নিয়ম ছিল এই যে, যাঁহাকে যাইতে হইবে তিনি রাত্রি দুইটায় উঠিয়া আড়াইটায় বাহির হইয়া পড়িবেন। ছয় সাত ঘণ্টায় তিনি জোহানস্‌বার্গে পৌঁছাইতে পারিতেন। সর্বাপেক্ষা কম সময় ৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে একবার একজন পৌঁছাইতে পারিয়াছিলেন।

পাঠকেরা মনে করিবেন না যে, ফার্মের অধিবাসীরা এই নিয়মকে ভার

স্বরূপ মনে করিতেন। বরং সকলে সানন্দে এই নিয়ম পালন করিতেন। জোর করিলে আমি একজনকেও ফার্মে রাখিতে পারিতাম না। শহরে খবরাখবর লইতে যাতায়াতেই হোক্ অথবা ফার্মের ভিতরকার কাজে, যুবকেরা হাসিমুখে লাগিয়া যাইত। কাজ করার সময় তাহাদিগের দুষ্টামি বন্ধ করা শক্ত হইত। স্বেচ্ছায় ও উৎফুল্লভাবে যতটা তাহারা করিতে পারে তাহার বেশী কাজ তাহাদের দেওয়া হইত না এবং এইভাবে কাজ করায় কখনও তাহা পরিমাণ অথবা গুণের দিক হইতে অসন্তোষজনক হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না।

আমাদের সাফাই-এর ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। বহুসংখ্যক অধিবাসী থাকিলেও কোথাও আবর্জনা, ময়লা, উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি কাহারও চোখে পড়িত না। সমস্ত আবর্জনাই গর্ত খুঁড়িয়া চাপা দেওয়া হইত। কেহ রাস্তায় জল ফেলিতে পারিত না। ময়লা জল বালতিতে জমা করিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া হইত। উচ্ছিষ্ট ও বাতিল শাকপাতা দ্বারা সার হইত। বাড়ীর নিকটেই কোনও স্থানে চৌকোনা করিয়া দেড় ফুট গভীর গর্ত করা হইত। সমস্ত পায়খানার ময়লা উহাতে আনিয়া ফেলা হইত। তাহার উপর পুনরায় খুব চাপিয়া মাটি দিয়া ভরাট করা হইত বলিয়া উহাতে দুর্গন্ধমাত্রও হইতে পারিত না। সেখানে মাছি ভন্‌ভন্ করিত না এবং সেখানে যে ময়লা পোঁতা হইয়াছে একথা কেহ ভাবিতেও পারিতেন না। এইরূপে আমরা যে কেবল আবর্জনা ও নোংরার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম তাহাই নহে, সম্ভাব্য আবর্জনা হইতে বহুমূল্য সারও পাইতাম। যদি আমরা বিষ্ঠা ঠিকমত ব্যবহার করি তবে বহু লক্ষ টাকার সার পাইতে পারি এবং অনেক রোগ হইতেও বাঁচা যায়। আমাদের বদভ্যাসের জন্য আমরা আমাদের পবিত্র নদীসমূহের পাড় অপবিত্র করি এবং মাছির জন্ম দিবার চমৎকার ব্যবস্থা করি। আমাদের শোচনীয় অনবধানতাবশতঃ বিষ্ঠা হইতে মাছির জন্ম হইয়া খোলা বিষ্ঠাতেই বসে এবং স্নানাদি করার পর আমাদের পরিচ্ছন্ন দেহকে আবার দূষিত করে। একটি ছোট কোদালি রাখিলে অনেক নোংরা জিনিস হইতে বাঁচিতে পারা যায়। চলার পথে পায়খানা করা, থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া, এ সকলই ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি পাপাচরণ। এসব কার্য অপরের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার অভাবের দ্যোতক। যে ব্যক্তি নিজের থুথু, কফ, বিষ্ঠাদি চাপা না দেয়, জঙ্গলে বাস করিলেও সে দণ্ডনীয়।

আমাদের লক্ষ্য ছিল ফার্মকে হাতের কাজের কলগুঞ্জনে ভরিয়া তোলা, খরচা বাঁচানো ও অবশেষে পরিবারগুলিকে স্বাশ্রয়ী করা। এই লক্ষ্য সাধন করিতে পারিলে যতদিন ইচ্ছা আমরা ট্রান্সভাল সরকারের সহিত লড়িতে পারিব। জুতার জন্য আমাদের একটা ব্যয় ছিল। গরম দেশে বন্ধ জুতা ব্যবহারে হানিই হয়। পায়ের ঘাম পা-ই আবার শুষিয়া লয়, সেজন্য পায়ের চামড়া নরম হয়। ভারতবর্ষের মত ট্রান্সভালেও মোজার দরকার হইত না। কিন্তু কাঁটা, পাথর ইত্যাদি হইতে পা-কে রক্ষা করার আবশ্যকতা আমরা অনুভব করিয়াছিলাম। সেইজন্য আমরা চপ্পল তৈরী শিক্ষা করিব স্থির করিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রেপিস্ট নামে রোমান ক্যাথলিক পাদরীদের মঠ আছে। সেখানে এই জাতীয় শিল্প চলে। তাঁহারা জার্মান। তাহারই এক মঠ হইতে শ্রীযুক্ত কলেনবেক জুতা তৈরী শিখিয়া আসিলেন। আসিয়া তিনি আমাকে ইহা শিখাইলেন এবং আমি অন্যান্য কর্মীদের শিখাইলাম। এইরূপে কতকগুলি যুবক চপ্পল তৈরী করা শিখিয়া গেল এবং অতঃপর আমরা বন্ধুদিগের মধ্যে উহা বেচিতে আরম্ভ করিলাম। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমার অনেক ছাত্রই আমার অপেক্ষা এই কাজে অধিক দক্ষ হইয়া পড়িল। ছুতারের কাজও শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইল। আমরা একটি গ্রাম বসাইতেছিলাম। তাই আমাদের পিঁড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া পেঁটরা পর্যন্ত বহুবিধ ছোট-বড় দ্রব্যের আবশ্যকতার অন্ত ছিল না। আমরা উহা নিজেরাই বানাইয়া লইতে লাগিলাম। ইতিপূর্বে যেসব স্বার্থত্যাগী ছুতার মিস্ত্রিদের কথা বলিয়াছি প্রথম কয়েক মাস তাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কার্যের ভার শ্রীযুক্ত কলেনবেক নিজেই লন। তাই তাঁহার কুশলতা ও নিপুণতার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিক্ষণেই পাইতাম।

যুবক, বালক ও বালিকাদের জন্য পাঠশালার অবশ্যই দরকার। এই কাজটিই সর্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। শেষ পর্যন্তও এই কার্যে আমরা সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই। শিক্ষা দেওয়ার ভার প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত কলেনবেক ও আমার উপর পড়িয়াছিল। দুপুরের পর ছাড়া পাঠশালা বসানো সম্ভব হইত না। ইতিমধ্যে সকালের পরিশ্রমের জন্য আমরা উভয়েই নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াইতে আসিতাম, স্কুলের ছাত্রেরাও পরিশ্রান্তই থাকিত। ফলে, আমরা মাঝে মাঝে ঝিমাইতাম এবং ছাত্ররাও ঝিমাইত। চোখে জল দিয়া, ছেলেদের সহিত খেলা করিয়া আমরা আমাদের ও তাহাদের

আলস্য জয় করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু অনেক সময় তাহা নিরর্থক হইত। শরীর যখন নিশ্চিতভাবে বিশ্রাম চায় তখন তাহা আদায় করিয়া ছাড়ে। ইহা তো খুব ছোট অসুবিধার কথা বলিলাম। কেন না ঝিমানো সত্ত্বেও ক্লাস চলিত। কিন্তু তামিল, তেলেগু ও গুজরাটী—এই তিন ভাষায় যে সকল ছেলেরা কথা বলে তাহাদিগকে কি শিখাইব, কোন্ রীতিতে শিখাইব? প্রত্যেককে তাহার মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ হইত। তামিল আমি অল্পবিস্তর জানিতাম। কিন্তু তেলেগুর কিছুই জানিতাম না। এই অবস্থায় একজন শিক্ষক কি করিবেন? কয়েকজন যুবককে শিক্ষাকার্যে লাগাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ সফল হয় নাই। ভাই প্রাগজীকেও কাজে লাগানো হইয়াছিল। যুবকদিগের মধ্যে কয়েকজন খুব দুর্দান্ত ও অলস ছিল। বইএর সহিত তাহাদের যেন আদা-কাঁচকলার সম্পর্ক। এ জাতীয় ছাত্রদের লইয়া শিক্ষকের পক্ষে অগ্রসর হওয়া বিশেষ সম্ভব ছিল না। তাহা ছাড়া আমরাও নিয়মিতভাবে পড়াইতে পারিতাম না। কার্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত কলেনবেক ও আমাকে সময় সময় জোহানস্বার্গ যাইতে হইত।

আর একটি দুরূহ অসুবিধা ছিল ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। মুসলমানেরা কোরান এবং পার্শীরা আবেস্তা পড়ুক—এই ইচ্ছা হইত। এক খোজা বালক ছিল যাহার পিতা খোজা ধর্মের ছোট একটি পুঁথি শিক্ষা দেওয়ার ভার আমার উপর চাপাইয়াছিলেন। আমি ইসলাম ও পার্শী ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তক সংগ্রহ করিলাম। হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্ব যেমন আমি বুঝিয়াছিলাম তাহা লিখিয়া ফেলিলাম। নিজের ছেলেদের জন্য অথবা এই ফার্মের ছেলেদের জন্য তাহা লিখিয়াছিলাম, সে কথা আজ আমার স্মরণ নাই। যদি আজ সেই সঙ্কলন আমার কাছে থাকিত তাহা হইলে আমার আধ্যাত্মিক প্রগতির নিদর্শন স্বরূপ তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতাম। কিন্তু এ জাতীয় বহু জিনিস আমি হয় ফেলিয়া দিয়াছি অথবা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি। আমার প্রয়োজন নাই মনে হওয়ায় অথবা আমার কর্মক্ষেত্র বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় বহু কাগজপত্র নষ্ট করিয়া দিয়াছি। তাহার জন্য আমার মনে অনুতাপ নাই। কারণ ঐ ধরনের সব কাগজপত্র রাখিলে তাহা বোঝা স্বরূপ হইত ও খরচ বাড়িত। সেগুলিকে সাবধানে রাখার জন্য আলমারি বাক্স ইত্যাদির আবশ্যকতা হইত। আমার অপরিগ্রাহী সত্তার নিকট ইহা অসহ্য বোধ হইত।

তবে এই ধরনে শিক্ষাদান করা ব্যর্থ হয় নাই। ছেলেদের মধ্যে একের

অন্যের প্রতি অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা দেয় নাই। পরস্পরের ধর্ম ও ধর্মের আচরণের প্রতি তাহারা উদারতা দেখাইতে শিখিয়াছিল। নিজের ভাই-এর মত তাহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে শিখিয়াছিল। তাহারা সেবা সৌজন্য ও কর্মঠতার পাঠও পাইয়াছিল। আজও সেই সব বালকদের কাহারও পরবর্তীকালীন জীবনযাত্রার সংবাদ আমি যতটুকু জানি তাহার ভিত্তিতে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে তাহাদের টলস্টয় ফার্মের শিক্ষা নিরর্থক হয় নাই।

অসম্পূর্ণ হইলেও উহা সুচিন্তিত ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল। টলস্টয় ফার্মের অনেক মধুর স্মৃতির মধ্যে এই শিক্ষাদানের স্মৃতি কম মধুর নয়।

কিন্তু সেই সকল স্মৃতির পরিচয় দেওয়ার জন্য আর একটি অধ্যায় আবশ্যক।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

টলস্টয় ফার্ম—৩

এই অধ্যায়ে টলস্টয় ফার্মের অনেকগুলি স্মৃতির কথা বলিব। এগুলি হয়ত কিঞ্চিৎ অসংলগ্ন লাগিবে। সেজন্য পাঠকের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

শিক্ষক হিসাবে আমাকে যে ক্লাসে পড়াইতে হইত কোনও শিক্ষকের অদৃষ্টে সেপ্রকার পাঁচমিশালী ক্লাস জোটে না। এই একই ক্লাসে সাত বৎসরের বালক-বালিকা হইতে বিশ বৎসরের যুবক, আর তের বৎসরের বালিকা পর্যন্ত ছিল। কতকগুলি ছেলে এমন ছিল যাহাদিগকে জঙ্গলী বলা যায়, তাহাদের দুর্দান্তপনার তো কথাই নাই।

এই পাঁচমিশালী দলকে আমি কি শিক্ষা দিব? সকলের স্বভাবের অনুকূল কি করিয়া হওয়া যায়? ইহাদের সকলের নিকট আমি কোন্ ভাষায় কথা বলিব? তামিল তেলেগু ছেলেরা তাহাদের মাতৃভাষা অথবা ইংরাজী ও অল্প-স্বল্প ডাচ ভাষা বুঝিত। তাহাদের সহিত আমি কেবল ইংরাজীতেই কথাবার্তা বলিতে পারিতাম। ক্লাসকে আমি দুই ভাগে ভাগ করিলাম। গুজরাটীদের সহিত গুজরাটীতে ও বাকী সকলের সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতাম। শিক্ষার

প্রধান অঙ্গ ছিল তাহারা যাহাতে আনন্দ পায় এমন কিছু গল্প বলা অথবা পড়িয়া শোনানো। তাহাদিগকে একসঙ্গে মিশিতে দিয়া মিত্রভাব, সেবাভাব শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা একটা উদ্দেশ্য ছিল। কিছু ইতিহাস-ভূগোলের সাধারণ জ্ঞান ও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা গণিত সেখানো হইত। লিখিতেও শেখানো হইত। আর শেখানো হইত ভজন, যাহা আমাদের প্রার্থনায় গাওয়া হইত। সেইজন্য ইহাতে তামিল বালকদিগকেও আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতাম।

বালক ও বালিকারা অবাধে মিশিত। টলস্টয় ফার্মে আমি খুব বেশী নির্ভরতা সহকারে সহশিক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছিলাম। তখন যেরূপ অবাধে মিশিতে, একত্র শিক্ষাগ্রহণ করিতে দিতাম, আজ সেপ্রকার করিতে দিতে আমার সাহস নাই। কখনও কখনও আমার মনে হয় যে, তখন আমার মন বর্তমানের তুলনায় অধিক নির্দোষ ছিল এবং সম্ভবতঃ তাহা আমার অনভিজ্ঞতার কারণ। তাহার পর হইতে আমি কটু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি এবং সময় সময় প্রচণ্ড বিপদেও পড়িয়াছি। যাঁহাদিগকে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে করিয়াছি, তাঁহারা দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। আমার নিজের স্বভাবেরও গভীরতম প্রদেশে আমি বিকার লক্ষ্য করিয়াছি—সেইজন্য আজ ভীরু হইয়া পড়িয়াছি।

ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আমার অনুতাপ বোধ হয় না। আমার বিবেক সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই পরীক্ষায় খারাপ কিছু হয় নাই। কিন্তু একবার গরম দুধে মুখ পুড়িলে শিশুরা যেমন ঘোলও ফুঁ দিয়া পান করিয়া থাকে, আমার বর্তমান অবস্থা সেইরূপ মাত্রাতিরিক্ত সাবধানতার।

মানুষ কাহারও কাছ হইতে বিশ্বাস অথবা সাহস ধার করিতে পারে না। গীতায় বলা হইয়াছে, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। টলস্টয় ফার্মে আমার বিশ্বাস ও সাহস পরাকাষ্ঠায় পৌছাইয়াছিল। আমাকে সেই বিশ্বাস ও সাহস ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট মিনতি করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে প্রার্থনায় এখনও তিনি কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার দরবারে আমার মত অসংখ্য ভিখারী। তবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে ভিখারীও যেমন অসংখ্য তাঁহার কানও তেমনি অসংখ্য। তাঁহার উপর আমি তাই পরিপূর্ণ আস্থা রাখি এবং জানি যে যখন আমি যোগ্য হইব তখনই তিনি আমার নিবেদন শুনিবেন।

এইবার আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলি। দুষ্ট প্রকৃতির বলিয়া খ্যাত বালকবৃন্দ ও নির্মল কিশোরীদিগকে একই সঙ্গে এক জায়গায় স্নান করিতে পাঠাইতাম। বালক-বালিকাদিগকে তাহাদের কর্তব্য সংযম সম্বন্ধে আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। আমার সত্যাগ্রহের মতবাদের সঙ্গেও তাহারা খুব পরিচিত ছিল। তাহাদের উপর যে আমার মায়ের মত স্নেহ ছিল তাহা আমি জানিতাম এবং তাহারাও তাহা জানিত। পাঠকদের হয়তো পাকশালা হইতে খানিকটা দূরের ঝরনার কথা স্মরণ আছে। সেখানে এইভাবে স্নানের জন্য মিলিত হইবে আবার নির্মল থাকিবে—এইরূপ আশা করা কি মূর্খতা? মায়ের চোখ যেমন কন্যার পিছনে থাকে, আমার চক্ষুও তেমনি এই বালিকাদের পিছনে পিছনে ফিরিত। স্নানের সময় নির্দিষ্ট ছিল। একসঙ্গে সকল ছেলে মেয়ে স্নান করিতে যাইত। একজোটে থাকার মধ্যে যে নিরাপদ ভাব রহিয়াছে তাহা এখানে ছিল। নিরালা থাকা পরিহার করা হইত। সাধারণতঃ আমিও একই সময়ে ঝরনার ধারে উপস্থিত থাকিতাম।

সকলেই খোলা বারান্দায় শুইতাম। বালক-বালিকারা আমার আশপাশে ছড়াইয়া শুইত। দুইটি বিছানার মধ্যে মধ্যে ফুট তিনেক করিয়া ফাঁক থাকিত। শয্যা কোন্‌টার পর কোন্‌টা পাতা হইবে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করা হইত। কিন্তু মনে কুভাব থাকিলে এই সাবধানতা নিরর্থক। এই ছেলে ও মেয়েদের মান ঈশ্বরই রাখিয়াছিলেন বলিয়া আজ বুঝিতে পারিতেছি। বালক ও বালিকারা এমনি নির্দোষভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে, এই বিশ্বাস-চালিত হইয়া এই পরীক্ষা করিয়াছিলাম। আমার প্রতি মা'বাপের অসীম বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাঁহারা ঐ প্রকার পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন।

বালিকারা স্বয়ং অথবা কোনও বালক আমাকে এই সংবাদ দিল। একদিন একটি যুবক দুইটি বালিকার সহিত হাসি-মস্করা করিতেছিল। এই সংবাদ পাইয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। খোঁজ লইয়া জানিলাম যে সংবাদ সত্য। আমি যুবকদিগকে তিরস্কার করিলাম, কিন্তু তাহা যথেষ্ট মনে হইল না। আমার ইচ্ছা হইল যে বালিকা দুইটির দেহে এমন কোনও চিহ্ন থাকে, যাহাতে প্রতিটি যুবকই বুঝিতে পারে যে তাহাদের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাইতে নাই এবং বালিকারাও যাহাতে উপলব্ধি করে যে, তাহাদের পবিত্রতার উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। রামচন্দ্র সহস্র মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও বিকারগ্রস্ত রাবণ কু-উদ্দেশ্য লইয়া সীতাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে নাই।

বালিকাদিগের অঙ্গে এমন কোন্ চিহ্ন অঙ্কিত করা যায় যাহাতে তাহারা নিজদিগকে সুরক্ষিত মনে করে এবং পাপীর দৃষ্টি রুদ্ধ করা যায়? প্রশ্নটি লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। প্রাতঃকালে আমি সৌম্যভাবে বালিকাদিগকে বলিলাম যে, তাহাদের ঐ সুন্দর ও লম্বা চুলগুলি কাটিয়া ফেলার অনুমতি আমাকে দিতে হইবে। ফার্মে আমরা একে অপরের ক্ষৌরকার্য ও চুল ছাঁটাই করিয়া দিতাম। তাই আমরা কাঁচি ও চুল কাটিবার যন্ত্র রাখিতাম। প্রথমে বালিকারা রাজী হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে আমি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া ছিলাম। আমার প্রস্তাবের কথা প্রথমে তাঁহারা চিন্তাতে না আনিতে পারিলেও পরে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন। বালিকাদ্বয় উন্নতমনা ছিল। হায়, আজ তাহাদের একজন আর নাই। সে খুব চটপটে ও বুদ্ধিমতী ছিল। অপরটি বাঁচিয়া আছে ও নিজের ঘরসংসার চালাইতেছে। অবশেষে তাহারা দুইজনেই স্বীকৃত হইল এবং অবিলম্বে যে হাত এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছে সেই হাতে কাঁচি লইয়া চুলে চালাইয়া দিলাম। পরে ক্লাসে আমি আমার পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিলাম এবং ইহার পরিণাম খুব ভাল হইল। আর কখনও হাসি-মস্করা করার কথা শুনি নাই। ঐ বালিকাদেরও কোনও হানি হয় নাই। তবে লাভ কতটা হইয়াছিল, তাহা ঈশ্বর জানেন। আমি আশা করি, সেই যুবকেরা আজও সে কথা মনে রাখিয়াছে ও তাহাদের দৃষ্টি কলুষমুক্তি রাখিতেছে।

আমি যে এই পরীক্ষার কথা লিখিলাম, ইহা কাহারও অনুকরণ করার জন্য নহে। কোনও শিক্ষক ইহার অনুকরণ করিতে গেলে মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা আছে। বিশেষ অবস্থায় মানুষ কতদূর যাইতে পারে ও সত্যাগ্রহ-যুদ্ধের পবিত্রতার নিদর্শন দেখাইবার জন্যই আমি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। এই যুদ্ধ জয়ের মূলে ছিল এই পবিত্রতা। এই প্রকার পরীক্ষার পূর্বে শিক্ষককে পিতা ও মাতা উভয়ই হইতে হইবে এবং যে কোন পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একমাত্র কঠোর তপশ্চর্যাকারীই এ জাতীয় পরীক্ষা করার অধিকারী।

আমার এই কার্যের প্রভাব সমস্ত ফার্মবাসীর জীবনের উপর না পড়িয়া থাকিতে পারে না। যত কম খরচে হয় থাকার সিদ্ধান্ত করার জন্যে আমাদের পরিচ্ছদের পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়। শহরে সত্যাগ্রহী সহ ভারতীয় পুরুষের পোশাক ইউরোপীয়দের মত ছিল। ফার্মে এত পরিচ্ছদের আবশ্যকতা ছিল না।

আমরা সকলেই মজুর হইয়া গিয়াছিলাম। সেই জন্য পোশাকও মজুরের মত করিলাম—কেবল তাহা ইউরোপীয় শ্রমিকদের মত অর্থাৎ পাত্‌লুন ও শার্ট হইল। এগুলি জেলের পোশাকের অনুকরণে তৈয়ারী হইয়াছিল। আসমানী রংএর মোটা কাপড়ের সস্তা পাত্‌লুন ও শার্ট সকলে ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে ভাল সেলাই জানিতেন। তাঁহারা সেলাই করার ভার লইলেন।

সাধারণতঃ আমাদের খাদ্য ছিল ভাত, ডাল, তরকারি ও রুটি। কখনও কখনও ইহার সহিত জাউ। এই সমস্ত দ্রব্য একই বাসনে পরিবেশন করা হইত। খাওয়ার বাসন ছিল থালার পরিবর্তে জেলের কয়েদীদের যেরূপ লোহার বাটি দেওয়া হয় সেইরূপ একটি পাত্র। আমরা ফার্মেই কাঠের চামচ তৈয়ারী করিয়া লইয়াছিলাম। খোরাক তিনবার দেওয়া হইত। সকালে ছয়টার সময় রুটি ও ঘরে তৈরী গমের কফি, এগারটায় ডাল, ভাত, তরকারি ও সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় জাউ ও দুধ অথবা রুটি ও ঘরের কফি। খাওয়ার পর সন্ধ্যা সাতটা বা সাড়ে সাতটায় প্রার্থনার নিয়ম ছিল। প্রার্থনায় ভজন হইত। কোনও দিন রামায়ণ, কোনও দিন বা ইসলামের পুস্তক হইতে কিছু পাঠ হইত। ভজন ইংরাজী, হিন্দী ও গুজরাটীতে হইত। কোনও দিন তিনটি ভাষাতেই এক একটি করিয়া, কোনও দিন আবার একটিমাত্র ভাষাতেই ভজন হইত। রাত্রি নয়টায় সকলকেই শুইতে হইত।

ফার্মে অনেকেই একাদশী ব্রত পালন করিতেন। শ্রীর পি. কে. কোতোয়াল এই সময় ফার্মে আসেন। তাঁহার উপবাসাদির ভাল রকম অভ্যাস ছিল। আমাদের কেহ কেহ তাঁহার সহিত চাতুর্মাস্য আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে রমজান আসিয়া পড়িল। আমাদের মধ্যে মুসলমান যুবক ছিল। তাহাদিগকে 'রোজা' পালন করার জন্য উৎসাহিত করা আমরা উচিত মনে করিলাম। তাহাদের জন্য আমরা অতি প্রত্যূষে ও রাত্রিতে ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সন্ধ্যাবেলায় তাহাদের জন্য জাউ ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। অবশ্য মাংস হইত না এবং কেহ তাহা খাইতে চাহেও নাই। মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গ দিবার জন্য বাদবাকী আমরা সকলে সন্ধ্যার সময় একবেলা মাত্র আহার করিতাম। সাধারণতঃ আমরা সূর্যাস্তের পূর্বেই আহার শেষ করিতাম। এই ব্যবস্থায় তফাৎ কেবল এইটুকু হইল যে অপর সকলে যখন খাওয়া শেষ করিতেছে রোজা পালনকারী মুসলমান যুবকেরা তখন আহার করিবার জন্য তৈরী হইত।

এই ছেলেরাও এত সৌজন্যপরায়ণ ছিল যে উপবাসী থাকা সত্ত্বেও কাহারও কোন অতিরিক্ত অসুবিধা হইতে দিত না। আবার এদিকে অমুসলমান ছেলেরাও রোজার সময় উপবাসের সাথী হওয়ায় সকলের উপরই ভাল প্রভাব হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান ছেলেদের মধ্যে ধর্ম লইয়া একবারও দলাদলি তো দূরের কথা এমন কি বিবাদ হইয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ নাই। বরঞ্চ ইহার বিপরীত ভাবই আমি লক্ষ্য করিয়াছি। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিয়াও একে অপরের সহিত সম্মানপূর্ণ আচরণ করিয়াছে এবং পরস্পরের ধর্মাচরণে সহায়তা দিয়াছে।

শহরের জীবনের সুখ-সুবিধা হইতে দূরে থাকিয়াও সম্ভাব্য ব্যারামপীড়ার চিকিৎসার সাধারণ আয়োজনও ছিল না। শিশুদের নিষ্পাপ স্বভাব সম্বন্ধে আমার যে বিশ্বাস, কেবল প্রাকৃতিক উপায়ে পীড়া আরোগ্য করার সম্বন্ধেও তেমনি বিশ্বাস সে সময়ে আমার ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে আমরা সাদাসিধা জীবনযাপন করি বলিয়া অসুখ হইবে না। আর যদি বা হয় তবে তাহা আমিই সারাইতে পারিব। আমি যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুস্তিকাটি লিখিয়াছি (আরোগ্য সাধন) উহা সেই সময়কার পরীক্ষার ও আমার দৃঢ় বিশ্বাসের বিবরণ। আমি গর্বভরে বিশ্বাস করিতাম যে, আমার রোগ হইতেই পারে না। কেবল জল, মাটি ও উপবাসের প্রয়োগ ও আহারের পরিবর্তন দ্বারা সকল রোগই সারানো যায় বলিয়া মনে করিতাম। ফার্মে কোনও রোগ হয় নাই যখন ঔষধ কিংবা ডাক্তারের আবশ্যকতা পড়িয়াছে। সত্তর বৎসর বয়স্ক জনৈক উত্তর ভারতবাসী বৃদ্ধের হাঁপানি-কাসি কেবল খাদ্যের পরিবর্তন ও জলের প্রয়োগ দ্বারা সারাইয়াছিলাম। কিন্তু সেই সাহস আজ হারাইয়া বসিয়াছি। আর নিজে দুইবার গুরুতর ভাবে পীড়িত হওয়ায় পূর্বোক্ত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার অধিকারও হারাইয়া বসিয়াছি বলিয়া মনে হয়।

আমরা ফার্মে থাকাকালীন গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন। তাঁহার ভ্রমণের কথা অপর অধ্যায়ে বলা হইবে। তবে তখনকার একটি অম্লমধুর স্মৃতির কথা এখানেই বলিতেছি। আমাদের ফার্মের জীবনযাত্রার ধরন সম্বন্ধে পাঠকেরা এতক্ষণে একটা ধারণা পাইয়াছেন। ফার্মে খাটিয়া বলিয়া কোনও পদার্থ ছিল না। তবে গোখলের জন্য একটা চাহিয়া আনিয়াছিলাম। তাঁহাকে নিরিবিলি থাকিতে দেওয়ার মত কামরাও ছিল না। বসিতে দেওয়ার জন্য ছিল কেবল স্কুলের বেঞ্চ। এত প্রচুর যেখানে আয়োজন সেখানে দুর্বল শরীর গোখলেকে এই

ফার্মে না আনিলে চলে কি করিয়া? তিনিই বা ফার্ম না দেখিয়া থাকেন কি করিয়া? বুদ্ধিহীনতার জন্য আমার মনে হইয়াছিল যে এক রাত্রির অসুবিধা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন। আর স্টেশন হইতে ফার্ম এই দেড় মাইল রাস্তা হাঁটিয়াই আসিতে পারিবেন। এই কর্মসূচী সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে পূর্বেই জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলাম এবং তিনিও তাঁহার সারল্য ও আমার উপর মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাসবশতঃ বিচার-বিবেচনা না করিয়া সমস্ত ব্যবস্থাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। দৈবক্রমে সেই দিন আবার বৃষ্টি হইতেছিল। হঠাৎ কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে তাই সম্ভব ছিল না। এমনি করিয়া অন্ধ ভালবাসাবশতঃ সেদিন গোখলেকে যে কষ্ট দিয়াছিলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। এত কষ্ট তাঁহার সহ্য হইল না; ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি হইল। খাওয়ার জন্য তাঁহাকে পাকশালায় লইয়া যাইতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত কলেনবেকের ঘরে তাঁহাকে উঠাইয়াছিলাম। রান্নাঘর হইতে সেখানে খাবার লইয়া যাইতে যাইতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তাঁহার জন্য আমি বিশেষ ধরনের 'সুপ' তৈয়ারী করিয়াছিলাম, ভাই কেতোয়াল আটার রুটি করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনটাই তাঁহাকে গরম গরম খাওয়ানো গেল না। ইহারই মধ্যে যতটা পারা যায় করিলাম। তিনি কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া আমি যে কত বড় মূর্খতা করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম। যখন তিনি দেখিলেন যে, আমরা সকলেই মাটিতে শুই, তখন তিনি খাটিয়া সরাইয়া দিয়া নিজের বিছানা মাটিতেই করিয়া লইলেন। আমার সমস্ত রাত্রি অনুতাপ করিয়া কাটিল। গোখলের এক অভ্যাস ছিল—আমার মতে বদভ্যাস। চাকর ছাড়া তিনি আর কাহারও সেবা লইতেন না। এ যাত্রায় চাকর লইয়া বাহির হন নাই। শ্রীযুক্ত কলেনবেক ও আমি তাঁহার পা টিপিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের পা ছুঁইতে দিতে পর্যন্ত স্বীকৃত হইলেন না। কতকটা চটিয়া, কতকটা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "তোমরা মনে কর যে, দুঃখ ভোগ করার জন্য এক তোমরাই জন্মিয়াছ, আর আমার মত লোক কেবল তোমাদের সেবায় পরিপুষ্ট হইতে জন্মিয়াছে। তোমাদের এই বাড়াবাড়ির শাস্তি আজ পুরামাত্রায় গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগকে আমাকে স্পর্শ করিতেও দিব না। তোমরা সকলে পায়খানা করার জন্য দূরে যাও আর আমার জন্য কমোডের ব্যবস্থা করিয়াছ এ কেমন কথা? আমার যতই অসুবিধা হোক্, তোমাদের গর্ব ভাঙ্গিব।" তাঁহার বাক্য যেন বজ্রের মত বাহির হইল। কলেনবেক ও আমি

মরমে মরিয়া গেলাম। তাঁহার মুখে বরাবর হাসি ছিল এইটুকু রক্ষা। কৃষ্ণের মহত্ত্ব না জানিয়া ও প্রেমে অন্ধ হইয়া অর্জুন তাঁহার প্রতি অনেক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে সকল কি কৃষ্ণ মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন? গোখলেও কেবল আমাদের সেবার আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ রাখিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাকে সেবা করার সম্মান আমাদের পাইতে দেন নাই। মোম্বাসা হইতে লেখা তাঁহার প্রেমপূর্ণ পত্রখানা আজও আমার হৃদয়ে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি সকল প্রকার কষ্ট সানন্দে সহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু যে সেবা আমরা করিতে পারিতাম শেষ পর্যন্ত তাহা করিতে দেন নাই। কেবল খাওয়াদাওয়া, তাহা আমাদের নিকট হইতে না লইয়া আর কি করিবেন?

পরের দিন প্রাতে তিনি না নিজে বিশ্রাম করিলেন, না আমাদিগকে দিলেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতা আমরা পুস্তকাকারে ছাপিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তিনি স্বয়ং সেইগুলি সংশোধন করিয়া দিলেন। কিছু লিখিবার সময় পায়চারি করিতে করিতে ভাবিয়া লইয়া পরে লেখাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। একখানা ছোটখাটো চিঠি লেখার ছিল। আমি ভাবিলাম এখনই তিনি তাহা লিখিয়া ফেলিবেন। কিন্তু তাহা কি হয়! আমি ইহা লইয়া মন্তব্য করিতে গিয়া এই উপদেশ পাইলাম, "আমার জীবনযাত্রার ধরন তুমি কি করিয়া জানিবে? আমি কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়েও তাড়াহুড়া করি না। উহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিব, উহার মূল বক্তব্য স্থির করিয়া লইব, তাহার পর উহার উপযুক্ত ভাষা সম্বন্ধে বিবেচনা করিব এবং অবশেষে লিখিব। সকলেই যদি এই প্রকার করেন তবে কত সময় বাঁচিয়া যায়। আর আজ যে অপরিপক্ক ভাবধারার প্রবল আঘাতে জাতির অস্তিত্ব পর্যুদস্ত তাহার হাত হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।"

যেমন গোখলের আগমনের কাহিনী বর্ণনা না করিলে টলস্টয় ফার্মের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি শ্রীযুক্ত কলেনবেকের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে। ফার্মে আমাদের সকলের সহিত মিশিয়া কেমনভাবে আমাদেরই একজন হইয়া তিনি থাকিতেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। গোখলে সহজে আকৃষ্ট হওয়ার লোক নহেন। কিন্তু তিনিও কলেনবেকের জীবনের মহা পরিবর্তন দ্বারা অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলেনবেক বিলাস-বৈভবের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন এবং কখনও কায়িক ক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। প্রভূত আরামে জীবনযাপন করাকেই তিনি ধর্ম করিয়া

লইয়াছিলেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখকর তাহা ভোগ করিতে বাকী রাখেন নাই, ধন-সম্পদ দ্বারা যে জিনিস পাওয়া যায় নিজের সুখের জন্য তাহা সংগ্রহ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

এই জাতীয় মানুষের পক্ষে টলস্টয় ফার্মে বাস করা, সকলের মত শোওয়া-বসা ও খাওয়া-দাওয়া করিয়া ভারতীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ওতঃপ্রোত হইয়া যাওয়া যেমন তেমন কথা নহে। সেখানকার বাসিন্দা ভারতীয়রা ইহাতে যেমন আশ্চর্য তেমনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। গোরাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁহাকে মূর্খ অথবা পাগল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। আর সকলে তাঁহার ত্যাগ বৃত্তি দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। কলেনবেক নিজের ত্যাগকে কখনও বেদনা-দায়ক মনে করিতেন না। অতীতে তিনি ভোগ করিয়া যত না আনন্দ পাইয়া-ছিলেন, ত্যাগ দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ বোধ করিতেছিলেন। সরল জীবনের সুখের কথা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং যাঁহারা শুনিতেন, তাঁহাদেরও ক্ষণকালের জন্য এই সুখ ভোগ করার ইচ্ছা হইত। বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলের সহিতই তিনি এমন প্রেমভরে মিশিতেন যে, তাঁহার স্বল্পকালীন অনুপস্থিতিকেও লোকে নিজের জীবনের একটি স্পষ্ট শূন্যতা বলিয়া অনুভব করিত। ফলগাছের উপর তাঁহার অত্যন্ত শখ ছিল বলিয়া বাগানের কাজ হাতে রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে তিনি শিশু ও বয়স্ক—সকলকেই ফল-পরিচর্যার কাজে লাগাইতেন। তাঁহার এমন সদানন্দ ভাব ও সহাস্য বদন-মণ্ডল ছিল যে, তিনি বাগিচার কাজে খুব খাটাইলেও সকলে সানন্দে তাঁহার সহিত কাজ করিতে চাহিতেন। যেদিনই রাত্রি দুইটায় উঠিয়া জোহানস্‌বার্গ যাওয়ার দল বাহির হইত, শ্রীযুক্ত কলেনবেক সেই দলে থাকিতেনই।

তাঁহার সহিত প্রায়ই আমার ধর্মালোচনা হইত। অহিংসা, অর্থাৎ প্রেম, সত্য ও এই জাতীয় মৌলিক বিষয় লইয়াই আমরা আলোচনা করিতাম। সর্পাদি মারা পাপ—একথা বলায় শ্রীযুক্ত কলেনবেক ও আমার অন্যান্য ইউরোপীয় মিত্ররা স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। শেষ অবধি বিমূর্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে তিনি এই নীতির সত্যতা স্বীকার করিয়া লন। আমার সহিত প্রথম পরিচয়ের সময় হইতেই তিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য নীতিসমূহকে আচরণে রূপায়িত করিবার যৌক্তিকতা ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। আর সেইজন্যই তিনি নিজের জীবনে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা না করিয়াই বহু মহৎ পরিবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত কলেনবেক

চিন্তা করিলেন যে সর্পাদি মারা যদি অন্যায় হয় তাহা হইলে তাহাদের সহিত আমাদের মিত্রতা করা উচিত। প্রথমতঃ বিভিন্ন রকমের সাপের সম্বন্ধে পরিচিত হওয়ার জন্য তিনি সাপের বিষয়ে কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিলেন। তিনি তাহা পড়িয়া বুঝিলেন যে, সকল সাপ বিষাক্ত নয়। আর কতকগুলি তো শস্যাদির সংরক্ষণ কার্যের সহায়ক। আমাদের সকলকে বিভিন্ন ধরনের সাপ চিনিতে তিনি শিখাইলেন এবং শেষ পর্যন্ত ফার্মে প্রাপ্ত একটি বড়সড় গোখরো সাপ ধরিয়া পুষিতে লাগিলেন। রোজ তিনি তাহাকে নিজের হাতে খাওয়াইতেন। আমি তাঁহার সহিত ইহা লইয়া মৃদুভাবে তর্ক করিলাম বলিলাম, "আপনি যদিও বন্ধুভাবে উহাকে পালন করিতেছেন, কিন্তু সাপটির হয়ত সে বোধ নাই। কেন না আপনার করুণার সহিত ভয়ও মিশানো রহিয়াছে। উহাকে ছাড়া রাখিয়া উহার সহিত খেলা করার সাহস আপনার বা আমার কাহারও নাই। অবশ্য এই ধরনের মুক্ত সাপের সহিত খেলা করার মত সাহসের ভাব বিকশিত করার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। সেইজন্য এই সাপ পোষার মধ্যে যদিও সৎ ইচ্ছা রহিয়াছে কিন্তু ইহাতে প্রেম নাই। আমাদের ব্যবহার এমন হওয়া চাই যাহাতে এই সাপও বুঝিতে পারে। আমরা তো সর্বদাই দেখিতে পাই যে কেহ তাহাকে ভালবাসে না ভয় করে তাহা সকল প্রাণীই অবিলম্বে বুঝিতে পারে। আপনি জানেন যে, এই গোখরোটি বিষাক্ত নয়। কেবল উহার চালচলন, উহার অভ্যাস ইত্যাদি লক্ষ্য করার জন্যই উহাকে কয়েদ করিয়াছেন। ইহাও একপ্রকার বিলাসিতা। সত্যকার মৈত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই প্রকার বিলাসের স্থান নাই।"

শ্রীযুক্ত কলেনবেক আমার যুক্তি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু গোখরোটাকে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিতে তাঁহার মন তৈয়ারী ছিল না। ইহা লইয়া আমি তাঁহার উপর চাপ দিলাম না। আমিও সাপটির জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম এবং ছেলেরা তো ইহা খুবই উপভোগ করিত। উহাকে বিরক্ত করিতে সকলকেই নিষেধ করা হইয়াছিল। তবে কয়েদী নিজেই পলাইবার রাস্তা খুঁজিতেছিল। অসতর্কতার কারণ পিঞ্জরের দরজা খোলাই থাকুক, অথবা সাপটি নিজেই কোন রকমে খুলিয়া থাকুক, দুই-চারদিনের ভিতরেই একদিন প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত কলেনবেক তাঁহার মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়া দেখেন যে, পিঞ্জর খালি। ইহাতে শ্রীযুক্ত কলেনবেক খুশী হইলেন—আমিও হইলাম। সাপ পোষার এই ঘটনার পর হইতে আমাদের মধ্যে সাপের

সম্বন্ধে হামেশা আলোচনা হইত। শ্রীযুক্ত কলেনবেক আলব্রেখট নামক এক গরীব জার্মানকে ফার্মে আনিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি গরীব এবং বিকলাঙ্গ ছিলেন। তাঁহার কুঁজ এত বড ছিল যে, লাঠির সাহায্য ছাডা চলিতে পারিতেন না। তাঁহার সাহসের অন্ত ছিল না।

আলব্রেখট শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনায় আনন্দ পাইতেন। তিনিও ফার্মে ভারতীয়দের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন। তিনি নির্ভয়ে সাপের সহিত খেলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সাপের ছানা হাতে করিয়া আনিতেন ও হাতের তালুর উপর রাখিয়া উহাকে খেলাইতেন। ফার্ম যদি দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকিত তাহা হইলে আলব্রেখটের এই দুঃসাহসিকতার কি পরিণাম হইত ঈশ্বর জানেন।

সাপ লইয়া এইপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ফলে সাপের ভয় কমিয়া গেলেও কেহ মনে করিবেন না যে, ফার্মে কাহারও সাপের ভয় আর ছিল না অথবা সর্পাদি মারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

কোন কাজ করা হিংসার দ্যোতক বা পাপ এই বোধ এক জিনিস, আর সেই বোধ অনুযায়ী আচরণ করার শক্তি থাকা অন্য জিনিস। যাহার ভিতর সাপের ভয় আছে ও যে সাপের হাতে মরিতে প্রস্তুত নয়, সঙ্কটে পড়িলে সে সাপকে না মারিয়া পারিবে না। এইরূপ একটি ঘটনা ফার্মে ঘটে। আমার তাহা স্মরণ আছে। পাঠকগণ জানেন যে ফার্মে সাপের উপদ্রব খুবই ছিল। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন ফার্মে কোনও জনবসতি ছিল না। কিছুদিন হইতে স্থানটি জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। একদিন শ্রীযুক্ত কলেনবেকের ঘরে এমন জায়গায় একটি সাপ দেখা গেল যেখান হইতে উহাকে তাড়ানো বা ধরা অসম্ভব। ফার্মের একটি ছাত্র উহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। আমাকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, এখন কি করা যায়? সে সাপটিকে মারিয়া ফেলার হুকুম চাহিল। হুকুম না পাইলেও সে সাপ মারিতে পারিত। কিন্তু সাধারণতঃ এই ধরনের কাজ ছেলেরা কি ফার্মের বাসিন্দা অপরে আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিত না। আমি দেখিলাম যে সাপটিকে মারিবার হুকুম দেওয়াই আমার কর্তব্য এবং তাই সে হুকুম দিলাম। আজ একথা লেখার সময়েও আমার মনে হইতেছে না যে ইহার দ্বারা কিছু অন্যায় কার্য করিয়াছিলাম। সাপটিকে হাত দিয়া ধরার সাহস অথবা অন্য কোন উপায়ে ফার্মের বাসিন্দাদের বিপদের কারণকে অপসৃত করার সাহস আমার ছিল না এবং আজও তাহা নাই।

বলা বাহুল্য, ফার্মে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ওঠা-নামা করিত। কেহ জেলে যাইবার প্রস্তুতি করিতেছেন কেহ বা আবার জেল হইতে ছাড়া পাইয়াছেন। একদিন ফার্মে এমন দুইজন সত্যাগ্রহী উপস্থিত হইলেন ম্যাজিস্ট্রেট যাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত মুচলেকাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং পরের দিন দণ্ডের আদেশ লওয়ার জন্য যাঁহাদের উপস্থিত হওয়ার কথা। কথা বলিতে বলিতে শেষ ট্রেনের সময় হইয়া গেল এবং তখন গিয়া তাঁহারা আর রেলগাড়ি ধরিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। তাঁহারা দুইজনেই ছিলেন যুবক ও ব্যায়াম-কুশল। তাঁহারা প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিলেন ও তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দিয়া আসার জন্য আমরা কয়েকজনও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিলাম। রাস্তাতেই আমি স্টেশনে গাড়ি আসার বাঁশি শুনিলাম। গাড়ি ছাড়ার দ্বিতীয় বাঁশি পড়ার সময় আমরা স্টেশনের কাছে পৌঁছাইয়াছি। ঐ দুই যুবক খুব জোরে দৌড়াইতে লাগিলেন, আমি পিছনে পড়িয়া গেলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। এই দুইজনকে দৌড়াইতে দেখিয়া স্টেশন মাস্টার সৌভাগ্যক্রমে গাড়ি থামাইয়া শেষ অবধি তাঁহাদের উঠিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি পৌঁছিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। এই ঘটনা হইতে দুইটি বিষয় স্পষ্ট হয়। এক হইতেছে, সত্যাগ্রহীদের জেলে যাওয়ার ও নিজেদের কথা রাখার আগ্রহ; আর স্থানীয় কর্মচারীদের সহিত সত্যাগ্রহীদের মধুর সম্পর্ক। এই যুবকেরা এই গাড়ি ধরিতে না পারিলে পরদিন আদালতে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনও জামিন চাওয়া হয় নাই; আদালতে তাঁহাদিগকে টাকাও জমা রাখিতে হয় নাই। তাঁহাদের ভদ্রতার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীরা এমন মর্যাদা অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা জেলে যাইতে উৎসুক বলিয়া বিচারকেরা তাঁহাদের নিকট জামিন চাওয়ার প্রয়োজন মনে করিতেন না। এই কারণেই ঐ তরুণ সত্যাগ্রহীদের গাড়ি না পাইবার আশঙ্কা এত প্রবল হইয়াছিল এবং তাঁহারা বায়ুবেগে দৌড়াইতেছিলেন। সত্যাগ্রহের প্রথম দিকটায় সরকারী কর্মচারীরা সত্যাগ্রহীদের কতকটা উত্যক্ত করিতেন বলা যায় এবং জেলের কর্তৃপক্ষ কোনও কোনও স্থানে অনাবশ্যক কঠোর হইয়াছিলেন। কিন্তু আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতেছিলাম যে, আমলাদের কড়া ভাব ক্রমশঃ কমিতেছিল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত মধুর সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সরকারী কর্মচারীদের সহিত সম্পর্ক অধিকদিনের হইলে পূর্বোক্ত স্টেশন মাস্টারের মত তাঁহারা এমন

কি আমাদের কাজে সাহায্য করিতেন। ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, সত্যাগ্রহীরা কোনও প্রকার ঘুষ দিয়া আমলাদের নিকট হইতে সুবিধা গ্রহণ করিতেন। অন্যায় উপায়ে কোনও সুবিধা পাওয়ার কথা কখনও সত্যাগ্রহীদের মনেও উদিত হয় নাই। কিন্তু ভদ্রতা করিয়া সুবিধা দিলে তাহা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হইত। আর এই জাতীয় সুবিধা সত্যাগ্রহীরা অনেক স্থানেই পাইয়াছেন। কোন স্টেশন মাস্টার যদি অপ্রসন্ন হন তবে আইনের ভিতর থাকিয়াও যাত্রীদের তিনি যথেষ্ট জ্বালাতন করিতে পারেন। এই প্রকার জ্বালাতনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও চলিতে পারে না। আর কর্মচারীটি যদি সদিচ্ছাপরায়ণ হন, তবে আইন পালন করিয়াও অনেক সুবিধা দিতে পারেন। এই রকম সকল সুবিধাই আমাদের ফার্মের নিকটস্থ স্টেশনের মাস্টার শ্রীযুক্ত ললীর নিকট হইতে পাওয়া যাইত। আর তাহার হেতু হইতেছে সত্যাগ্রহীদের ভদ্রতা, তাঁহাদের ধৈর্য, আত্মনিগ্রহ সহন করার শক্তি।

একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে উল্লেখ করা অহেতুক নয় বলিয়া মনে করি। আজ প্রায় ৩৫ বৎসর হইল ধার্মিক, আর্থিক ও স্বাস্থ্যের দিক হইতে আমার খাদ্য লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। খাদ্য সংস্কারের এই পথে এখনও মন্দা পড়ে নাই। এই পরীক্ষার প্রভাব স্বভাবতই আমার ধারে-কাছের লোকেদের উপরও পড়ে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিনা ঔষধে কেবল জল ও মাটির মত প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে চিকিৎসা করার পরীক্ষাও আমি করিতাম। ওকালতি করার সময় মক্কেলদের সঙ্গে আমার এমন হৃদ্যতার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল যে পরস্পরকে আমরা প্রায় একই পরিবারের সদস্যের মত মনে করিতাম। মক্কেলরাও আমাকে তাঁহাদের সুখ-দুঃখের ভাগী মনে করিতেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য কেহ কেহ আমার পরামর্শ লইতেন। এই প্রকার সাহায্য লওয়ার জন্য কেহ কেহ টলস্টয় ফার্মেও আসিতেন। ইহাদের মধ্যে লুটাবন নামে উত্তর ভারতবাসী আমার এক বয়স্ক মক্কেল ছিলেন। প্রথমে তিনি গিরমিটিয়াদের সহিত আসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ৭০এর উপর। অনেক দিন হইতে তাঁহার পুরাতন হাঁপানি ও কাশি ছিল। বৈদ্যের বড়ি ও ডাক্তারের শিশির নানাবিধ ঔষধ তিনি অনেকদিন সেবন করিয়াছিলেন। সে সময় নিজের রোগ নিরাময়ের পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসের অন্ত ছিল না। সুতরাং তাঁহার নিছক চিকিৎসা করিতেই সম্মত হইলাম না, যদি তিনি আমার সমস্ত নির্দেশ

পালন করিয়া ফার্মে বাস করেন, তবে তাঁহার উপর আমার পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিব বলিয়া মনস্থ করিলাম। তিনি আমার শর্ত স্বীকার করিলেন। লুটাবনের তামাক খাওয়ার বিষম অভ্যাস ছিল। ইহাও ছাড়িতে হইবে বলিয়া একটি শর্ত ছিল। লুটাবনকে একদিনের উপবাস করাইলাম। প্রতিদিন বারোটায় আমি তাঁহাকে রৌদ্র-স্নান করাইতে লাগিলাম। তখন রৌদ্রের খুব তেজ ছিল না। অল্প ভাত ও জলপাইয়ের তেল খাইতে দিলাম। তাহার সহিত মধু, আবার কখনও জাউ ও মিঠা নারাঙ্গী বা আঙ্গুর, কিছু গমের কফি দেওয়া হইত। লবণ ও মশলা একেবারেই বাদ দেওয়া হইয়াছিল। যে বাড়িতে আমি শুইতাম তাহার ভিতরের দিকে লুটাবনেরও বিছানা হইত। বিছানার জন্য প্রত্যেককে দুইখানা করিয়া কম্বল দেওয়া হইত—একখানা পাতার জন্য ও একখানা গায়ে দেওয়ার জন্য। আর একখানি কাঠের পিঁড়ি বালিশ রূপে ব্যবহৃত হইত। এক সপ্তাহ কাটিল, লুটাবনের শরীরে কতকটা শক্তি আসিল। হাঁফ কম হইল; কাশিও কমিল। কিন্তু দিনের তুলনায় রাত্রিতে হাঁফ ও কাসি দুই-ই বাড়িত। আমার সন্দেহ হইল গোপনে তিনি ধূমপান করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি অস্বীকার করিলেন। কয়েকদিন গেল। তবুও রোগ কমিল না দেখিয়া আমি গোপনে লুটাবনের উপর লক্ষ্য রাখিব স্থির করিলাম। সকলেই মেঝেতে শুইতেন। সাপের উপদ্রব ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত কলেনবেক আমাকে একটা টর্চ লাইট দিয়াছিলেন, নিজেও একটি রাখিয়াছিলেন। উহা পার্শ্বে রাখিয়া আমি শুইতাম। একদিন রাত্রে শয্যায় শুইয়া আমি জাগিয়া থাকা স্থির করিলাম। দরজার বাহিরে বারান্দায় আমার বিছানা, আর দরজার ভিতরেই লুটাবনের বিছানা। দুপুররাত্রিতে লুটাবনের কাশি উঠিল। তিনি দেশলাই জ্বালাইয়া বিড়ি ধরাইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যার নিকট গিয়া টর্চ জ্বালাইয়া ধরিলাম। লুটাবন সব বুঝিতে পারিয়া ঘাবড়াইয়া গেলেন। বিড়ি ফেলিয়া দিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন ও আমার পায়ে ধরিলেন। "আমি বড় অপরাধ করিয়াছি, আর কখনও তামাকু খাইব না। আমি আপনাকে ঠকাইয়াছি। আমাকে মাপ করুন—" এই কথা বলিতে বলিতে লুটাবন প্রায় ফোঁপাইতে লাগিলেন। আমিতাঁহাকে সান্ত্বনা দিলাম ও বুঝাইলাম যে বিড়ি না খাইলে তাঁহারই ভাল। আমার হিসাব মত তাঁহার কাশি সারিয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু সারে নাই বলিয়া আমার সন্দেহ হয় যে তিনি গোপনে ধূমপান করিতেছেন। লুটাবন বিড়ি ছাড়িলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন

দিনের মধ্যেই তাহার হাঁপানী ও কাশির প্রকোপ কমিল। একমাসের মধ্যে তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। লুটাবনের শরীরে খুব শক্তি হইল ও তিনি বিদায় লইলেন।

স্টেশন মাস্টারের ছিল একটি দুই বছরের ছেলে। তাহার টাইফয়েড হইয়াছিল। তিনিও আমার চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা শুনিয়াছিলেন এবং আমার পরামর্শ চাহিলেন। প্রথম দিন আমি বালকটিকে কিছুই খাইতে দিলাম না। দ্বিতীয় দিন খাইতে দিলাম মাত্র অর্ধেকটা কলা বেশ করিয়া মাড়িয়া তাহাতে এক চামচ অলিভ অয়েল ও কয়েক ফোঁটা কমলালেবুর রস, আর কিছু না। ছেলেটির তলপেটে রাত্রিতে মাটির ঠাণ্ডা পুলটিস বাঁধিয়া দিলাম। এই ক্ষেত্রেও আমার চিকিৎসাপদ্ধতি সফল হইল। হইতে পারে যে, ডাক্তারের রোগনির্ণয়ে ভুল ছিল, উহা টাইফয়েড জ্বর ছিল না।

এই রকম অনেক পরীক্ষা ফার্মে করিয়াছিলাম। ইহার কোনটা নিষ্ফল হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। আজ কিন্তু এই ধরনের চিকিৎসা করার সাহস আমার নাই। টাইফয়েড রোগীকে অলিভ অয়েল ও কলা দেওয়ার কথায় এখন কম্প উপস্থিত হয়। ১৯১৮ সালে আমার নিজের আমাশয় হয়, আমি তাহা সারাইতে পারি নাই। আজও আমি বুঝিতে পারি না যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চিকিৎসায় উপকার হইত এখানে তাহা সফল হয় না কেন? আমার আত্ম-বিশ্বাসের অল্পতা ইহার হেতু না এখানকার আবহাওয়া ঐ চিকিৎসার উপযুক্ত নয়? তবে এইটুকু আমি জানি যে, এই ধরনের ঘরোয়া চিকিৎসা ও টলস্টয় ফার্মে আমাদের সাদাসিধা জীবনযাত্রার ফলে জনসাধারণের অন্ততঃ দুই-তিন লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গিয়াছিল। ফার্মের বাসিন্দারা পরস্পরকে একই পরিবারের সদস্য হিসাবে দেখার শিক্ষালাভ করিলেন, সত্যাগ্রহীরা একটি পবিত্র আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছিলেন, অসদাচরণ ও কপটতার পথ বন্ধ হইয়াছিল এবং ভাল ও মন্দের বাছাই করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

উপরে বর্ণিত খাদ্য সম্বন্ধীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি করা হইয়াছিল কেবল স্বাস্থ্যের দিক হইতেই। কিন্তু এইখানেই আমি নিজের উপর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

নিরামিষাহারী হিসাবে আমাদের দুধ খাওয়ার অধিকার আছে অথবা নাই, এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ফার্মে থাকার সময় আমার হাতে একটি পুস্তক অথবা সংবাদপত্র আসিয়া পড়ে। কলিকাতায় গো-মহিষের

শেষ বিন্দু পর্যন্ত দুগ্ধ দোহন করার জন্য অমানুষিক ভাবে 'ফুকা' নামক যে নিষ্ঠুর ও ভয়ানক প্রক্রিয়ার শরণ লওয়া হয় তাহার বর্ণনা ছিল। এক সময় শ্রীযুক্ত কলেনবেকের সহিত দুধ খাওয়ার আবশ্যকতার বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে আমি উক্ত প্রসঙ্গও উত্থাপন করি। দুধ ত্যাগ করার দ্বারা অন্যান্য যে সকল আধ্যাত্মিক লাভের সম্ভাবনা তাহারও বর্ণনা করি এবং মন্তব্য করি যে সম্ভব হইলে দুগ্ধ পান ত্যাগ করা ভাল। আমার বক্তব্য শ্রীযুক্ত কলেবেকের খুবই ভাল লাগিয়াছিল এবং তাই তাঁহার স্বাভাবিক সাহসিকতাবশে অবিলম্বে দুধ ছাড়ার পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। সেই দিনই আমরা দুইজনে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিলাম এবং শেষ অবধি সকল প্রকার রান্না করা খাদ্যদ্রব্যও বর্জন করিয়া মাত্র শুষ্ক ও টাটকা ফলের উপর নির্ভর করিতে লাগিলাম। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরবর্তী ইতিহাস অথবা কেমন করিয়া ইহার অবসান ঘটিয়াছিল সে কথা বলার স্থান ইহা নয়, তবে এইটুকুমাত্র জানাইতেছি যে, কেবল ফলাহার করিয়া যে পাঁচ বৎসর ছিলাম তাহার মধ্যে কখনও দুর্বলতা বোধ করি নাই অথবা কোনও ব্যাধি ভোগ করি নাই। এই সময়টাতে আমার শারীরিক কার্য করার শক্তি পুরামাত্রায় ছিল। এমন শরীর ছিল যে, একদিনে পায়ে হাঁটিয়া ৫১ মাইল গিয়াছিলাম। ৪০ মাইল দিনে চলা তো সাধারণ ব্যাপার ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই পরীক্ষার আধ্যাত্মিক পরিণাম খুব ভালই হইয়াছিল। কেবল ফলাহার করিয়া জীবনধারণ করার আমার এই পরীক্ষা বাধ্য হইয়া কতকটা পরিবর্তন করিতে হইয়াছে বলিয়া চিরকাল আমার মনে একটা দুঃখ রহিয়া গিয়াছে। আমার রাজনৈতিক কার্যকলাপ হইতে যদি মুক্তি পাই তবে পুনরায় এই বয়সে ও এই শরীরে বিপদের আশঙ্কা লইয়াও এই পরীক্ষার আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা আবিষ্কারের জন্য ইহা আবার আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করে। ডাক্তার ও বৈদ্যদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি না থাকায়ও আমার পথে বাধা পড়িয়াছে।

এক্ষণে এই মধুর অথচ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিতে পূর্ণ অধ্যায় লেখা শেষ করিতে হইবে। এই রকম বিপজ্জনক পরীক্ষা কেবল আত্মশুদ্ধির যুদ্ধেরই অঙ্গ হইতে পারে। সত্যাগ্রহের অন্তিম যুদ্ধের জন্য টলস্টয় ফার্ম এক আধ্যাত্মিক শুদ্ধি ও তপশ্চর্যার স্থান হইয়া পড়িল। টলস্টয় ফার্ম না থাকিলে আট বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ চালানো যাইত কিনা, বেশী করিয়া অর্থ পাওয়া যাইত কিনা এবং আন্দোলনের অন্তিম পর্যায়ে যে হাজার হাজার লোক যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন

তাঁহারা যোগ দিতেন কিনা, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। টলস্টয় ফার্মকে কখনও লোকের কাছে জাহির করা হয় নাই। অথচ এ যোগ্যতা ফার্মের ছিল বলিয়া প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের সহানুভূতি পাইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা দেখিয়াছিলেন যে, যে কাজ তাঁহারা করিতে প্রস্তুত নহেন এবং যাহা তাঁহাদের কঠিন বলিয়া মনে হইত তাহা ফার্মের অধিবাসীরা করিতেছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আন্দোলনকে যখন ব্যাপক ভিত্তিতে নূতন করিয়া সংগঠিত করা হয় ফার্মের কার্যকলাপের উপর জনসাধারণের এই বিশ্বাস তখন এক মূল্যবান সম্পদ স্বরূপ পরিগণিত হয়। এ জাতীয় সম্পদের প্রতিদান পাওয়া যায় কিনা এবং গেলেও কবে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা সহকারে কেহ কিছু বলিতে পারেন না। এ জাতীয় প্রচ্ছন্ন সম্পদ ঈশ্বরের করুণা হইলে সময়মত প্রকট যে হয়ই সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং পাঠকও যেন কোন সন্দেহ না রাখেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়

গোখলের সফর

এইভাবে টলস্টয় ফার্মে সত্যাগ্রহীদের বন্ধুর জীবনযাত্রা চলিতেছিল এবং অদৃষ্টে যাহাই থাকুক তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কবে যে যুদ্ধ শেষ হইবে তাহা তাঁহারা জানিতেন না, তাঁহাদের সে চিন্তাও ছিল না। তাঁহাদের একমাত্র প্রতিজ্ঞা ছিল কালা কানুনের বশীভূত হইতে অস্বীকার করা এবং তাহার জন্য যে দুঃখ সহিতে হয় তাহা সহন করা। যোদ্ধার কাছে যুদ্ধ করাই জয়, কেন না একমাত্র যুদ্ধ করাতেই তাঁহার আনন্দ। যুদ্ধ করা তাঁহার হাতেই বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন যে জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, তাঁহার নিজের উপরই নির্ভরশীল। তাঁহার অভিধানে দুঃখ অথবা পরাজয় বলিয়া কোনও শব্দ নাই। গীতার কথায় বলা যায়, তাঁহার নিকট সুখ-দুঃখ, হার-জিত সবই সমান।

বিচ্ছিন্নভাবে দুই একজন সত্যাগ্রহী জেলে যাইতেন। কিন্তু যখন জেলে যাওয়ার দরকার হইত না তখন বাহির হইতে ফার্মের কাজকর্ম দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিতেন না যে, এখানে সত্যাগ্রহীরা থাকেন অথবা তাঁহারা একটা

যুদ্ধের জন্য তৈয়ারী হইতেছেন। কোনও অবিশ্বাসী ফার্ম পরিদর্শন করিতে আসিলে তিনি যদি মিত্র হইতেন তবে আমাদিগকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখিতেন, আর সমালোচক হইলে নিন্দা করিতেন। বলিতেন, "ইহারা অলস হইয়া পড়িয়াছে এবং তাই এই জঙ্গলে পড়িয়া পড়িয়া উদরপূর্তি করিতেছে। ইহারা জেলের ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে, আর সেই জন্য এই সুন্দর ফল বাগিচায় বসিয়া শহরের ঝঞ্চাট হইতে গা বাঁচাইয়া ছুটি উপভোগ করিতেছে।" এই সকল সমালোচকদিকে কেমন করিয়া বুঝানো যাইবে যে, সত্যাগ্রহী নৈতিক আইন ভঙ্গ করিয়া জেলে যাইতে পারে না এবং তাঁহার শান্তিনিষ্ঠা ও আত্মসংযম "যুদ্ধ" প্রস্তুতির উদ্যোগ-পর্ব। এই সমালোচকদিগকে কে বুঝাইবে যে, সত্যাগ্রহী মানুষের সাহায্য পাইবার কথা চিন্তা করা পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকেই একমাত্র শরণ জ্ঞান করিয়া আছে? ফলে শেষ অবধি মানুষের ধারণাতীত ঘটনা ঘটিয়াছিল অথবা ঈশ্বর ঘটাইয়াছিলেন। সমপরিমাণ অপ্রত্যাশিত সাহায্যও আসিয়াছিল, অপ্রত্যাশিত পরীক্ষাও আসিয়াছিল এবং শেষ অবধি স্থূল দৃষ্টিগোচর বিজয়লাভও হইয়াছিল।

গোখলে ও অন্যান্য নেতাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছিলাম যে, তাঁহারা যেন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া সেখানকার ভারতবাসীর অবস্থা সরেজমিনে দেখেন। কিন্তু সত্যসত্যই আসিবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। শ্রীযুক্ত রিচ চাহিতেছিলেন যে কোনও ভারতীয় নেতা যেন এই উপমহাদেশ পরিদর্শন করেন। কিন্তু আন্দোলনে যে সময়ে মন্দা পড়িয়াছে সে সময়ে কেই বা আসার গরজ করিবেন? ১৯১১ সালে গোখলে বিলাতে ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াই ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দিল্লীর বিধান পরিষদে তিনি এই সমস্যা লইয়া বিতর্কের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী উক্ত পরিষদে নাতালে গিরমিটিয়া পাঠানো বন্ধ করার জন্য এক আইন প্রণয়নের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। উহা পাসও হইয়াছিল। তাঁহার সহিত বরাবর আমার পত্র ব্যবহার চলিতেছিল। ভারত-সচিবের সহিত তিনি আলোচনা করিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানিয়া লওয়ার ইচ্ছার কথাও তাঁহাকে জানাইলেন। ভারত-সচিব তাঁহার আসার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। গোখলে ছয় সপ্তাহ দক্ষিণ আফ্রিকায় সফরের ব্যবস্থা করিতে আমাকে লিখিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করার সর্বশেষ তারিখও আমাকে

জানাইয়া দিলেন। আমাদের আনন্দের অন্ত রহিল না। এ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় নেতাই দক্ষিণ আফ্রিকা—দক্ষিণ আফ্রিকা কেন, ভারতের বাইরে কোথাও সেখানে বসতিস্থাপনকারী ভারতবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য যান নাই। আমরা তাই গোখলের মত মহান নেতার আগমনের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলাম। আমরা ঠিক করিলাম যে, গোখলেকে এমন ভাবে অভ্যর্থনা জানাইব যাহা রাজার ভাগ্যেও জোটে না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান শহরগুলিতে তাঁহাকে লইয়া যাইব বলিয়া স্থির করিলাম। সত্যাগ্রহী ও অন্যান্য ভারতীয়েরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য সানন্দে লাগিয়া গেলেন। সসমারোহ অভ্যর্থনায় গোরাদিগকেও যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করা হইল এবং প্রায় সকল স্থানেই তাঁহারা যোগ দিলেন। যেখানে সম্ভব টাউন হলেই জনসভা করার সিদ্ধান্ত হইল এবং স্থির হইল যে সেখানকার মেয়র যদি সম্মত হন তবে তাঁহাকেই সেই সভার সভাপতি করা হইবে। প্রধান প্রধান রেলস্টেশনগুলিকে আমরা সাজাইবার সিদ্ধান্ত লইলাম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি পাওয়া গেল। সাধারণতঃ এ প্রকার অনুমতি পাওয়া যায় না। অভ্যর্থনা করার জন্য ধুমধামের সহিত যে আয়োজন হইতেছিল, ইহার প্রভাব কর্তৃপক্ষের উপরেও পড়ে এবং তাঁহারা যতটা সম্ভব সহানুভূতি প্রকাশ করেন। প্রবেশ-দ্বার স্বরূপ জোহানস্‌বার্গের রেলওয়ে স্টেশন সাজাইতে আমাদের প্রায় পনের দিন লাগিয়াছিল। সেখানে শ্রীযুক্ত কলেনবেকের নকশা অনুসারে কারুকার্যখচিত এক সুন্দর তোরণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা যে কেমন জায়গা তাহার পূর্বাভাস তিনি বিলাতেই পাইয়াছিলেন। ভারত-সচিব দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে গোখলের উচ্চ মর্যাদা ও সাম্রাজ্যে তাঁহার স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্য স্টীমারের টিকিট করিতে অথবা ভাল একটি কেবিনের ব্যবস্থা করিতে কাহার গরজ পড়িয়াছে? গোখলের স্বাস্থ্য এত দুর্বল ছিল যে যাহাতে তিনি কিঞ্চিৎ নিরালা থাকিতে পারেন তাহার জন্য একটি ভাল ব্যবস্থাযুক্ত কেবিনের প্রয়োজন। স্টীমার কোম্পানী প্রকারান্তরে জবাব দিলেন যে এমন কেবিন নাই। আমার ঠিক মনে নাই যে, ইণ্ডিয়া অফিসে এই খবরটা গোখলে নিজেই দিয়াছিলেন অথবা তাঁহার তরফ হইতে আর কেহ দিয়াছিলেন। স্টীমার কোম্পানীর ডিরেক্টরের নামে ইণ্ডিয়া অফিস হইতে পত্র গেল এবং ইতিপূর্বে সেরকম কেবিন "না থাকিলেও" অতঃপর গোখলের জন্য খুব ভাল এক

কেবিনের ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই প্রাথমিক মন্দ হইতে ভালর জন্ম হইল। স্টীমারের কাপ্তানের নিকটও গোখলেকে স্বাগত জানাইবার উপদেশ গিয়াছিল। সেই জন্য এই সমুদ্রযাত্রাকাল গোখলের শান্তি ও আনন্দে কাটিয়াছিল। তিনি যতটা গম্ভীরস্বভাব ব্যক্তি ততটাই আবার হাসিখুশী ও রসিক ছিলেন। তিনি স্টীমারের খেলা-ধূলা ও আনন্দ উৎসবে যোগ দিতেন এবং এইভাবে স্টীমারের সহযাত্রীদের মধ্যে খুব লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইউনিয়ন সরকার প্রিটোরিয়াতে থাকাকালীন গোখলেকে তাঁহাদের অতিথি হইতে ও সরকারী সেলুন ব্যবহারে সম্মত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমার সহিত পরামর্শ করিয়া এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর গোখলে কেপটাউন বন্দরে নামিলেন। আমি যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম তাঁহার শরীর তাহা অপেক্ষাও খারাপ দেখিলাম। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তাঁহার বহু বিধিনিষেধ ছিল এবং খুব বেশী পরিশ্রম করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহার জন্য যে কার্যক্রম নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার পক্ষে খুব পরিশ্রমসাধ্য হইবে মনে হইল এবং তাই যথাসম্ভব তাহার কাটছাঁট করিলাম। সফর-সূচীর পরিবর্তন সম্ভবপর না হইলে শরীরের দিকে না তাকাইয়াই তিনি মূল কর্মসূচী অনুসারে সমস্ত সফর করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার জন্য কঠিন কার্যক্রম স্থির করার জন্য মনে বড় অনুতাপ হইল। কতকটা পরিবর্তন করিলেও অধিকাংশ যেমন ছিল তেমনই রাখিতে হইল। গোখলের থাকার ব্যবস্থা একেবারে নিরালা করা আবশ্যক বলিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই। তাই পরে তাঁহাকে নিরিবিলি থাকিতে দেওয়া সর্বাপেক্ষা মুশকিলের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বিনয়ের সহিত ও সত্যের খাতিরে আমি ইহাও বলিব যে, আমার রোগীর ও গুরুজনের সেবা করার অভ্যাস ও আগ্রহ ছিল বলিয়া আমার ভুল বুঝিতে পারামাত্র, তাঁহাকে সর্বাধিক পরিমাণ শান্তি দিতে এবং খুব নিরিবিলিতে রাখার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থায় উপযুক্ত পরিবর্তনসাধন করিতে পারিয়াছিলাম। সমস্ত ভ্রমণকালে তাঁহার সচিবের কাজ আমি করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত কলেনবেক সহ যে সকল স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন তাঁহারা সদাজাগ্রত থাকিতেন। সেইজন্য সেবকের অভাবে গোখলের কোনও কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। কেপটাউনে যে খুব জমকালো সভা হইবে—ইহা জানা কথা ছিল। শ্রাইনার পরিবার সম্বন্ধে আমি পূর্বেই লিখিয়াছি। সেই

বিখ্যাত পরিবারের কর্তা সিনেটর ডবলিউ. পি. শ্রাইনারকে উক্ত সভার সভাপতি হওয়ার অনুরোধ করিলাম এবং তিনি অনুগ্রহপূর্বক সম্মত হইলেন। বিরাট সভা হইয়াছিল এবং অনেক ভারতীয় ও গোরারা আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্রাইনার মিষ্টবাক্যে গোখলেকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। গোখলে সংক্ষেপে যে বক্তৃতা দিলেন তাহা জ্ঞানে সমৃদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথচ বিনয়পূর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে ভারতীয়েরা সন্তুষ্ট এবং গোরারা অভিভূত হইলেন। প্রত্যুত দক্ষিণ আফ্রিকায় পদার্পণ করার দিন হইতেই গোখলে সে দেশের নানা প্রকারের লোকের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কেপটাউন হইতে দুই দিন রেলে চলিয়া গোখলের জোহানস্‌বার্গ যাওয়ার কথা। লড়াইয়ের কুরুক্ষেত্র ছিল ট্রান্সভাল। কেপটাউন হইতে ট্রান্সভালে প্রবেশের মুখে সীমান্তের বড় রেলওয়ে স্টেশন ছিল ক্লার্কস্‌ডর্প। যাত্রাপথের এই সব স্থানে অনেক ভারতীয় বাস করিতেন বলিয়া ক্লার্কস্‌ডর্পে ও জোহানস্‌বার্গ এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী আর দুইটি শহরে সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুতরাং ক্লার্কস্‌ডর্প হইতে তাঁহার যাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উভয় স্থানের মেয়রই সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কোন জায়গাতেই দুই এক ঘণ্টার বেশী গাড়িকে দাঁড় করানো হয় নাই। গাড়ি জোহান্‌স্‌বার্গে একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছাইয়াছিল; এক মিনিটও এদিক ওদিক হয় নাই। স্টেশনের উপরে বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী একটি মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল এবং তাহার উপর মূল্যবান গালিচা ইত্যাদি পাতা হইয়াছিল। অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের সহিত জোহানস্‌বার্গের মেয়রও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সেই সোনার শহরে গোখলের অবস্থানকালে তাঁহাকে নিজের মোটরখানা ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন। গোখলেকে স্টেশনেই একটি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। অবশ্য প্রত্যেক স্থলেই তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইত। জোহানস্‌বার্গের অভিনন্দন-পত্রখানি তত্রস্থ খনির সোনায় হৃৎপিণ্ডাকৃতি একটি পাতে খোদাই করিয়া লেখা হইয়াছিল ও উহা রোডেসিয়ার সেগুনকাঠের উপর বসানো হইয়াছিল। সোনার পাতের উপর সিংহল সহ ভারতের একটি মানচিত্র খোদাই করা ছিল। কাঠের আধারের দুই পাশে দুটি সোনার ফলক ছিল যাহার একটিতে তাজমহল ও অন্যটিতে ভারতীয় দৃশ্য খোদাই করা হইয়াছিল। সমগ্র কাঠের আধারটির গাত্রেও সুন্দর সুন্দর ভারতীয় দৃশ্য উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল।

সকলের সহিত পরিচয় করিতে, মূল অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করিতে ও তাহার উত্তর দিতে এবং অন্যান্য মানপত্র পঠিত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশ মিনিটের বেশী সময় লাগে নাই। অভিনন্দন-পত্র এত সংক্ষিপ্ত ছিল যে পড়িতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগে নাই। গোখলের জবাবও পাঁচ মিনিটের বেশী লাগে নাই। স্বেচ্ছাসেবকেরা এমন চমৎকার ভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়াছিলেন যে, প্ল্যাটফর্মে সহজে যত লোক আঁটে তাহা অপেক্ষা বেশী আসে নাই। গণ্ডগোল মোটেই হয় নাই। বাহিরে বহু লোকের ভিড় ছিল। কিন্তু তাহাতে কাহারও স্টেশনে প্রবেশ করা বা বাহির হওয়া আটকায় নাই।

শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে এক টিলার উপরে শ্রীযুক্ত কলেনবেকের একটি সুন্দর বাংলো ছিল। গোখলের বাসের জন্য সেই স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানকার দৃশ্য এত আনন্দদায়ক ও আবহাওয়া এত মনোরম ছিল এবং বাংলোটি অনাড়ম্বর হইলেও এমন শিল্পকলামণ্ডিত ছিল যে, গোখলের তাহা বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। সকলের সহিত দেখা করার জন্য শহরেই একটি অফিস ভাড়া করা হইয়াছিল। উহাতে একটি কামরা কেবল তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য ছিল। একটি কামরা দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য আর একটায় সকলের বসার ব্যবস্থা ছিল। জোহানস্‌বার্গের কয়েকজন নামজাদা গৃহস্থের বাড়িতে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করাইবার জন্য গোখলেকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গদের বক্তব্য গোখলে যাহাতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন সেইজন্য বিশিষ্ট ইউরোপীয়-দের লইয়া পৃথক একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া গোখলের সম্মানার্থে এক বড় ভোজ দেওয়া হয়। উহাতে ৪০০ জন লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ১৫০ জন গোরা ছিলেন। ভারতীয়েরা টিকিট করিয়া আসিবেন এই ব্যবস্থা ছিল। উহার মূল্য এক গিনি করিয়া ধার্য হইয়াছিল। ঐ টিকিটের টাকা দিয়া এই ভোজের খরচ তোলা হইয়াছিল। কেবল নিরামিষ ভোজ্যবস্তু দেওয়া হইয়াছিল ও ইহাতে মদ দেওয়া হয় নাই। রান্না কেবল স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা করানো হইয়াছিল। এখানে সেই ভোজসভায় সম্যক ধারণা দেওয়া মুশকিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের মধ্যে একসঙ্গে বসিয়া খাইতে বাধা নাই। নিরামিষ আহারীরা অবশ্য মাছমাংস খান না। সেদেশে কতকগুলি ভারতীয় খ্রীষ্টান পরিবার ছিলেন, যাঁহাদের সহিত আমি অপর সকলের ন্যায়ই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহারা অধিকাংশই গিরমিটিয়াদের সন্তান এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হোটেলে পরিবেশন করার কাজ করিতেন।

ইঁহাদেরই সাহায্যে এত লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা গিয়াছিল। ভোজে পনের রকমের খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গোরাদের নিকট ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। এতগুলি ভারতীয়ের সহিত একসঙ্গে বসিয়া খাওয়া, নিরামিষ ভোজন, আর ভোজে সম্পূর্ণরূপে মদ্য বর্জন! এই তিনটি জিনিসই অনেকের নিকট নূতন; দুইটি তো সকলের পক্ষেই নূতন।

এই ভোজসভায় গোখলে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার অন্য সকল বক্তৃতা অপেক্ষা দীর্ঘ এবং সর্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণ হইয়াছিল। এই বক্তৃতা তৈয়ারী করার জন্য তিনি আমাদিগের নিকট হইতে সকল কথা খুব ভাল করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁহার সমগ্র জীবনের অভ্যাস হইল স্থানীয় লোকের দৃষ্টিকোণ অগ্রাহ্য না করা এবং তাঁহার ক্ষমতায় যতটা সম্ভব স্থানীয় লোকদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা। সেইজন্য আমার দিক হইতে আমি তাঁহাকে দিয়া এই সভায় কি বলাইতে চাই তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। আমাকে আমার বক্তব্য লিখিতভাবে দিতে হইবে এবং এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে আমার খসড়া হইতে তিনি যদি একটি বাক্য অথবা একটি যুক্তিও গ্রহণ না করেন, তবে যেন আমি ক্ষুব্ধ না হই। আমার লেখা খুব দীর্ঘও হইবে না আবার এমন ছোটও হইবে না যাহাতে কোনও প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ যায়। তিনি অবশ্য আমার ভাষা আদৌ ব্যবহার করেন নাই। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত গোখলে আমার খসড়ার ভাষা গ্রহণ করিবেন ইহা আমি আশাই করিতে পারি না। আমার যুক্তিগুলিও যে তিনি লইয়াছিলেন একথাও বলিতে পারি না। তবে আমার মতামতকে তিনি যে এত গুরুত্ব দিয়াছিলেন তাহাতেই আমি ধরিয়া লইতেছি যে তাঁহার বক্তৃতায় ঐ সকল যুক্তিকে হয়তো তিনি কোন না কোন প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ গোখলের চিন্তাধারা এমন ছিল যে তাহার মধ্যে আর কাহারও ভাবধারার সমাবেশ ঘটিয়াছিল কিনা একথা বলা শক্ত। গোখলের সমস্ত বক্তৃতাই আমি শুনিয়াছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, কোনও বক্তৃতাতেই তিনি এমন একটা কথা বলিয়াছিলেন বা এমন একটা বিশেষণও প্রয়োগ করিয়াছিলেন যাহা না বলিলেই ভাল হইত। তাঁহার উক্তির স্পষ্টতা, দৃঢ়তা ও পরিমার্জিত রূপ তাঁহার অত্যন্ত পরিশ্রম ও সত্যপরায়ণতার ফল।

জোহানস্‌বার্গে কেবল ভারতীয়দেরই এক জনসভা করারও আবশ্যকতা

ছিল। মাতৃভাষা অথবা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পূর্ব হইতেই আমার আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহের জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সহিত আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সেইজন্য আমার আগ্রহ ছিল যে ভারতীয়দের সভায় গোখলেও হিন্দুস্থানীতে বলুন। এই বিষয়ে গোখলের অভিমত আমি জানিতাম। ভুল হিন্দীতে বলা অপেক্ষা তিনি মারাঠী অথবা ইংরাজীতে বলাই পছন্দ করিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় মারাঠীতে বলা তাঁহার নিকট কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইতেছিল। আর তিনি যদি মারাঠীতে বলেনও তবে গুজরাটী ও উত্তর ভারতীয় শ্রোতাদের জন্য পুনরায় উহা হিন্দুস্থানীতে তর্জমা করিতেই হইবে। তাহাই যদি হয় তবে ইংরাজীতে বলিতেই বা দোষ কি? সৌভাগ্যক্রমে আমার বক্তব্যের সপক্ষে এমন একটি যুক্তি ছিল যাহার কারণ তিনি শেষ অবধি মারাঠীতে বলিতে সম্মত হন। অনেক কোঙ্কনী মুসলমান ও কিছু মারাঠী হিন্দু জোহানস্‌বার্গে বাস করিতেন। ইঁহাদের সকলেই মারাঠীতে গোখলের বক্তৃতা শুনিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে মারাঠীতে বলার জন্য গোখলেকে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে তিনি মারাঠীতে বলিলে ঐ সকল বন্ধু খুবই খুশী হইবেন এবং ঐ মারাঠী বক্তৃতার হিন্দী তর্জমা আমি করিব। একথা শুনিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "তোমার হিন্দুস্থানীর জ্ঞানের দৌড় আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এই জ্ঞানের জন্য তোমাকে প্রশংসা করা যায় না। তুমি আবার মারাঠীরও হিন্দুস্থানীতে তর্জমা করিতে চাও? মারাঠীর এমন প্রগাঢ় জ্ঞান তুমি কোথা হইতে পাইলে?" আমি বলিলাম, "আমার হিন্দুস্থানীর জ্ঞান সম্বন্ধে যে কথা খাটে মারাঠীর সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। মারাঠীতে আমি একটি কথাও বলিতে পারি না। কিন্তু যে বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে সেই বিষয়ে আপনি মারাঠীতে বলিবেন। সুতরাং তাহার ভাবার্থ অবশ্যই আমি হিন্দীতে বলিতে পারিব। আপনার বক্তব্যের ভুল অর্থ করিব না ইহা আপনি দেখিয়া লইবেন। মারাঠী ভাল জানেন অন্য এমন লোকও আছেন যাঁহারা আপনার দোভাষীর কাজ করিতে পারেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা হয়ত আপনার পছন্দ হইবে না। সুতরাং দয়া করিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হউন ও মারাঠীতেই বলুন। কোঙ্কনের এই বাসিন্দাদের সহিত আমারও আপনার মারাঠী বক্তৃতা শোনার ইচ্ছা। গোখলে বলিলেন, "সর্বদা তোমার জেদই বজায় থাকিবে। এখানে

যখন তোমার পাল্লায় পড়িয়াছি তখন আর উপায় আছে?" এই বলিয়া গোখলে আমার কথায় সম্মতি দিলেন। ইহার পর হইতে জাঞ্জীবার পর্যন্ত এই জাতীয় প্রত্যেক সভাতেই তিনি মারাঠীতে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং আমি তাঁহার স্বয়ং-নিযুক্ত দোভাষীর কাজ করিয়াছি। ব্যাকরণ-শুদ্ধ ইংরাজীতে বলা অপেক্ষা যথাসম্ভব নিজের মাতৃভাষায় এবং এমন কি ভাঙ্গাচুরা ও ভুল হিন্দীতেও বলা ভাল—এই অভিমত তাঁহাকে দিয়া গ্রহণ করাইতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি ভাল ভাবেই একথা জানি যে কেবল আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় মারাঠীতে বলিয়াছিলেন। কয়েকবার বক্তৃতা দিবার পর আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল দৃষ্টে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যেখানে নীতির প্রশ্ন নাই সেখানে অনুগামীদের ইচ্ছা পূর্ণ করায় যে সুফল লাভ হয় গোখলে ইহা তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার বহু আচরণেই প্রমাণ করিয়াছিলেন।

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়

গোখলের সফর (পূর্বানুবৃত্তি)

জোহানস্‌বার্গ হইতে গোখলে নাতালে গেলেন এবং সেখান হইতে প্রিটোরিয়া। ইউনিয়ন সরকার সেখানে তাঁহাকে ট্রান্সভাল হোটেলে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইস্থানে বোথা ও জেনারেল স্মাট্‌স্ সহ ইউনিয়ন সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত তাঁহার দেখা করার কথা। প্রতিদিনের কার্যক্রম তাঁহাকে সকালবেলায় বলিয়া দেওয়া আমার সাধারণ রীতি ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে পূর্বদিন সন্ধ্যাতেও বলিতাম। মন্ত্রীদিগের সহিত আসন্ন সাক্ষাৎকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা ঠিক করিলাম যে গোখলের সহিত যাইব না এবং এমন কি যাইতেও চাহিব না। আমার উপস্থিতি গোখলে ও মন্ত্রীদিগের মধ্যে কতকটা ব্যবধানের মত দাঁড়াইয়া যাইবে। তাঁহাদের মতে যাহা স্থানীয় ভারতীয়দের এবং এমন কি আমারও ভুল তাহা হয়ত তাঁহারা মন খুলিয়া বলিতে পারিবেন না। তাহা ছাড়া ভবিষ্যৎ নীতির সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছু বলিতে ইচ্ছা হইলেও, আমি থাকিলে হয়তো বলিতে পারিবেন না। এই

সকল কারণের জন্য গোখলের একাই যাওয়া উচিত, যদিও ইহার ফলে তাঁহার দায়িত্বভার খুবই বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু গোখলে যদি আলোচনার সময় নিজের অজ্ঞাতসারে কোন তথ্যগত ভুল করিয়া ফেলেন তাহা হইলে কি হইবে? অথবা মন্ত্রীগণ কর্তৃক যদি এমন কোন তথ্য উপস্থাপিত করা হয় যাহা ইতিপূর্বে তাঁহার গোচর করা হয় নাই তাহা হইলেই বা কি হইবে? কিংবা ভারতীয়দের কোন দায়িত্বশীল নেতার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে যদি ভারতীয়দের সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থা স্বীকার করিতে বলা হয় তখনই বা কি উপায় হইবে? কিন্তু গোখলে অবিলম্বে ইহার সুরাহা করিলেন। আমাকে তিনি প্রথমহইতে এ পর্যন্ত ভারতীয়দের অবস্থার এক সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ তৈয়ারী করিতে বলিলেন। মিটমাটের প্রয়াসে ভারতীয়েরা কতদূর যাইতে প্রস্তুত আছেন তাহাও লিখিয়া দিতে বলিলেন। আলোচনায় যদি উহার বাইরের কোনও বিষয় উঠে, তবে গোখলে স্থির করিলেন যে সে সম্বন্ধে তিনি নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিবেন। অতঃপর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন। এখন রহিল কেবল আমার বিবৃতি প্রস্তুত করা ও গোখলের তাহা পড়িয়া লওয়া। কিন্তু ১৮ বৎসর ধরিয়া চারিটি উপনিবেশের ভারতীয়দের ইতিহাসের ওঠানামা আমি অন্ততঃ দশ-বিশ পৃষ্ঠা না লিখিলে কি করিয়া জানাইব? তবে তাহা পড়িবার সময় গোখলে পাইবেন কিরূপে? আবার বিবৃতি পড়ার পর অনেক বিষয়ে তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে। কিন্তু গোখলের স্মরণশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ ছিল, তাঁহার পরিশ্রম করার ক্ষমতাও তেমনি অসাধারণ ছিল। সারারাত্রি নিজে জাগিলেন এবং আর সকলকেও জাগাইয়া রাখিলেন। প্রতিটি বিষয় বুঝিয়া লইলেন এবং নিজে ঠিক মত বুঝিয়াছেন কিনা তাহা দেখার জন্য আমাদিগকে বলিয়া শুনাইলেন। অবশেষে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। আমার মনে অবশ্য কখনও ভয় ছিল না।

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীরসহিত গোখলের আলোচনা হইল। ফিরিয়া আসিয়াই তিনি বলিলেন, "তোমাকে এক বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সকল ব্যাপারেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। 'কালা কানুন' রদ হইবে। বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন হইতে বর্ণভেদমূলক ধারা উঠিয়া যাইবে। তিন পাউণ্ড কর রদ হইবে।" আমি জবাব দিলাম, "আমার খুবই সন্দেহ আছে। মন্ত্রীমণ্ডলীকে আপনি আমার মত চেনেন না। স্বয়ং আশাবাদী হওয়ায় আপনার আশাবাদ আমি ভালবাসি। কিন্তু অনেকবার নিরাশ হইয়াছি বলিয়া এ বিষয়ে আমি আপনার মত আশা করিতে পারিতেছি না। কিন্তু

আমার ভয়ও নাই। আপনি যে মন্ত্রীদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নিতান্ত আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করা এবং আমাদের সংগ্রাম যে ধর্মযুদ্ধ সে কথা প্রমাণ করাই আমার কর্তব্য। তাঁহারা আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় যে আমাদের দাবি ন্যায়ানুমোদিত এবং শেষ পর্যন্ত যদি যুদ্ধ করিতেই হয় তবে উহাতে আমাদের লড়াইএর শক্তি দ্বিগুণ হইবে। কিন্তু আমার মনে হয় যে আরও বহু ভারতীয় জেলে না গেলে আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে না এবং এক বৎসরে আমার ফেরাও হইবে না।"

গোখলে বলিলেন, "আমি যাহা বলিলাম উহা হইবেই। জেনারেল বোথা আমাকে কথা দিয়াছেন যে, কালা কানুন রদ করা হইবে এবং তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া দেওয়া হইবে। তোমাকে বারো মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরিতে হইবে, আমি তোমার কোনও অজুহাতে কান দিব না।"

নাতাল ভ্রমণের সময় ডারবান, মরিৎসবর্গ প্রভৃতি স্থানে গোখলে বহু শ্বেতাঙ্গের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। তিনি কিম্বারলীর হীরার খনি দেখেন। সেখানে এবং ডারবানেও অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে ভোজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং বহু শ্বেতাঙ্গ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এইভাবে ভারতীয় ও গোরাদের মন হরণ করিয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে রওনা হন। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই আমি ও কলেনবেক তাঁহাকে জাঞ্জীবার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলাম। স্টীমারে তাঁহার উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ভারতে ফিরিবার পথে ডেলা-গোয়া-বে, ইন্‌হামবেন ও জাঞ্জীবার প্রভৃতি বন্দরে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল।

স্টীমারে আমাদের কথার বিষয় ছিল কেবল ভারতবর্ষ, অথবা মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য। গোখলের প্রতিটি কথায় তাঁহার কোমল হৃদয়, সত্যপরায়ণতা ও স্বদেশপ্রীতি ফুটিয়া উঠিত। আমি দেখিয়াছিলাম স্টীমারে গোখলে যেসকল খেলাধূলা করিতেন তাহা কেবল তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য না হইয়া তাহার পিছনে একটা স্বদেশপ্রেমিকতার মনোভাবও ক্রিয়াশীল থাকিত এবং সেখানেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

স্টীমারে মন খুলিয়া কথাবার্তা বলার মত যথেষ্ট অবকাশ হইয়াছিল। এই সকল কথাবার্তার মাধ্যমে গোখলে আমাকে ভারতবর্ষে কার্যের জন্য তৈয়ারী

করিয়া লইলেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেক নেতার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই বিশ্লেষণ এত নিখুঁত ছিল যে, ঐ সকল নেতাদের সহিত পরিচয়ের পরে তাঁহার বিশ্লেষণের সহিত আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোনও তফাৎ দেখিতে পাই নাই।

গোখলের দক্ষিণ আফ্রিকার সফর সম্বন্ধিত আমার বহু পবিত্র স্মৃতিকথা আছে যাহা এখানে বলা যায়। কিন্তু সত্যাগ্রহের ইতিহাসের সহিত তাহার যোগ নাই বলিয়া আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে কলম সংযত করিতে হইতেছে। জাঞ্জীবারে বিদায় লওয়া কলেনবেক ও আমার উভয়ের পক্ষেই খুব দুঃখদায়ক হইয়াছিল। কিন্তু মরণশীল মানুষকে নিকটতম সম্পর্কও একদিন শেষ করিতে হয় ভাবিয়া আমি ও কলেনবেক কোনরকমে মনকে প্রবোধ দিলাম। হৃদয়ে এই আশা পোষণ করিলাম যে, গোখলের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবে ও বৎসরকালের মধ্যে আমরা ভারতবর্ষে ফিরিতে পারিব। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই।

যাহা হোক্, গোখলের দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করিল এবং এই লড়াই পুনরায় সক্রিয়ভাবে আরম্ভ হওয়ার পর গোখলের সফরের তাৎপর্য ও গুরুত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল।

গোখলে যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় না যাইতেন এবং যদি মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হইত তাহা হইলে তিন পাউণ্ড কর রদ করাকেও আমরা লড়াইয়ের অঙ্গীভূত করিতে পারিতাম না।

'কালা কানুন' রদ হইয়াই যদি সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম বন্ধ হইত তাহা হইলে তিন পাউণ্ড কর বাতিল করার জন্য নূতন করিয়া সত্যাগ্রহ করিতে হইত এবং ইহার জন্য শুধু যে ভারতীয়দের অসীম দুঃখ সহ্য করিতে হইত তাহা নহে, এত সত্বর তাঁহারা আবার এক নূতন ও দুরূহ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই কর উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা স্বাধীন ভারতীয়দের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য ছিল। উহা রদ করার জন্য যাবতীয় বৈধানিক পন্থার প্রয়োগ করা সত্ত্বেও কোন কাজ হয় নাই। ১৮৯৫ সাল হইতে কর দিতে হইতেছিল। যত প্রচণ্ড অন্যায়ই হোক্ না কেন, তাহা যদি দীর্ঘদিন ধরিয়া চলে তবে মানুষ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। তখন ইহার প্রতিকার করা যে তাহাদের কর্তব্য তাহা মানুষকে বুঝানো কঠিন হয়। আর ইহা যে যথার্থই অন্যায় তাহা পৃথিবীকে বোঝানও কম কঠিন হয় না। গোখলেকে

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্যাগ্রহীদের কর্তব্য সহজ করিয়া দিয়াছিল। আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারকে কর রদ করিতেই হয়। আর তাহা না করিলে সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ সত্যাগ্রহ জারি রাখার জোরালো কারণ হইয়া পড়ে। কাজেও তাহাই হইয়াছিল। সরকার এক বৎসরের ভিতর কর রদ তো করিলেন না, উপরন্তু এই কর তুলিয়া দেওয়া হইবে না ইহাও স্পষ্ট শুনাইয়া দিলেন।

এইভাবে গোখলের সফরের জন্য কেবল আমরা তিন পাউণ্ড কর সত্যাগ্রহের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পাই নাই, ইহার জন্যই গোখলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যার একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জন্য তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধিত অভিমতের মূল্য বাড়িয়া গেল। এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের কি করা উচিত তাহা তিনি নিজেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং ভারতবাসীকেও বুঝাইবার শক্তি লাভ করিলেন। পরে যখন আন্দোলন আবার তীব্রভাবে আরম্ভ হইল তখন ভারতবর্ষ হইতে সত্যাগ্রহ-ভাণ্ডারে প্রভূত অর্থ দেওয়া হইয়াছিল এবং লর্ড হার্ডিঞ্জও (১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসে) সত্যাগ্রহীর প্রতি "গভীর ও উদগ্র" সহানুভূতি জানাইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ ও শ্রীযুক্ত পিয়ারসন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। গোখলে না আসিলে এ সমস্ত ঘটিত না।

মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

অষ্টাত্রিংশৎ অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবার সময় ভারতীয়রা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতেন যে সত্যাগ্রহ-নীতির বহির্ভূত কোন পদক্ষেপ যেন না করা হয় এবং কোন অবৈধ উপায়ে যেন সরকারকে উত্যক্ত না করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে 'কালা কানুন' যেহেতু কেবল ট্রান্সভালবাসী

ভারতীয়দের উপর প্রযুক্ত ছিল, সেইজন্য কেবল ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়দেরই এ যুদ্ধে যোগ দিতে দেওয়া হইত। নাতাল, কেপকলোনি ইত্যাদি স্থান হইতে কাহাকেও যে কেবল সত্যাগ্রহী-দলে লওয়া হয় নাই তাহা নহে, ট্রান্সভালের বাহির হইতে কেহ সত্যাগ্রহী-দলের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিলে তাঁহাকে ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইত। এই আইন প্রত্যাহারের গণ্ডীর মধ্যেই আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। এই সীমাবদ্ধতার ব্যাপারটি ভারতীয় বা গোরারা কেহই বুঝিতেন না। আন্দোলনের প্রারম্ভিক যুগে প্রায়ই ভারতীয়েরা দাবি করিতেন যে কালা কানুন ছাড়া অন্যান্য অভিযোগও যেন আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধৈর্যের সহিত আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতাম যে, তাহাতে সত্য ভঙ্গ করা হয়। আর যেখানে সত্যের—নিছক সত্যেরই আগ্রহ সেখানে সত্য ভঙ্গ করার কথা কেমন করিয়া চিন্তা করা যায়? শুদ্ধ যুদ্ধে যুদ্ধ চলিতে চলিতে যোদ্ধাদের শক্তি যদি বৃদ্ধিও পায় তবু তাঁহারা যুদ্ধ আরম্ভ করার সময় যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াছিলেন তাহার বাহিরে কদাচ যাইবেন না। পক্ষান্তরে যদি তাঁহাদের শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে তাহা হইলেও লক্ষ্যের কোনও অংশ বর্জন করা যায় না। এই উভয় সিদ্ধান্তের প্রয়োগই দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পূর্ণভাবে করা হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি লড়াইয়ের আরম্ভে সম্প্রদায়ের যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলাম তাহা পরে কমিয়া গিয়াছিল। তাহা হইলেও বাদ-বাকী মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহী যুদ্ধ ছাড়েন নাই। এইভাবে বাধা-বিপত্তির মাঝে এককভাবে যুদ্ধ করিয়া যাওয়া বরঞ্চ সহজ। কিন্তু শক্তির বৃদ্ধি ঘটিলে সত্যাগ্রহের লক্ষ্য সম্প্রসারিত না করা বড়ই কঠিন এবং উহাতে অধিকতর সংযম আবশ্যক। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেকবার এই প্রকারের প্রলোভনের সম্মুখীন হইয়াছি কিন্তু একটিবারও আমরা তাহার নিকট নতিস্বীকার করি নাই, একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি। সেইজন্যই আমি সময় সময় বলিয়া থাকি যে, সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য কেবল একটিই, যাহা হইতে তিনি সরিতেও পারেন না এবং যাহাকে অতিক্রম করিয়া তিনি অগ্রসরও হইতে পারেন না। প্রত্যুত উহার হ্রাস-বৃদ্ধির অবকাশ নাই। মানুষ নিজেকে যে মানদণ্ডে মাপে জগৎও সেই মানদণ্ডেই তাহাকে মাপে। সরকার যখন দেখিলেন যে সত্যাগ্রহীরা এই জাতীয় সূক্ষ্মনীতি অনুসরণের দাবি করিতেছেন, তাঁহারা যদিও কোনও নীতিরই ধার ধারিতেন না, তবুও সত্যাগ্রহীদিগকে তাঁহারা সেই সূক্ষ্ম নীতির

মানদণ্ডে মাপিতে লাগিলেন ও একাধিকবার এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন যে সত্যাগ্রহীরা নিজেদের নীতি ভঙ্গ করিয়াছেন। কালা কানুনের পরও যদি ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নূতন আইন তৈয়ারী করা হয় তবে তাহা যে সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তাহা বালকেও বুঝিতে পারে। তবুও ভারতীয় বসতিস্থাপনকারীদের উপর নূতন বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য বাধ্য হইয়া যখন আমরা তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আমাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিলাম সরকার তখন অন্যায়ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে নূতন বিষয় উত্থাপনের অভিযোগ করিলেন। ভারতীয় নবাগতদের উপর যদি নূতন বিধি-নিষেধ আরোপ করা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে লওয়ার অধিকারও অবশ্যই আমাদের থাকে এবং পাঠক দেখিয়াছেন যে এইজন্যই সোরাবজী প্রভৃতি ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সরকার ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু নিরপেক্ষ লোকদিগকে আমাদের কার্যের ঔচিত্য বুঝাইতে মোটেই কষ্ট হয় নাই। গোখলে চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় এইরূপ এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। গোখলে ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, তিন পাউণ্ড কর এক বৎসরের ভিতর রদ করা হইবে এবং তাঁহার যাওয়ার পরই রদ করার আইন ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার পরিবর্তে জেনারেল স্মাট্‌স্ সেই পার্লামেণ্টে স্বীয় আসন হইতে ঘোষণা করিলেন যে নাতালের গোরারা এই আইন রদ করিতে অসম্মত হওয়ায় সরকার উহা রদ করার আইন করিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ ব্যাপার এরূপ ছিল না। ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে চারটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা থাকেন। তাই একা নাতালের সভ্যদের সেখানে কিছু করা অসম্ভব। তাহা ছাড়া জেনারেল স্মাট্‌সের কর্তব্য ছিল মন্ত্রীমণ্ডলীর তরফ হইতে আইনের খসড়া পার্লামেণ্টে পেশ করা। তাহার পর যাহা হইবার হইত। কিন্তু সেরকম কিছুই জেনারেল স্মাট্‌স্ করেন নাই। ইহা হইতে এই সাংঘাতিক করকে আমরা "যুদ্ধের" কারণ করার শুভ অবসর বিনা চেষ্টায় পাইলাম। ইহার দুইটি কারণ ছিল। একটি হইতেছে এই যে লড়াই চলার সময় সরকার পক্ষ হইতে কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে স্বভাবতই তাহা সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ গোখলের মত একজন ভারতের প্রতিনিধিকে কথা দিয়া না রাখিলে তাহা কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত অপমান নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের অপমান এবং তাই তাহা সহ্য করা যায় না। যদি কেবল প্রথম হেতুই উপস্থিত হইত

এবং সত্যাগ্রহীদের ভিতর যদি শক্তির স্বল্পতা থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা তিন পাউণ্ড কর রদ করার জন্য সত্যাগ্রহ না করিলে তাঁহাদের ক্ষমা করা চলিত। কিন্তু মাতৃভূমির অপমান বরদাস্ত করা অসম্ভব এবং তাই আমাদের মনে হইল যে তিন পাউণ্ড কর রদ করার দাবি নিজ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে সত্যাগ্রহীরা বাধ্য। আর এই দাবি যখন আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হইল তখন গিরমিটিয়া ভারতীয়েরাও সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার অধিকার পাইলেন। পাঠকদের অবশ্যই জানা আছে যে, এ পর্যন্ত ইঁহাদিগকে লড়াইয়ের বাহিরেই রাখা হইয়াছিল। কর্মসূচীর এই নব সংস্করণের ফলে একদিকে যেমন আমাদের দায়িত্বভার বৃদ্ধি পাইল, অন্যদিকে তেমনি আমাদের "সেনাবাহিনী"তে ভর্তি করার একটি নূতন ক্ষেত্র আমরা পাইলাম।

গিরমিটিয়াদের মধ্যে এ পর্যন্তও সত্যাগ্রহের বিশেষ চর্চা ছিল না। সেই জন্য তাঁহাদিগকে ইহাতে যোগদান করার শিক্ষা দেওয়ার কথাও উঠে নাই। তাঁহারা নিরক্ষর বলিয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' বা অন্য কোন পত্রিকা পড়িতে পারিতেন না। তাহা হইলেও আমি দেখিলাম যে, এই দরিদ্র ব্যক্তিরা অভিনিবেশ সহকারে আমাদের সংগ্রামকে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই যুদ্ধে যোগ দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেও তাঁহারা এই আন্দোলনের তাৎপর্য প্রণিধান করিতেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী-মণ্ডলী যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলেন এবং তিন পাউণ্ড কর রদ করার দাবি যখন আমাদের কর্মসূচীর অঙ্গীভূত হইল, তখন তাঁহাদের মধ্যে কে যে যুদ্ধে যোগ দিবেন সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা গোখলেকে লিখিলাম। এই খবর পাইয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। আমি তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত হইতে নিষেধ করিয়া এই আশ্বাস দিলাম যে, আমরা আমৃত্যু যুদ্ধ করিব এবং অনিচ্ছুক ট্রান্সভাল সরকারকে এই কর রদ করাইয়া ছাড়িব। অবশ্য এক বৎসরের মধ্যে আমার ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করিতে হইল। কতদিনে যে ফিরিতে পারিব তাহা আর বলার সামর্থ্য রহিল না। গোখলে অঙ্ক-শাস্ত্রী। আমাদের শান্তি-সৈনিকদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা তিনি আমার নিকট জানিতে চাহিলেন। ইহার সহিত যোদ্ধৃবর্গের নামও দাখিল করিতে বলিলেন। যতদূর মনে পড়ে যে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ ৬৫ কি ৬৬ এবং সর্বনিম্ন ১৬ জন হইবে বলিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। আর এই সামান্যসংখ্যক লোকের জন্য ভারতবর্ষ হইতে

অর্থসাহায্যের অপেক্ষা রাখি না একথাও তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিলাম এবং লিখিলাম যে তিনি যেন তাঁহার শরীরের উপর অহেতুক চাপ না দেন। সংবাদপত্র ও অন্যান্য সূত্রে আমি একথাও জানিয়াছিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বোম্বাই ফিরিবার পরে তাঁহার বিরুদ্ধে দুর্বলতা দেখানো ইত্যাদি অভিযোগ আনা হইয়াছিল। সেই-জন্য আমার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি যেন এখানে টাকা পাঠাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে টাকা তোলার কোনও আয়োজন না করেন। কিন্তু গোখলের কড়া জবাব আসিল, "দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমার দায়িত্ব কি তাহা তুমি যেমন বোঝ, ভারতবর্ষে আমাদেরও কি কর্তব্য আমরা তেমনি তাহা বুঝি। আমাদের কি করা উচিত বা উচিত নহে সে কথা তোমাকে বলিতে দিব না। আমি কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থাই জানিতে চাহিয়াছিলাম, আমাদের কি করা উচিত সে পরামর্শ চাহি নাই।" গোখলের কথার মর্ম আমি বুঝিতে পারিলাম। ইহার পর এ বিষয়ে একটি কথাও বলি নাই অথবা লিখি নাই। সে পত্রেই তিনি আমাকে আশ্বাস দেন ও সতর্কও করিয়া দেন। গোখলের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, প্রতিশ্রুতি যখন ভঙ্গ করা হইয়াছে তখন যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলিবে। তবে এই মুষ্টিমেয় লোক যে কতদিন ইউনিয়ন সরকারের উদ্ধত পশুবলের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা তৈয়ারী হইতে লাগিলাম। আসন্ন যুদ্ধ যে আর ধীরভাবে শুইয়া বসিয়া করা চলিবে না তাহা বুঝিয়াছিলাম। বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে দীর্ঘকালের জন্য আমাদের কারারুদ্ধ হইতে হইবে। টলস্টয় ফার্ম বন্ধ করা স্থির হইল। পরিবারের রোজগারকারী ব্যক্তি কারামুক্ত হওয়ায় কোন কোন পরিবারের লোকেরা বাড়িতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। বাকী যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা বেশীর ভাগই ফিনিক্সের লোক। সেইজন্য ফিনিক্স হইতেই ভবিষ্যতের সত্যাগ্রহীদের যুদ্ধ চলিবে স্থির হইল। ফিনিক্সকে নির্বাচন করার আর একটা হেতুও এই ছিল যে, এখন তিন পাউণ্ড করের বিরুদ্ধে গিরমিটিয়ারা আন্দোলনে নামিলে নাতালে কোন স্থান হইতে তাঁহাদের সহিত সংযোগ রক্ষা করা তাহার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল।

আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করার প্রস্তুতি চলিতেছে এমন সময় এক নূতন অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইল, যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও যুদ্ধে যথাসাধ্য করার সুযোগ উপস্থিত হইল। কয়েকজন সাহসী স্ত্রীলোক ইতিপূর্বেই

যুদ্ধে যোগ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যখন বিনা লাইসেন্সে ফেরি করিয়া সত্যাগ্রহীরা জেলে যাইতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের স্ত্রীরাও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জেলেও যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমরা মহিলাদের বিদেশের জেলে পাঠানো সমীচীন মনে করি নাই। সমরক্ষেত্রের অগ্রবর্তী দলে মহিলাদের পাঠাইবার সম্যক কারণ আছে বলিয়া তখন মনে হয় নাই এবং তাঁহাদের সামনে ঠেলিয়া দিবার সাহসও তখন আমার অন্ততঃ ছিল না। তাহা ছাড়া এই যুক্তিও ছিল যে, কেবলমাত্র পুরুষের উপর প্রযোজ্য আইন রদ করার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে উৎসর্গ করা পুরুষ জাতির পক্ষে অমর্যাদাকর হইবে। কিন্তু এখন এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষভাবে অপমানিত করা হইল এবং তাই স্ত্রীলোকদিগেরও যুদ্ধে যোগ দিতে দিবার ঔচিত্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায়

যে বিবাহ বিবাহই নয়

যেন অদৃশ্য থাকিয়া ঈশ্বরই ভারতীয়দের বিজয়ী করার উপাদান সৃষ্টি করিতেছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় আচরণ আরও স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই এমন একটি ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন যাহা সকলের নিকই অপ্রত্যাশিত ছিল। ভারতবর্ষ হইতে অনেক বিবাহিত লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। অনেকে আবার এখানে আসিয়াও বিবাহ করেন। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বিবাহ রেজিস্ট্রী করার আইন নাই, বিবাহের ধর্মানুষ্ঠানই যথেষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ভারতীয়দের সম্বন্ধে এই প্রথাই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। গত চল্লিশ বৎসর হইতে ভারতবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছিলেন। বস্তুতঃ এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহের সঙ্গতি সম্বন্ধে প্রশ্নও উঠে নাই। কিন্তু এই সময় একটি মোকদ্দমায় কেপ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার্লে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ রায় দিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে খ্রীষ্ট ধর্মানুমোদিত ও রেজিস্ট্রীকৃত বিবাহ ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের বিবাহ আইনতঃ অসিদ্ধ। এই মারাত্মক রায়

কলমের এক আঁচড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ইত্যাদি ধর্মানুসারে অনুষ্ঠিত যাবতীয় বিবাহকে অসিদ্ধ করিয়া দিল। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বহুসংখ্যক পরিণীতা স্ত্রী তাঁহাদের স্বামীর ধর্মপত্নী হওয়ার পরিবর্তে রক্ষিতা বলিয়া গণ্য হইলেন এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিও আর পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ রহিল না। এই অবস্থা নারীদের মত পুরুষদের নিকটও অসহ্য হইয়া উঠিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হইল।

আমার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী আমি সরকারকে লিখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহারা বিচারপতি সার্লের রায়ের সহিত সহমত কিনা এবং উক্ত বিচারপতি আইনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যদি যথার্থ হইয়া থাকে তবে সরকার নূতন আইন করিয়া ভারতে প্রচলিত ধর্মীয় প্রথাসমূহ অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ ভারতের মত আইনসম্মত বলিয়া গণ্য করিবেন কি না? সরকারের তখন আমাদের কোন কথা শোনার মত মেজাজ নয় এবং তাই তাঁহারা আমার প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিলেন না।

বিচাপতি সার্লের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা উচিত কিনা সত্যাগ্রহ এসোসিয়েশন একটি সভায় তাহা আলোচনা করিলেন। সকলে স্থির করিলেন যে এ জাতীয় প্রশ্নে আপীল করা চলে না। যদি আপীল করিতে হয় তবে সরকারই তাহা করিবেন অথবা সরকার চাহিলে ভারতীয়রাও আপীল করিতে পারেন। কিন্তু সে অবস্থায় সরকারকে অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। এই সব শর্ত পূর্ণ করার পূর্বে নিজেরা আপীল করার অর্থ হইবে প্রকারান্তরে ইহা মানিয়া লওয়া যে ভারতীয় বিবাহ অসিদ্ধ। আবার আপীল করার পরও যদি পরাজয় হয়, তবে সত্যাগ্রহই করিতে হইবে। সেইজন্য এই পরিস্থিতিতে এই অকথ্য অপমানের বিরুদ্ধে আপীল না করাই স্থির হইল।

সুতরাং এমন একটা সংকট উপস্থিত হইল যখন আর দিনক্ষণ দেখার অবসর নাই। আমাদের নারীজাতির এই অপমানের পর আর ধৈর্যধারণ করা অসম্ভব। সত্যাগ্রহীর সংখ্যার কথা বিবেচনা না করিয়া আমরা জোরে সত্যাগ্রহ চালানো স্থির করিলাম। এক্ষণে শুধু যে স্ত্রীলোকদিগকে আর লড়াইয়ে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়া যায় না তাহাই নহে, বরঞ্চ আমরা স্ত্রীলোকদিগকে এই লড়াইয়ে পুরুষদের সহিত সমানভাবে যোগ দিতে আমন্ত্রণ

জানানো স্থির করিলাম। যে সকল ভগ্নী টলস্টয় ফার্মে ছিলেন প্রথমে তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ জানানো হইল। দেখিলাম যে তাঁহারা আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য লালায়িতই ছিলেন। এই লড়াইয়ে যোগ দিবার মধ্যে যে সকল বিপদ আছে সে বিষয়ে আমি তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইলাম। খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় ও চলা-ফেরার ব্যাপারে যে পরাধীনতা বরদাস্ত করিতে হইবে তাহাও তাঁহাদের বুঝাইলাম। জেলে কঠিন পরিশ্রম করাইবে, কাপড় কাচাইবে ও এমন কি ওয়ার্ডারেরা অপমান পর্যন্ত করিতে পারে, ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলাম। কিন্তু এই ভগ্নীরা সকলেই সাহসী ছিলেন এবং এসব কিছুতেই ভয় পাইলেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজন গর্ভবতী ছিলেন এবং ছয়জনের কোলে ছেলে ছিল। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য আগ্রহ করিলেন এবং আমার পক্ষে তাঁহাদের পথের বাধা হওয়া সম্ভবপর হইল না। একজন বাদে এই ভগ্নীরা সকলেই ছিলেন তামিল। নিম্নে তাঁহাদের নাম দিতেছি :

১। শ্রীমতী থাম্বী নাইডু ২। শ্রীমতী এন. পিল্লে ৩। শ্রীমতী কে. মুরুগেসা পিল্লে ৪। শ্রীমতী এ. পি. নাইডু ৫। শ্রীমতী পি. কে. নাইডু ৬। শ্রীমতী চিন্নস্বামী পিল্লে ৭। শ্রীমতী এন. এস. পিল্লে ৮। শ্রীমতী আর. এস. মুদলিঙ্গম ৯। শ্রীমতী ভবানী দয়াল ১০। কুমারী মীনাক্ষী পিল্লে ১১। কুমারী বি. এম. পিল্লে।

অপরাধ করিয়া জেলে যাওয়া সোজা কিন্তু নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও গ্রেপ্তার হওয়া কঠিন। অপরাধী গ্রেপ্তার হওয়া এড়াইতে চায়, সেইজন্য পুলিস তাহার পিছনে ধাওয়া করিয়া ধরে। কিন্তু স্বেচ্ছায় যে নির্দোষ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইতে চান তাঁহাকে পুলিস ধরে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া। এই ভগ্নীরা প্রথম চেষ্টায় নিষ্ফল হইলেন। তাঁহারা ভেরীনিগিং সীমান্তে বিনা অনুমতি-পত্রে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইল না। তাঁহারা লাইসেন্স না লইয়া ফেরি করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তবুও পুলিস তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিল। কেমন করিয়া ধরা পড়া যায় ইহা তাঁহাদের নিকট এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কারাগারে যাইতে প্রস্তুত এমন পুরুষের সংখ্যাও বেশী ছিল না, আবার যাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন তাঁহাদের ইচ্ছাও সহজে পূর্ণ হইতেছিল না।

এবার আমরা শেষ উপায়ের শরণ লওয়া স্থির করিলাম। এই উপায়ে আমাদের আশানুরূপ কার্য হইল। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে সঙ্কট-মুহূর্তে

ফিনিক্সের সকল অধিবাসীকেই উৎসর্গ করিতে হইবে। সত্যের দেবতার নিকট ইহাই হইবে আমার সর্বশেষ নৈবেদ্য। ফিনিক্সের অধিকাংশ বাসিন্দা আমার ঘনিষ্ঠ সাথী ও আত্মীয়। আমি স্থির করিলাম যে "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" চালাইতে যে কয়জন লোকের প্রয়োজন ও যাহাদের বয়স ষোল বৎসরের কম কেবল তাহাদিগকেই বাদ দিয়া আর সকলকেই জেলে পাঠাইব। ঐ পরিস্থিতিতে ইহা অপেক্ষা বেশী আর কোনও ত্যাগই আমার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। গোখলেকে যে ষোলজন সাহসী ব্যক্তির কথা লিখিয়াছিলাম তাঁহারা ফিনিক্সে প্রথম বসতি স্থাপনকারীদের অন্যতম। স্থির হইল যে, ইঁহারা ট্রান্সভালের নিষিদ্ধ সীমানায় প্রবেশ করিবেন এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশের জন্য ধৃত হইবেন। আশঙ্কা ছিল যে একথা রাষ্ট্র হইলে হয়ত সরকার ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন না। সেইজন্য দুই-চারিজন মিত্রকে ছাড়া আর কাহাকেও একথা জানানো হয় নাই। সীমানা অতিক্রম করিলে সাধারণতঃ পুলিস নামধাম জিজ্ঞাসা করে, সেস্থলে নামধাম বলা হইবে না বলিয়া ঠিক করা হইল। পরিচয় দিলে তাঁহারা আমার আত্মীয় জানিয়া পুলিস হয়ত তাঁহাদের না ধরিতে পারে। আমলাদিগকে নাম ও পরিচয় না দেওয়াও একটা পৃথক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যে ভগ্নীরা ইতিমধ্যে ট্রান্সভালে ধরা পড়িতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহারাও নাতালে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিবেন স্থির হইল। নাতাল হইতে বিনা অনুমতিতে ট্রান্সভালে প্রবেশ যেমন দণ্ডনীয়, ট্রান্সভাল হইতে নাতালে প্রবেশও সেই রকম দণ্ডনীয় ছিল। এই ভগ্নীরা নাতালে প্রবেশ করা মাত্রই যদি ধৃত হন, তবে ভালই। আর তাহা না হইলে তাঁহারা নাতালের কয়লাখনির কেন্দ্রস্থল নিউক্যাস্‌ল-এ গিয়া সেখানকার গিরমিটিয়া মজুরদিগকে ধর্মঘট করার অনুরোধ করিবেন। এই ভগ্নীদের মাতৃভাষা ছিল তামিল, ইহা ছাড়া তাঁহারা কিছু কিছু হিন্দুস্থানীও জানিতেন। আর মজুরেরা বেশীর ভাগই মাদ্রাজ অঞ্চলের লোক এবং তামিল বা তেলেগু ভাষী ছিলেন। অবশ্য উত্তর ভারতের মজুরও অনেক ছিলেন। এই ভগ্নীদের কথা শুনিয়া মজুরেরা ধর্মঘট করিলে সরকার তাঁহাদিগকে মজুরদের সঙ্গেই গ্রেপ্তার না করিয়া পারিবেন না। ইহাতে সম্ভবতঃ শ্রমিকদের মনে অধিকতর উদ্দীপনার সৃষ্টি হইবে। এইভাবে বূহ রচনার কল্পনা করিয়া ট্রান্সভালস্থ সেই ভগ্নীদিগকে বুঝাইলাম।

অতঃপর আমি ফিনিক্সে গেলাম এবং আমার পরিকল্পনা সম্বন্ধে সকলের

সহিত আলোচনা করিলাম। প্রথমে ফিনিক্সের ভগ্নীদের সহিত পরামর্শ করিলাম। ভগ্নীদিগকে জেলে পাঠানোতে যে গুরুতর বিপদের ঝুঁকি আছে তাহা আমি জানিতাম। ফিনিক্সবাসী অধিকাংশ ভগ্নীই গুজরাটী বলিতেন। ট্রান্সভালবাসিনী ভগ্নীদের ন্যায় তাঁহাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহা ছাড়া ইঁহাদের অনেকেই ছিলেন আমার আত্মীয় এবং হয়ত আমার কথায় লজ্জার খাতিরে ইঁহারা জেলে যাইতে প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু বিচারের সময় যদি তাঁহারা ভয় পান, অথবা জেলে গিয়া কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া যদি ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহা হইলে তাহা যে কেবল আমার পক্ষে অত্যন্ত ব্যথার কারণ হইবে তাহাই নহে, আন্দোলনও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি তো আমার স্ত্রীকে একথা বলিবই না ঠিক করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে কিছু বলিলে তিনি তাহা অস্বীকার করিবেন না জানিতাম। কিন্তু তিনি সম্মতি জানাইলেও সেই সম্মতির মূল্য কতটুকু তাহা জানিতাম না। আমি জানিতাম যে এই রকম বিপদসঙ্কুল বিষয়ে স্বামীর স্ত্রীকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে দেওয়া উচিত এবং তিনি যদি কোন পদক্ষেপই গ্রহণ না করেন তাহা হইলেও স্বামীর ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নহে। অন্যান্য ভগ্নীদের সহিত আমি কথা বলিলাম এবং তাঁহারা অবিলম্বে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও কারাবরণ করার প্রস্তুতির কথা জানাইলেন। তাঁহারা আমাকে কথা দিলেন যে, দুঃখ যতই হোক্ না কেন, জেলের মেয়াদ তাঁহারা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। অন্যান্য মহিলাদের সহিত এই আলোচনার কথা আমার স্ত্রী শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "আমাকে এ খবর না দেওয়ায় আমার দুঃখ হইতেছে। আমার ভিতর এমন কি ত্রুটি দেখিতেছ যে, আমি জেলে যাইতে পারিব না? এই ভগ্নীদিগকে তুমি যে পথে চলিবার আহ্বান জানাইতেছ আমিও সেই পথ লইতে চাই।" আমি বলিলাম, "তুমি জান যে তোমাকে দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। আর তোমাকে আমার অবিশ্বাস করার কথাও ওঠে না। তুমি কারাবরণ করিলে আমি খুবই সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু আমার কথায় তুমি জেলে যাইতেছ তাহা যেন না হয়। এই ধরনের কাজ প্রত্যেককে নিজের শক্তি ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই করিতে হয়। আমি বলিলে আমার কথা রাখিবার জন্য তুমি সহজেই যাইতে চাহিবে। কিন্তু আদালতে দাঁড়াইয়া যদি কাঁপিতে থাক, অথবা যদি কারাজীবনের কঠোরতায় ভীত হইয়া পড় তবে তাহার জন্য তোমাকে কোনও দোষ

না দিলেও আমার অবস্থাটা কি হইবে ভাবিয়া দেখ। তখন তোমাকে কেমন করিয়া আশ্রয় দিব, আর জগতের সম্মুখেই বা দাঁড়াইব কি করিয়া? এই সকল আশঙ্কার জন্যই আমি তোমাকে জেলে যাইতে বলিতে পারি নাই।" তিনি জবাব দিলেন, "আমি যদি জেলের কষ্টে হার মানিয়া পলাইয়া আসি তবে আমাকে ঘরে স্থান দিও না। তুমি যদি কষ্ট সহ্য করিতে পার, আমার ছেলেরা যদি পারে, তাহা হইলে আমিই বা পারিব না কেন? আমি এই লড়াইয়ে যোগ দিবই।" আমি জবাব দিলাম, "তাহা হইলে আমি তোমাকে লড়াইয়ে লইবই। আমার শর্তাবলী তুমি জান, আমার স্বভাবও তুমি জান। ইচ্ছা হইলে ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা কর, আর ভালভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বেচ্ছায় যদি ইহাতে যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত কর তাহা হইলে ফিরিয়া যাইবার অধিকার তোমার আছে। বুঝিয়া লও যে এখনও তোমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার মধ্যে লজ্জার কিছু নাই।"

তিনি আমাকে জবাব দিলেন, "আমার আর ভাবার কিছু নাই, আমার সঙ্কল্প একেবারে স্থির।"

ফিনিক্সের অন্যান্য অধিবাসীদিগকেও আমি স্বাধীনভাবে নিজ কর্তব্য স্থির করিতে বলিলাম। আমি সকলকেই বার বার ও নানা ভাবে বুঝাইলাম যে, একবার যুদ্ধে যোগ দিলে কোনক্রমেই আর পিছু ফেরা নাই—লড়াই অল্প দিনের জন্যই হোক বা দীর্ঘদিনের জন্য, ফিনিক্স থাকে অথবা ধূলিসাৎ হইয়া যাক। জেলে শরীর ভাল থাক অথবা রোগই হোক্—কিছুতেই ফেরা নাই। সকলেই প্রস্তুত হইলেন। ফিনিক্সের বাহিরের একজন মাত্র এই দলে ছিলেন—শ্রীযুত রুস্তমজী জীবনজী ঘোরখোড়ু। তাঁহার নিকট এই সব আলোচনার কথা গোপন রাখা যায় নাই। আদর করিয়া সকলে তাঁহাকে কাকাজী নামে ডাকিতেন। এ জাতীয় ঘটনায় কাকাজী পিছনে পড়িয়া থাকিতে পারেন না। তিনি পূর্বেও জেলে গিয়াছেন এবং পুনরায় যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া "আক্রমণকারী" দল গঠিত হইল:

১। শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী। ২। শ্রীমতী জয়া কুম্বর মণিলাল ডাক্তার। ৩। শ্রীমতী কাশী ছগনলাল গান্ধী। ৪। শ্রীমতী সন্তোক মগনলাল গান্ধী। ৫। শ্রীপার্শী রুস্তমজী জীবনজী ঘোরখোড়ু। ৬। শ্রীছগনলাল খুশহালচন্দ গান্ধী। ৭। শ্রীরাওজীভাই মণিলাল প্যাটেল। ৮। শ্রীমগনভাই হরিভাই প্যাটেল। ৯। শ্রীসোলোমন রায়প্পন। ১০। শ্রীরাজু গোবিন্দু।

১১। শ্রীরামদাস মোহনদাস গান্ধী। ১২। শ্রীশিবপূজন বদ্রী। ১৩। শ্রীগোবিন্দ রাজুলু। ১৪। শ্রীকপ্পুস্বামী মুনলাইট মুদালিয়ার। ১৫। শ্রীগোকুলদাস হংসরাজ। ১৬। শ্রীরেবাশঙ্কর রতনসী সোঢ়া।

অতঃপর কি হইয়াছিল তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে লিখিতেছি।

চত্বারিংশৎ অধ্যায়

স্ত্রীলোকেরা জেলে

এই সব "আক্রমণকারীদের" সীমান্ত পার হইয়া বিনানুমতিতে ট্রান্সভাল প্রবেশের জন্য জেলে যাওয়ার কথা। যে পাঠক তাঁহাদের নামের তালিকা দেখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে পূর্বাহ্ণে যদি ইঁহাদের কাহারও কাহারও নাম প্রকাশিত হইত তাহা হইলে পুলিস সম্ভবতঃ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিত না। আমার সহিত বস্তুতঃ এই রকম হইয়াছিল। দুই-তিনবার আমাকে ধরার পর সীমান্ত পার হওয়ার জন্য পুলিস আমাকে ধরিত না। এই দলের বাহির হওয়ার সংবাদ কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। খবরের কাগজে আর এ সংবাদ কোথা হইতে উঠিবে? তাহা ছাড়া তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে পুলিসকে তাঁহারা পরিচয় না দিয়া বলিবেন যে আদালতে পরিচয় দিবেন।

পুলিস এই ধরনের ব্যাপারের সহিত ওয়াকিবহাল ছিল। ভারতীয়দের গ্রেপ্তার হওয়া আরম্ভ করার পর অনেক সময় নিছক মজা করার জন্যই ভারতীয়রা নিজেদের নাম বলিতেন না। সুতরাং ফিনিক্সের এই দলের আচরণেও পুলিস নূতন কিছু লক্ষ্য করিল না এবং এই দলকে গ্রেপ্তার করিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা চলিল ও সকলেরই তিন তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইল (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর)।

যে ভগ্নীরা ট্রান্সভালে গ্রেপ্তার হওয়ার ব্যাপারে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন তাঁহারা নাতালে প্রবেশ করিলেন। পুলিস কিন্তু বিনানুমতিতে নাতালে প্রবেশের জন্য তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল না।

সুতরাং তাঁহারা নিউকাস্‌লে রওনা হইলেন এবং সেখানে উপনীত হইয়া

পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের প্রভাব দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। তিন পাউণ্ড করের বোঝায় যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার বর্ণনা অবিলম্বে মজুরদের হৃদয় স্পর্শ করিল এবং তাঁহারা ধর্মঘট শুরু করিলেন। আমি তারযোগে এই সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে হতবুদ্ধিও হইলাম। এখন কি করা যায়? এই অদ্ভুত জাগৃতির জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এই কার্য সামলাইবার মত টাকা বা লোক আমার হাতে ছিল না। তবে আমার কর্তব্য আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। আমার নিউকাস্‌লে পৌঁছানো উচিত ও সেখানে গিয়া যাহা করার করা উচিত। আমি অবিলম্বে সেখানকার উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম।

ট্রান্সভালের এই সাহসী ভগ্নীদিগকে সরকার এখন আর মুক্ত রাখিয়া তাঁহাদের কাজ করিতে দিতে পারেন না। তাঁহাদিগকেও একই মেয়াদ—তিন মাসের জন্য সাজা দেওয়া হইল এবং ফিনিক্সের দল যে জেলে ছিলেন তাঁহারাও সেখানে প্রেরিত হইলেন (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর)।

এই সকল ঘটনায় কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দেরই নহে, মূল মাতৃভূমির ভারতীয়দেরও হৃদয় গভীর ভাবে আলোড়িত হইল। স্যার ফিরোজ শা মেটা এযাবৎ উদাসীন ছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় না যাওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত সাগরপারের ভারতীয় বাসিন্দাদের জন্য কিছু করা সম্ভব নহে। এবং প্রথম দিকে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন তাঁহার মনে বিশেষ দাগ কাটিতে পারে নাই। কিন্তু এই স্ত্রীলোক-দিগের জেল হওয়ার ঘটনা যেন তাঁহার উপর যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য করিল। তিনি নিজেই বোম্বাই-এর টাউন হলে তাঁহার বক্তৃতায় জানাইলেন যে, সাধারণ অপরাধীদের সহিত এই মহিলারা একসঙ্গে গাদাগাদি করিয়া রহিয়াছেন—একথা ভাবিতেই তাঁহার রক্ত টগবগ করিতেছে এবং তাই ভারতবর্ষ এখন আর এ ব্যাপারে নিরুদ্বেগে বসিয়া থাকিতে পারে না।

এই মহিলাদের বীরত্বও ছিল বর্ণনাতীত। সকলকেই মরিৎসবার্গের জেলে রাখা হয় এবং সেখানে তাঁহাদিগকে খুব কষ্ট দেওয়া হয়। তাঁহাদের খোরাক ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং তাঁহাদিগকে ধোপার কাজ দেওয়া হইয়াছিল। বাহিরের কোনও খাদ্য দেওয়া প্রায় খালাস হওয়ার সময় পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। এক ভগ্নীর বিশেষ ধরনের খাদ্য লওয়ার ব্রত ছিল। অনেক কষ্টের পর জেল

কর্তৃপক্ষ তাঁহার জন্য সেই জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু ভোজ্যোপকরণ এত খারাপ দিতেন যে, তাহা মানুষের খাওয়ার অনুপযুক্ত। ভগ্নীটির জলপাইয়ের তেলের খুবই আবশ্যকতা হইত। প্রথমে তো তাহা পান-ই নাই, পরে যাহা পাওয়া গেল তাহাও পুরানো ও খারাপ। তিনি নিজের পয়সায় ইহা কিনিয়া আনিতে দেওয়ার অনুরোধ করিলে জবাব পাইলেন, "জেল হোটেল নয় এবং তাই যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহাই খাইতে হইবে।" এই ভগ্নী যখন জেল হইতে বাহির হইলেন, তখন একেবারে অস্থিচর্মসার। অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে বাঁচানো গিয়াছিল।

আর একজন মহিলা মারাত্মক জ্বর লইয়া জেল হইতে বাহির হইলেন। জেল হইতে খালাস হওয়ার কয়েকদিন পরে (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কথা কি করিয়া ভুলিব! ভালিয়াম্মার বাড়ি জোহানসবার্গে এবং তাহার বয়স ছিল মাত্র ষোল বৎসর। যখন আমি তাহার কাছে গেলাম তখন সে শয্যাশায়ী। তাহার গড়ন ছিল লম্বা, তাই তাহার কঙ্কালসার দেহ দেখিলে ভয় হইত।

"ভালিয়াম্মা, জেলে যাওয়ার জন্য তোমার অনুতপ্ত বোধ হইতেছে না?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"অনুতাপ কেন হইবে? আবার যদি আমাকে ধরে তবে এখনও আমি জেলে যাইতে প্রস্তুত।"

"কিন্তু ইহাতেই যদি তোমার মৃত্যু হয়?"

"হয় ত হোক, দেশের জন্য মরিতে কার না ভাল লাগে।" ভালিয়াম্মার নিকট হইতে এই উত্তর পাওয়া গেল।

এই কথাবার্তার কিছুদিন পরেই ভালিয়াম্মার মৃত্যু হইল। তাহার দেহের বিনাশ হইয়াছে, কিন্তু এই বালিকা নিজেকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ভালিয়াম্মার মৃত্যুর পর নানা জায়গায় শোকসভা হয় এবং ভারতের এই কন্যার চরম আত্মোৎসর্গের স্মৃতিরক্ষার্থ ভারতীয়েরা 'ভালিয়াম্মা হল' নির্মাণের সঙ্কল্প করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সঙ্কল্প আজও বাস্তবে পরিণত হয় নাই। এ ব্যাপারে অনেক বিঘ্ন ঘটে। সম্প্রদায়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিবাদ উপস্থিত হয়, প্রধান কর্মকর্তারা একে একে পরলোকগমন করেন। সে যাহা হোক, পাথর আর চুন দিয়া হল তৈরী না হইলেও ভালিয়াম্মার সেবার বিনাশ নাই। নিজের হাতে ভালিয়াম্মা তাহার সেবার দেউল গড়িয়া গিয়াছে, তাহার মহান

মূর্তি অনেকের হৃদয়ে আজও বিরাজ করিতেছে। যতদিন ভারতবর্ষের নাম থাকিবে, ততদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাসের সহিত ভাল্লিয়াম্মার নাম বাঁচিয়া থাকিবে।

এই সব ভগ্নীদের আত্মত্যাগ নিতান্ত বিশুদ্ধ ছিল। ইঁহারা আইনের কথা কিছুই বুঝিতেন না। আইনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁহারা অজ্ঞ ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই স্বদেশ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না—তাঁহাদের দেশপ্রেম কেবল শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরক্ষর ছিলেন এবং তাই সংবাদপত্র পড়িতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে ভারতীয়দের সম্মানের প্রতি মারাত্মক আঘাত করা হইতেছে এবং তাঁহাদের জেলে যাওয়া এক বেদনার্ত হৃদয়ের ক্রন্দন ও অন্তরের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত প্রার্থনা। প্রকৃত ইহা শুদ্ধতম আত্মবলিদান। এই প্রকার আন্তরিক প্রার্থনা প্রভু সর্বদা শুনিয়া থাকেন। যজ্ঞের শুদ্ধতা যতটা ততটাই তাহার সফলতা। প্রভু ভক্তের ভক্তির পিয়াসী। ভক্তিপূর্বক অর্থাৎ নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে দেওয়া ফল, ফুল বা জল ঈশ্বর সানন্দে গ্রহণ করেন ও তাহার শতগুণ প্রতিদান দিয়া থাকেন। সরল সুদামের এক মুষ্টি তণ্ডুল ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছিলেন ও নিজের বহু বৎসরের অনটন ও ক্ষুধার উপশম ঘটাইয়াছিলেন। অনেকের জেলে যাওয়া ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু একজন মাত্র শুদ্ধআত্মার ভক্তির সহিত প্রদত্ত অর্ঘ্য কদাচ বিফল হইতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় কাহার আত্মোৎসর্গ ঈশ্বর কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল ও কাহার ত্যাগের জন্য তিনি ফল দান করিয়াছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু এটুকু আমরা অবশ্যই জানি যে, ভাল্লিয়াম্মার আত্মোৎসর্গের ফল অবশ্যই ফলিয়াছিল এবং অনুরূপ ভাবে অন্যান্য ভগ্নীদের আত্মবলিদানের ফলও অবশ্যই ফলিয়াছিল।

স্বদেশ এবং মানবতার সেবার জন্য অতীতে অসংখ্য ব্যক্তি প্রাণ বলি দিয়াছেন, বর্তমানে দিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও দিবেন। ইহাই স্বাভাবিক। কারণ কে যে শুদ্ধ তাহা কেহই জানেন না। কিন্তু সত্যাগ্রহীর ভালভাবে একথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তাঁহাদের মধ্যে যদি একজনও এমন থাকেন যিনি স্ফটিকের ন্যায় শুদ্ধ, তবে তাঁহার আত্মোৎসর্গ লক্ষ্যপূর্তির পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবী সত্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে। অসত্যের অর্থ মিথ্যা এবং যাহা অসৎ বা অস্তিত্ববিহীন তাহাও বটে। সত্যের অর্থ সৎ অর্থাৎ যাহা

আছে। অসত্যের যখন অস্তিত্বই নাই তখন ইহার সফলতার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আর সত্যের অর্থ যখন সৎ বা যাহার অস্তিত্ব আছে, তখন কখনও তাহার বিনাশ নাই। ইহাই সংক্ষেপে সত্যাগ্রহের শাস্ত্র।

একচত্বারিংশৎ অধ্যায়

মজুরের স্রোত

মহিলাদের কারাবরণ নিউকাস্‌লের নিকটবর্তী খনির শ্রমিকদের উপর যাদুমন্ত্রের মত কাজ করিল। তাঁহারা তাঁহাদের হাতিয়ারপত্র রাখিয়া দলে দলে শহরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। আমি সংবাদ পাওয়া মাত্র ফিনিক্স হইতে নিউকাস্‌লে আসিলাম।

এই সকল মজুরদের নিজেদের কোনও বাড়ীঘর ছিল না। খনির মালিকেরাই তাঁহাদের ঘর করিয়া দেন, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করেন এবং পানীয় জল যোগান। ইহার ফলে মজুরেরা সকল রকমেই একান্ত পরাধীন হইয়া পড়েন। তাঁহাদের অবস্থা তুলসীদাস যেমন বলিয়াছেন :

"পরাধীন স্বপনে সুখ নাহি"

ধর্মঘটীরা আমার কাছে অনেক অভিযোগ লইয়া আসিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন যে মালিক রাস্তার বাতি অথবা জল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কেহ বা বলিলেন ধর্মঘটীদের জিনিসপত্র ঘর হইতে টানিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সৈয়দ ইব্রাহিম নামে একজন পাঠান আসিয়া তাঁহার পিঠ দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, "এই দেখুন আমাকে কেমন করিয়া মারিয়াছে। আপনার জন্য আমি সেই বদমাশদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি। আপনার যে সেই রকম হুকুম। আমি পাঠান। আর পাঠানেরা কখনও মার খায় না, মার দেয়।"

আমি জবাব দিলাম, "ভাই, আপনি খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন। এই জাতীয় আচরণকেই আমি খাঁটি বাহাদুরি বলি। আপনার মত লোকদের জন্যই আমরা জয়লাভ করিব।"

আমি তাঁহাকে তো অভিনন্দন জানাইলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম যে, অনেকের উপর যদি এইপ্রকার মারপিট হইতে থাকে তবে হরতাল চলিবে

না। এক মারধোরের কথা ছাড়িয়া দিলে যাঁহারা হরতাল করিতেছেন তাঁহাদের বাতি-জল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা খনির কর্তৃপক্ষ যদি বন্ধ করিয়া দেন তবে অভিযোগ করার কিছু নাই। তবে অভিযোগের হেতু থাকুক বা না-ই থাকুক, এই অবস্থায় ধর্মঘটীরা থাকিতে পারিবেন না এবং এই অসুবিধা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন একটা উপায় আমায় করিতেই হইবে। নচেৎ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া অবশেষে অপারগ হইয়া কাষে যোগদান করা অপেক্ষা এখনই হার স্বীকার করিয়া কাজে ফিরিয়া যাওয়া ভাল। তবে হার মানার পরামর্শ দেওয়া আমার স্বভাবে নাই। আমি তাই তাঁহাদের বলিলাম যে তাঁহাদের সম্মুখে একমাত্র পন্থা হইতেছে মালিকের বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া তীর্থযাত্রীর মত পথে বাহির হইয়া পড়া।

মজুর বিশ-পঁচিশজন ছিল না। শত শত লোক হরতাল করিয়াছিল, এ সংখ্যা সহজেই হাজারে হাজারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই ক্রমবর্ধমান জনসম্প্রদায়ের জন্য নিবাস ও খাদ্যের কি ব্যবস্থা হইবে? ভারতবর্ষের কাছে টাকার জন্য আবেদন জানাইব না। তখনও আমাদের মাতৃভূমি হইতে অর্থ-বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই। ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও ভয় পাইয়াছিলেন এবং আমাকে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। খনির মালিক ও অন্যান্য গোরাদের সহিত তাঁহাদের ব্যবসা ছিল। পূর্বে নিউকাস্‌ল্‌ গেলেই আমি তাঁহাদের বাড়িতে উঠিতাম। কিন্তু এবার তাঁহাদের বাড়িতে উঠিলে বিব্রত করা হইবে বলিয়া অন্যত্র উঠা স্থির করিলাম।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ট্রান্সভালের ভাইদের অধিকাংশই ছিলেন তামিল দেশীয়। নিউকাস্‌লে তাঁহারা শ্রীযুক্ত ডি. লাজারাস নামক জনৈক মধ্যবিত্ত খ্রীষ্টান তামিল ভদ্রলোকের বাড়িতে উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের ছোট একটু জমি ছিল এবং তাহার উপর একখানা দুই বা তিন কামরাযুক্ত ঘর ছিল। আমিও এই পরিবারের সহিত থাকা স্থির করিলাম এবং তাঁহারাও সাগ্রহে আমাকে গ্রহণ করিলেন। গরীবের আবার ভয়টা কি? আমার গৃহকর্তা গিরমিটিয়ার সন্তান এবং সেইজন্য তাঁহাদের ও তাঁহাদের আত্মীয়-পরিজনদের তিন পাউণ্ড কর দিতে হইত। স্বভাবতই গিরমিটিয়াদের দুঃখের সহিত ইঁহারা পরিচিত হওয়ার কারণ তাঁহাদের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। আমাকে আশ্রয় দেওয়া আমার বন্ধুদের পক্ষে কোনও দিনই সহজ কথা ছিল না, কিন্তু এখন আমাকে আতিথ্য দেওয়ার মানে আর্থিক ক্ষতি এবং

এমন কি হয়ত জেলে যাওয়াকে আমন্ত্রণ জানানো। ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অল্প লোকেই এই অবস্থায় পড়িতে চাহিবেন। আমি তাঁহাদের এবং আমার নিজেরও সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করিলাম ও তাই তাঁহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট দূরে রহিলাম। লাজারাস বেচারার কিছু বেতন যদি মারা যায় তো যাক্। প্রয়োজনে তিনি জেলে যাইতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও দরিদ্র গিরমিটিয়াদের উপর যে অন্যায়-অবিচারের বোঝা চাপানো হইয়াছে তাহা কি করিয়া সহ্য করিবেন? লাজারাস দেখিয়াছেন যে তাঁহার অতিথি হইয়া ট্রান্সভালের যে ভগ্নীরা ছিলেন গিরমিটিয়াদিগকে সাহায্য করায় তাঁহাদিগকে জেলে যাইতে হইয়াছে। তিনি অনুভব করিলেন যে, মজুরদের প্রতি তাঁহারও একটা কর্তব্য আছে এবং তাই তিনি আমাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি কেবল আমাকে আশ্রয়ই দিলেন না, নিজের সর্বস্বই এই আদর্শে উৎসর্গ করিলেন। আমার সেখানে থাকার ফলে তাঁহার বাড়িটা ধর্মশালা হইয়া গেল। সব রকমের ও অবস্থার লোক যখন ইচ্ছা তখন আসা-যাওয়া করিতেছেন। তাঁহার বাড়ির চারিদিকে যেন জনসমুদ্রের জোয়ার দেখা দিল। তাঁহার ঘরে দিনরাত রান্না চলিতে লাগিল। তাঁহার ধর্মপত্নী এই সব কাজে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার ও স্বামীর মুখে অনির্বাণ সূর্যশিখার মত হাসি লাগিয়াই থাকিত।

কিন্তু শত শত মজুরকে খাওয়ানো লাজারাসের পক্ষে সম্ভব নয়। মজুরদিগকে আমি বলিয়া দিয়াছিলাম যে, এই হরতাল স্থায়ী হইবে মনে করিয়া তাঁহারা যেন মালিকদের বাড়ীঘর ছাড়িয়া দেন। কিছু জিনিস বেচা সম্ভব হইলে বেচিয়া ফেলুন। বাকী সব নিজের নিজের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া আসিবেন। মালিকেরা উহাতে হাত দিবেন না, কিন্তু আরও প্রতিশোধ লওয়ার জন্য যদি উহা রাস্তায় ফেলিয়া দেন তবে সে লোকসানের ঝুঁকিও লইতে হইবে। আমার কাছে আসিবার সময় পরনের কাপড় ও গায়ে দেওয়ার কম্বল ছাড়া আর কিছুই আনিবেন না। যতদিন হরতাল চলে, অথবা তাঁহারা জেলের বাহিরে থাকেন ততদিন আমি তাঁহাদের সঙ্গে থাকার ও খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম। একমাত্র এই শর্তে যদি তাঁহারা বাহির হইয়া আসিতে পারেন, তবেই তাঁহারা ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে পারিবেন ও জয়লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপ করার সাহস যাঁহাদের নাই তাঁহারা যেন নিজেদের কাজে ফিরিয়া যান। এইভাবে যাঁহারা ফিরিয়া যাইবেন তাঁহাদের কেহ তিরস্কার অথবা বিরক্ত করিতে

পারিবেন না। আমার এই শর্তাবলীতে কোন শ্রমিক আপত্তি করেন নাই। যেদিন এই কথা আমি প্রথম ঘোষণা করিলাম সেইদিন হইতে অবিরত ধারায় "গৃহী হইতে অনিকেত" এই সব তীর্থযাত্রীদের প্রবাহ আসিতে লাগিল। সঙ্গে তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যা এবং মাথায় কাপড়ের পোঁটলা।

ইঁহাদের আশ্রয়ের জন্য কোন ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করার সঙ্গতি আমার ছিল না। আকাশই ছিল তাঁহাদের মাথার উপর একমাত্র আচ্ছাদন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় আবহাওয়া অনুকূল ছিল—বর্ষা বা শীত ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, ব্যবসায়ীরা আমাদিগকে খাওয়াইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। নিউকাস্‌লের ব্যবসায়ীরা রান্না করার বাসন ও চাল-ডালের বস্তা পাঠাইয়া দিলেন। অন্যান্য স্থান হইতেও চাল, ডাল, তরিতরকারী, আচার ও অন্যান্য জিনিসের স্রোত আমাদের কাছে আসিতে লাগিল। আমার অনুমান অপেক্ষা অনেক বেশী জিনিসপত্র আসিতে লাগিল। সকলেই জেলে যাইতে প্রস্তুত না থাকিলেও আমাদের আদর্শের প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল। সকলেই যথাশক্তি আন্দোলনে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাঁহার কিছু দেওয়ার সঙ্গতি ছিল না, তিনি স্বেচ্ছাসেবকরূপে সেবা দিতে লাগিলেন। এই অজ্ঞান অশিক্ষিত লোকদিগকে দেখাশুনা করার জন্য খ্যাতিবান, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান স্বেচ্ছাসেবকের আবশ্যকতা ছিল। তাহাও পাওয়া গেল। তাঁহারা অশেষ সাহায্য করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গ্রেপ্তারও হইয়াছিলেন। এইভাবে সকলে যথাশক্তি সাহায্য করিলেন ও আমাদের পথ সুগম হইল।

বহু লোক একত্রিত হইল ও এই জনসমাবেশ ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। এতগুলি লোককে বিনা কাজে একস্থানে রাখাঅসাধ্যনাহইলেওবড়কঠিনকাজ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাফাই-এর রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁহারা সাধারণতঃ অজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের ভিতর কেহ কেহ খুন চুরি অথবা ব্যভিচারের অপরাধে জেল খাটিয়া আসিয়াছেন। তবে ধর্মঘটীদের নীতিপরায়ণতার বিচার করার ক্ষমতা আমার আছে বলিয়া আমি মনে করি নাই। শাক বাছার কাজ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে মূর্খতার পরিচায়ক হইত। আমার কাজ ছিল কেবল হরতাল চালানো। ইহার সহিত অপর কোন সংস্কার সাধন কার্যকে মেশানো চলে না। অবশ্য এই সমাবেশে থাকাকালীন নৈতিক বিধানাবলী পালন হইতেছে কিনা দেখার ভার আমার; কিন্তু অতীতকালে কে কি করিয়াছিলেন তাহার অনুসন্ধান করা আমার কাজ ছিল না। আর যদি কোথাও বেকারদের এই

ধরনের শিবচতুর্দশীর মেলা বসিয়া যায়, তবে কিছু না কিছু অপরাধমূলক কার্যকলাপ না হইয়া যায় না। তবে আশ্চর্যের কথা এই যে, যে কয়দিন ইহাদিগকে লইয়া এইভাবে কাটাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে কোন রকম দুর্ঘটনা হয় নাই। অবস্থার গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এইভাবে সকলে শান্ত সমাহিত ছিলেন।

আমার সমস্যার সমাধানের একটি উপায় চিন্তা করিলাম। ফিনিক্সের দলের মত এই "সেনাবাহিনী"কে ট্রান্সভালে প্রবেশ করাইয়া নিরাপদে জেলে স্থান করিয়া দিব। এই বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে সীমান্ত পার হইতে হইবে। কিন্তু আমি পরে এই মত ত্যাগ করি। কেন না এইভাবে বারে বারে লোক পাঠাইতে অনেক সময় লাগিত। তাহা ছাড়া ছোট ছোট দল দফায় দফায় জেলে গেলে গণ-আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণাম সৃষ্টি হইবে না।

এই "সৈন্যবাহিনী"র সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হইয়া উঠিয়াছিল। এত লোকের ট্রেন-ভাড়া দিবার টাকা আমার ছিল না। এবং তাই তাঁহাদের সকলকে রেলযোগে লইয়া যাইবার উপায় ছিল না। আর তাহা ছাড়া তাঁহাদের রেলে করিয়া লইয়া গেলে তাঁহাদের মনোবলেরও পরীক্ষা হইবে না। নিউকাস্‌ল হইতে ট্রান্সভালের সীমান্ত ৩৬ মাইল দূরে। নাতাল ও ট্রান্সভালের সীমান্ত গ্রাম যথাক্রমে চার্লস্‌টাউন ও ভোকস্রাস্ট। শেষ পর্যন্ত আমরা হাঁটিয়াই যাইব স্থির করিলাম। শ্রমিকদের সহিত আমি পরামর্শ করিলাম। তাঁহাদের সহিত স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে ছিল এবং তাই তাঁহাদের কেহ কেহ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে দ্বিধা করিলেন। হৃদয় কঠিন করা ছাড়া আমার আর কোনও গত্যন্তর ছিল না এবং তাই ঘোষণা করিলাম যে যাঁহারা ইচ্ছুক খনিতে ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু কেহই ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন না। যাঁহারা শারীরিক কারণে অশক্ত তাঁহাদিগকে আমরা রেলগাড়ীতে পাঠাইব স্থির করিলাম। শরীরের দিক হইতে সমর্থ বাকী সকলে পায়ে হাঁটিয়া চার্লস্‌টাউন যাইতে তাঁহাদের প্রস্তুতির কথা জানাইলেন। এই পথ দুই দিনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হইল। অবশেষে যে আমরা যাইতেছি ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রমিকেরা উপলব্ধি করিলেন যে অতঃপর বেচারা লাজারাস ও তাঁহার পরিবার কিছুটা স্বস্তি পাইবেন। নিউকাস্‌লের গোরারা প্লেগের ভয় করিতেছিলেন এবং ইহার প্রতিষেধক হিসাবে তাঁহারা নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করার

কথা চিন্তা করিতেছিলেন। নিউকাস্‌ল হইতে যাত্রা করাতে আমরা তাঁহাদের মানসিক শান্তি ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করিলাম এবং প্লেগের আশঙ্কায় তাঁহারা যে সকল সম্ভাব্য বিরক্তিকর বিধিনিষেধ আমাদের উপর আরোপ করিতেন তাহার হাত হইতেও মুক্তি পাইলাম।

যাত্রা করার প্রস্তুতিপর্ব যখন চলিতেছে তখন খনির মালিকদিগের সহিত দেখা করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাইলাম। ইহার জন্য আমি ডারবান গেলাম। এই আলোচনা ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে নূতন অধ্যায়ে বলা হইবে।

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়

আলোচনা ও তাহার পর

খনির মালিকদের আমন্ত্রণ অনুযায়ী তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আমি ডারবান গেলাম। আমি বুঝিলাম যে, মালিকদের উপর হরতালের কিছু প্রভাব হইয়াছে। তবে এই আলোচনায় যে খুব একটা ফল হইবে সে আশা আমার ছিল না। কিন্তু সত্যাগ্রহীর নম্রতার কোন সীমা নাই। মিটমাটের কোনও অবসরই তিনি ত্যাগ করেন না। সেজন্য যদি কেহ তাঁহাকে ভীরু মনে করেন তবে তাহাতে তাঁহার কিছু যায় আসে না। যাঁহার নিজের উপর বিশ্বাস আছে ও সেই আত্মবিশ্বাসসঞ্জাত শক্তি আছে, অপরে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তিনি একান্তভাবে নিজের আভ্যন্তরীণ বলের উপর নির্ভর করেন। তিনি তাই সকলের সহিত সৌজন্যতা-পূর্ণ আচরণ করেন এবং এইভাবে বিশ্ব জনমতকে নিজের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেন।

সুতরাং মালিকদের এই নিমন্ত্রণ আমার কাছে ভাল লাগিয়াছিল। তবে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করার সময় লক্ষ্য করিলাম যে তাঁহাদের ভিতর সময়োচিত উত্তাপ ও উত্তেজনা রহিয়াছে। আমার নিকট হইতে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা শুনিতে না চাহিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি আমাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও তাঁহাকে যথাযোগ্য উত্তর দিলাম।

তাঁহাকে আমি বলিলাম, "এই হরতাল বন্ধ করা কি আপনাদের হাতে?"

উত্তর পাইলাম, "আমরা তো সরকারের কর্মচারী নই।"

আমি বলিলাম, "সরকারী কর্মচারী না হইলেও আপনারা অনেক কিছু করিতে পারেন। আপনারা শ্রমিকদের হইয়া লড়িতে পারেন। সরকারকে আপনারা যদি তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া দিতে বলেন, তবে সরকার তাহা রদ করিতে আপত্তি করিবেন বলিয়া আমি মনে করি না। এ ব্যাপারে আপনারা ইউরোপীয় জনমত গঠন করিতেও পারেন।"

"কিন্তু তিন পাউণ্ড করের সহিত এই হরতালের কি সম্বন্ধ? শ্রমিকদের যদি মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে তবে তাহার প্রতিকারের জন্য যথারীতি তাঁহাদের কাছে যাইতে পারেন।"

"মজুরদের কাছে হরতাল ছাড়া অপর কোন অস্ত্র আছে বলিয়া আমি দেখি না। তিন পাউণ্ড করও মালিকদের স্বার্থে বসানো হইয়াছে। মালিকেরা মজুরদের খাটাইয়া লইতে চান, কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করুন তাহা চান না। তিন পাউণ্ড কর প্রত্যাহারের দাবিতে শ্রমিকেরা যদি ধর্মঘট করেন তাহা হইলে মালিকদের প্রতি তাঁহারা অন্যায় বা অবিচার করিতেছেন বলিয়া আমি মনে করি না।"

"তাহাহইলে আপনি মজুরদিগকে কাজে যোগদান করার পরামর্শ দিবেন না?"

"আমি দুঃখিত, ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"ইহার পরিণাম কি তাহা জানেন তো?"

"জানি। আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।"

"সে কথা ঠিক। আপনার কোন ক্ষতিই হইবে না। কিন্তু ভ্রান্তপথে চালিত এই শ্রমিকদের যে ক্ষতি হইবে আপনি তাহার খেসারত দিবেন কি?"

"যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করিয়া এবং লোকসান হইবে ইহা ভালভাবে জানিয়া শুনিয়াই শ্রমিকরা এই হরতাল আরম্ভ করিয়াছেন। আত্মসম্মান হারানো অপেক্ষা অধিক লোকসান মানুষের আর কি হইতে পারে তাহা আমি ধারণা করিতে পারি না। মজুরেরা যে এই মূল নীতি বুঝিয়াছেন ইহাই আমার গভীর সন্তোষের বিষয়।"

এই ধরনের কথাবার্তা হইয়াছিল। সকল কথা আজ স্মরণ নাই। আমার যতটা মনে আছে তাহাই সংক্ষেপে লিখিলাম। দেখিলাম যে মালিক পক্ষ তাঁহাদের দুর্বলতার কথা উপলব্ধি করিতেছেন। কারণ ইতিপূর্বেই তাঁহারা সরকারের সহিত পত্রব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ডারবান যাতায়াতের সময় আমি দেখিলাম যে, এই হরতাল ও ধর্মঘটী মজুরদের শান্ত ব্যবহার রেলের গার্ড ইত্যাদির উপর ভাল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যথারীতি আমি তৃতীয় শ্রেণীতেই চলাফেরা করিতাম। সেইখানেও রেলের গার্ড ও অন্যান্য কর্মচারীরা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিতেন, আগ্রহের সহিত সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং আমাদের জয় কামনা করিতেন। আমাকে তাঁহারা নানা প্রকারের ছোটখাটো সুবিধা করিয়া দিতেন। আমিও তাঁহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ যথাসম্ভব নির্মল ও পবিত্র রাখিতাম। কোনও সুবিধা পাইবার জন্যই আমি তাঁহাদের সম্মুখে কোন প্রলোভন রাখিতাম না। তাঁহারা স্বেচ্ছায় সৌজন্য প্রকাশ করিলে আমি খুশী হইতাম; কিন্তু সৌজন্য আদায় করার জন্য কখনও চেষ্টা করি নাই। গরীব, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ শ্রমিকেরা এত চমৎকার দৃঢ়তা দেখানোতে এই সব কর্মচারীরা আশ্চর্য বোধ করিতেন। দৃঢ়তা ও সাহস এমন গুণ যে, বিরুদ্ধ পক্ষের উপরও তাহা প্রভাব বিস্তার করিতে বাধ্য।

নিউকাস্‌লে ফিরিলাম। তখনও চতুর্দিক হইতে শ্রমিকদের স্রোত আসিতেছিল। "সৈন্যবাহিনীকে" সমগ্র পরিস্থিতি আমি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলাম। বলিলাম যে তাঁহারা ফিরিতে চান তো ফিরিতে পারেন। মালিকেরা যে ধমক দেখাইয়াছেন তাহার কথা বলিয়া ভবিষ্যতে যে বিপদ হইতে পারে, তাহাও তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। লড়াই কবে শেষ হইবে তাহার ঠিক নাই—সে কথা এবং জেলের দুঃখের কথা বলিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা বিচলিত হইলেন না। নির্ভীক ভাবে তাঁহারা জবাব দিলেন যে যতদিন আমি তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইয়া লড়াই করিব তাঁহারা কিছুতেই নিরুৎসাহ হইবেন না। তাঁহারা কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যস্ত বলিয়া আমি যেন তাঁহাদের জন্য উদ্বেগ বোধ না করি তাহার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

এখন কেবল যাত্রা করা বাকী। একদিন সন্ধ্যায় শ্রমিকদের জানানো হইল যে পরদিবস প্রভাতে (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর) উঠিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। যাত্রা-পথে যেসব নিয়ম-কানুন পালন করিতে হইবে তাহাও তাঁহাদিগকে পড়িয়া শোনানো হইল। পাঁচ-ছয় হাজার লোক লইয়া চলা যে সে কথা নয়। সংখ্যায় তাঁহারা সঠিক কত ছিলেন আমার তাহা জানা ছিল না। তাঁহাদের সকলের নাম-ধামও জানিতাম না। তাঁহাদের যতজন

স্বেচ্ছায় থাকেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্টি বোধ করিয়াছিলাম। পথ চলার সময় প্রতিটি "সৈনিককে" দৈনিক দশ ছটাক রুটি ও আড়াই তোলা গুড় ছাড়া আর কিছু দেওয়ার সামর্থ্য আমার ছিল না। ইহা ছাড়া রাস্তায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আরও কিছু পাইবার কথা ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা পাওয়া সম্ভব না হইলে এই রুটি ও গুড়েই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। বুয়ার যুদ্ধ ও জুলু "বিদ্রোহের" অভিজ্ঞতা এই ক্ষেত্রে আমার খুব কাজে লাগিল। "আক্রমণকারীরা" কেহ দরকারের বেশী কাপড় সঙ্গে রাখিবেন না স্থির হইয়াছিল। রাস্তায় কেহ কাহারও কোন দ্রব্য লইতে পারিবেন না। কোন সরকারী আমলা অথবা বেসরকারী শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে দেখা হইলে যদি গালি দেন অথবা এমন কি যদি চাবুকও মারেন তবে ধৈর্য সহকারে তাহা সহ্য করিতে হইবে। আর পুলিস যদি গ্রেপ্তার করিতে চান তবে গ্রেপ্তার করিতে দিতে হইবে। আমাকে যদি কয়েদ করা হয় তবুও পদযাত্রা চলিতেই থাকিবে। সকল কথা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। আমার অবর্তমানে কাহার পর কে এই "বাহিনীকে" পরিচালনা করিবেন তাহাও শুনাইয়া দিলাম।

সকলেই এইসব উপদেশের মর্ম বুঝিলেন। আমাদের বাহিনী নিরাপদে চার্লস্‌টাউন পৌঁছিল। সেখানকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আমাদের খুব সাহায্য করিলেন। তাঁহাদের বাড়ি আমাদের ব্যবহার করিতে দিলেন। মসজিদের আঙ্গিনায় রান্না করার আজ্ঞা দিলেন। রাস্তার রসদ বিরতি-স্থলে পৌঁছাইয়া শেষ হইয়া যায়। এই জন্য রান্নার বাসনের আবশ্যকতা ছিল। ব্যবসায়ীরাই খুশী হইয়াই তাহা দিলেন। আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট চাউল ইত্যাদি ছিল। সেখানকার ব্যবসায়ীরা তবুও আরও চাউল ইত্যাদি আমাদের দিলেন।

চার্লস্‌টাউন বড় জোর এক হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট ছোট একটি গ্রাম। সেখানে কোনমতে আমাদের কয়েক হাজার তীর্থযাত্রীর থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। একমাত্র নারী ও শিশুদের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা হইল। আর সকলে খোলা ময়দানেই রহিলেন।

আমাদের চার্লস্‌টাউনে অবস্থিতির অনেক মধুর ও কিছু তিক্ত স্মৃতি রহিয়াছে। মধুর স্মৃতি চার্লস্‌টাউনের সাফাই বিভাগ ও জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ডাঃ ব্রিস্কোর সহিত সম্বন্ধিত। তাঁহারা এত লোক দেখিয়া

শঙ্কিত হইয়া গেলেন কিন্তু কোনও কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে তাঁহারা আমার সহিত দেখা করিলেন এবং কিছু কিছু পরামর্শ দিলেন ও সাহায্য করিতে চাহিলেন। তিনটি বিষয়ে ইউরোপের লোকেরা সাবধান এবং আমাদের লোকেরা সাবধান নন। জলের শুদ্ধতা এবং পথঘাট ও পায়খানা ইত্যাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। ডাঃ ব্রিস্কো আমাকে অনুরোধ করিলেন যে আমাদের লোকেরা যেন রাস্তায় জল না ফেলেন, যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করেন ও যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলেন। ইহা ছাড়া তিনি পরামর্শ দিলেন যে তাঁহারা যে যে স্থান দেখাইয়া দিবেন সেই সেই স্থানে আমাদের লোকদিগকে থাকিতে হইবে এবং সেই জায়গার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য আমাকে দায়ী হইতে হইবে। আমি ধন্যবাদের সহিত তাঁহার প্রস্তাবসমূহ স্বীকার করিয়া লইলাম এবং তাহার পর সম্পূর্ণ শান্তিতে ছিলাম।

আমাদের লোকদিগের দ্বারা এই নিয়ম পালন করানো খুব কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু তীর্থযাত্রী ও সাথীরা মিলিয়া কাজ সহজ করিয়া দিলেন। চিরকাল আমি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি যে, সেবক যদি জনসাধারণকে হুকুম না করিয়া যথার্থ সেবা করেন, তবে অনেক কিছু করা যায়। সেবক যদি স্বয়ং শরীর খাটান তবে অপরেও তাঁহার অনুকরণ করিবে। সেই সময়ও একই অভিমত অর্জন করিয়াছিলাম। আমার সহকর্মীবৃন্দ ও আমি ঝাড় দিতে, ময়লা সাফ প্রভৃতি কাজ করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হইতাম না। ফলে আর সকলেও উৎসাহের সহিত সেই কাজ করিতেন। এই প্রকার বিবেচনা পূর্বক পদক্ষেপ না করিলে অপরকে কেবল হুকুম দিয়া কোন লাভ নাই। তাহা হইলে সকলেই নেতা হইয়া অপরকে হুকুম করিবেন এবং শেষ অবধি কোন কাজই হইবে না। কিন্তু নেতা স্বয়ং যেখানে সেবক হন সেখানে নেতৃত্বের অপর কোন দাবিদার হন না।

আমার সঙ্গীদিগের মধ্যে কলেনবেক পূর্বেই চার্লস্‌টাউনে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীমতী শ্লেসিনও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই মেয়েটির পরিশ্রম করার শক্তি, নিপুণতা ও বিশ্বস্ততার যতই প্রশংসা করি না কেন, কিছুতেই তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায় না। ভারতীয়দের মধ্যে শুধু পি. কে. নাইডু ও আলবার্ট ক্রিস্টোফারের নাম এখন মনে পড়ে। ইহা ছাড়া আরও অনেকে খুব পরিশ্রম করিয়া মূল্যবান সাহায্য করিয়াছিলেন।

রান্নার মধ্যে ছিল ভাত আর ডাল। তরিতরকারী খুবই পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা আলাদা করিয়া রান্না করার বাসনের সুবিধা ছিল না। সেইজন্য একই পাত্রে ডালের সহিত মিশাইয়া রান্না করা হইত। রান্না চব্বিশ ঘণ্টাই চলিত। কেন না যখন তখন ক্ষুধার্ত লোক আসিয়া উপস্থিত হইতেন। নিউকাস্‌লে আর কোন শ্রমিক থাকিতেছিলেন না। কোন্ পথে যাইতে হইবে তাহা সকলেরই জানা ছিল। সেইজন্য খনি হইতে রওনা হইয়া লোকে সোজা চার্লস্‌টাউনে আসিতেছিলেন।

লোকের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কথা ভাবিলে আমি কেবল ঈশ্বরের মহিমাই দেখিতে পাই। রান্নার প্রধান ভার আমি লইয়াছিলাম। কখনও ডালে বেশী জল হইত, কখনও কাঁচা থাকিত। কখনও তরকারী এবং সময় সময় ভাত কাঁচা থাকিয়া যাইত। এই খাদ্য হাসিমুখে খান, এমন লোক আমি জগতে কমই দেখিয়াছি। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে শিক্ষিত বলিয়া গণ্য এমন বহু ব্যক্তি দেখিয়াছি যাঁহারা খাদ্যের পরিমাণ কম হইলে, কাঁচা থাকিলে অথবা দিতে একটু বিলম্ব হইলেই মেজাজ করিতেন।

রান্না করা অপেক্ষা পরিবেশন করা বেশী মুশকিলের কাজ ছিল। তাই উহা একমাত্র আমারই হাতে রাখিয়াছিলাম। রান্না ভাল-মন্দ হওয়ার দায়িত্ব আমিই লইতাম। হিসাব হইতে বেশী ভোজনার্থী আসিয়া পড়ার জন্য রান্না করা খাদ্য কম পড়িয়া গেলে যাহা আছে তাহাই অল্প স্বল্প করিয়া সকলকে দিয়া সন্তুষ্ট করার দায়িত্বও আমারই উপর ছিল। পরিবেশনের সময় যে ভগ্নীদের পাতে কম দিয়াছি তাঁহারা এক মুহূর্তের জন্য ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া পর মুহূর্তেই স্বেচ্ছায় গৃহীত দায়িত্বের কারণ আমার অসহায় অবস্থা বুঝিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছেন। এ দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নয়। আমি বলিতাম, "আমি নিরুপায়। রান্না কম, খাওয়াইতে হইবে অনেককে। যাহা আছে তাহাই সমান ভাগ করিয়া দিতেছি।" ইহাতে তাঁহারা অবস্থা বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহারা তৃপ্ত—এই কথা বলিয়া সস্মিত বদনে আহার করিয়া চলিয়া যাইতেন।

এ সকলই মধুর স্মৃতি। এবার তিক্ত স্মৃতির কথা বলি। দেখিতাম লোকেরা অবকাশ পাইলেই কোন্দল করিতেন। আরও শোচনীয় ব্যাপার এই যে ব্যভিচারের ঘটনাও ঘটিয়াছিল। প্রবল ভিড়ের জন্য স্ত্রী-পুরুষকে একসঙ্গে রাখিতে হইত। পশু প্রবৃত্তির লজ্জা সরম নাই। এই জাতীয় ঘটনা

ঘটিলেই আমি সেখানে গিয়া পৌছিতাম। অপরাধী ব্যক্তিরা লজ্জিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে আলাদা করিয়া রাখা হইত। কিন্তু আমি জানি না এমন কত ঘটনা যে ঘটিয়াছে তাহা কে বলিতে পারেন। এ বিষয় লইয়া আর বেশী আলোচনা করা নিরর্থক। তবে সব কিছুই যে ঠিকমত হয় নাই এবং অন্যায় করিলেও যে কেহ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই—ইহা জানাইবার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। গোড়ায় আধা বর্বর এবং নৈতিক বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে খুব একটা কড়াকড়ি নাই এমন ব্যক্তিত্ব পরবর্তীকালে ভাল পরিবেশে পড়িয়া যেমন সৎ স্বভাবের হইয়া যান ইহা আমি এ জাতীয় বহু ঘটনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ প্রসঙ্গে সেই সত্য উপলব্ধি করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় ও লাভজনক।

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়

ট্রান্সভালে প্রবেশ

১৯১৩ সালের নভেম্বরের প্রথম ভাগের কথা বলিতেছি। আরও অগ্রসর হইবার পূর্বে দুইটি ঘটনার কথা লিখিব। নিউকাসলে দ্রাবিড় ভগ্নীগণের কারাদণ্ড হওয়ায় ডারবানের ফতেমা বাঈ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার বৃদ্ধা মাতা হানিফা বাঈ ও সাত বৎসরের ছেলেকে লইয়া গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য ভোকস্রাস্টে রওনা হইলেন। মাতা ও কন্যাকে গ্রেপ্তার করা হইলেও সরকার ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করিতে অস্বীকার করিলেন। ফতেমা বাঈ-এর আঙুলের টিপ পুলিস লইতে চাহিলে তিনি নির্ভীকভাবে সেই অসম্মানের কাছে নতিস্বীকার করিতে অস্বীকার করেন। ফলস্বরূপ তাঁহাকে ও তাঁহার মাকে তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় (১৩ই অক্টোবর, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

এই সময় শ্রমিকদের হরতাল খুব জোরে চলিতেছিল। খনি এলাকা হইতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা সমানে চার্লস্টাউনে আসিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইটি মহিলা ও তাঁহাদের শিশুসন্তান ছিলেন। একটি ছেলে যাত্রা-পথে ঠাণ্ডা লাগার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একটি খাদ পার হইবার সময় কোল হইতে পড়িয়া গিয়া অপর মহিলাটির শিশুসন্তান জলস্রোতে ভাসিয়া যায়।

কিন্তু সাহসী মায়েরা ইহাতেও হতাশ না হইয়া পথ চলা জারি রাখেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "মৃতের জন্য শোক করিয়া লাভ নাই, তাহারা আর ফিরিবে না। জীবিতদের জন্য কাজ করিয়া যাওয়াই আমাদের কর্তব্য।" এই প্রকার শান্ত বীর্য, ঈশ্বরে প্রগাঢ় আস্থা ও প্রাণদায়ী জ্ঞান আমি গরীবদের ভিতর অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি।

এই প্রকার দৃঢ়তার সহিত স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা চার্লস্‌টাউনে তাঁহাদের কঠিন কর্তব্য পালন করিতেছিলেন। কারণ আমরা শান্তিস্থাপনার প্রয়াসে সীমান্তের সেই গ্রামে উপনীত হই নাই। শান্তি কেহ চাহিলে নিজ অন্তরের মধ্যে তাহা খোঁজার আবশ্যকতা ছিল। বাহিরে যেখানে তাকানো যাক্‌, সর্বত্র যেন স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল, "এখানে শান্তি নাই।" কিন্তু এই প্রকার ঝটিকা-প্রবাহের মধ্যেই মীরাবাঈ-এর ন্যায় ভক্তেরা সানন্দ স্থৈর্যের সহিত বিষের পেয়ালা ওষ্ঠের কাছে তুলিয়া ধরেন। এমনি অবস্থায় অন্ধকার ও নিঃসঙ্গ কারাকক্ষে মৃত্যুপথযাত্রী সক্রেটিস্‌ তাঁহার বন্ধু ও আমাদের এই রহস্যময় উপদেশ দেন যে শান্তি চাহিলে নিজের হৃদয়ের মধ্যে উহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সত্যাগ্রহীর দল এই জাতীয় অনির্বচনীয় শান্তির মধ্যে তাঁহাদের ছাউনিতে বাস করিতেন। আগামীকাল কি হইবে সে বিষয়ে কোন চিন্তা তাঁহাদের মনে থাকিত না।

আমি সরকারকে পত্র দিয়াছিলাম যে, আমরা ট্রান্সভালে বসবাস করার জন্য প্রবেশ করিতেছি না। মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং আমাদের আত্মসম্মান নষ্ট করার জন্য আমাদের যে খেদ হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়ার জন্যই আমরা প্রবেশ করিতেছি। আমরা তখন যেখানে ছিলাম সেই চার্লস্‌টাউনেই আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিলে সরকার আমাদের যাবতীয় উদ্বেগ দূর করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছিলাম। সরকার যদি এরূপ না করেন এবং ইহার মধ্য হইতে কেহ যদি গোপনে ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন তবে তাহার জন্য আমরা দায়ী হইব না। আমাদের গতিবিধির মধ্যে কোন গোপনীয়তা ছিল না। এই কার্যে কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থও ছিল না। আমাদের মধ্যে কেহ গোপনে ট্রান্সভালে প্রবেশ করুন ইহা আমাদের অভিপ্রেত নয়; কিন্তু যেখানে হাজার হাজার অপরিচিত লোক লইয়া আমাদের কাজ করিতে হইতেছে এবং যেখানে প্রেমের বন্ধন ব্যতীত অন্য কোনও শাসনের ব্যবস্থাও নাই, সেখানে কোনও একজন ব্যক্তির কার্যের জন্য

আমরা দায়ী হইতে পারি না। সর্বশেষে আমি সরকারকে আশ্বাস দিই যে তিন পাউণ্ড কর রদ করিয়া দিলে গিরমিটিয়ারা কাজে ফিরিয়া যাইবেন ও হরতাল বন্ধ হইবে। কারণ আমাদের অন্যান্য অভিযোগ দূর করার জন্য যে সাধারণ সংগ্রাম চলিতেছে তাহাতে যোগদান করার জন্য ইঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইবে না।

অবস্থা তাই একেবারেই অনিশ্চিত এবং সরকার কবে আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন তাহার ঠিক নাই। এই জাতীয় সঙ্কটজনক অবস্থায় দীর্ঘদিন সরকারের উত্তরের জন্য বসিয়া থাকা যায় না। দুই একটি ফিরতি ডাকের অপেক্ষা করা চলে। তাই অবিলম্বে সরকার যদি আমাদের গ্রেপ্তার না করেন, তবে আমরা চার্লস্‌টাউন ত্যাগ করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করা স্থির করিলাম। রাস্তায় গ্রেপ্তার না হইলে "শান্তি সৈনিকের" এই দল প্রতিদিন কুড়ি হইতে চব্বিশ মাইল চলিয়া আট দিনে টলস্টয় ফার্মে পৌছাইবে। সংগ্রাম চলা পর্যন্ত সকলে সেইখানে থাকিবেন ও ফার্মে কাজ করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জন করিবেন—এই প্রকার পরিকল্পনা করা হইল। শ্রীযুক্ত কলেনবেক প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রীরা স্বয়ং নিজেদের জন্য মাটির ঘর তৈয়ারী করিয়া লইবেন স্থির হইল। ঘর তৈয়ারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধ ও অসমর্থেরা তাঁবুতে থাকিবেন, সমর্থ সকলেই খোলা মাঠে বাস করিবেন। একমাত্র অসুবিধা ছিল এই যে বর্ষাকাল আসন্নপ্রায়। সে সময় সকলেরই মাথা গুঁজিবার কোনও আশ্রয় চাই। কিন্তু কোন না কোন ভাবে এ সমস্যার সমাধান করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত কলেনবেক সাহসিকতার সহিত আশা করিতেছিলেন।

যাত্রার অন্যান্য ব্যবস্থাও আমরা করিলাম। চার্লস্‌টাউনের সহৃদয় ডাক্তার ব্রিস্কো ঔষধের ছোট একটি বাক্স সাজাইয়া আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর আমার মত আনাড়ি লোকও ব্যবহার করিতে পারে এমন কিছু যন্ত্রপাতিও দিয়াছিলেন। এই বাক্স ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, কেন না যাত্রীদলের সহিত কোনও যানবাহন ছিল না। আমাদের সহিত তাই অতি সামান্য পরিমাণ মাত্র ঔষধই লওয়া সম্ভব হইয়াছিল। একবারে একশত লোকের চিকিৎসা করারও ঔষধ ছিল না। তবে তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কারণ আমরা কোনও না কোনও গ্রামের কাছেই প্রতিদিন ছাউনি করা স্থির করিয়াছিলাম। যে ঔষধ কম পড়িবে তাহা সেইখানে পাওয়া যাইবে আশা

ছিল। আর যেহেতু আমরা কোন রোগী বা অক্ষম ব্যক্তিকে আমাদের সঙ্গে লইতেছিলাম না তাই তাঁহাদের আমরা যাত্রাপথের কোন গ্রামে রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

খাওয়ার জন্য রুটি ও গুড ছাড়া আর কিছুর আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আটদিনের এই যাত্রায় নিয়মিতভাবে রুটি পাইবারই বা কি ব্যবস্থা হইবে? কেন না সঙ্গে ভাণ্ডার বহিয়া লওয়া চলিবে না। রুটি প্রত্যহ যাত্রীদের বিতরণ করিতে হইবে, ইহা হইতে কিছুই জমা রাখা সম্ভব নহে। ইহার একমাত্র সমাধান হইল কেহ যদি আমাদের প্রতিটি যাত্রাবিরতির স্থলে রুটি সরবরাহ করেন। কিন্তু কে এই কার্য করিবেন? কোনও ভারতীয়ের পাউরুটির কারখানা ছিল না। প্রত্যেক গ্রামে রুটি তৈয়ারীর ব্যবস্থাও নাই, সাধারণতঃ শহর হইতেই গ্রামে রুটি আসে। তাহা হইলে কোনও রুটি-ওয়ালাকে ইহার ভার লইতে হয় এবং রেলযোগে প্রতিদিন নির্ধারিত জায়গায় পৌছাইয়া দিতে হয়। ভোকস্রাস্ট চার্লস্‌টাউনের প্রায় দ্বিগুণ বড জায়গা। সেখানে ইউরোপীয়দের পরিচালিত বড় একটি কারখানার কর্তৃপক্ষ সানন্দে যথানির্দিষ্ট স্থানে রুটি পৌছাইয়া দিবার দায়িত্ব লইলেন। আমাদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা জানিয়াও তিনি বাজার অপেক্ষা অধিক দাম লওয়ার চেষ্টা করেন নাই এবং ভাল ময়দা হইতে রুটি বানাইয়া দিতেন। যথাসময়ে তিনি রেলযোগে পাউরুটি পাঠাইয়া দিতেন এবং রেলওয়ে কর্মচারীরা সকলে ইউরোপীয় হওয়া সত্বেও কেবল যে বিশ্বস্ততার সহিত আমাদিগকে উহা দিয়া দিতেন তাহাই নহে, উপরন্তু আমাদের জিনিস যাহাতে ভাল ভাবে আমাদের কাছে পৌছায় তাহা দেখিতেন ও আমাদের জন্য কিছু কিছু বিশেষ সুবিধাও করিয়া দিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে আমাদের অন্তরে শত্রুভাব নাই, কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাই না এবং একমাত্র নিজেরা দুঃখবরণ করিয়াই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে চাই। আমাদের চারিদিকের পরিবেশ এই ভাবে শুদ্ধ হইয়াছিল ও শুদ্ধই থাকিয়া গিয়াছিল। মানুষের মধ্যে যে প্রেমভাব সুপ্ত অথচ চিরবিদ্যমান তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, মুসলমান অথবা যাহাই হই না কেন, আমরা যে সকলেই ভাই এই ভাব সকলেই অনুভব করিতেছিলেন।

যাত্রার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পর মিটমাটের জন্য আমি আর একবার চেষ্টা করিলাম। পত্র ও তার ইত্যাদি তো পূর্বেই পাঠাইয়াছিলাম।

আমি স্থির করিলাম যে একবার টেলিফোন করিয়া দেখিব এবং উপযাচক হইয়া কথা বলিতে যাওয়ার জন্য যদি অপমানিত হই তো হইব। চার্লস্‌টাউন হইতে প্রিটোরিয়ায় জেনারেল স্মাট্‌সের সচিবকে ফোন করিয়া আমি বলিলাম, "জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে বলুন যে যাত্রার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ভোকস্রাস্টের গোরারা উত্তেজিত এবং তাঁহারা হয়ত আমাদের প্রাণ বিপন্নও করিতে পারেন। সেই ভয়ই তাঁহারা দেখাইতেছেন। আমি বিশ্বাস করি যে স্বয়ং জেনারেল চান না যে এ জাতীয় বিপর্যয় ঘটুক। তিনি যদি তিন পাউণ্ড কর রদ করার কথা দেন, তবে আমি যাত্রা আরম্ভ করিব না। আইন ভঙ্গ করার জন্যই আমি আইন ভঙ্গ করিতে যাইতেছি না, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই করিতেছি। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ কি ছোট্ট এই অনুরোধটুকু রক্ষা করিবেন না?" আধ মিনিটের মধ্যেই জবাব আসিল, "জেনারেল স্মাট্‌স্‌ আপনার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতে চাহেন না। আপনার যাহা খুশী করিতে পারেন।" টেলিফোন ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

ইহাই হইবে আমি জানিতাম, কিন্তু অভদ্র জবাবটা আশা করি নাই। ছয় বৎসর হইল সত্যাগ্রহের জন্য জেনারেলের সহিত আমার রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সেইজন্য আমি ভদ্রতাপূর্ণ জবাবের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার ভদ্র ব্যবহারে যেমন গর্বস্ফীত হই নাই তেমনি তাঁহার অসৌজন্যমূলক আচরণেও হতোদ্যম হইলাম না। যে ঋজু ও সঙ্কীর্ণ পথ আমাকে চলিতে হইবে তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। পরদিন (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর) নির্দিষ্ট সময়ে (সকাল সাড়ে ছয়টায়) আমরা প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বরের নামে যাত্রা শুরু করিলাম। যাত্রীদলে ২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন স্ত্রীলোক ও ৫৭ জন বালক-বালিকা ছিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়

মহা অভিযান

তীর্থযাত্রী দল এইভাবে যথানির্দিষ্ট সময়ে রওনা হইলেন। চার্লস্টাউন হইতে এক মাইল দূরে একটি ছোট খাদ ছিল। সেই খাদটি পার হইলেই ভোকস্রাস্টে বা ট্রান্সভালে প্রবেশ করা হয়। এই সীমান্তের প্রবেশ মুখে একদল প্রহরারত ঘোড়সওয়ার ছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট গেলাম ও আমাদের বাহিনীর নিকট বলিয়া গেলাম যে, আমি সঙ্কেত করিলে তাহারা খাদ পার হইবেন কিন্তু আমি যখন পুলিসের সহিত কথা বলিতেছি, তখন অকস্মাৎ যাত্রীদল হুড়োহুড়ি করিয়া খাদ পার হইয়া গেলেন। সওয়ার পুলিসেরা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সেই জনসমুদ্রকে রোখা সহজ ব্যাপার নহে। আমাদিগকে গ্রেপ্তার করার অভিপ্রায় পুলিসের ছিল না। আমি যাত্রীদিগকে শান্ত করিলাম ও তাহাদিগকে সারিবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইলাম কয়েক মিনিটে সব শান্ত হইয়া গেল ও ট্রান্সভালের ভিতর যাত্রা শুরু হইল।

ইহার দুই দিন পূর্বে ভোকস্রাস্টের ইউরোপীয়েরা একটি সভা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাহারা ভারতীয়দের অনেক শাসানি দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ভারতীয়েরা ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে গুলি করিবেন। গোরাদিগকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত কলেনবেক ঐ সভায় গিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই কলেনবেকের কথা শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন শ্রীযুক্ত কলেনবেককে মারিতে উঠিয়াছিলেন। কলেনবেক স্বয়ং ব্যায়ামবীর ছিলেন এবং স্যাণ্ডোর নিকট হইতে তিনি কসরৎ শিখিয়াছিলেন। তাই তাহাকে ভয় দেখানো শক্ত। জনৈক গোরা তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। শ্রীযুক্ত কলেনবেক বলেন, "আমি শান্তি-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেইজন্য আমি এই আহ্বান স্বীকার করিতে পারি না। তবে আমাকে যাঁহারা প্রহার করিতে চাহেন তাঁহারা যত ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। কিন্তু আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই সভাতে বলিবার চেষ্টা করিবই। আপনারা প্রকাশ্যভাবে সকল গোরাকে এই সভায় আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এবং তাই আমি আপনাদের জানাইতে চাই সকল গোরাই

আপনাদের মত নির্দোষ মানুষকে মারিতে ইচ্ছুক নন। অন্ততঃ এমন একজন গোরা আছেন যিনি আপনাদিগকে জানাইতে চান যে, আপনারা ভারতীয়দের উপর যে দোষ দিতেছেন তাহা মিথ্যা। আপনারা যাহা মনে করিতেছেন ভারতীয়েরা তাহা চান না। তাঁহারা আপনাদের রাজত্ব চান না, আপনাদিগের সহিত লড়াই করিতে চান না, অথবা নিজেদের লোক দিয়া এই দেশ ভরিয়া ফেলিতে চান না—তাঁহারা কেবল ন্যায়বিচার চান। বসবাস করার জন্য তাঁহারা ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতেছেন না, তাঁহাদের উপর যে অন্যায় কর বসানো হইয়াছে, তাহার সক্রিয় প্রতিবাদ স্বরূপই তাঁহাদের এই প্রবেশ। তাঁহারা সাহসী। তাঁহারা আপনাদের শরীর বা ধনসম্পত্তির কোনও ক্ষতি করিবেন না, আপনাদের সহিত লড়াই করিবেন না, কিন্তু আপনাদের গোলাগুলি সত্ত্বেও প্রবেশ তাঁহারা করিবেনই। আপনাদের গোলাগুলি অথবা বল্লমের ভয়ে তাঁহারা ফিরিয়া যাইবার মানুষ নহেন। দুঃখ সহ্য করিয়া তাঁহারা আপনাদের হৃদয় গলাইতে মনস্থ করিয়াছেন এবং আমি জানি তাঁহারা ইহা অবশ্যই করিবেন কথা বলিতেই কেবল আমি এখানে আসিয়াছি। আমার বক্তব্য শেষ এবং আমি মনে করি যে এ কথা বলিয়া আমি আপনাদের সেবাই করিয়াছি। আপনারা সাবধান হউন এবং অন্যায় হইতে নিবৃত্ত হউন।" এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত কলেনবেক আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী লজ্জিত হইলেন। যে পালোয়ান তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

আমরা এই সভার খবর জানিতাম, সেইজন্য ভোকস্রাস্টে শ্বেতাঙ্গরা কিছু হাঙ্গামা করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলাম। সম্ভবতঃ সীমান্তে বিপুল সংখ্যক পুলিসের সমাবেশ করার উদ্দেশ্য ছিল শ্বেতাঙ্গদের সংযত রাখা। সে যাহাই হউক, আমাদের শোভাযাত্রা শান্তিতেই সেই পথ অতিক্রম করিল। কোনও গোরা এমন কি পরিহাস করার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য সকলে পথে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও চক্ষুতে মিত্রতার আভাসও ছিল।

ভোকস্রাস্ট হইতে আট মাইল দূরে পামফোর্ডে আমাদের প্রথম দিন রাত্রিবাস করার কথা। আমরা সেখানে সন্ধ্যা প্রায় পাঁচটার সময় পৌঁছাইলাম। যাত্রীরা তাঁহাদের বরাদ্দ রুটি গুড় খাইয়া খোলা মাঠে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেহ গল্পগুজব করিতেছিলেন কেহ বা ভজন গাহিতেছিলেন। পদ-

যাত্রার কারণ কয়েকজন স্ত্রীলোক একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এযাবৎ তাঁহারা তাঁহাদের শিশুসন্তানদের কোলে করিয়া পথ চলিয়াছেন, কিন্তু এভাবে আর চলা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্য পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে একজন ভাল ভারতীয় দোকানদারের নিকট তাঁহাদিগকে রাখার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। আমাদের যদি টলস্টয় ফার্মে যাইতে দেওয়া হয় তবে দোকানদার ভাইটি তাঁহাদের সেখানে পৌঁছাইয়া দিবেন, আর আমরা গ্রেপ্তার হইলে তাঁহাদের বাড়ি পাঠাইয়া দিবেন।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, সকল কলরব শান্ত হইল। আমি ঘুমাইতে যাইব, এমন সময় খট্‌মট্‌ শব্দ শুনিলাম। দেখিলাম একজন গোরা লণ্ঠন লইয়া আসিতেছেন। ইহার তাৎপর্য আমি বুঝিতে পারিলাম। আমার তৈয়ারী হওয়ার কিছুই ছিল না। পদস্থ পুলিস কর্মচারীটি বলিলেন, "আপনার নামে আমার নিকট গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রহিয়াছে, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করিতে চাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন?"

"এখনই।" জবাব পাইলাম।

"আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন?"

"এখন নিকটবর্তী স্টেশনে, তাহার পর গাড়ী আসিলে ভোকস্রাস্ট।"

আমি বলিলাম, "আমি কাহাকেও না জাগাইয়াই আপনার সহিত যাইব। তবে আমার জনৈক সহকর্মীকে কিছু উপদেশ দিয়া লইব।"

"দিতে পারেন।"

পি. কে. নাইডু আমার নিকট শুইয়াছিলেন, তাঁহাকে জাগাইলাম। তাঁহাকে আমার গ্রেপ্তারের খবর দিয়া যাত্রীদের কাহাকেও প্রাতঃকালের পূর্বে জাগাইতে নিষেধ করিলাম। সকালবেলায় তাঁহারা যেন নিয়মমত পদযাত্রা আরম্ভ করেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। সাময়িক বিশ্রাম ও খাদ্য বণ্টনের সময় আসিলে যেন সকলকে আমার গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়। ইতিমধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহাকে এ সংবাদ দিতে পারেন। যাত্রীদলকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহারা নিজেদের গ্রেপ্তার হইতে দিবেন। আর নতুবা নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁহারা পদযাত্রা চালাইবেন। নাইডুর কোনই ভয় ছিল না। নাইডু গ্রেপ্তার হইলে কি হইবে তাহাও তাঁহাকে বলিয়া রাখিলাম। ভোকস্রাস্টে শ্রীযুক্ত কলেনবেকও সে সময় ছিলেন।

আমি পুলিস কর্মচারীটির সঙ্গে গেলাম ও পরদিবস প্রত্যুষে ভোকস্রাস্টের ট্রেনে চাপিলাম। ভোকস্রাস্টের আদালতে হাজির হইলাম। কিন্তু সরকারী সাক্ষী ইত্যাদি তৈয়ারী না থাকায় উকীল স্বয়ং ১৪ই পর্যন্ত মোকদ্দমা মুলতুবী রাখার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে মামলা মুলতুবী হইল। আমার দায়িত্বে ২০০০ পুরুষ, ১২২ জন নারী ও ৫০টি শিশু রহিয়াছে এবং মামলা মুলতুবী থাকার সময়ের মধ্যে তাঁহাদের আমি গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে চাই—এই বলিয়া আমি জামিনের আবেদন করিলাম। সরকারী উকীল জামিনের প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট নিরুপায়। কারণ যেসব বন্দীদের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ নাই আইন অনুযায়ী তাঁহারা জামিন পাইবার অধিকারী এবং আমাকেও সে অধিকারে বঞ্চিত করা যায় না। তিনি তাই আমাকে ৫০ পাউণ্ড জামিনে ছাড়িয়া দিলেন। আমার জন্য শ্রীযুক্ত কলেনবেক পূর্ব হইতে মোটর তৈয়ারী রাখিয়াছিলেন। উহাতে করিয়া তিনি আমাকে পুনরায় "আক্রমণকারীদের" নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। "দি ট্রান্সভাল লিডার" সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি আমাদের সহিত আসিতে চাহিলেন। তাঁহাকে আমরা গাড়ীতে লই। এই মোকদ্দমা, মোটরভ্রমণ ও যাত্রীদের সহিত মিলিত হইবার সময় তাঁহারা যে উৎসাহ ও আনন্দের সহিত আমাকে গ্রহণ করেন তাহার বিশদ বিবরণ এই সময় তিনি প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত কলেনবেক তখনই ভোকস্রাস্ট ফিরিয়া গেলেন। কারণ যেসব ভারতীয় চার্লস্টাউনে অপেক্ষা করিয়াছিলেন ও নূতন যে সকল যাত্রী আসিতেছিলেন তাঁহাদের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাঁহার উপর ছিল

আমরা যাত্রা চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু সরকার আমাকে মুক্ত থাকিতে দিতে পারেন না। সেইজন্য ৮ই আমাকে দ্বিতীয়বারের জন্য স্ট্যাণ্ডারটনে গ্রেপ্তার করা হইল। স্ট্যাণ্ডারটন অপেক্ষাকৃত বড় জায়গা। এখানে আমাকে অদ্ভুত ভাবে গ্রেপ্তার করা হইল। যাত্রীদিগকে আমি রুটি বিলাইতেছিলাম। স্ট্যাণ্ডারটনের ভারতীয় দোকানীরা আমাদের কয়েক টিন মোরব্বা উপহার দিয়াছিলেন। তাই খাদ্য বিতরণ কার্যে সেদিন স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক সময় লাগিতেছিল। ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইলেন। পরিবেশনের কার্য সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন। তারপর তিনি আমাকে একধারে ডাকিয়া লইলেন। ভদ্রলোককে আমি চিনিতাম। তাই

আমার মনে হইল যে, তিনি হয়ত আমার সহিত কোনও কথা বলিতে চাহেন। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি আমার কয়েদী।"

আমি বলিলাম, "আমার পদোন্নতি হইয়াছে মনে হয়। কারণ পুলিসের বদলে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন। তাহা হইলে এখনই আমার বিচার হইবে তো?"

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, "আমার সঙ্গে চলুন, আদালতের কাজ এখনও চলিতেছে।"

যাত্রীদিগকে পথ চলা জারি রাখিতে বলিয়া আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে গেলাম। আদালতে গিয়াই দেখিলাম যে আমার কয়েকজন সহকর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পি. কে. নাইডু, বিহারীলাল মহারাজ, রামনারায়ণ সিং, রঘু নারায় ও রহিম খাঁ – এই পাঁচজন ছিলেন।

আমাকে তখনই আদালতে দাঁড করানো হইল। ভোকস্রাস্টের ন্যায় একই কারণ দেখাইয়া এখানেও আমি জামিনে মুক্তি চাহিলাম। এখানেও সরকারী উকিল ইহার তীব্র বিরোধিতা করিলেন। এখানেও ম্যাজিস্ট্রেট ৫০ পাউণ্ড জামিনে আমাকে মুক্তি দিলেন এবং ২১শে পর্যন্ত মামলা মুলতুবী রহিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আমার জন্য গাড়ী তৈয়ারী রাখিয়াছিলেন। যাত্রীরা আরও তিন মাইল যাইতে না যাইতেই তাঁহাদের সহিত গিয়া মিলিত হইলাম। যাত্রীদের এবং আমারও এবার বিশ্বাস হইল যে আমরা হয়ত টলস্টয় ফার্মে গিয়া পৌছাইতে পারিব। কিন্তু তাহা হয় নাই। আমার গ্রেপ্তার হওয়াতে লোকে যে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা কোন কম ব্যাপার নহে। আমার পাঁচজন সহকর্মী জেলেই রহিয়া গেলেন।

পঞ্চাচত্বারিংশৎ অধ্যায়

সকলেই কারাগারে

আমরা এইবার জোহানস্‌বার্গের খুব কাছেই আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে পরিক্রমার সারা পথটা আট ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। এতাবৎ আমরা পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছিলাম। আর চারদিনের যাত্রা বাকী। কিন্তু প্রত্যহ আমাদের উৎসাহ উত্তরোত্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় "আক্রমণকারীদের" সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য সরকারের উৎকণ্ঠাও নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছিল। গন্তব্যস্থলে উপনীত হওয়ার পর যদি আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়, তাহা হইলে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বলতা ও কৌশলের অভাবের অভিযোগ উঠিবে। তাই যদি গ্রেপ্তার করিতেই হয় তব লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তাহা করা উচিত।

সরকার দেখিলেন যে আমাকে গ্রেপ্তার করা সত্ত্বেও যাত্রীদল হতাশ বা ভীত হইতেছেন না, অথবা ইহার কারণ তাঁহারা শান্তিভঙ্গও করিতেছেন না। তাঁহারা হাঙ্গামা করিলেই সরকার তাঁহাদের বন্দুকের খোরাক করিবার চমৎকার সুযোগ পাইবেন। আমাদের দৃঢ়তা শান্তির সহিত যুক্ত হওয়ায় জেনারেল স্মাট্‌সের কাছে তাহা পীড়াদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সে কথা বলিয়াও ছিলেন। শান্ত লোককে কতদিন আর উত্যক্ত করা যায়? স্বেচ্ছায় যে মরিয়া আছে তাঁহাকে আর কেমন করিয়া মারিবেন? মরিতে যিনি আগ্রহী তাঁহাকে মারিয়া মজা নাই। সৈন্যরা সেইজন্যই শত্রুকে জীবন্ত ধরিতে তৎপর হইয়া থাকে। ইঁদুর যদি বিড়াল দেখিয়া না পলায়, তবে বিড়াল অন্য শিকার খুঁজিতে বাধ্য হইবে। সকল মেষ যদি সিংহের সামনে গিয়া দাঁড়ায়, তবে সিংহকে বাধ্য হইয়া মেষ খাওয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। সিংহ যদি অপ্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করে তবে বড় বড় শিকারী সিংহ শিকার ছাড়িয়া দিবেন। অহিংসা ও দৃঢ়তা—আমাদের এই দুই গুণের সমাহারের ভিতর আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী রূপে নিহিত ছিল।

গোখলে তারযোগে এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, পোলক

ভারতবর্ষে গিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থার কথা ভারত ও সম্রাটের সরকারের নিকট পেশ করিতে তাঁহাকে যেন সাহায্য করেন। শ্রীযুক্ত পোলকের স্বভাব এমন ছিল যে, তাঁহাকে যে কাজে লাগানো যাইত, তিনি সেই কাজেরই উপযোগী হইয়া পড়িতেন। যে কাজই হাতে লইতেন তাহাতেই পুরামাত্রায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে সেইজন্য ভারতবর্ষে পাঠাইবার উদ্যোগ চলিতেছিল। আমি তাই তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলাম যে, তিনি যেন যান। কিন্তু আমার সহিত দেখা না করিয়া, আমার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নির্দেশ না লইয়া তিনি যাইতে চাহিলেন না। সেইজন্য আমার সহিত এই যাত্রা-পথেই দেখা করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। আমি তারযোগে তাঁহাকে জানাইলাম যে, ইচ্ছা হইলে তিনি আসিতে পারেন। তবে এইরূপ করিলে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা আছে। যোদ্ধারা আবশ্যকমত ঝুঁকি লইতে দ্বিধা করেন না। আন্দোলনের একটি মূলনীতি ছিল এই যে সরকারের দৃষ্টি পড়িলে সকলেই গ্রেপ্তার হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন এবং সরকার গ্রেপ্তার করিতে অনিচ্ছুক না হওয়া পর্যন্ত গ্রেপ্তার হইবার জন্য সকল প্রকারের প্রকাশ্য ও নৈতিক প্রয়াস করিবেন। সেইজন্য শ্রীযুক্ত পোলক ধরা পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আসা সাব্যস্ত করিলেন।

স্ট্যাণ্ডারটন ও গ্রেলিংস্ট্যাণ্ডের মধ্যবর্তী টিকওয়ার্থে ৯ই তারিখে শ্রীযুক্ত পোলক আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমরা কথাবার্তা বলিতেছিলাম এবং আলোচনা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তখন অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা। আমরা উভয়ে যাত্রী-দলের আগে আগে হাঁটিতেছিলাম। কয়েকজন সহকর্মী আমাদের আলোচনা শুনিতেছিলেন। সন্ধ্যার গাড়ীতে শ্রীযুক্ত পোলকের ডারবান ফেরার কথা। কিন্তু ঈশ্বর সর্বদা মানুষকে তাহার পরিকল্পনা মত কাজ করিতে দেন না। শ্রীরামচন্দ্রকেই রাজ্যাভিষেকের দিন বনে যাইতে হইয়াছিল। আমরা কথা বলিতেছি, এমন সময় আমাদের সামনে একটি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা হইতে ট্রান্সভালের বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের মুখ্যকর্তা শ্রীযুক্ত চ্যামনে ও জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী নামিলেন। আমাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতেছি।"

এইভাবে আমি চারদিনে তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হইলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাত্রীদিগের কি হইবে?"

"তাহা আমরা দেখিব।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। শ্রীযুক্ত পোলককে আমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাত্রীদের লইয়া আগাইয়া যাইতে বলিলাম। পুলিস কর্মচারীটি যাত্রীদলকে কেবল আমার গ্রেপ্তার হইবার খবর দিবার অনুমতি দিলেন। আমি তাঁহাদিগকে যখন শান্তিরক্ষা ইত্যাদি করিতে বলিতেছি, এমন সময় পুলিস কর্মচারীটি বাধা দিয়া আমাকে বলিলেন, "এখন আপনি কয়েদী, তাই বক্তৃতা দিতে পারিবেন না।"

আমার অবস্থা বুঝিলাম। তবে বুঝাইবার দরকার ছিল না। আমার কথা বন্ধ করিয়া দিয়াই পুলিস কর্মচারীটি গাড়োয়ানকে জোরে গাড়ী হাঁকাইতে হুকুম দিলেন। মুহূর্ত-মধ্যে যাত্রীদল চক্ষের অন্তরাল হইল।

কর্মচারীটি জানিতেন যে, তখনকার মত আমি সেখানকার মালিক। সেইজন্য আমাদের অহিংসার উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি সেই শ্বেতাঙ্গবিহীন প্রান্তরে দুই হাজার ভারতীয়দের মধ্য হইতে একাকী আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাও তিনি জানিতেন যে তিনি লিখিতভাবে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠাইলেও আমি গিয়া ধরা দিতাম। এই অবস্থায় আমি যে কয়েদী তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিরর্থক। আর যাত্রীদলকে আমি যে পরামর্শ দিতাম তাহা আমাদের মত সরকারের পক্ষেও মঙ্গলজনক হইত। কিন্তু রাজকর্মচারী কিরূপে তাঁহার স্বল্পক্ষণস্থায়ী কর্তৃত্ব প্রকট করা হইতে বিরত থাকিবেন? তবে আমি একথাও বলিব যে, অনেক রাজপুরুষই ইঁহার চেয়ে আমাদিগকে ভালভাবে বুঝিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, গ্রেপ্তার হওয়াকে আমরা যে শুধু ভয় পাই না তাহাই নহে, ইহাকে বরং আমরা মুক্তির সিংহদ্বার বলিয়া বিবেচনা করি। সেইজন্য তাঁহারা আমাদিগকে সর্বপ্রকার ন্যায্য স্বাধীনতা দিতেন এবং তাঁহাদের সুবিধামত ও সুচারুরূপে গ্রেপ্তার করার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের সাহায্য লইতেন। দুই রকমের উদাহরণই পাঠক এই গ্রন্থে পাইবেন।

আমাকে গ্রেলিংস্ট্যাণ্ড লইয়া যাওয়া হইল। সেখান হইতে বালফোর হইয়া অবশেষে হেডলবার্গ। সেইখানেই রাত কাটিল।

যাত্রীদল পোলকের নেতৃত্বে যাত্রা আরম্ভ করিলেন এবং সেই রাত্রির মত গ্রেলিংস্ট্যাণ্ডে আশ্রয় লইলেন। সেখানে শেঠ আহমদ মহম্মদ কাছলীয়া ও শেঠ আহমদ ভায়াত প্রমুখ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা

সংবাদ পাইয়াছিলেন যে যাত্রীদলের সকলকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। পোলক ভাবিলেন যে, যাত্রীদলকে গ্রেপ্তার করা হইলে তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কর্তব্য শেষ হইবে এবং তাই একদিন বিলম্ব হইলেও তিনি ডারবান পৌঁছাইবেন এবং সেখান হইতে ভারতবর্ষে যাওয়ার স্টীমার ধরিতে পারিবেন। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ।

১০ই তারিখে সকাল প্রায় নয়টায় যাত্রীদল বালফোর পৌঁছিলেন। তাঁহাদিগকে ধরিয়া নাতালে নির্বাসিত করার জন্য সেখানকার রেল স্টেশনে তিনটি স্পেশাল ট্রেন অপেক্ষা করিতেছিল। যাত্রীদল সেখানে কিছুটা জেদাজেদি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দাবি জানাইলেন যে আমাকে সেখানে হাজির করিতে হইবে এবং আমি পরামর্শ দিলে তবে তাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়া গাড়িতে বসিবেন। যাত্রীদের এ জাতীয় আচরণ অন্যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন না করিলে সব কিছু নষ্ট হইবে এবং আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যাত্রীদের জেলে যাইবার জন্য আমাকে কি দরকার? সিপাই কখনও সেনাপতিকে মনোনীত করার দাবি করিতে পারে না অথবা তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ একজনের কথাই শুনিব বলিয়া জেদ করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত চ্যামনে এই লোকদিগকে গ্রেপ্তার করার জন্য শ্রীযুক্ত পোলক ও কাছলীয়া শেঠের সাহায্য চাহিলেন। যাত্রীদলকে অবস্থা বুঝাইতে এই বন্ধুদ্বয়ের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। তাঁহারা তাঁহাদিগকে বলিলেন যে কারাগার যাত্রীদের অন্তিম লক্ষ্য। সেইজন্য সরকার যখন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে চান তখন তাহাকে স্বাগত জানানো উচিত। একমাত্র এই উপায়েই সত্যাগ্রহীরা তাঁহাদের চরিত্রবল প্রকাশ করিতে পারেন ও তাঁহাদের সংগ্রামের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারেন। তাঁহাদের বুঝা দরকার যে অপর কোন পদ্ধতি আমার অনুমোদন পাইতে পারে না। যাত্রীরা বুঝিলেন ও শান্তিপূর্ণভাবে গাড়ীতে চড়িলেন।

আমাকে আবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হইল। যাত্রীদের নিকট হইতে আমাকে লইয়া আসার পর কি হয় সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিতাম না। আবার আমি জামিনে মুক্তি চাহিলাম। আমি বলিলাম যে দুইজন বিচারক পূর্বে আমাকে জামিন দিয়াছেন এবং আমাদের গন্তব্যস্থল আর দূরে নয়। আমি তাই অনুরোধ জানাইলাম যে, হয় সরকার সকল যাত্রীকে গ্রেপ্তার করুন, না হয় আমাকে নিরাপদে তাঁহাদের টলস্টয় ফার্মে পৌঁছাইয়া

দিতে দিন। ম্যাজিস্ট্রেট আমার আরজি মঞ্জুর করিলেন না তবে অবিলম্বে তাহা সরকারকে পাঠাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সময় আমাকে ডাণ্ডী হইতে জারি করা এক পরোয়ানার বলে গ্রেপ্তার করা হয়। তাই আমার বিচার সেইখানে হইবার কথা। আমার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে গিরমিটিয়াদের আমি নাতাল ত্যাগে প্ররোচিত করিয়াছি। সেইজন্য সেইদিনই আমাকে রেলযোগে ডাণ্ডী লইয়া যাওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত পোলক তো বালফোরে গ্রেপ্তার হইলেনই না, উপরন্তু কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ পাইলেন। শ্রীযুক্ত চ্যামনে এমন কি ইহাও বলিলেন যে, সরকারের তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা নাই। কিন্তু ইহা শ্রীযুক্ত চ্যামনের ব্যক্তিগত অভিমত, অথবা তখন পর্যন্ত তিনি সরকারের যে মত জানিতেন তাহাই। সরকারের মত তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলায়। তাই শেষ পর্যন্ত সরকার স্থির করেন যে, শ্রীযুক্ত পোলককে ভারতবর্ষে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং শ্রীযুক্ত কলেনবেককে—যিনি ভারতীয়দের পক্ষ হইতে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে কাজ করিতেছিলেন—তাঁহার সহিত গ্রেপ্তার করা হইবে। সুতরাং শ্রীযুক্ত পোলক যখন চার্লস্টাউনে গাড়ী ধরার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন তখন গ্রেপ্তার হইলেন। শ্রীযুক্ত কলেনবেকও গ্রেপ্তার হইলেন ও উভয়কেই ভোকস্রাস্ট জেলে রাখা হইল।

১১ই ডাণ্ডীতে আমার বিচার হইল ও আমাকে নয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইল। কিন্তু নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে সাহায্য ও প্ররোচিত করার অভিযোগে ভোকস্রাস্টের আদালতে আমার দ্বিতীয়বার বিচার তখনও বাকী ছিল। সুতরাং ১৩ই আমাকে ভোকস্রাস্টে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে শ্রীযুক্ত কলেনবেক ও শ্রীযুক্ত পোলকের সহিত মিলিত হওয়ায় খুব আনন্দ হইল।

১৪ই আমাকে ভোকস্রাস্টের আদালতে হাজিরা দিতে হইল। এই মামলার বৈশিষ্ট্য এই যে ক্রোমডারাই-এ আমি যে সাক্ষ্য দিই কেবল তাহার ভিত্তিতেই আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পুলিসের পক্ষে সাক্ষী যোগাড় করা শক্ত ছিল। সেইজন্য তাঁহারা আমার সাহায্য লইলেন। এখানকার আদালতে কেবল কয়েদী নিজে অপরাধ স্বীকার করিলে তাঁহাকে সাজা দেওয়া হইত না।

আমার বেলায় তো ইহা হইয়া গেল, কিন্তু শ্রীযুক্ত কলেনবেক ও শ্রীযুক্ত

পোলকের বিরুদ্ধে কোথা হইতে সাক্ষী জুটিবে? সাক্ষী না পাওয়া গেলে তাঁহাদিগকে সাজা দেওয়া অসম্ভব আবার তাঁহাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সাক্ষী যোগাড় করাও শক্ত। শ্রীযুক্ত কলেনবেক নিজের অপরাধ স্বীকার করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কেন না তাঁহার যাত্রীদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পোলকের ভারতবর্ষে যাওয়ার কথা এবং তাই এই সময়ে ইচ্ছা করিয়া জেলে যাওয়ার কথা চিন্তা করিতেছিলেন না। সেইজন্য আমরা তিনজনে মিলিয়া আলোচনান্তে স্থির করিলাম যে, শ্রীযুক্ত পোলক অপরাধ করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কেহই 'হাঁ' অথবা 'না' কিছুই বলিব না।

উভয়ের বিরুদ্ধেই আমিই সাক্ষী হইলাম। মামলা দীর্ঘদিন চলে, তাহা আমাদের কাম্য ছিল না। সেইজন্য একদিনেই যাহাতে প্রতিটি মামলা শেষ হয় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার বিরুদ্ধে মামলা ১৪ই শেষ হইল, কলেনবেকের বিরুদ্ধে মামলা শেষ হইল ১৫ই ও পোলকের বিরুদ্ধে সমাপ্ত হইল ১৭ই। ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের প্রত্যেককে তিন মাস করিয়া কারাদণ্ড দিলেন। আমরা ভাবিলাম যে এবার তিন মাস ভোকস্রাস্ট জেলে আমরা একত্র থাকিতে পারিব। কিন্তু সরকার তাহা হইতে দিলেন না।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন আমরা ভোকস্রাস্ট জেলে সুখে কাটাইলাম। এখানে রোজই নূতন কয়েদী আসিতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বাহিরের খবর পাওয়া যাইত। এই সকল সত্যাগ্রহী কয়েদীদের মধ্যে হরবৎ সিং নামে একজন প্রায় ৭৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ কয়েদী ছিলেন। তিনি কোনও খনিতে কাজ করিতেন না। অনেক বৎসর পূর্বে তাঁহার চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছিল বলিয়া তিনি হরতালের মধ্যে ছিলেন না। আমার গ্রেপ্তারের পর ভারতীয়দের মধ্যে উৎসাহ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল ও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নাতাল হইতে ট্রান্সভাল প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার হইতেছিলেন। হরবৎ সিং ছিলেন এই রকম একজন উৎসাহী ব্যক্তি।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেন জেলে আসিলেন? আপনার মত বৃদ্ধকে তো আমি জেলে আসিতে নিমন্ত্রণ দিই নাই?"

হরবৎ সিং জবাব দিলেন, "যখন আপনি, আপনার ধর্মপত্নী ও আপনার ছেলেরা আমাদের জন্য জেলে আসিলেন তখন আমি আর কি করিয়া বসিয়া থাকি।"

"কিন্তু আপনি তো কারাজীবনের দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন না। আমি

আপনাকে কারামুক্ত হইবার পরামর্শ দিতেছি। আপনার মুক্তির জন্য আমি চেষ্টা করিব কি ?"

"দয়া করিয়া সে চেষ্টা করিবেন না। আমি কিছুতেই জেলের বাহিরে যাইব না। শীঘ্রই আমাকে তো মরিতেই হইবে। তাই জেলেই মৃত্যু হইলে তাহা কী সুখের বিষয়ই হইবে !"

এই জাতীয় দৃঢ়তা টলানো আমার সাধ্যায়ত্ত নহে এবং আমি চেষ্টা করিলেও উহা টলিবার মত নহে। এই নিরক্ষর জ্ঞানীর নিকট আমার মাথা শ্রদ্ধায় নত হইল। হরবৎ সিং-এর ইচ্ছা পূর্ণ হইল, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী ডারবান কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার শব শত ভারতীয়ের উপস্থিতিতে সসম্মানে হিন্দুমতে সৎকার করা হইল। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে হরবৎ সিং একা ছিলেন না, এরকম অনেকে ছিলেন। তবে কারাগারে মৃত্যুবরণ করার মহান সৌভাগ্য কেবল হরবৎ সিং-এরই হইয়াছিল। সেইজন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে তাঁহার নাম সম্মানের সহিত উল্লেখ করার যোগ্য।

লোকে এইভাবে স্বেচ্ছায় কারাগারের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন অথবা কারামুক্ত হইয়া বন্দীরা আমার বাণী বাহিরে প্রচার করিবেন—ইহা সরকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। সরকার কলেনবেক, পোলক ও আমাকে আলাদা আলাদা করিয়া ভোকস্রাস্ট হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিলেন। বিশেষ করিয়া আমাকে এমন এক জেলে লইয়া যাওয়া হইবে কোনও ভারতীয় যেস্থানে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারেন। আমাকে সেইজন্য অরেঞ্জিয়ার রাজধানী ব্লুমফন্টেনের জেলে পাঠানো হইল। সেখানে মোট জনপঞ্চাশ ভারতীয়ের বাস। আর তাঁহারা সকলেই হোটেলে চাকুরি করিতেন। এখানকার জেলে আমিই একমাত্র ভারতীয় কয়েদী, বাকী সকলেই গোরা ও নিগ্রো। এই নিঃসঙ্গতায় আদৌ আমার দুঃখ হয় নাই। বরঞ্চ ইহাকে সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিলাম। আর আমার চোখ কান খোলা রাখার আবশ্যকতা নাই। আমার জন্য এক নূতন অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করিতেছে জানিয়া আমি সুখীই হইলাম। তাহা ছাড়া বহু বৎসর এবং বিশেষ করিয়া ১৮৯৩ সাল হইতে এ কয়েক বৎসর আমি পড়াশুনা করিতে পারি নাই। অতঃপর এক বৎসরকাল যে নির্বিঘ্নে পড়াশুনা করিতে পারিব এই সম্ভাবনায় আমার মনে আনন্দ হইল।

ব্লুমফন্টেন জেলে পৌঁছিলাম। এখানকার নির্জনতা অসীম। অসুবিধা

অনেক ছিল, কিন্তু সে সমস্ত সহনযোগ্য, তাই পাঠকের নিকট তাহার বর্ণনা করিব না। তবে এটুকু জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এখানকার ডাক্তার আমার মিত্র হইয়া গেলেন। জেলার কেবল নিজের কর্তৃত্বের কথাই বুঝেন। চিকিৎসক কিন্তু কয়েদীকে প্রাপ্য অধিকার দেওয়াইতে চেষ্টা করেন! এই সময় আমি কেবল ফলাহার করিতাম। দুধ, ঘি, অথবা ভাত ইত্যাদি খাইতাম না। আমার খাদ্য ছিল কলা, টোমাটো, কাঁচা চীনাবাদাম, লেবু ও জলপাইয়ের তেল। ইহাদের কোনও একটা খারাপ হওয়ার অর্থ আমার উপবাসী থাকা। ডাক্তার সেইজন্য ঐগুলি যত্নপূর্বক আনাইবার ব্যবস্থা করিতেন এবং উহার সহিত কাঠবাদাম, আখরোট ও ব্রাজিল-নাট দিতেন। আমার জন্য আনীত সব কিছু তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। আমাকে থাকার জন্য যে কারা-প্রকোষ্ঠ দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে হাওয়া চলাচলের অসুবিধা ছিল। ডাক্তার সাহেব তাহার দরজা খোলা রাখার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। দরজা খোলা রাখিলে জেলার চাকুরিতে ইস্তফা দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। জেলার লোক খারাপ ছিলেন না, কিন্তু তিনি যেভাবে চলিতেছিলেন তাহার পরিবর্তন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুর্দান্ত কয়েদীদের লইয়া তাঁহাকে ঘর করিতে হইত। আমার মত নম্রস্বভাব কয়েদীর প্রতি তিনি যদি ভাল ব্যবহার করেন, তবে উদ্দণ্ড স্বভাবের কয়েদীরা আস্কারা পাইয়া মাথায় উঠিবে বলিয়া তাঁহার বাস্তবিক ভয় ছিল। আমি জেলারের অবস্থা পুরাপুরি বুঝিতে পারিতাম। সেইজন্য ডাক্তার ও জেলারের মধ্যে আমাকে লইয়া যে বিবাদ হইত, তাহাতে আমার সহানুভূতি সর্বদাই জেলারের পক্ষে থাকিত। তিনি অভিজ্ঞ ও ঋজু স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন ও তাঁহার সামনের পথ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন।

শ্রীযুক্ত কলেনবেককে প্রিটোরিয়া জেলে ও শ্রীযুক্ত পোলককে জার্মিস্টন জেলে পাঠানো হইয়াছিল।

কিন্তু সরকারের এই সকল ব্যবস্থা কোন কাজের হয় নাই। আকাশই যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে জোড়াতাড়া দিবার স্থান কোথায়? নাতালের ভারতীয় শ্রমিকেরা পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়াছিলেন! তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায়

পরীক্ষা

স্বর্ণকার সোনা পরীক্ষা করার জন্য উহাকে কষ্টিপাথরে ঘষিয়া থাকেন। ইহাতেও তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হইলে উহাকে আগুনে ফেলিয়া পিটান, যাহাতে ময়লা থাকিলে তাহা বিদূরীত হইয়া কেবল খাঁটি সোনা থাকিয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের এখন এই ধরনের পরীক্ষা হইতেছিল। তাঁহাদের হাতুড়ি দিয়া পিটানো হইতেছিল, তাঁহারা অগ্নিদগ্ধ হইতেছিলেন এবং এই জাতীয় পরীক্ষার যাবতীয় প্রক্রিয়ায় উন্নীত হইলেই কেবল তাঁহাদের উপর শুদ্ধতার ছাপ দেওয়া হইতেছিল।

যাত্রীদিগকে ট্রেনে চাপানো হইয়াছিল বনভোজনের নিমন্ত্রণের জন্য নহে, অগ্নিশুদ্ধ করিবার জন্য। রাস্তায় সরকার তাঁহাদিগকে খাওয়াইবার কোনও ব্যবস্থাই করেন নাই। নাতালে পৌঁছানো মাত্রই তাঁহাদের নামে মামলা চালাইয়া তাঁহাদিগকে জেলে পাঠানো হয়। আমরা ইহাই আশা করিয়াছিলাম এবং এমন কি চাহিয়াও ছিলাম। কিন্তু হাজার হাজার শ্রমিককে জেলে রাখায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, আর ইহাতে ভারতীয়দেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া সরকার মনে করিলেন। ওদিকে কয়লার খনিগুলিও বন্ধ থাকিবে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলিলে সরকারের পক্ষে তিন পাউণ্ড কর রদ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। সরকার তাই একটি নূতন পরিকল্পনা করিলেন। কয়লাখনির এলাকা সমূহকে তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া সরকার ঐ সকল এলাকাকে ডাণ্ডি ও নিউকাস্‌ল জেলের বহির্বিভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং কয়লাখনির ইউরোপীয় কর্মচারীদের ওয়ার্ডার নিযুক্ত করা হইল। এইভাবে মজুরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার আবার তাঁহাদের মাটির তলে যাইতে বাধ্য করিলেন এবং খনিগুলি আবার চালু হইল। গোলামী আর চাকুরিতে পার্থক্য এই যে চাকর যদি কাজ ছাড়ে তবে তাহার নামে দেওয়ানী মোকদ্দমা চলে, আর গোলাম যদি কাজ ছাড়ে তবে গায়ের জোরে তাহাকে কাজে লাগানো যায়। সুতরাং এবার মজুরেরা সম্পূর্ণরূপে গোলাম হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ইহাতেই যথেষ্ট হইল না। মজুরেরা ছিলেন সাহসী। তাঁহারা খনিতে কাজ করিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে তাঁহাদিগকে সাংঘাতিক বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইল। উদ্ধত চরিত্রের লোকগুলি হঠাৎ সাময়িকভাবে সরকারের আমলা হইয়া শ্রমিকদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার পাইয়া তাঁহাদিগকে লাথি মারিলেন, গালাগালি দিলেন এবং আরও কত যে অত্যাচার করিলেন তাহার লেখাজোখা নাই। হতভাগ্য মজুরেরা এই সমস্ত ধৈর্যের সহিত সহ্য করিলেন। এই অত্যাচারের সংবাদ তারযোগে ভারতবর্ষে গোখলেকে জানানো হইত। মাত্র একদিন বিস্তারিত সংবাদ না পাইলেই তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া তারযোগে খবরাখবর লইতেন। এই সময় তিনি কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তিনি রোগশয্যা হইতেই এই সকল সংবাদ ভারতবর্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশুনা করার জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করিতেন এবং কি দিন কি রাত্রি তিনি ইহা লইয়া লাগিয়া থাকিতেন। পরিণামে সারা ভারতবর্ষ গভীরভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্ন ভারতবর্ষের প্রধানতম চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

এ সময়ে (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর) লর্ড হার্ডিঞ্জ মাদ্রাজে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতা করেন, যাহার ফলে বিলাত ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হইল। ভাইসরয়ের সাম্রাজ্যের অপর কোন উপনিবেশের প্রকাশ্য সমালোচনা করা উচিত নহে। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ শুধু যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের তীব্র সমালোচনা করিলেন তাহাই নহে, সর্বান্তঃকরণে তিনি সত্যাগ্রহীদের কার্য সমর্থন করিলেন—অন্যায় ও অসম্মানজনক আইনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আইন অমান্যকে সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন। বিলাতের কোন কোন মহলে লর্ড হার্ডিঞ্জের আচরণের বিরূপ সমালোচনা হইল। তিনি কিন্তু ইহার জন্য অনুতাপ না করিয়া তিনি যে পদক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহারও ঔচিত্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার এই দৃঢ়তা সর্বত্র ভাল প্রভাব সৃষ্টি করিল।

মুহূর্তকালের জন্য এই সাহসী অথচ দুঃখী কয়েদী মজুরদের কথা ছাড়িয়া খনির বাহিরে নাতালের অন্যত্র কি হইতেছিল তাহা দেখা যাক। খনিগুলি নাতালের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। কিন্তু সর্বাধিক ভারতীয় মজুর খাটিতেন উত্তর ও দক্ষিণ তীরবর্তী স্থানসমূহে। উত্তর তটস্থ স্থানের মধ্যে ফনিক্স, ভেরুলাম, টোঙ্গাট ইত্যাদির মজুরদের সহিত আমার ভালরকম

পরিচয় ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমার সহিত বুয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। দক্ষিণ দিকে ডারবান হইতে ইসিপিঙ্গো ও উমজিস্তো ইত্যাদি পর্যন্ত স্থানের ভারতীয় শ্রমিকদের সহিত আমার এত পরিচয় ছিল না এবং আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে ঐদিককার বাসিন্দা কম ছিলেন। তাহা হইলেও এই হরতাল ও জেলের কথা বিদ্যুৎবেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল এবং উভয় তীরবর্তী স্থান হইতে অপ্রত্যাশিত ও স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে হাজার হাজার শ্রমিক বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বেচিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন লড়াই দীর্ঘদিন চলিবে এবং পেটের জন্য অপরের উপর নির্ভর করা চলিবে না। আমি জেলে যাওয়ার সময় আরও শ্রমিকদের হরতাল করিতে দিবার বিরুদ্ধে সহকর্মীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। আশা ছিল যে, কেবল খনির শ্রমিকদের সাহায্যেই লড়াইয়ে জয় হইবে। মোট মজুর ছিলেন প্রায় ষাট হাজার এবং তাঁহাদের সকলেই যদি হরতাল করেন তবে তাঁহাদিগকে পোষণ করা কঠিন। এত লোক লইয়া চলার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। ইঁহাদের চালাইবার মত লোকবল বা খাওয়াইবার মত অর্থবল—কিছুই ছিল না। তাহা ছাড়া এতলোক একত্র হইলে একটা হাঙ্গামা ঠেকানো শক্ত।

কিন্তু বন্যা আসিলে সর্বব্যাপী প্রলয়কে ঠেকাইবে কে? সমস্ত স্থানের মজুরেরাই নিজ ইচ্ছায় ধর্মঘট করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের দেখাশুনা করার জন্যও সর্বত্র স্বেচ্ছাসেবকেরা ভার লইলেন।

সরকার এইবার চণ্ডনীতির শরণ লওয়া আরম্ভ করিলেন। জোর করিয়াই হরতালে বাধা দেওয়া হইতে লাগিল। মজুরদের পিছনে অশ্বারোহী সশস্ত্র পুলিস লেলাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে নিজ কর্মস্থানে ফিরাইয়া আনা হইত। কিছুমাত্র গোলযোগ করিলেই শ্রমিকদের উপর গুলী চালানো হইত। একদল ধর্মঘটী কাজে ফিরাইয়া লইবার প্রয়াসে বাধা দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জনকয়েক এমন কি ঢিল ছুঁড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুলী চলিল। অনেকে জখম হইলেন—কয়েকজন মরিলেন। শ্রমিকেরা কিন্তু হতোদ্যম হইলেন না। অনেক চেষ্টায় স্বেচ্ছাসেবকেরা ভেরুলামের নিকট এক ধর্মঘট বন্ধ করিলেন। কিন্তু সব শ্রমিকই কাজে ফিরিলেন না, অনেকে ভয়ে লুকাইয়া রহিলেন।

একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ভেরুলাম নামক স্থানে অনেক মজুর ধর্মঘট করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষের শতবিধ প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁহারা

কোনক্রমেই কাজে ফিরিতেছিলেন না। জেনারেল ল্যুকিন সিপাই লইয়া সেখানে হাজির হইলেন ও গুলী চালানোর হুকুম দিতে উদ্যত হইলেন। পার্শী রুস্তমজীর ছোট ছেলে সোরাবজী সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। মোটে আঠার বৎসর বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে ছিল খুব সাহসী। জেনারেলের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আপনি গুলী চালাইবার হুকুম দিবেন না। আমাদের এই লোকদিগকে আমি শান্তভাবে কাজে ফিরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিতেছি।" জেনারেল ছেলেটির সাহস দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে তাহার প্রেমের বল পরীক্ষা করার অবকাশ দিলেন। সোরাবজী শ্রমিকদিগকে বুঝাইল ও তাঁহারা তাহার যুক্তি মানিয়া লইয়া কাজে ফিরিয়া গেলেন। এইভাবে এক যুবকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নির্ভীকতা ও সপ্রেম অনুকম্পার জন্য কতকগুলি লোকের খুন হওয়া বন্ধ হইল।

পাঠকেরা অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এইপ্রকার গুলী চালানো ও ধর্মঘটীদের উপর সরকারের আচরণ বে-আইনী। ধর্মঘট করার জন্য নয়, যে সমস্ত খনি-শ্রমিক উপযুক্ত অনুমতি-পত্র ব্যতিরেকে ট্রান্সভাল প্রবেশ করেন তাঁহাদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে সরকারের আচরণ অন্ততঃ কিছুমাত্রায় আইনসঙ্গত ছিল। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্রতটে হরতাল করাকেই সরকার অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করেন। কোন আইনের বলে এরূপ করা হয় নাই, করা হইয়াছিল সরকারের গায়ের জোরে। শেষকালে গায়ের জোরই আইন হইয়া পড়ে। ইংরাজের আইনে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "রাজা কোনও অন্যায় করিতে পারেন না।" তাহার মানে কর্তৃপক্ষের সুবিধাই সর্বশেষ আইন। এই অভিযোগ তাবৎ সরকারের সম্বন্ধেই সমানভাবে খাটে। বাস্তবিকপক্ষে সাধারণ আইনকে এইভাবে শিকায় তুলিয়া রাখার জন্য সকল সময় দোষও দেওয়া যায় না। কখনও কখনও সাধারণ আইনের উপর নিষ্ঠা স্বয়ং আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়। লোকহিতের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ যখন এজাতীয় বিধিনিষেধের কারণ বিনষ্টির সম্মুখীন হন তখন বিবেকের নির্দেশে এজাতীয় বন্ধন অগ্রাহ্য করার অধিকার তাঁহাদের থাকে। তবে এইরূপ অবস্থা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ হামেসাই আইনের বিধিনিষেধ অতিক্রম করিতে অভ্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা লোকের উপকার হইতে পারে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে সরকারের অবাধে প্রভুত্ব খাটাইবার কোনও হেতু ছিল না। হরতাল করিবার অধিকার শ্রমিকেরা বহুদিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

হরতালকারীরা যে অসৎ-উদ্দেশ্য প্রণোদিত নহে সে কথা জানার যথেষ্ট উপাদান সরকারের নিকট ছিল। বড় বেশী হইলে হরতালের দ্বারা কেবল তিন পাউণ্ড কর রদ হইত। শান্তিপ্রিয় লোকেদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাই প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল না, ইহার উদ্দেশ্য ছিল সচরাচর ভারতীয়দের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন শ্বেতাঙ্গদেরই উপকার সাধন করা। সেইজন্য এইরূপ পক্ষপাতদুষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাবতীয় নিয়ন্ত্রণের বাঁধ ভঙ্গ করা কোনক্রমেই উচিত অথবা ক্ষমার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

সুতরাং আমার মতে এস্থানে ক্ষমতার সম্পূর্ণ অপব্যবহার হইয়াছিল। তাই যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই অপব্যবহার তাহা পূর্ণ হইতে পারে না। কখনও কখনও ক্ষণিক সিদ্ধি পাওয়া গেলেও স্থায়ী সমাধান এজাতীয় নিন্দার্হ পন্থায় হইতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে তিন পাউণ্ড কর বজায় রাখার জন্য সরকারকে এত সব উৎপীড়ন করিতে হয় গুলী চালানোর ছয় মাসের মধ্যে তাহা রদ হইয়া গেল। এইভাবে অনেক সময় দুঃখই সুখের পুরোগামী হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের দুঃখের আর্তনাদের প্রতিধ্বনি সর্বত্র শোনা গেল। প্রত্যুত আমি বিশ্বাস করি যে, যেমন কোনও যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের যথাস্থানে থাকার আবশ্যকতা আছে, তেমনি মানুষের যে কোন আন্দোলনেও প্রত্যেক পর্যায়েরই নির্দিষ্ট স্থান আছে। মরিচা ও ধুলাবালি ইত্যাদির কারণ যেমন যন্ত্রের গতি রুদ্ধ হয়, তেমনি কতকগুলি ব্যাপারের জন্য আন্দোলনেরও গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের নিমিত্তমাত্র এবং সেইজন্য কেন আমরা অগ্রসর হই আবার কিসের জন্যই বা বাধা পাই তাহা সব সময় জানিতে পারি না। তাই পন্থা বা উপায় সম্বন্ধে জানিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সাধন যদি পবিত্র হয় তবে পরিণাম সম্বন্ধে আমরা নির্ভয়ে নিশ্চিত থাকিতে পারি।

এই সংগ্রামে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, যুদ্ধরত ব্যক্তিদের দুঃখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং নিগৃহীত ব্যক্তিদের নির্দোষিতা ক্রমশঃ স্পষ্ট হওয়ার সহিত ইহার অবসানও ত্বরান্বিত হইতে লাগিল। আমি ইহাও দেখিতে পাইলাম যে, এই প্রকার শুদ্ধ, নিঃশস্ত্র ও অহিংস সংগ্রামের জন্য লোকবল অর্থ বা রসদ ইত্যাদি যে সকল উপকরণ প্রয়োজন যথাসময়ে তাহা আসে। অনেক স্বেচ্ছাসেবক যাঁহাদিগকে আমি জানিতাম না—আজও জানি না, তাঁহারা

স্বেচ্ছায় এই সময় সাহায্য করিয়াছেন। এই প্রকার সেবক বেশীর ভাগই নিঃস্বার্থ। আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহারা যেন অদৃশ্যভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। কেহ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করেন নাই, কেহ তাঁহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এমন কি ইহা জানেনও না যে তাঁহাদের এই অনামা কিন্তু অমূল্য এবং অবিস্মরণীয় প্রেমমণ্ডিত কার্য অতন্দ্র দেবদূতের চোখে ঠিকই পড়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের যে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছিল তাঁহারা তাহা হইতে সাফল্য সহকারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ও অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। যুদ্ধ-সমাপ্তির সূচনা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লিখিব।

সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়

সমাপ্তির সূচনা

পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যতটা শান্ত শক্তিপ্রয়োগ করিতে পারা যায়, ভারতীয়েরা তাহা করিয়াছিলেন। যতটা আশা করা যায় ইহা তাহা অপেক্ষাও বেশী। পাঠক ইহাও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে অহিংস প্রতিরোধ-কারীদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র ও নির্যাতিত এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন আশা পোষণ করাই সমীচীন নহে। তাঁহার হয়ত ইহাও স্মরণ আছে যে, ফিনিক্সে-এর দুই কি তিনজন দায়িত্ববান কর্মী ব্যতীত আর সকলেই তখন জেলে। ফিনিক্সের বাহিরের কর্মীদের মধ্যে শেঠ আহমদ মহম্মদ কাছলীয়া বাহিরে ছিলেন। ফিনিক্সে ছিলেন শ্রীযুক্ত ওয়েস্ট, তাঁহার ভগ্নী কুমারী ওয়েস্ট ও মগনলাল গান্ধী। কাছলীয়া শেঠ উপরের সাধারণ দেখাশুনার কাজ করিতেন। কুমারী শ্লেসিন ট্রান্সভালের সমস্ত হিসাবপত্র ও সীমান্ত লঙ্ঘনকারীদের দেখাশুনা করিতেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' ইংরাজী অংশ পরিচালনা করা ও গোখলের সহিত তারবার্তার আদান-প্রদানের ভার ছিল শ্রীযুক্ত ওয়েস্টের উপর। এখন নিত্য নূতন অবস্থার সূচনা হইতেছিল। এসময় পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করার প্রশ্নই উঠিতে

পারে না। পত্রের মতই লম্বা লম্বা তারবার্তা পাঠাইতে হইত। এই গুরু-দায়িত্ব শ্রীযুক্ত ওয়েস্টই লইয়াছিলেন।

খনি অঞ্চলের নিউকাস্‌লের মত ফিনিক্স এখন উত্তরাঞ্চলের হরতাল-কারীদের কেন্দ্র হইয়া পড়িল। শত শত লোক পরামর্শ ও আশ্রয়ের জন্য এখানে আসিতে লাগিলেন। সুতরাং এক্ষণে সরকারের নজর ফিনিক্সের উপরেই বা না পড়িবে কেন? আশেপাশের গোরাদেরও রক্তচক্ষু ইহার উপর পড়িল। ফিনিক্সে থাকা কতকটা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। তাহা হইলেও সেখানকার ছেলেপিলেরাও সাহস সহকারে বিপজ্জনক কায করিয়া যাইতেছিল। এই অবসরে ওয়েস্টকে গ্রেপ্তার করা হইল, যদিও তাঁহাকে ধরার কোনও কারণ ছিল না। আমাদের ব্যবস্থা এই ছিল যে, ওয়েস্ট ও মগনলাল গান্ধী ধরা দেওয়ার চেষ্টা তো করিবেনই না, বরং যতটা সম্ভব ধরা পড়ার সম্ভাবনাকে এড়াইয়া চলিবেন। সেইজন্য ওয়েস্ট ধরা পড়ার কোনও কাজ করেন নাই। কিন্তু সরকার সত্যাগ্রহীদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিবেন এমন আশা করা যায় না। আর যাঁহার অবাধ বিচরণের ফলে তাঁহারা বিব্রত বোধ করেন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার কোন অজুহাতের জন্য সরকারের অপেক্ষা করার প্রয়োজনই বা কি? কোন কিছু করার জন্য কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাই তাহা করিবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ। ওয়েস্টের গ্রেপ্তারের সংবাদ গোখলের নিকট যাওয়া মাত্র তিনি ভারতবর্ষ হইতে দক্ষ লোক পাঠাইবার নীতি গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহীদের সমর্থনে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সভায় এণ্ড্রুজ নিজের সমস্ত টাকাকড়ি তাহাদের জন্য দান করেন এবং সেই হইতেই তাঁহার উপর গোখলের নজর পড়িয়াছিল। সেইজন্য ওয়েস্টের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়াই তিনি তারযোগে এণ্ড্রুজের নিকট জানিতে চাহিলেন যে অবিলম্বে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা? এণ্ড্রুজ সম্মতি জানাইলেন। তাঁহার পরম প্রিয় মিত্র পিয়ার্সনও অবিলম্বে প্রস্তুত হইলেন এবং এই দুই বন্ধু পরবর্তী প্রথম স্টীমারেই দক্ষিণ আফ্রিকা যাইবার জন্য ভারত হইতে রওনা হইলেন।

কিন্তু এইবার সংগ্রাম শেষ হইয়া আসিতেছিল। হাজার হাজার নির্দোষ লোককে জেলে পুরিয়া রাখার শক্তি ইউনিয়ন সরকারের ছিল না। ভাইসরয় আর এ অবস্থা বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং জেনারেল স্মাট্‌স্ কি করেন তাহা দেখার জন্য সারা জগৎ অপেক্ষা করিতেছিল। অনুরূপ অবস্থায়

অন্যান্য সরকার সাধারণতঃ যাহা করিয়া থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারও তাহাই করিলেন। তদন্ত করার অবশ্যকতা কিছুই ছিল না। যে অন্যায় করা হইতেছিল তাহা সর্বজনবিদিত ছিল এবং এই অন্যায় দূর করার আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করিতেছিলেন। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ও দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, অন্যায় হইয়াছে এবং তাহার প্রতিবিধান আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার অবস্থা হইয়াছিল সাপের ছুঁচা গেলার মত। ন্যায়বিচার তিনি করিতে চান, কিন্তু ইহার শক্তি তিনি খোয়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। কারণ নিজেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার গোরাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে. তিনি তিন পাউণ্ড কর রদ বা অপর কোন সংস্কার করিবেন না। এখন সেই কর উঠাইয়া দিতে এবং অন্য সংস্কার করিতে তিনি বাধ্য হইতেছেন। জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাষ্ট্র অনুরূপ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য একটা কমিশন নিয়োগ করিয়া থাকে। এই কমিশন একটা নামমাত্র তদন্ত করেন, কেন না কমিশনের সুপারিশ পূর্ব হইতেই স্থির থাকে। সরকার কর্তৃক এ জাতীয় কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করা একটা প্রচলিত রেওয়াজ এবং সেইজন্য কমিশনের রায় কার্যকরী করার নামে প্রথমে যে ন্যায়বিচার প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল পরে সরকার তাহা করিয়া থাকেন। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ তিনজন সভ্যবিশিষ্ট এক কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কমিশন সংক্রান্ত কতকগুলি দাবি সরকার কর্তৃক প্রতিপালিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সম্প্রদায় কমিশন বয়কট করিবেন স্থির করিলেন। ইহার একটি দাবি ছিল এই যে. সত্যাগ্রহীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়দের কমিশনে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি থাকিবেন। প্রথম দাবি কমিশনই কতকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং সরকারের কাছে সুপারিশ জানাইয়াছিলেন যে, "তদন্ত কার্য যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করিতে দেওয়ার জন্য" শ্রীযুক্ত কলেনবেক, শ্রীযুক্ত পোলক ও আমাকে যেন বিনা শর্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর) ছাড়িয়া দিলেন। আমাদের বড় বেশী হইলে ছয় সপ্তাহের জন্য জেল খাটিতে হইয়াছিল। এদিকে ওয়েস্ট গ্রেপ্তার হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ ছিল না বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন পৌছাইবার পূর্বেই এই সব ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেইজন্য উভয়ে ডারবানে স্টীমার হইতে নামার সময় আমি তাঁহাদের অভ্যর্থনা

জানাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তাঁহারা স্টীমারে থাকাকালীন যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার কোনও সংবাদ তাঁহাদের জানা না থাকায় স্টীমার-ঘাটে আমাকে দেখিয়া তাঁহারা খুব আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন। এই মহাপ্রাণ ইংরেজদের সহিত এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

আমরা তিনজনেই মুক্তি পাইয়া নিরাশ হইলাম। আমরা বাহিরের কোনই খবর জানিতাম না। কমিশনের খবর শুনিয়া আমরা আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে কোনমতেই আমরা কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে পারি না। অন্তত: একজন প্রতিনিধিকে কমিশনে মনোনীত করার অধিকার ভারতীয়দের দেওয়া চাই বলিয়া আমি মনে করিলাম। এইজন্য আমরা তিনজনে ডারবানে পৌঁছিয়া ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে নিম্নোক্ত মর্মে এক পত্র দিলাম :

"আমরা কমিশন নিয়োগকে স্বাগত জানাইতেছি। কিন্তু উহাতে শ্রীযুক্ত এসিলেন ও ওয়াইলাইকে লওয়ায় আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। তাঁহারা প্রসিদ্ধ ও দক্ষ ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই অনেক সময় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মানুষ নিজের স্বভাব হঠাৎ পরিবর্তন করিতে পারেন না। এই দুই ভদ্রলোক যে হঠাৎ নিজেদের স্বভাব বদলাইতে পারিবেন, ইহা মনে করা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। আমরা অবশ্য একথা বলি না যে তাঁহাদিগকে কমিশন হইতে অপসারিত করা হউক। আমরা শুধু ইহাই প্রস্তাব করিতেছি যে তাঁহাদের ছাড়া অন্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগকেও উহাতে লওয়া হউক। এই প্রসঙ্গে আমরা স্যার জেম্‌স রোজ ইনেস্‌ ও মাননীয় ডবলিউ. পি. শ্রাইনারের নাম প্রস্তাব করিতেছি। ইঁহারা দুইজনেই বিখ্যাত লোক ও ন্যায়বান বলিয়া গণ্য। আমাদের দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, সকল সত্যাগ্রহী কয়েদীকে যেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহা না করিলে আমাদেরও জেলের বাহিরে থাকা মুশকিল হইবে। সত্যাগ্রহীদিগকে আর জেলে রাখার কোন কারণ নাই। তৃতীয়ত: আমাদের যদি কমিশনে সাক্ষ্য দিতে হয়, তবে খনি ও কলকারখানা ইত্যাদি অন্যান্য স্থানে যেখানে গিরমিটিয়ারা কাজ করেন সেখানে যাওয়ার অধিকার দিতে হইবে। আমাদের এই সব প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদিগকে পুনরায় জেলে প্রবেশের রাস্তা খুঁজিতে হইবে।"

জেনারেল স্মাট্‌স্ কমিশনে নূতন কোন সদস্য লইতে অস্বীকার করিলেন এবং জানাইলেন যে, কমিশন কোন পক্ষের জন্য নিযুক্ত হয় নাই, ইহার নিয়োগ কেবল সরকারের সন্তোষের জন্য। ২৪শে ডিসেম্বর এই জবাব পাওয়ার পর জেলে যাইবার প্রস্তুতি করা ছাড়া আমাদের সম্মুখে কোন গত্যন্তর রহিল না। আমরা তাই ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে এক প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিলাম যে, ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারী ডারবান হইতে ভারতীয় জেল-যাত্রীদের যাত্রা আরম্ভ হইবে।

কিন্তু জেনারেল স্মাট্‌সের জবাবে এমন একটি বাক্য ছিল, যাহার জন্য তাঁহাকে আবার একটি পত্র দিতে আমি প্রবুদ্ধ হইলাম। জবাবে এই কথা ছিল, "আমরা একটি নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়াছি। এ ব্যাপারে যেমন ভারতীয়দের পরামর্শ লওয়া হয় নাই, তেমনি খনির মালিক বা আখের ক্ষেতের মালিকদেরও পরামর্শ লওয়া হয় নাই।" আমি তাই ব্যক্তিগতভাবে জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে লিখিলাম যে, সরকার যদি ন্যায়বিচার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতকগুলি তথ্য জানাইতে চাই। জেনারেল স্মাট্‌স্ দেখা করিতে স্বীকার করিলেন এবং এইজন্য কুচ করা দিনকতকের জন্য মুলতুবী রহিল।

এদিকে গোখলে যখন শুনিলেন যে, আবার কুচ করার কথা চিন্তা করা হইতেছে তখন একটি দীর্ঘ তারবার্তার মাধ্যমে জানাইলেন যে আমরা এরূপ করিলে লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং তাঁহাকে বিব্রত অবস্থায় পড়িতে হইবে এবং আমরা যেন তাই কুচ বন্ধ করিয়া কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিয়া তাঁহার সহিত সহযোগিতা করি।

আমাদের উভয়-সঙ্কট উপস্থিত হইল। যদি কমিশনের সভ্যসংখ্যা ভারতীয়দের মনোমত করিয়া বাড়ানো না হয়, তবে ভারতীয়রা তাহা বর্জন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা লইয়া ফেলিয়াছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ হয়ত নারাজ হইবেন, গোখলে হয়ত দুঃখিত হইবেন, কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রতিজ্ঞা কি করিয়া ভঙ্গ করা যায়? এণ্ড্রুজ আমাদিগকে গোখলের ইচ্ছার, তাঁহার অসুস্থ শরীর এবং আমাদের সিদ্ধান্তের ফলে তিনি যে আঘাত পাইবেন তাহার কথা বিবেচনা করিতে বলিলেন। সেদিকে অবশ্য আমারও খেয়াল ছিল। সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া আলোচনান্তে চূড়ান্তভাবে স্থির করিলেন যে, কমিশনের সদস্যসংখ্যা না বাড়াইলে যত হানিই হোক্ না কেন, কমিশন

বর্জন করা হইবে। সেইজন্য প্রায় এক শত পাউণ্ড (১৫০০৲) খরচ করিয়া গোখলেকে এক দীর্ঘ তারবার্তা পাঠানো হইল। এণ্ড্রুজও আমাদের বক্তব্যের মর্মের সহিত সহমত হইলেন। ইহার ভাবার্থ এই প্রকার :

"আপনার দুঃখ বুঝিতে পারিতেছি। যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিয়াও আপনার পরামর্শ মত চলিতে ইচ্ছা রাখি। লর্ড হার্ডিঞ্জ অমূল্য সাহায্য করিয়াছেন এবং আশা রাখি যে শেষ পর্যন্ত তাহা পাইব। কিন্তু আমরা চাই যে, আমাদের অবস্থা আপনি যেন বুঝিয়া দেখেন। হাজার হাজার লোক একটি প্রতিজ্ঞা লইয়াছেন এবং এখন আর কোন বাছবিচার করার অবকাশ নাই। আমাদের সমস্ত সংগ্রাম প্রতিজ্ঞার ভিত্তির উপর রচিত। প্রতিজ্ঞার দৃঢ় বন্ধন না থাকিলে আমাদের মধ্যে অনেকে আজ পড়িয়া যাইতেন। হাজার হাজার লোকের গৃহীত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে নীতির যাবতীয় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে। যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করিয়া প্রতিজ্ঞা লওয়া হইয়াছিল এবং ইহাতে নীতিবিগর্হিত কিছুই নাই। সম্প্রদায়ের বয়কট করার শপথ লওয়ার অধিকার প্রশ্নাতীত। এই জাতীয় প্রতিজ্ঞা যেন ভাঙ্গা না হয়, যাহাই ঘটুক না কেন সকলেই অলঙ্ঘনীয় বিবেচনায় ইহা পালন করিবেন—এ পরামর্শ এমন কি আপনিও দিবেন, ইহাই আমরা চাই। এই তার লর্ড হার্ডিঞ্জকে দেখাইবেন। আপনি বিব্রত হউন ইহা আমরা চাই না। আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, একমাত্র তাঁহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এই লড়াই আরম্ভ করিয়াছি। গুরুজন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সাহায্য আমরা প্রার্থনা করি এবং তাহা পাওয়া গেলে খুশীও হই। তবে তাহা পাওয়া যাক আর নাই যাক আমাদের বিনম্র অভিমত এই যে সর্বদা সততা সহকারে প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা পালনে আপনার সমর্থন ও আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিতেছি।"

এই তার গোখলের নিকট পৌছানোর পর তাঁহার ভগ্নশরীরের উপর আঘাত করিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি পূর্বেরই মত, বরং তাহা অপেক্ষাও অধিক উৎসাহে সাহায্য করিতে লাগিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জকে তিনি এই ব্যাপার জানাইয়া তার পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমাদিগকে ত্যাগ তো করিলেনই না বরং আমাদের পদক্ষেপের সমর্থন করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জও স্থির রহিলেন।

আমি এণ্ড্রুজকে সঙ্গে করিয়া প্রিটোরিয়া গেলাম। এই সময়ে রেলের গোরা কর্মচারীদের বড় রকম হরতাল চলিতেছিল। ফলে সরকারের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই শুভক্ষণে আমাকে ভারতীয়দের কুচ আরম্ভ

করিতে বলা হইল। কিন্তু আমি ঘোষণা করিলাম যে, ভারতীয়রা এইভাবে রেলওয়ের হরতালকারীদের সাহায্য করিতে পারেন না। কারণ সরকারকে বিব্রত করা ভারতীয়দের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের লড়াই অন্যরকম। উহার পদ্ধতিও ভিন্ন। আমাদের যদি কুচ করিতেও হয় তবে অন্য সময়ে, যখন রেলওয়ের হাঙ্গামা শান্ত হইয়া যাইবে, তখন করিব। আমাদের এই সিদ্ধান্ত খুব ভাল প্রভাব সৃষ্টি করিল এবং রয়টার তারযোগে এই সংবাদ বিলাতে পাঠাইল। লর্ড এম্পথিল বিলাত হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তার করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ বন্ধুবর্গেরাও আমাদের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করিলেন। জেনারেল স্মাট্সের জনৈক সেক্রেটারী তামাশা করিয়া বলিলেন, "আপনাদিগকে আমার মোটেই পছন্দ হয় না, আপনাদিগকে আমি আদৌ কোনও সাহায্য করিতে চাই না। কিন্তু কি করিব? আপনারা আমাদের সঙ্কটের সময় সাহায্য করেন। আপনাদিগের উপর কি করিয়া হাত তোলা যায়? আমি অনেক সময়ে এই ইচ্ছাই করি যে, আপনারাও ইংরেজ হরতাল-কারীদের মত হাঙ্গামা শুরু করিয়া দিন। তাহা হইলে অবিলম্বে আপনাদিগকে শায়েস্তা করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনারা তো শত্রুরও ক্ষতি করিবেন না। আপনারা কেবল আত্মনিগ্রহ বরণ করিয়া জয়লাভ করিতে চান এবং কদাচ আপনারা সৌজন্য ও ভদ্রতার আপনাদের স্বতঃআরোপিত সীমা অতিক্রম করেন না। এমত অবস্থায় আমাদিগকে নাচার হইয়াই থাকিতে হয়।" এই ধরনের কথা জেনারেল স্মাট্স্ও বলিয়াছিলেন।

পাঠকদিগকে বলাই বাহুল্য যে, সত্যাগ্রহীরা এই প্রথম অপরের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করেন নাই। উত্তর সমুদ্রতটের ভারতীয় শ্রমিকরা হরতাল করার সময় ক্ষেতের কাটা আখ কলে আনিয়া মাড়াই না করিলে মাউণ্ট এডগিকম্বের ক্ষেত-মালিকদের খুবই লোকসান হইত। তাই সেখানে কাজ শেষ করিয়া দেওয়ার জন্য বারো শত ভারতীয় ফিরিয়া যান এবং কাজ শেষ করিয়া দিয়া আবার সাথীদের সহিত আসিয়া যোগ দেন। ডারবান মিউনিসিপ্যালিটির ভারতীয়দের ধর্মঘটের সময় ঝাড়ুদার, মেথর এবং হাসপাতালে যাঁহারা রোগীদের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহারাও খুশী হইয়া কাজে ফিরিয়া যান। সাফাই-এর কাজ ব্যাহত হইলে এবং হাসপাতালে রোগী পরিচর্যার লোক না থাকিলে শহরে রোগের প্রকোপ আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে ও রোগীরাও শুশ্রূষা হইতে বঞ্চিত হইবে। কোন

সত্যাগ্রহীর নিকট ইহা বাঞ্ছিত হইতে পারে না। সেইজন্য এই জাতীয় কর্মচারীদের হরতালের আওতা হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীকে প্রত্যেক পদক্ষেপেই বিরুদ্ধপক্ষের অবস্থার কথা বিচার করিতে হইবে।

সত্যাগ্রহীদের এই জাতীয় অসংখ্য সৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিটি সর্বত্র তাহার অদৃশ্য অথচ সুস্পষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করিতেছিল, ইহা আমি দেখিতে পাইতে-ছিলাম। ইহাতে ভারতীয়দিগের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতেছিল ও মিটমাটের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইতেছিল।

অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায়

প্রাথমিক মিটমাট

এমনি করিয়া মিটমাটের জন্য চারিদিকের অবস্থা অনুকূল হইতেছিল। আমি ও শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ যখন প্রিটোরিয়ায় পৌছাইলাম তখন স্যার বেঞ্জামিন রবার্টসন একটি বিশেষ স্টীমারে করিয়া সেখানে আসিয়া পৌছাইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু স্যার বেঞ্জামিনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া জেনারেল স্মাট্‌স্ দেখা করার জন্য যেদিন ধার্য করিয়াছিলেন সেই দিনই আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করার কারণও কিছু দেখিলাম না। কারণ লড়াইয়ের অন্তিম পরিণাম আমাদের শক্তির উপরেই নির্ভর করে।

আমরা দুইজনেই প্রিটোরিয়া পৌছিয়াছিলাম। তবে জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত আমার একারই দেখা করার কথা। এদিকে স্মাট্‌স্ সাহেব রেলে ধর্মঘটের কারণ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এই ধর্মঘট এত গুরুতর হইয়াছিল যে, ইউনিয়ন সরকারকেও সামরিক আইন জারি করিতে হইয়াছিল। ইউরোপীয় রেল কর্মচারীরা কেবল নিজেদের বেতন-বৃদ্ধি দাবি করেন নাই, শাসনক্ষমতা হাতে লওয়ার উদ্দেশ্যও তাঁহাদের ছিল। জেনারেলের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎকার খুব সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমি দেখিলাম যে যাত্রীদল প্রথম মহা অভিযান করার সময় তাঁহার ভিতর যে উষ্মা ছিল, আজ তাহা নাই। সে সময় জেনারেল স্মাট্‌স্ আমার সহিত এমন কি কথা বলিতেও প্রস্তুত

ছিলেন না। সত্যাগ্রহের ধমক তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনি বিদ্যমান। তবুও তখন তিনি কথা বলিতেও চাহেন নাই, আর আজ তিনি আমার সহিত পরামর্শ করিতে প্রস্তুত।

ভারতীয় সম্প্রদায়ের দাবি ছিল যে, ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে কমিশনে কাহাকেও লইতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে জেনারেল স্মাট্‌স্ কিছুতেই সম্মতিস্বীকার করিবেন না। তিনি বলিলেন, "উহা হইতে পারে না। উহাতে সরকারের প্রতিপত্তি খাটো হইবে। তাহা ছাড়া আমি যে সংস্কার সাধন করিতে চাই তাহাও করিতে পারিব না। আপনি জানিবেন যে শ্রীযুক্ত এসলেন আমাদের লোক এবং সংস্কার সাধন সম্বন্ধে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে যাইবেন না, বরঞ্চ সরকারের অনুকূল হইবেন। কর্ণেল ওয়াইলি নাতালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, তাহাকে হয়ত বা ভারতীয়দের প্রতিকূলও বলা যাইতে পারে। সেইজন্য ইঁহারাও যদি তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া দিবার সুপারিশ করেন, তবে সরকারের কাজ সহজ হইবে। আমাদের বহুবিধ অসুবিধা, তাই আমাদের কোনও অবকাশ নাই। সেইজন্য ভারতীয়দের সমস্যা মিটাইয়া ফেলিতে চাই। আপনাদের দাবি মিটাইয়া দেওয়া আমরা সাব্যস্ত করিয়াছি। কিন্তু ইহা করিতে কমিশনের সুপারিশ প্রয়োজন। আপনাদের অবস্থাও আমি বুঝিতে পারিতেছি। আপনারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে, ভারতীয়দের কোন প্রতিনিধিকে কমিশনে না লইলে আপনারা কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবেন না। আপনারা সাক্ষ্য নাই-বা দিলেন। কিন্তু যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে চান তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য কোন সক্রিয় আন্দোলন করিবেন না ও ইতিমধ্যে আপনাদের সত্যাগ্রহ মুলতুবী রাখিবেন। আমি মনে করি, এরূপ করিলে আপনারও লাভ হইবে ও আমিও শান্তি পাইব। ভারতীয় হরতালকারীদের উপর অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া আপনারা অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা সাক্ষ্য না দিলে তাহা প্রমাণিত হইবে না। কিন্তু ইহা পুরাপুরি আপনাদের বিবেচনার ব্যাপার।"

জেনারেল স্মাট্‌স্ এই ধরনের কথা বলিলেন। মোটের উপর আমি এ সকল কথা অনুকূল বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। সৈন্যদল ও কারাপ্রহরী কর্তৃক ধর্মঘটীদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করা সম্বন্ধে আমরা বহুসংখ্যক অভিযোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু কমিশন বর্জন করায় তাহা প্রমাণ করার অবকাশ আমাদের হইবে না— এই ধর্মসঙ্কট উপস্থিত হইল। ভারতীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ ছিল।

এক পক্ষ বলিতেছেন যে, ভারতীয়রা সৈন্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করা হোক্। তাই তাঁহারা বলিলেন যে, কমিশনে যদি সাক্ষ্য না দেওয়াই সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে আমাদের নিকট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে সব নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে তাহা সাধারণ্যে প্রচার করা হোক্ যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে মানহানির দাবিতে নালিশ করিতে পারেন। আমার ইহাতে মত ছিল না। কমিশন সরকারের প্রতিকূল কোন রায় দিবেন সে সম্ভাবনা ছিল না। মানহানির মোকদ্দমা লড়িতে গেলে সম্প্রদায় মহা ঝঞ্ঝাটে পড়িবে। ইহার নীট লাভ হইবে মাত্র এই সন্তোষটুকু যে অসদ্ব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণ করা গিয়াছে। ব্যারিস্টার বলিয়া আমি ভালভাবেই জানিতাম যে মানহানির অভিযোগ প্রমাণ করা শক্ত। কিন্তু আমার সব চাইতে বড় যুক্তি ছিল এই যে সত্যাগ্রহীকে তো দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে। সত্যাগ্রহ শুরু করিবার পূর্বেই সত্যাগ্রহী জানেন যে তাঁহাদের এমন কি মৃত্যুবরণ করিতে হইতে পারে এবং এ জাতীয় নিগ্রহ বরণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। এমতাবস্থায় তাঁহারা যে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন ইহা প্রমাণ করার কোন সার্থকতা নাই। প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছার সহিত সত্যাগ্রহের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া নিজের দুঃখ হইয়াছে প্রমাণ করার অসুবিধা থাকিলে শান্ত হইয়া থাকাই ভাল। সত্যাগ্রহী কেবল অপরিহার্য বিষয়ের জন্য লড়াই করেন। সেই অপরিহার্য বিষয় হইতেছে অন্যায় আইনকে রদ অথবা উপযুক্তভাবে পরিবর্তন করা। যখন ইহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান তখন অন্য ব্যাপার লইয়া মাথা না ঘামানোই ভাল। তাহা ছাড়া সত্যাগ্রহীর মৌনই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে তাহাকে সাহায্য করিবে। এই প্রকার যুক্তি দ্বারা বিরুদ্ধপক্ষের অধিকাংশকেই আমি স্বপক্ষে আনিতে পারিয়াছিলাম এবং অত্যাচারের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা না করাই আমরা স্থির করিলাম।

উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

পত্র আদান-প্রদান

জেনারেল স্মাট্‌স্ ও আমার কয়েকটি সাক্ষাৎকারের পরিণাম স্বরূপ যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করার জন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারীর আমার পত্রের মর্ম এই প্রকার ছিল:

"বর্তমানে কমিশন যেভাবে গঠিত তাহাতে তাহার নিকট সাক্ষ্য দেওয়ায় আমাদের বিবেকের বাধা আছে। আপনি আমাদের এই বাধার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন ও উহার প্রতি মর্যাদা দেখাইয়াছেন, কিন্তু আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা সম্ভব নহে বলিয়া জানাইয়াছেন। তবে আপনি ভারতীয়দের সহিত পরামর্শ করার নীতি স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া কমিশনের রায় প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এবং তাহার ভিত্তিতে বিধানসভার আগামী অধিবেশনে আইনের খসড়া উপস্থাপিত না করা পর্যন্ত কোন রকম সক্রিয় প্রচারকার্য দ্বারা কমিশনের কাজে বাধা না দিতে অথবা অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন আবার শুরু করিয়া সরকারকে বিব্রত না করিতে আমি আমার সম্প্রদায়কে পরামর্শ দিব। ভারতবর্ষের বড়লাট স্যার বেঞ্জামিন রবার্টসনকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিতেও সম্প্রদায়কে বলিতেছি।

"নাতালে ভারতীয়দের হরতালের সময় আমাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করার যে অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে জানাইতেছি যে, আমাদের প্রতিজ্ঞার জন্য কমিশনের নিকট তাহা প্রমাণ করার পথ বন্ধ। সত্যাগ্রহী হিসাবে আমরা ব্যক্তিগতভাবে অত্যাচারিত হওয়ার জন্য যথাসম্ভব অভিযোগ করিতে চাই না। তবে আমাদের নীরবতাকে যাহাতে ভুল বোঝা না হয় তাহার জন্য আমার অনুরোধ এই যে আপনি আমাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করুন এবং আমাদের মনোভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া কমিশনের সমক্ষে অভিযোগ সম্বন্ধে কোন রকম নেতিমূলক সাক্ষ্য হাজির করিবেন না।

"তাহা ছাড়া সত্যাগ্রহ মুলতুবী রাখার সহিত সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তির আবেদনও জড়িত।

"আমরা কি চাই সে কথাও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি :

১। তিন পাউণ্ড কর রদ করা।

২। হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি ধর্মানুমোদিত বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা।

৩। শিক্ষিত ভারতবাসীর এদেশে প্রবেশাধিকার।

৪। অরেঞ্জিয়ার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতির পরিবর্তন।

৫। বর্তমান আইনগুলি—বিশেষভাবে যাহা ভারতীয়দের সহিত সম্পর্কিত তাহার সৎপ্রয়োগ হওয়া চাই, অথচ তাহাতে কাহারও বর্তমান স্বার্থের কোনও ক্ষতি যেন না হয়।

"আমার এই বক্তব্য আপনি যদি অনুমোদন করেন তাহা হইলে এই পত্রের বক্তব্য মত আমার স্বদেশীয়দের পরামর্শ দিতে প্রস্তুত থাকিব।"

সেই দিনই জেনারেল স্মাট্সের নিকট হইতে যে উত্তর পাই তাহার মর্ম এইরূপ :

"আপনারা কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারিবেন না তজ্জন্য আমি দুঃখিত। তবে আপনাদের স্থিতি বুঝিতে পারিতেছি। অপর এক বিচারকের সামনে মানহানির মামলা উপলক্ষে হাজির হইয়া পুরাতন ক্ষতকে নূতন করিবার ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহের পিছনে যে মনোভাব ক্রিয়াশীল, তাহাও আমি উপলব্ধি করিতেছি। ভারতীয় ধর্মঘটীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগ সরকার স্বীকার করেন না। কিন্তু এই অভিযোগের পক্ষে যখন আপনারা সাক্ষ্য দিবেন না তখন সরকারী কর্মচারীদের আচরণের সমর্থনে সাক্ষ্য পেশ করিতে যাওয়া সরকারের পক্ষে নিরর্থক হইবে। সত্যাগ্রহী কয়েদীদিগকে মুক্তি দেওয়ার হুকুম আপনার পত্র পাওয়ার পূর্বেই সরকার দিয়াছেন। আপনার পত্রের শেষে অভিযোগের যে তালিকা দেওয়া আছে, কমিশনের সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত সরকার সে বিষয়ে কিছু করা মুলতুবী রাখিবেন।"

এই পত্রের আদান-প্রদান হওয়ার পূর্বে আমি ও শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ অনেকবার জেনারেল স্মাট্সের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে স্যার বেঞ্জামিন রবার্টসনও প্রিটোরিয়াতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্যার বেঞ্জামিন লোকপ্রিয় রাজকর্মচারী বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং তিনি গোখলের নিকট হইতে পরিচয়-পত্রও আনিয়াছিলেন। তথাপি আমি দেখিলাম যে সাধারণ ইংরাজ কর্মচারীর

দুর্বলতা সমূহ হইতে তিনি পুরাপুরি মুক্ত নহেন। তিনি আসার পর মুহূর্ত হইতেই ভারতীয়দের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন ও সত্যাগ্রহীদিগকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রিটোরিয়াতে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা হয় নাই। তাঁহার ধমক দেখাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে জানাইয়া আমি যেসব টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম তাহার কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত—তাই বা কেন, সকলের সহিতই আমি গোপনতাবিবর্জিত খোলামেলা আচরণ করি এবং সেইজন্য তিনি আমার মিত্র হইয়া পড়িলেন। তবে প্রায়ই আমি দেখিয়াছি যে যাঁহারা নিরাহংভাবে আত্মসমর্পণ করেন আমলারা তাঁহাদের ভয় দেখানোর রীতিই গ্রহণ করেন এবং যাঁহারা ভয় না পাইয়া সিধা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করেন।

এইভাবে প্রাথমিক মিটমাট হইল এবং সত্যাগ্রহ শেষবারের মত মুলতুবী হইল। অনেক ইংরাজ মিত্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা অন্তিম মিটমাটের সময় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভারতীয়দিগকে দিয়া এই মিটমাট স্বীকার করাইয়া লওয়া কিছুটা শক্ত ব্যাপার ছিল। যে উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ভাঁটা পড়ুক ইহা কাহারও অভিপ্রেত ছিল না। আর তাহা ছাড়া জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে বিশ্বাস করিবে কে? অনেকে আমাকে ১৯০৮ সালের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "একবার জেনারেল স্মাট্‌স্‌ আমাদের ঠকাইয়াছেন, নূতন বিষয় সত্যাগ্রহে আমদানি করা হইতেছে বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন এবং সম্প্রদায়কে অসীম সঙ্কটে ফেলিয়াছেন। তথাপি যে আপনি তাঁহাকে অবিশ্বাস করার শিক্ষা পাইলেন না ইহা কি কম দুঃখের কথা? আবার এই লোকটি আপনাকে দাগা দিবে এবং তখন আবার আপনি সত্যাগ্রহ করার কথা বলিবেন। কিন্তু তখন কে আপনার কথায় কর্ণপাত করিবে? ইহা কি কখনও সম্ভব যে, লোকে বারে বারে জেলে যাইবে ও বারে বারে বেকুব সাজিবে? জেনারেল স্মাট্‌সের মত লোকের সহিত একটিমাত্র উপায়ে মিটমাটই হইতে পারে—যাহা তিনি দিতে চাহেন তাহা হাতে হাতে দেওয়া। উঁহার নিকট প্রতিশ্রুতি লওয়ার কোন মূল্য নাই। যে ব্যক্তি কথা দিয়া কথা রক্ষা করেন না তাঁহাকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়?"

এই ধরনের যুক্তি যে উপস্থাপিত করা হইবে তাহা আমি জানিতাম এবং

তাই ইহাতে আশ্চর্য হই নাই। কিন্তু সত্যাগ্রহী যতবারই প্রতারিত হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত অবিশ্বাসের স্পষ্ট কারণ না থাকে ততক্ষণ তিনি প্রতিপক্ষের উপর আস্থা রাখিবেন। সত্যাগ্রহীর নিকট বেদনা আনন্দেরই সমতুল্য। সুতরাং কষ্টের ভয়ে তিনি ভিত্তিহীন অবিশ্বাসের প্রশ্রয় দিবেন না। পক্ষান্তরে তিনি নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস করেন বলিয়া প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না, ক্রমাগত প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করিবেন এবং এই আস্থা লইয়া চলিবেন যে এইরূপ আচরণের দ্বারা তিনি সত্যের শক্তিকে বলশালী ও বিজয়কে ত্বরান্বিত করিতেছেন। সুতরাং নানাস্থানে সভার অনুষ্ঠান হইল এবং শেষ অবধি এই মিটমাটের শর্ত ভারতীয়গণ কর্তৃক অনুমোদিত করাইতে পারিলাম। অতঃপর ভারতীয়েরা আরও ভাল ভাবে সত্যাগ্রহের তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। এবারকার মিটমাটের মধ্যস্থ এবং সাক্ষী ছিলেন শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ। ইহা ছাড়া ভারত সরকারের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন স্যার বেঞ্জামিন রবার্টসন। এই কারণে পরে মীমাংসা অগ্রাহ্য করার খুবই কম সম্ভাবনা ছিল। যদি আমি মিটমাট না করার জন্য জেদ করিতাম তাহা হইলে ইহা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত এবং পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে যে বিজয় অর্জিত হইয়াছিল তাহা নানাপ্রকার বিঘ্ন-কণ্টকিত হইয়া পড়িত। সত্যাগ্রহীর উপর যাহাতে কেহ এতটুকুও দোষারোপ না করিতে পারেন সেইজন্যই 'ক্ষমা বীরস্য ভূষণম' এই আপ্তবাক্য প্রচলিত। অবিশ্বাস ভয়ের লক্ষণ। সত্যাগ্রহে সকল প্রকার দুর্বলতাকে এবং সেইজন্য অবিশ্বাসকেও নির্বাসন দিতে হয়। প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করা নয়, জয় করাই যখন লক্ষ্য তখন সত্যাগ্রহে স্পষ্টতঃ অবিশ্বাসের কোন স্থান নাই।

এইভাবে ভারতীয়েরা মিটমাট অনুমোদন করার পর ইউনিয়ন পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কোন কাজ ছিল না। ইতিমধ্যে কমিশনের কাজ চলিতে লাগিল। কমিশনে খুব অল্প ভারতীয়ই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। সম্প্রদায়ের উপর সত্যাগ্রহীদের যে কি প্রবল প্রভাব সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা তাহারই পরিচায়ক। স্যার বেঞ্জামিন রবার্টসন অনেক ভারতীয়কে সাক্ষ্য দিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহের প্রবল বিরোধী কয়েকজন ছাড়া আর কাহাকেও রাজী করিতে পারেন নাই। কমিশন বর্জনের প্রভাব মোটেই খারাপ হয় নাই। কমিশনের

কার্য ত্বরান্বিত হইয়াছিল ও অনতিবিলম্বে প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতীয় সম্প্রদায় কমিশনের সাহায্য করেন নাই বলিয়া প্রতিবেদনে তাঁহাদের তীব্র সমালোচনা ছিল এবং সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও কমিশন বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। তবে অবিলম্বে সম্প্রদায়ের সকল দাবি পূর্ণ করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। তিন পাউণ্ড কর রদ করা, ভারতীয় বিবাহপদ্ধতি স্বীকার করা ও আরও কতকগুলি ছোটখাটো সুবিধা দেওয়া ইহার মধ্যে পড়ে। সুতরাং জেনারেল স্মাট্‌সের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই কমিশনের প্রতিবেদন ভারতীয়দের অনুকূল হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ বিলাত রওনা হইলেন। স্যার বেঞ্জামিন রবার্টসনও ভারতবর্ষে ফিরিলেন। কমিশনের সুপারিশ কার্যান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈয়ারী হইবে বলিয়া আমরা আশ্বাস পাইয়াছিলাম। কি প্রকার আইন হইয়াছিল ও কেমন করিয়া হইয়াছিল ইহা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

যুদ্ধান্তে

কমিশন প্রতিবেদন দাখিল করার অল্পদিন পরেই "ইণ্ডিয়ান্স রিলিফ বিল" অর্থাৎ যে আইন দ্বারা ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁহাদের বহুদিনের বিবাদের মীমাংসা হয় তাহার খসড়া ইউনিয়ন সরকারের গেজেটে বাহির হয়। অবিলম্বেই আমি কেপটাউনে গেলাম। কারণ ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট সেইখানেই বসিয়া থাকে। এই বিলে নয়টি ধারা ছিল। ইহার সমস্তটা "ইয়ং ইণ্ডিয়ার" মত পত্রিকার দুই কলমে ধরিয়া যায়। ইহার একটি অংশে ভারতীয়দের বিবাহের কথা ছিল এবং উহাতে বলা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষে যে সকল বিবাহ আইনমত সিদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তাহা সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার কেবল এইটুকু ব্যতিক্রম থাকিবে যে কোন এক সময় একাধিক পত্নীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনতঃ স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয় অংশে প্রত্যেক গিরমিটমুক্ত ভারতীয়কে স্বাধীনভাবে থাকিতে হইলে প্রতি বৎসর যে তিন পাউণ্ড কর দিতে হইত, তাহা রদ করা হইল। তৃতীয় অংশ দ্বারা নাতালের

ভারতীয়দের সরকার দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করার যে সার্টিফিকেট দিতেন এবং যাহাতে সার্টিফিকেটধারীর অঙ্গুষ্ঠের ছাপ থাকিত তাহার ভিত্তিতে তিনিই যে উল্লিখিত ব্যক্তি ইহা প্রমাণিত হইলেই তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকৃত হইল। এই বিলের উপর ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে দীর্ঘ এবং মনোরম আলোচনা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান্স রিলিফ বিলের বহির্ভূত প্রশাসনিক ব্যাপারের মীমাংসা জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত চিঠিপত্রদ্বারা করিয়াছিলাম। কেপকলোনিতে শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার, "বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত" শিক্ষিত ভারতবাসীদের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের অধিকার দান, বিগত তিন বৎসরে যে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকায় আগমন করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকার নির্ধারণ এবং যাঁহাদের একাধিক পরিণীতা স্ত্রী আছেন তাঁহাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বামীর সহিত মিলিত হইতে দেওয়া ইত্যাদি ইহার মধ্যে পড়ে। জেনারেল স্মাট্‌স্ তাঁহার ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুনের পত্রে এই সকল বিষয়ের আলোচনান্তে লেখেন, "প্রচলিত আইন প্রয়োগ সম্বন্ধে অতীতেও ইউনিয়ন সরকার চাহিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতেও চাহিবেন যে, এই সকল আইন ন্যায়পরতার সহিত এবং বর্তমানে যাঁহারা যে সুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহা রক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হউক।

সেই দিনই আমি নিম্নোক্ত মর্মে ইহার উত্তর দিই :

"আপনার আজকার তারিখের পত্র পাইলাম। আমাদের আলোচনার সময় আপনি যে ধৈর্য ও সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। 'ইণ্ডিয়ানস রিলিফ' বিল পাস হইবার পর এবং আপনার সহিত এই পত্র ব্যবহারের পর সত্যাগ্রহ-যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি হইতেছে। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ এই সংগ্রামের জন্য ভারতীয় সম্প্রদায়কে বহু শারীরিক নিগ্রহ ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। সরকারকেও প্রভূত পরিমাণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে হইয়াছে।

"আপনি জানেন যে, আমার কয়েকজন স্বদেশীয় ভাইয়ের দাবি বেশী ছিল। ট্রেড লাইসেন্স আইন, ট্রান্সভাল গোল্ড-ল, ট্রান্সভাল টাউনসিপ অ্যাক্ট ও ১৮৮৫ সালের ট্রান্সভালের তিন আইন ইত্যাদির কোনও পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া তাঁহারা অসন্তুষ্ট। কারণ ইহা না হইলে বসবাস করা, ব্যবসা করা অথবা জমির স্বত্ব পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার হয় না। অনেকের এই অসন্তোষও

আছে যে, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া অবাধে বসবাস করার অধিকার পাওয়া যায় নাই। ভারতীয়দের বিবাহ সংক্রান্ত আইনে যতটুকু অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী অধিকার পাওয়া যায় নাই বলিয়া কেহ কেহ অসন্তুষ্ট। উপরোক্ত সকল বিষয়কে সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন। আমি কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তবে এই সকল দাবি সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত না করিলেও একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, কোনও না কোন দিন সরকারকে এসব বিষয়ে সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতেই হইবে। ভারতীয় বাসিন্দাদের পূর্ণ নাগরিকের অধিকার না দেওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ সন্তোষ আশা করা যায় না।

"আমার স্বদেশীয়দিগকে আমি এই কথা জানাইতেছি যে, তাঁহাদিগকে ধৈর্য ধারণ করিতে হইবে এবং যাবতীয় সম্মানজনক উপায়ে এইরূপ লোক-মত গঠন করিতে হইবে যে, বর্তমানের এই পত্র-বিনিময়ের মাধ্যমে ভারতীয়দের যে সকল অধিকার দিবার স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে ভবিষ্যতে সরকার যেন তদপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন। আমি আশা রাখি যে, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা যখন ভাল ভাবে বুঝিবেন যে ভারতবর্ষ হইতে গিরমিটিয়া মজুর আসা বন্ধ হইয়াছে এবং গত বৎসরের বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা নূতন স্বাধীন ভারতীয়দের আসাও প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং যখন দেখিবেন যে আমার স্বদেশবাসীর এখানকার রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করার কোনও ইচ্ছা নাই, তখন এদেশের ইউরোপীয়দের মধ্যে ন্যায়বোধ জাগ্রত হইবে এবং পূর্বোক্ত অধিকার আমার স্বদেশবাসীকে যে দেওয়া প্রয়োজন ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন।

ইতিমধ্যে গত কয়েক মাসে যে ঔদার্য সহকারে সরকার এই সকল প্রশ্ন সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা যদি আপনার পত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মত বর্তমানের আইন-কানুন সমূহকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে সমগ্র ইউনিয়ন রাজ্যে ভারতীয় সম্প্রদায় কতকটা স্বস্তি পাইবে এবং সরকারকেও হয়রান করার কারণ হইবে না।"

উপসংহার

আট বৎসর পরে এমনি করিয়া এই মহান সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের অন্ত হইল, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়রা এবার শান্তি পাইল। হরিষ-বিষাদ মণ্ডিত অন্তরে আমি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই ইংলণ্ডে রওনা হইলাম—উদ্দেশ্য গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করা। হর্ষ এইজন্য যে বহু বৎসর পর আমি স্বদেশে ফিরিতেছি এবং গোখলের নেতৃত্বে দেশের সেবা করার সুযোগ পাইব। দুঃখ এইজন্য যে আমার জীবনের দীর্ঘ একুশ বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় মানবীয় অভিজ্ঞতার মধুর ও তিক্ত স্বাদ লাভ করিয়াছি এবং সেদেশে আমার জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছি।

সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের সুন্দর অবসানের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বর্তমানের দুঃখজনক তুলনা করিলে মুহূর্তের জন্য মনে হইতে পারে যে, সত্যাগ্রহের জন্য যে এত দুঃখ সহ্য করা গেল, তাহা বোধ হয় নিরর্থক হইয়াছে অথবা তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে মানবজাতির সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানের ক্ষমতা সত্যাগ্রহের নাই। এখানে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রকৃতির অন্যতম বিধান হইল, যে জিনিস যে উপায়ে পাওয়া যায় সে জিনিস সেই উপায়েই রাখা সম্ভব। দণ্ড দ্বারা লব্ধ বস্তু কেবল দণ্ড-দ্বারাই রাখা যায়, আর সত্য দ্বারা লব্ধ বস্তু সত্য দ্বারাই রাখা যায়। সেই জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা আজ যদি সত্যাগ্রহ অস্ত্রের ব্যবহার করেন তবে তাঁহাদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হইবে। সত্যাগ্রহে এমন কোন অলৌকিক বিশেষত্ব নাই যে, সত্য দ্বারা লব্ধ বস্তু সত্য ত্যাগ করিলেও রক্ষা করা যাইবে। ইহা সম্ভবপর হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। তাই বর্তমানে যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা খারাপ হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ তাঁহাদের মধ্যে সত্যাগ্রহীর অভাব। ইহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান ভারতীয়দিগকে দোষ দেওয়া হইতেছে না, সেখানকার বাস্তবিক অবস্থা ব্যক্ত করা হইতেছে। ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগোষ্ঠী নিজের ভিতর যে বল নাই তাহা অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিতে পারেন না। একের পর এক প্রবীণ সত্যাগ্রহীরা চলিয়া গিয়াছেন। সোরাবজী, কাছলীয়া, নাইডু, পার্শী রুস্তমজী প্রভৃতির স্বর্গবাস হওয়ায় সত্যাগ্রহের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ অল্প লোকই এখন রহিয়াছেন।

যে অল্প কয়েকজন রহিয়াছেন তাঁহারা এখনও যুদ্ধ করিতেছেন এবং আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নাই যে, তাঁহাদের মধ্যে সত্যাগ্রহের মশাল উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত থাকিলে সম্প্রদায়ের বিপদের দিনে তাঁহারা তাহাকে রক্ষাও করিতে পারিবেন।

অবশেষে পাঠকগণ একথা অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, এই মহাযুদ্ধ যদি না হইত এবং বহুসংখ্যক ভারতবাসী পরম নিষ্ঠাভরে যে অকথ্য দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন তাহা যদি না করিতেন, তাহা হইলে ভারতীয়েরা আজ দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত হইতেন। কেবল ইহাই নহে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা যে জয়লাভ করিয়াছিলেন তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের প্রবাসী ভারতবাসীদের বাঁচাইবার ঢাল স্বরূপ হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের উপর উৎপীড়ন হইলে এই সব অন্যান্য উপনিবেশের বাসিন্দা ভারতীয়রাও উৎপীড়িত হইতেন। কারণ তাঁহাদের মধ্যে সত্যাগ্রহ অনুপস্থিত এবং ভারতও তাঁহাদের রক্ষা করিতে অসমর্থ। সত্যাগ্রহ-অস্ত্রের কোনরূপ ত্রুটির জন্য এরূপ হইবে না। যদি এই ইতিহাস হইতে একথা অল্পবিস্তরও প্রমাণিত হইয়া থাকে যে সত্যাগ্রহ অমূল্য ও অতুলনীয় অস্ত্র এবং যাঁহারা ইহা প্রয়োগ করেন তাঁহাদের মধ্যে নৈরাশ্য বা পরাজয়ের স্থান নাই তাহা হইলে আমি কৃতার্থ বোধ করিব।

পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রস্তাবনা

পাঠকগণ জানেন যে উপবাসাদির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস কতকটা লেখার পর বন্ধ রাখিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে উহা পুনরায় পূর্বলিখিত অধ্যায়ের পর হইতে আরম্ভ করিতেছি। আমি আশা করি যে এক্ষণে ইহা নির্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব।

আজ এই ইতিহাস স্মরণ করিয়া আমি দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষে আমাদের বর্তমান যুদ্ধে এমন একটি জিনিসও নাই যাহা ক্ষুদ্র আকারে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুভূত না হইয়াছে—আরম্ভকালের সেই উৎসাহ, সেই সমর্পণ, সেই আগ্রহ; মধ্যকালের সেই নিরাশা, সেই অসুবিধা, পরস্পরের ভিতর ঝগড়া, দ্বেষ ইত্যাদি এবং তাহা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় লোকের অবিচল শ্রদ্ধা, দৃঢ়তা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও নানাপ্রকার প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত বাধা। ভারতবর্ষে এই যুদ্ধের অন্তিমকাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ-যুদ্ধে অন্তিম জয়লাভ করিয়াছি। এখানেও আমি সে ফল পাওয়ার আশা রাখি। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের অন্তিমকাল এই খণ্ডে অতঃপর বর্ণনা করা হইতেছে। কেমনভাবে অযাচিত সাহায্য আসিয়া পড়িয়াছিল, কেমন অনায়াসেই উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়া অবশেষে ভারতীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে জয়ী করিয়াছিল পাঠক এসকল দেখিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যেমন হইয়াছিল ভারতবর্ষেও তেমনি যে হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কেন না তপশ্চর্যা সত্য ও অহিংসার উপর আমার অখণ্ড শ্রদ্ধা রহিয়াছে। আমি ইহা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি যে সত্যের সেবকের সম্মুখে সারা জগতের সমৃদ্ধি পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লভ্য। অহিংসার সান্নিধ্যে বৈরভাব থাকিতে পারে না—এই বাক্য আমি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া জানি। যিনি দুঃখ সহ্য করেন তাঁহার কিছুই অলভ্য নাই—এই নীতির আমি উপাসক। এই তিন পদার্থের সংযোগ আমি কত সেবকের মধ্যে দেখিতেছি। তাঁহাদের সাধনা নিষ্ফল হইবে না বলিয়াই আমার নিঃসংশয় অভিজ্ঞতা।

হয়ত কেহ কেহ বলিবেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পূর্ণ জয় মানে ভারতীয়েরা পূর্বে যেমন ছিলেন আবার তেমনি হইলেন। এরূপ যাঁহারা বলিবেন তাঁহারা কিছুই জানেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ না হইলে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা কেন, সমস্ত উপনিবেশগুলিতেই ভারতীয়দিগকে আর তিষ্ঠিতে হইত না। একথাও বলা হয় যে সত্যাগ্রহ না করিয়া আপস আলোচনার শরণ লইলেও সেখানে আজিকার যে অবস্থা তাহাই হইত। এই যুক্তির কোনও ভিত্তি নাই। আর যেখানে যুক্তি কেবল অনুমানমাত্র সেখানে কোন্ অনুমান যে উত্তম কে বলিবে? সকলেরই অনুমান করার অধিকার আছে। কিন্তু যে কথাটার উত্তর দেওয়া যায় না, তাহা হইতেছে এই যে, যে-অস্ত্র দ্বারা যাহা অর্জন করা যায় সেই অস্ত্র দ্বারা তাহা রাখাও যায়।

সেই বাণ সেই ধনুক হাতে,
অর্জুনে আজ ডাকাত লুটে!

শিবকে যে অর্জুন হারাইয়াছিলেন, কৌরবদিগের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই অর্জুন যখন কৃষ্ণরূপী সারথি বর্জিত হইলেন তখন তাঁহার হাতে গাণ্ডীব ধনুক থাকিতেও একদল লুণ্ঠনকারীকে প্রতিহত করিতে পারিলেন না। সেই অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের হইয়াছে। এখনও তাঁহারা যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু যে সত্যাগ্রহ দ্বারা তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছিলেন সেই অস্ত্র যদি তাঁহারা খোয়াইয়া বসেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হারিতে হইবে। সত্যাগ্রহ তাঁহাদের সারথি ছিল, আর এই সারথিই তাঁহাদিগের সহায় হইতে পারে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

(নবজীবন, ৫-৭-১৯২৫)

সত্যাগ্রহ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদ

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২২

প্রথম খণ্ড ঃ সত্যাগ্রহ কি ?

॥ ১ ॥

সত্যাগ্রহ, অহিংস আইন অমান্য, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, অসহযোগ

সত্যাগ্রহের শাব্দিক অর্থ হল সত্যকে আঁকড়ে থাকা এবং তাই শব্দটির মানে হল সত্যের শক্তি। সত্য হল আত্মা বা চৈতন্য। সেইজন্য সত্যাগ্রহকে আত্মার শক্তিও বলা হয়। সত্যাগ্রহে হিংসা প্রয়োগের স্থান নেই। কারণ মানুষের চরম ও পরম সত্য জানার ক্ষমতা নেই এবং তাই সে শাস্তি দেবারও অধিকারী নয়। সত্যাগ্রহ শব্দটির ব্যবহার দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম শুরু হয়। ভোটের অধিকারের জন্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে সেকালে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আন্দোলন চলছিল তার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অহিংস আন্দোলনের পার্থক্য বোঝাবার জন্য শব্দটির প্রবর্তন করা হয়। দুর্বলের অস্ত্র হিসাবে এর কল্পনা করা হয়নি।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রয়োগ খাঁটি ইংরাজী অর্থে করা হয়ে থাকে এবং সার্বজনীক ভোটাধিকার প্রার্থী ও যুদ্ধবিরোধী—উভয় প্রকারের আন্দোলনকারীরাই এর শরণ নিয়ে থাকেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়েছে দুর্বলের অস্ত্র হিসাবে এবং জনসাধারণও একে তা-ই মনে করে থাকে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে দুর্বলের পক্ষে আচরণীয় সম্ভব নয় বিধায়ে হিংসা পরিহার্য বিবেচিত হলেও কোন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী যদি কখনও মনে করেন যে অবস্থাগতিকে এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে হিংসা একেবারে বর্জনীয় নাও হতে পারে। তবে চিরকালই সশস্ত্র প্রতিরোধের সঙ্গে এর পার্থক্য করা হয়েছে এবং এক সময়ে তো এর প্রয়োগ কেবল খ্রীষ্টান শহীদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন হল অনৈতিক আইন-কানুনকে ভদ্র ও শান্তিপূর্ণভাবে ভঙ্গ করা। আমি যতদূর জানি রাষ্ট্রের দাসত্বব্যঞ্জক আইন-কানুনের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে থোরো সর্বপ্রথম শব্দটির ব্যবহার করেন। আইন অমান্যের কর্তব্য সম্বন্ধে থোরো অতীব মূল্যবান রচনা লিখে রেখে গেছেন। তবে থোরো সম্ভবতঃ পুরোপুরি অহিংসার ধ্বজাধারক ছিলেন না।

আর তিনি সম্ভবতঃ তাঁর আইন অমান্যকে রাজস্ব বিভাগীয় বিধি-বিধান অর্থাৎ কর প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যে আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলাম তা ছিল সর্বপ্রকার অনৈতিক আইনের বিরুদ্ধে। এর তাৎপর্য ছিল এই যে অহিংস আইন অমান্যকারী ভদ্র অর্থাৎ শান্তিময় পদ্ধতিতে এই বিরোধ করবেন। এর পরিণামে তিনি আইনের দণ্ড মাথা পেতে নেবেন এবং সানন্দ চিত্তে কারাবরণ করবেন। এ ব্যাপার সত্যাগ্রহেরই একটি শাখা।

মূলতঃ অসহযোগের তাৎপর্য হল অসহযোগকারীর মতে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছে তার সঙ্গে সকল রকমের সহযোগিতার অবসান ঘটানো। এর সঙ্গে উপরে বর্ণিত তীব্র ধরনের আইন অমান্যেরও কোন সম্পর্ক নেই। অসহযোগের স্বধর্ম এমন যে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি-বিবেচনাযুক্ত শিশুও এতে যোগ দিতে পারে এবং জনসাধারণও কোন রকমের আশঙ্কা ব্যতিরেকে এর আচরণের সক্ষম। আইন অমান্যের পূর্ব শর্ত হল এই যে মানুষ আইনভঙ্গের দণ্ডের ভয়ে নয় স্বেচ্ছায় আইন পালন করতে অভ্যস্ত থাকবে। সুতরাং যাই হোক না কেন এর শরণ নেওয়া উচিত একেবারে শেষ অস্ত্র হিসাবে এবং অন্ততঃ প্রথম দিকে মুষ্টিমেয় সংখ্যক নির্বাচিত নর-নারী ছাড়া আর কেউ এর আচরণ করতে পারে না। অসহযোগও আইন অমান্যের মত সত্যাগ্রহেরই একটি শাখা, মধ্যে সত্যের মর্যাদা রক্ষার্থ যাবতীয় অহিংস প্রতিরোধই যার অন্তর্ভুক্ত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩-৩-১৯২১

॥ ২ ॥

সত্যাগ্রহ

সত্যাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান। দুর্বলের অস্ত্র হিসাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কল্পনা এবং লক্ষ্যপূর্তির জন্য প্রয়োজন বোধ করলে দৈহিক শক্তি বা হিংসার শরণ নেওয়া এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে সত্যাগ্রহ হল সবলতমের অস্ত্র এবং এতে কোন রকমের হিংসার স্থান নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন আমি তত্রস্থ ভারতীয়েরা পুরো আট বৎসর কাল যে শক্তি প্রয়োগ করেন তাকে ব্যক্ত করবার জন্য সত্যাগ্রহ শব্দটির প্রবর্তন করি। সে সময় ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নামে যে আন্দোলন চলছিল তার সঙ্গে আমাদের আন্দোলনের পার্থক্য বোঝানোর জন্য এই নূতন শব্দটি প্রবর্তন করার প্রয়োজন দেখা যায়।

শব্দটির মূল অর্থ হল সত্যকে ধরে থাকা বা আঁকড়ে থাকা—অর্থাৎ সত্যের শক্তি। একে আমি প্রেমশক্তি বা আত্মার শক্তিও আখ্যা দিয়ে থাকি। সত্যাগ্রহ প্রয়োগের গোড়ার দিকেই আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে সত্যের অনুশীলন তার বিরোধীর প্রতি হিংসা প্রয়োগ সমর্থন করে না। ধৈর্য ও সহানুভূতি দ্বারা তাঁকে অন্যায় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে। কারণ একের কাছে যা সত্য মনে হচ্ছে অপরের কাছে তা-ই ভ্রান্তি মনে হতে পারে। আর ধৈর্যের অর্থ হল আত্মনিগ্রহ। অতএব সত্যাগ্রহ-নীতির অর্থ হল বিরোধীর উপর নয়, নিজের উপর নিগ্রহ করে সত্যের মর্যাদা রক্ষা করা।

তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের তরফ থেকে সংগ্রামের একটা বড অংশই হল অযৌক্তিক আইনরূপী ভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আবেদন নিবেদন এবং ঐ জাতীয় পন্থাতেও যখন আইন প্রণয়নকারীদের এই ভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন করা সম্ভবপর হয় না, তখন আপনারা যদি অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার করতে রাজী না থাকেন তাহলে যে একমাত্র পথ আপনাদের সম্মুখে খোলা থাকে তা হল আইন প্রণয়নকারীর উপর দৈহিক শক্তি প্রয়োগে অথবা আইন ভঙ্গ করার জন্য যে সাজা প্রাপ্য তা-ই বরণ করে আত্মনিগ্রহের দ্বারা তাঁকে আপনাদের অনুবর্তী করা। সুতরাং জনসাধারণের চোখে সত্যাগ্রহ প্রধানতঃ অহিংস আইন অমান্য বা বৈধ প্রতিরোধ রূপে প্রতীয়মান হয়।

সাধারণ আইন-ভঙ্গকারী গোপনে আইন ভঙ্গ করেন এবং এর জন্য প্রাপ্য সাজা এড়াতে চান ; কিন্তু অহিংস আইন অমান্যকারীর উদ্দেশ্য তা নয়। আইন ভঙ্গ করলে যে শাস্তি পেতে হবে তার ভয়ে নয়, সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনাতে অহিংস আইন অমান্যকারী যে রাষ্ট্রের বাসিন্দা তার আইন-কানুন প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রাতেই মেনে চলেন। তবে বিরল হলেও সময় সময় তাঁর এমন মনে হয় যে কোন কোন আইন এত অন্যায় যে তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের অর্থ হল নিজের চরম অসম্মান। তখন তিনি প্রকাশ্য ও অহিংস পন্থায় সেই সব আইন অমান্য করেন এবং তার জন্য যে

শাস্তি প্রাপ্য নীরবে তা ভোগ করেন। আর আইন প্রণেতাদের কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য যেসব আইন নৈতিক ভ্রষ্টাচারের পর্যায়ে পড়ে না ইচ্ছা করলে তিনি সেগুলিকেও অমান্য করে রাষ্ট্রের সঙ্গে অসহযোগ করতে পারেন।

আমার মতে সত্যাগ্রহের সৌন্দর্য ও কার্যকুশলতা এত এবং এই আদর্শ এমন সহজ যে এমন কি শিশুদের কাছেও এর প্রচার করা যেতে পারে। গিরমিটিয়া ভারতীয় নামে পরিচিত সহস্র সহস্র পুরুষ নারী ও শিশুর কাছে আমি প্রভূত সাফল্য সহকারে এর প্রচার করেছি।

আমার নম্র নিবেদন এই যে যতই স্বৈরাচারী হোক না কেন কোন রাষ্ট্রের এমন কোন আইন প্রণয়ন করবার অধিকার নেই যা সমগ্র জনসাধারণের কাছে অপ্রীতিকর। আর ভারত সরকারের মত যে সরকার বৈধানিক বিধিবিধান ও নজীর দ্বারা চালিত হয় তার পক্ষে তো একথা উঠতেই পারে না। আমি এও মনে করি যে আগামী আন্দোলনকে যদি ব্যর্থতা বা হিংসার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হয় তাহলে তাকে একটা সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করতে হবে।

এইজন্য আমি সাহস করে দেশের সমক্ষে আইন অমান্য মূলক সত্যাগ্রহ উপস্থাপিত করেছি। আর এটা একান্তভাবে একটা আভ্যন্তরীণ ও শুদ্ধিকরণের আন্দোলন বলে আমি ৬ই এপ্রিল—এই একটি দিনের জন্য উপবাস, প্রার্থনা ও কর্মবিরতির প্রস্তাব রেখেছিলাম। কোন রকম সংগঠন ও পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই ভারতবর্ষের সুদূর প্রত্যন্ত প্রদেশ এবং এমন কি ছোট ছোট পল্লীগ্রামও এ ডাকে চমৎকার ভাবে সাড়া দিয়েছিল।…৬ই এপ্রিল জনসাধারণ কোন রকম হিংসার শরণ নেননি এবং পুলিসের সঙ্গেও উল্লেখযোগ্য কোন সংঘর্ষ হয়নি। সেইদিনকার হরতাল ছিল একান্তভাবে স্বেচ্ছামূলক ও স্বতঃপ্রণোদিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-৬-১৯২০

॥ ৩ ॥

হাণ্টার কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য

ক : লর্ড হাণ্টারের সঙ্গে সওয়াল জবাব

প্রঃ। শ্রীযুক্ত গান্ধী, আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনিই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জনক।

উঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রঃ। আপনি কি সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা করবেন ?

উঃ। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল হিংস পদ্ধতির স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং পূর্ণমাত্রায় সত্যের উপর আধারিত এই আন্দোলন। আমি যেভাবে আন্দোলনের কল্পনা করেছি তা হল গার্হস্থ্য বিধানকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা। আর আমার অভিজ্ঞতার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অভাব অভিযোগের নিরাকরণের জন্য দেশের কোণে কোণে হিংসা ছড়িয়ে পড়ার যে আশঙ্কা আছে একমাত্র এই আন্দোলনই পারে ভারতবর্ষকে তার হাত থেকে রক্ষা করতে।

প্রঃ। রাউলাট অ্যাক্টের বিরোধিতা করার জন্য আপনি এ আন্দোলন আরম্ভ করেন। আর সেই কারণে আপনি জনসাধারণকে সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্রে হস্তাক্ষর দিতে অনুরোধ করেন।

উঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রঃ। যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে আন্দোলনের জন্য সংগ্রহ করা কি আপনার উদ্দেশ্য ছিল ?

উঃ। হ্যাঁ, সত্য এবং অহিংসার নীতি মেনে চলবেন এমন যতজন পাওয়া যায়। এই নীতি অনুসরণ করে কাজ করবেন এমন দশ লক্ষ লোক পেলেও আমি তাঁদের সত্যাগ্রহীর তালিকাভুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করতাম না।

প্রঃ। এ আন্দোলন কি মূলতঃ সরকার বিরোধী নয় ? কারণ আপনি সরকারের ইচ্ছার পরিবর্তে সত্যাগ্রহ কমিটির ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করার অভিলাষী হয়েছিলেন।

উঃ। জনসাধারণ এই অর্থে আন্দোলনকে বোঝেনি।

প্রঃ। আমি আপনাকে সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি দেখার জন্য

অনুরোধ করছি। আপনি যদি স্বয়ং সরকার হতেন তাহলে আপনাদের কমিটি যেসব আইন ভঙ্গ করার জন্য এই আন্দোলন করছে তার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি হত ?

উঃ। সত্যাগ্রহ নীতির সবটুকু কিন্তু এতে স্পষ্ট হল না। সরকারের দায়িত্ব যদি আমার উপর থাকত এবং আমি যদি এমন একটি গোষ্ঠীর সম্মুখীন হতাম যারা কেবল সত্যের সন্ধানে কোন রকম হিংসার কারণ না নিয়ে অন্যায় আইনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য দৃঢ়সংকল্প তাহলে সেই গোষ্ঠীকে আমি অভিনন্দন জানাতাম এবং মনে করতাম যে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ আইন মেনে চলা মানুষের দল। শাসনকর্তা হিসাবে আমি তাহলে তাঁদের আমার উপদেষ্টারূপে পাশে পাশে রাখতাম যাতে তাঁরা আমাকে সঠিক পথে রাখতে পারেন।

প্রঃ। কোন বিশেষ আইন ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায়—এ নিয়ে কি জনসাধারণের মধ্যে মতানৈক্য হয় ?

উঃ। মূলতঃ এই কারণের জন্যই তো সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিংসা বর্জিত এবং সত্যাগ্রহী নিজের জন্য যতটা স্বাধীনতার অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি চান নিজ বিরোধীকেও ততখানি দিতে প্রস্তুত। সত্যাগ্রহীর পদ্ধতি হল নিজের উপর নিগ্রহবরণ করে যুদ্ধ করা।

প্রঃ। সরকারের অস্তিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ব্যাপারটি দেখছিলাম। আপনি যদি সরকারের বিরোধকারী এমন একদল লোক সৃষ্টি করেন যাঁরা সরকারের বক্তব্য না শুনে স্বতন্ত্র কমিটির বক্তব্য অনুসারে চলবেন তাহলে কোন সরকারের অস্তিত্ব বজায় রাখা কি সম্ভবপর হয় ?

উঃ। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটানা আট বছরের সংগ্রামের সময় এটা সম্ভবপর হয়েছিল। আমি দেখেছি যে সরকারের তরফ থেকে সেখানে যাঁকে এই আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয় সেই জেনারেল স্মাট্স্ আন্দোলনের অবসানে মন্তব্য করেছিলেন যে সবাই যদি সত্যাগ্রহীদের মত আচরণ করেন তাহলে কারও ভয়ের কোন কারণ নেই।

প্রঃ। কিন্তু এখানে যেভাবে আন্দোলনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাতে ঐ জাতীয় কোন প্রতিজ্ঞার স্থান ছিল না।

উঃ। অবশ্যই ছিল। সত্যাগ্রহী যেসব আইনকে অন্যায় মনে করছেন এবং যার চারিত্রধর্ম ফৌজদারী ধরনের নয় তার প্রত্যেকটির বিরোধিতা করে

সরকারকে জনসাধারণের ইচ্ছার সম্মুখে নত করার জন্য চেষ্টা করতে প্রতিটি সত্যাগ্রহী বাধ্য।

প্রঃ। আমার মনে হয় সত্যাগ্রহ কমিটি যেসব আইন ভঙ্গ করতে বলবে তা ভঙ্গ করা আপনাদের সংকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

উঃ। আজ্ঞে হাঁ। এই কমিটির কাছে আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের প্রতিজ্ঞাপণের ঐ অংশের উদ্দেশ্য হল সত্যাগ্রহীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। আমি একে গণ-আন্দোলনে পর্যবসিত করার অভিলাষী ছিলাম বলে যাতে কোন ব্যক্তি স্বয়ং আইনের শেষ কথা না হয়ে ওঠেন তার জন্য এ জাতীয় কোন কমিটি গঠন করাকে আমি অপরিহার্য মনে করেছিলাম। তাই আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম যে কোন্ কোন্ আইন ভঙ্গ করতে হবে এই কমিটি তা বলে দেবে।

প্রঃ। বলা হয়ে থাকে যে চিকিৎসকদের মধ্যেও মতদ্বৈধ হয়। সত্যাগ্রহীদের মধ্যেও তো তেমনি হতে পারে ?

উঃ। পারে। বেশ কিছুটা মূল্য দিয়ে আমিও সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

প্রঃ। ধরুন যদি কোন বিশেষ আইন সম্বন্ধে কোন সত্যাগ্রহীর মনে হয় যে সেটি ন্যায়সঙ্গত অথচ সত্যাগ্রহ কমিটি সেটি মানছে না, সেক্ষেত্রে সত্যাগ্রহীর কর্তব্য কি ?

উঃ। তিনি সে আইন অমান্য করতে বাধ্য নন। এ জাতীয় সত্যাগ্রহীর অনেক উদাহরণ আমাদের কাছে আছে।

প্রঃ। এটা কি একটা বিপজ্জনক আন্দোলন নয় ?

উঃ। আমারই মত আপনি যদি মনে করেন যে এ আন্দোলনের লক্ষ্য হল দেশকে হিংসার হাত থেকে বাঁচানো তাহলে এ সম্বন্ধে আপনার ধারণা আমার অনুরূপ হবে। আমি মনে করি যে যাই হোক না কেন, এ জাতীয় আন্দোলন আমাদের এই দেশে শুদ্ধরূপে বজায় থাকবে।

প্রঃ। আপনাদের সঙ্কল্পপত্রের দ্বারা আপনারা কি মানুষের বিবেককে আবদ্ধ করতে চাইছেন না ?

উঃ। আমার ব্যাখ্যা মত তা আমরা চাইছি না। সঙ্কল্পের আমার ভাষ্য যদি ভ্রমাত্মক প্রতীয়মান হয় তাহলে এমন কি আন্দোলনকে আবার গোড়া থেকে শুরু করেও আমি আমার ভ্রম সংশোধন করব। (লর্ড হান্টার—না না,

শ্রীযুক্ত গান্ধী। আমি আপনাকে সে পরামর্শ দেব না।)

আমার ইচ্ছা আমি (হাণ্টার) কমিটির এই ধারণা দূর করি যে সত্যাগ্রহ এক বিপজ্জনক নীতি। দেশকে হিংসার আদর্শের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই কেবল এর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রঃ। কোন বিরোধীর আপনার সঙ্গে মতদ্বৈধ হলে তাঁকে তো আর মুহূর্তের মধ্যে সন্তুষ্ট করা যায় না। এটা করতে হয় ধাপে ধাপে। আইন অমান্য করে এটা করতে যাওয়াটা কি একটা কঠোর পন্থা নয়?

উঃ। শ্রদ্ধা সহকারে আমি এই কথা নিবেদন করতে চাই যে আমি ধর্মাবতারের সঙ্গে সহমত নই। যদি আমি দেখি যে স্বয়ং আমার পিতা আমার বিবেকবিরুদ্ধ কোন আইন আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন তাহলে আমার মতে সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম কঠোর পন্থা হবে যথোচিত সম্মানসহকারে তাঁকে এই কথা জানিয়ে দেওয়া যে আমি সে আইন মানতে পারব না। এরকম করে আমি আমার পিতার উপর ন্যায়বিচার ছাড়া অপর কিছু করি না। এই কমিটির প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন না করে আমি একথা বলতে চাই যে নিজের ক্ষেত্রে আমি এই পন্থাই অতীব লাভজনকভাবে অবলম্বন করেছি, আর সে কথা আমি আগাগোড়া বলেও এসেছি। নিজের বাবাকে একথা বলায় যদি তাঁর অসম্মান করা না হয় তাহলে কোন বন্ধু—প্রত্যুত আমার সরকারকে একথা বলায় অসম্মান প্রদর্শন করার কথা উঠবে কেন?

প্রঃ। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে আপনারা যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন তাতে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বাত্মক হরতাল পালনের সিদ্ধান্তও ছিল। স্থির হয়েছিল যে সেই হরতালের দিনে কোন স্বাভাবিক কাজকর্ম হবে না এবং জনসাধারণ এইভাবে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাবেন। হরতালের অর্থ হল সমগ্র দেশে কাজকর্ম বন্ধ করা। এর পরিণামে কি এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না?

উঃ। দীর্ঘ দিন ধরে কাজকর্ম বন্ধ থাকলে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

প্রঃ। আপনি স্বীকার করছেন যে কর্মবিরতি স্বেচ্ছামূলক হবে?

উঃ। হ্যাঁ, একেবারে স্বেচ্ছামূলক। এমন কি হরতালের দিনে কাউকে হরতাল করার জন্য পীড়াপীড়িও করা চলবে না। তবে যতক্ষণ না দৈহিক শক্তিপ্রয়োগ করা হচ্ছে ততক্ষণ হরতালের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে ইস্তাহার এবং

অন্যান্য প্রচারকার্যের মাধ্যমে জনসাধারণকে হরতালের অনুকূল করার চেষ্টাকে একান্ত ন্যায়সঙ্গত আখ্যা দিতে হবে।

প্রঃ। হরতালের দিনে টাঙ্গা চলাচলে বাধাদানকারী জনসাধারণের কাজের কি আপনি বিরোধিতা করেন?

উঃ। নিশ্চয়।

প্রঃ। জনসাধারণের তরফ থেকে এই জাতীয় অন্যায় হস্তক্ষেপে পুলিস যদি তাতে বাধা দেয় তাহলে আপনার নিশ্চয় আপত্তি নেই?

উঃ। তাঁরা যদি যথোচিত সংযম ও সহিষ্ণুতা সহকারে একাজ করেন তাহলে আমার আপত্তি নেই।

প্রঃ। কিন্তু আপনি স্বীকার করেন যে হরতালের দিনে অন্য লোকদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করা কিংবা টাঙ্গা বন্ধ করার চেষ্টা করা খুবই অন্যায় হয়েছিল?

উঃ। সত্যাগ্রহীর ভূমিকা থেকে এসবকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।

প্রঃ। আপনার দিল্লীর প্রখ্যাত অনুগামী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (শ্রীযুক্ত গান্ধী বাধা দিয়ে বললেন, তাঁকে আমি আমার অনুগামী বলতে চাই না—তিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী) কি এ বিষয়ে আপনাকে একটি পত্র লিখে জানান যে দিল্লী ও পাঞ্জাবে যা ঘটে গেছে তার থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সাধারণ ধর্মঘট পালন করতে গেলে হিংসার বিস্ফোরণের প্রবল আশঙ্কা আছে?

উঃ। সে পত্রের পুরো বয়ান আমার স্মরণ নেই। তবে আমার মনে হয় তিনি আরও কিছুটা এগিয়ে মন্তব্য করেন যে জনসাধারণের মধ্যে অবাধে আইন ভঙ্গ করার আন্দোলন পরিচালনা করা অসম্ভব নয়। তিনি অবশ্য হরতালের বিশদ উল্লেখ করেননি। আমি যখন আইন অমান্য মুলতবী করলাম তখন তাঁর এবং আমার মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। জনসাধারণের উপর আমার মনোমত যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল না বলে আমি সে আন্দোলন মুলতবী রাখার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যা বলেছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই যে সত্যাগ্রহকে গণআন্দোলন মনে করা যায় না। আমি কিন্তু তাঁর মত মেনে নিতে পারিনি এবং আমি একথা জানি না যে আজও তিনি আমার মতে আসেননি। আইন-বিরুদ্ধ কাজ করলে তার বিরুদ্ধে যেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় তেমনি প্রয়োজনকালে অহিংস আইন অমান্য মুলতবী করা প্রয়োজন। (হাণ্টার) কমিটি হরতাল ও অহিংস আইন অমান্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করুন এটা আমি চাই। হরতালের উদ্দেশ্য হল জনসাধারণ ও

সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। পক্ষান্তরে অহিংস আইন অমান্য হল সম্ভাব্য অমান্যকারীদের পক্ষে অনুশীলন। এ জাতীয় কোন আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলন ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের মন বোঝার অপর কোন উপায় আমার সামনে ছিল না। অহিংস আইন অমান্যকে আমি কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব তার পরিমাপক যন্ত্র ছিল হরতাল।

* * * *

প্রঃ। ঐ ঘটনাগুলি (এপ্রিলের ১০-১২ই তারিখে জনসাধারণ কর্তৃক আমেদাবাদ এবং বিরামগাঁও-এ অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক ঘটনাবলী—অনুঃ) সম্বন্ধে আপনার বোধ হয় ব্যক্তিগতভাবে কিছু জানা নেই?

উঃ। না জানা নেই।

প্রঃ। আমাদের মতামত গঠনের জন্য ঐ ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে কিনা জানি না।

উঃ। আমার এই অভিমত আমি নিবেদন করতে চাই যে আমেদাবাদ বা বিরামগাঁও যেখানেই হোক না কেন জনসাধারণের কাজকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে অযৌক্তিক বিবেচনা করি। তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলাকে আমি একটি দুঃখজনক ঘটনা বলে মনে করি। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি এও মনে করি যে ন্যায়সঙ্গতভাবে হোক অথবা অন্যায়ভাবে যাঁদের ভিতর আমি জনপ্রিয় ছিলাম সরকার তাঁদের দারুণ পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছিলেন। তাঁদের অবশ্য আরও ভাল ভাবে এ ব্যাপার জানা উচিত ছিল। আমি একথা বলি না যে সরকার একটা ক্ষমার অযোগ্য বিচারবিভ্রম করেছিলেন এবং জনসাধারণ কোনই ভুল করেননি। পক্ষান্তরে আমার বিশ্বাস এই যে সরকারের তুলনায় জনসাধারণের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

এই ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য গান্ধীজী নিজের সাধ্যমত কতটা কি করেছিলেন অতপরঃ তিনি তা সবিস্তারে বললেন। নিজেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষের সহায়তায় নিবেদন করে দিয়েছিলেন।

প্রঃ। এই প্রশ্নটির উত্তর আপনি দিতে চাইবেন কিনা আমি জানি না। যেসব লোকে অপরাধ করেছেন তাঁদের সরকারী কর্তৃপক্ষ শাস্তি দেবেন—এটা সত্যাগ্রহের নীতি অনুসারে ঠিক কিনা?

উঃ। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ (শাস্তির মাধ্যমে) আপনি বাইরে থেকে চাপ দেবার অনুমান করছেন। আমি একথা বলব না যে পদ্ধতিটি

অন্যায়, তবে এর চেয়েও ভাল পদ্ধতি আছে। তবে আমার মতে সামগ্রিক ভাবে একথা বলা যায় যে কোন অপরাধীকে শাস্তি দিলে সত্যাগ্রহীর তা নিয়ে অনুযোগ করার কারণ নেই। সুতরাং এই অর্থে তিনি সরকারবিরোধী হতে পারেন না।

প্রঃ। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দেবার মত তথ্য যদি সত্যাগ্রহীর কাছে থাকে তা সরকারকে জানিয়ে সরকারের কাছে সহযোগিতা করা বাহ্যতঃ সত্যাগ্রহ-নীতির বিরোধী।

উঃ। সত্যাগ্রহ-নীতি অনুযায়ী এটা অসঙ্গতিপূর্ণ। এর সহজ কারণ এই যে পুলিসের কর্মপ্রণালীতে পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করা সত্যাগ্রহীর কাজ নয়। তবে জনসাধারণকে অধিকমাত্রায় আইন-কানুন পালনকারী ও কর্তৃপক্ষের চক্ষে মাননীয় করে তুলে সত্যাগ্রহী কর্তৃপক্ষ ও পুলিসের সহায়তা করে থাকেন।

প্রঃ। ধরুন কোন সত্যাগ্রহী এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় নিজের সাক্ষাতে কোন গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে দেখেছেন। এ অবস্থায় পুলিসকে খবর দেওয়া কি তাঁর কর্তব্য নয়?

উঃ। দেশের যুবশক্তিকে আমি বিপথে চালিত করতে চাই না। তবুও আমি বলব যে তিনি যেন তাঁর ভাই-এর বিরুদ্ধে না যান। "ভাই" শব্দটি ব্যবহার করার সময় আমি অবশ্য দেশ বা জাতির কোন পার্থক্য করছি না। সত্যাগ্রহী সম্পূর্ণভাবে এসব ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে। সত্যাগ্রহীর অবস্থা কতকটা কোন অভিযুক্তের পক্ষসমর্থনকারী আইনজীবির মত। মারাত্মক ধরনের অপরাধীদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে এবং সবিনয়ে আমি এই দাবি পেশ করতে চাই যে তাদের মধ্যে অনেককে অপরাধের জীবন থেকে নিবৃত্ত করতে আমি সহায়ক হয়েছি। এদের একজনের নামও প্রকাশ করলে আমি আর তাদের বিশ্বাসভাজন থাকতাম না। কিন্তু ধরুন যদি আমি তাদের হৃদয় জয়ে অক্ষম হতাম তাহলেও নিশ্চয় আমি তার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে পুলিসের কাছে গিয়ে তাদের খবর বলে দিতাম না। একথা বলতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নই যে একেবারে তাঁর চক্ষের সম্মুখে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে দেখলেও সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য না দেওয়াই সত্যাগ্রহীর পক্ষে সব চেয়ে সহজ কাজ। তবে এ নীতির ব্যবহার হবে কচিৎ কখনও এবং আজও আমি একথা বলতে পারি না যে অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় কোন

দুষ্কৃতিকারীকে ধরা পড়তে দেখলেও আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেব না।

খ : স্যার চিমনলাল শীতলবাদের সঙ্গে সওয়াল জবাব

প্রঃ। আপনার সত্যাগ্রহের নীতি আমি যতটুকু বুঝেছি তার তাৎপর্য হল সত্যের অনুসরণ প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় আপনি নিজের উপর নিগ্রহ বরণ করে নেন, অপর কারও উপর হিংসার প্রয়োগ করেন না।

উঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রঃ। যতই সততা সহকারে কেউ সত্যের সন্ধান করুন না কেন সত্য সম্বন্ধীয় তাঁর ধারণা আর সকলের ধারণা থেকে পৃথক হতে পারে। তাহলে সত্যের নির্ধারণ করবে কে?

উঃ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং একাজ করবেন।

প্রঃ। বিভিন্ন ব্যক্তির সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা হবে। এর পরিণামে কি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে না?

উঃ। আমার তা মনে হয় না।

প্রঃ। সৎ ভাবে সত্য উপলব্ধির চেষ্টা প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক।

উঃ। এই জন্য এর অহিংসার অংশ এত অপরিহার্য। অহিংসা ছাড়া বিভ্রান্তি কেন তার চেয়েও শোচনীয় পরিণতি হতে পারে।

প্রঃ। সত্য অনুসরণকারীর নৈতিক ও বৌদ্ধিক মান কি খুব উচ্চদরের হওয়া উচিত নয়?

উঃ। না। সকলের কাছ থেকে এটা আশা করা অসম্ভব। নিজ প্রচেষ্টায় "ক" যদি এমন সত্যের আবিষ্কার করে থাকে যা "খ", "গ" এবং অপরাপর ব্যক্তিদেরও গ্রহণীয় তাহলে আমি একথা আশা করব না যে তাঁদেরও সবার "ক"-এর মত নৈতিক ও বৌদ্ধিক মান থাকা প্রয়োজন।

প্রঃ। তাহলে আপনি এই কথা বলতে চান যে কেউ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর তাঁর থেকে বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক শক্তিতে ক্ষীণ অপর সকলকে তা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হবে?

উঃ। অন্ধভাবে নয়। আমি যা বলতে চাই তা হল এই যে প্রতিটি ব্যক্তি, যদি তিনি স্বয়ং স্বাধীনভাবে সত্যের সন্ধান না করতে চান তাহলে তাঁকে এমন কারও অনুসরণ করতে হবে যিনি সত্য নির্ধারণ করেছেন।

প্রঃ। আপনার পরিকল্পনায় তাহলে উচ্চ নৈতিক ও বৌদ্ধিক মানের ব্যক্তিরা সত্য নির্ধারণ করবেন এবং নিজেদের স্বল্পতর বুদ্ধির কারণ বহুল সংখ্যক ব্যক্তি এ জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না ও তাই তাঁরা প্রথমোক্তদের অন্ধভাবে অনুসরণ করবেন।

উঃ। একজন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যা আশা করা যায় তার চেয়ে বেশী কিছু তাঁদের কাছে আমি আশা করব না।

প্রঃ। আমি তাহলে একথা ধরে নেব যে অনুবর্তীর সংখ্যাধিক্যের উপরই প্রচারের শক্তি নির্ভর করে?

উঃ। না। সত্যাগ্রহে এমন কি একজনও সঠিক ধরনের সত্যাগ্রহী পাওয়া গেলে সাফল্য সম্ভবপর।

প্রঃ। শ্রীযুক্ত গান্ধী, আপনি বলেছেন যে এখনও আপনি নিজেকে নিখুঁত সত্যাগ্রহী বিবেচনা করেন না। তাহলে অধিকাংশ জনসাধারণ তো আরও অসম্পূর্ণ।

উঃ। না। নিজেকে আমি অসাধারণ মনে করি না। এমন অনেকে থাকতে পারেন যাঁরা সত্য নির্ধারণের ব্যাপারে আমার থেকেও যোগ্য। একেবারে সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন দক্ষিণ আফ্রিকার চল্লিশ হাজার ভারতীয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে তাঁরা সত্যাগ্রহী হতে পারেন। ট্রান্সভালে যে চমৎকার ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল তা যদি সব আপনাকে শোনাতে পারতাম তাহলে আপনি একথা জেনে বিস্মিত হতেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনার স্বদেশবাসীরা কী পরিমাণ সংযমের পরিচয় দিয়েছিল।

প্রঃ। কিন্তু সেখানে আপনারা সবাই একমত হয়ে কাজ করেছিলেন।

উঃ। দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে এখানে বেশী মতৈক্য আছে।

প্রঃ। কিন্তু সেখানে আপনাদের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট, এখানে তো তা নয়।

এখানেও আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট এবং তা হল রাউলাট আইন।

প্রঃ নিগ্রহ বরণ করে নিতে কি অসাধারণ আত্মসংযমের প্রয়োজন ঘটে না।

উঃ। না, কোন রকম অসাধারণ আত্মসংযমের প্রয়োজন ঘটে না। প্রতিটি মাতাই কৃচ্ছ্রসাধন করেন। আমার নিবেদন এই যে আপনার স্বদেশবাসীর ভিতর এই সংযমশক্তি বিদ্যমান এবং এর যথেষ্ট প্রমাণও তাঁরা দিয়েছেন।

প্রঃ। আমেদাবাদের কথাই ধরুন না কেন। সেখানকার অধিবাসীরা

কি সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন ?

উঃ। আমি কেবল এইটুকুই বলতে চাই যে সমগ্র ভারতবর্ষে যেখানে আপনি এ জাতীয় হিংসামূলক কার্যের বিচ্ছিন্ন নিদর্শন পাবেন সেখানে এমন বহু সংখ্যক মানুষের উদাহরণ পাওয়া যাবে যাঁরা আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছেন। আমেদাবাদ এবং ঐ জাতীয় অপরাপর জায়গার উদাহরণ থেকে এই কথাই বোঝা যায় যে এখনও আমরা সম্যকমাত্রায় আত্মসংযমী হতে পারিনি। গত বছর কৈরার জনসাধারণ প্রচণ্ড প্ররোচনার মধ্যেও প্রভূত আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছিল।

প্রঃ। আপনি কি বলতে চান যে এইসব হিংসাত্মক ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা ?

উঃ। দুর্ঘটনা নয়। এগুলি বিরল ঘটনা এবং সত্যাগ্রহ সম্বন্ধীয় ধারণা অধিকতর স্পষ্ট হলে এরা বিরলতর হবে। আমার মনে হয় দেশ এই নীতিকে দ্বিতীয়বার পরখ করার মত যথেষ্ট বুঝেছে। দৃঢ়ভাবে আমি বিশ্বাস করি যে সত্যাগ্রহের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাবার কারণ দেশ অধিকতর শুদ্ধ ও পবিত্র।

প্রঃ। সাধারণতঃ আপনার নীতির তাৎপর্য হল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা, জাতি-বিদ্বেষের অবসান এবং আত্মনিগ্রহ বরণ। কিন্তু এই নিগ্রহ কি অসদ্ভাবের জন্ম দেয় না ?

উঃ। আত্মনিগ্রহ বরণের ফলে জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে—এটা আমার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার বিরোধী। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তীব্র সংগ্রামের পর ভারতীয়েরা তত্রস্থ সরকারের সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ভাবের মধ্যে বাস করেছেন এবং সেখানকার ভারতবাসীরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জেনারেল স্মাস্‌ট্‌স্‌কে এক অভিনন্দনপত্রও দেন।

প্রঃ। সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প না নিয়ে কি এ আন্দোলনে ভাগ নেওয়া যায় ?

উঃ। আমি তাঁদের আন্দোলনের অহিংস আইন অমান্য পর্যায় ছাড়া অপরাপর অংশে ভাগ নেবার পরামর্শ দেব। তবে সঙ্কল্প গ্রহণ না করা পর্যন্ত জনসাধারণ আইন অমান্য করবেন না। অতএব যাঁরা আইন অমান্যকারী নন তাঁদের জন্য পৃথক এক সঙ্কল্পবাক্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে তাঁরা যে-কোন মূল্যে সত্য অনুসরণ করবেন এবং হিংসা থেকে বিরত থাকবেন। সে সময় আমি আইন অমান্যের অংশ মুলতবী রেখেছিলাম। সঙ্কল্পের যে কোন একাংশের উপর পরিস্থিতি অনুসারে জোর দেবার অধিকার নেতার সর্বদাই

থাকে। সুতরাং সে সময় জনসাধারণের পক্ষে উপযোগী নয় বিধায়ে আমি আইন অমান্যের অংশ বাদ দিই এবং সত্যের অংশ তাঁদের সম্মুখে উপস্থাপিত করি।

প্রঃ। সরকারকে বিব্রত করা কি সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নয়?

উঃ। কিছুতেই না। সত্যাগ্রহী কাউকে বিব্রত করার নীতিতে বিশ্বাসী নন। ন্যায়বিচার পাবার জন্য তিনি আত্মনিগ্রহের নীতিতে আস্থাশীল।

প্রঃ। এর ফলে সুষ্ঠুভাবে সরকারের কাজকর্ম চালানো কি অসম্ভব হয়ে পড়বে না?

উঃ। সম্পূর্ণভাবে নিরীহ ব্যক্তিরা যদি আইন ভঙ্গ করেন তাহলে সরকারের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলা বন্ধ হতে পারে না। তবে যদি দেখি যে সরকার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন তাহলে অবশ্যই আমি সরকারের কাজকর্ম চলা অসম্ভব করে তুলব।

প্রঃ। জনসাধারণের প্রতি আপনার আবেদনে আপনি তাঁদের হিংসা পরিহার করতে বলেছিলেন, কিন্তু তবুও হিংসা সংঘটিত হয়। এর থেকে এই কথাই প্রতিপাদিত হয় না কি যে সাধারণ লোকের পক্ষে অহিংস-নীতি অনুযায়ী আচরণ করা অতীব দুরূহ।

উঃ। বহুদিন যাবৎ হিংস পদ্ধতির সহায়তা নেবার পর তাঁদের পক্ষে এর থেকে নিবৃত্ত হওয়া কঠিন।

গ : পণ্ডিত জগৎনারায়ণের সঙ্গে সওয়াল জবাব

প্রঃ। কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল সরকারকে বিব্রত করা। আপনার আন্দোলন সম্বন্ধে আপনি কি এরকম কোন আশঙ্কা পোষণ করেন না?

উঃ। সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলন সময় সময় এই জাতীয় উদ্দেশ্যে শুরু হলেও সত্যাগ্রহ সরকারকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ করা হয় না। তবে সত্যাগ্রহী যদি দেখেন যে তাঁর কার্যের পরিণাম স্বরূপ সরকার বিব্রত হচ্ছেন তবে তিনি সে অবস্থার সম্মুখীন হতে দ্বিধাবোধ করবেন না।

প্রঃ। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে সহমত হবেন যে প্রত্যেক রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্য তার অনুবর্তীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

উঃ। আমি বিশ্বাস করি না যে ন্যায়সঙ্গত দাবির সাফল্যের জন্য সংখ্যা-

শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। এ ব্যাপারে উচ্চনীচ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের হাতেই প্রতিবিধানের পন্থা বিদ্যমান।

প্রঃ। কিন্তু আপনি নিশ্চয় আপনার আন্দোলনে যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে পাবার চেষ্টা করবেন।

উঃ। ঠিক তা নয়। সত্যাগ্রহী কেবল সত্য ও সেই সত্যের খাতিরে নিজের নিগ্রহ বরণের ক্ষমতার উপর নির্ভর করেন।

প্রঃ। কিন্তু মহাত্মাজী, রাজনীতিতে একক একজন মানুষের কণ্ঠস্বর কি করে শ্রুতিগোচর হবে?

উঃ। ঠিক এই কথাটা ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্যই আমি কাজ করছি।

প্রঃ। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে কোন ইংরেজ রাজকর্মচারী কোন বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রতি দৃকপাত করবেন?

উঃ। কেন নয়? আমার অভিজ্ঞতায় আমি এরকম দেখেছি। কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সাধারণ শ্রীযুক্ত বেণ্টিঙ্ক হন।

প্রঃ। আপনি তো একটি অসাধারণ মানুষের উদাহরণ দিচ্ছেন।

উঃ। সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষও নৈতিক শক্তির বিকাশ করতে পারে। আমাদের দেশের জনসাধারণের নিরক্ষরতাকে অবশ্যই আমি এক শোচনীয় ব্যাপার বলে বিবেচনা করি, আর তাঁদের যে শিক্ষিত করে তোলা দরকার—এও আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তবুও বলব যে একেবারে নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষেও সত্যাগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব। এটা আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা।

এখানে শ্রীযুক্ত গান্ধী সংক্ষেপে হরতাল ও সত্যাগ্রহের পার্থক্য বর্ণনা করলেন। হরতাল সত্যাগ্রহের অভিন্ন অঙ্গ নয়। নেহাৎ দরকার পড়লেই তবে হরতালের শরণ নিতে হবে। শ্রীযুক্ত হর্নিম্যানের বহিষ্কার ও খিলাফৎ আন্দোলনের সময় তিনি সাফল্য সহকারে এর প্রয়োগ করেছেন।

প্রঃ। দায়িত্বজ্ঞানহীন বিদেশী রাজকর্মচারীদের বিরোধিতা করার অপর কোন পদ্ধতির শরণ নিতে পারছেন না বলেই আপনি এই আন্দোলন শুরু করেছেন। তাই নয় কি?

উঃ। জোর করে আমি সেকথা বলতে পারছি না। ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করার জন্য সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথাও আমি কল্পনা করতে পারি। অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে আমাদের মন্ত্রীরা

আজ কদাচ আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন না, যদিচ ইংরেজ রাজকর্মচারীরা এ জাতীয় কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন।

প্রঃ। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলে আমরা মন্ত্রীদের বরখাস্ত করতে সমর্থ হব।

উঃ। এই ব্যাপারে আমি চিরকালের জন্য এতটা আশ্বস্ত বোধ করতে পারছি না। ইংলণ্ডে সময় সময় এও দেখা যায় যে জনসাধারণের সবটুকু আস্থা হারানোর পরও কোন কোন মন্ত্রীর মন্ত্রীসভায় ঠাঁই হয়। এদেশেও এরকম হতে পারে। সুতরাং আমি এমন একটা অবস্থার কল্পনা করতে পারি যখন এদেশে স্বায়ত্তশাসনের আওতাতেও সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা থাকবে।

প্রঃ। আপনি কি মনে করেন যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর কোন আলোড়ন সৃষ্টি হবে না?

উঃ। আমি যে শুধু মনে করি না তা-ই নয়, অনসূয়া বেন ও আমার গ্রেপ্তারের পর যদি এ জাতীয় কোন আলোড়ন না হত তা হলে আমি হতাশ হতাম। কিন্তু সে আলোড়ন হিংসার রূপ নেবে না। অপরে নিগৃহীত হচ্ছে দেখে সত্যাগ্রহীর কষ্ট হয়। সত্যাগ্রহীরা একের পর অপরে কারাবরণ করবেন। এ জাতীয় আলোড়ন আমি অবশ্যই চাই।

ক ও খ—ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১-১৯২০, গ—ঐ, ৪-২-১৯২০

॥ ৪ ॥

সত্যাগ্রহের আদর্শ ও বাস্তব রূপায়ণ

শেষ অবধি সত্যাগ্রহ আর্থিক বা অন্যবিধ ভৌতিক সহায়তার সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ। আর এর প্রাথমিক- পর্যায়ের সঙ্গেও যে দৈহিক শক্তি বা হিংসার সম্বন্ধ নেই একথা বলাই বাহুল্য। প্রত্যুত হিংসা হচ্ছে এই মহান আধ্যাত্মিক শক্তির অস্বীকৃতি এবং যাঁরা সম্পূর্ণভাবে হিংসা বর্জন করবেন তাঁরাই কেবল এই শক্তির অনুশীলন ও প্রয়োগে সমর্থ হবেন। এ শক্তি ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তি-গোষ্ঠী সবাই প্রয়োগ করতে পারেন। রাজনীতি ও গৃহস্থালী—উভয় ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার হতে পারে। এর বিশ্বজনীন প্রয়োগ এর শাশ্বত ও অজেয় চারিত্রধর্মের লক্ষণ। পুরুষ নারী শিশু নির্বিশেষে সবাই এর প্রয়োগ করতে পারে। দুর্বল যতদিন

না হিংসা দিয়ে হিংসার প্রত্যুত্তর দিতে পারছে কেবল ততদিন এ শক্তি তাদের দ্বারা প্রযোজ্য—একথা একেবারেই ভ্রমাত্মক। এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে রয়েছে "প্যাসিভ রেসিস্টেন্স"—এই ইংরাজী প্রতিশব্দটির অপূর্ণতা। নিজেদের যাঁরা দুর্বল বলে বিবেচনা করেন তাদের পক্ষে এ শক্তি প্রয়োগ করা অসম্ভব। একমাত্র যাঁরা একথা উপলব্ধি করেন যে, মানুষের ভিতর এমন একটা কিছু আছে যা তার পাশব সত্তা থেকে মহত্তর এবং এই পশুসত্তা সর্বদাই সেই মহত্তর সত্তার কাছে নতি স্বীকার করে, তাঁরাই কেবল কার্যকরীভাবে সত্যাগ্রহী হতে পারেন। অন্ধকারের সঙ্গে আলোর যে সম্বন্ধ, এই মহত্তর শক্তির সঙ্গে হিংসা এবং সেই কারণে তাবৎ অত্যাচার ও অবিচারেরও সেই সম্পর্ক। জনসাধারণ যতদিন চেতন বা অচেতনভাবে শাসিত হতে চাইবে ততদিনই কেবল তাদের উপর শাসন করা সম্ভবপর—এই অপরিবর্তনীয় বিধানের উপর রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নির্ভরিত। আমরা ট্রান্সভালের ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক আইন দ্বারা শাসিত হতে চাইনি এবং তাই এই মহান শক্তির সম্মুখীন হয়ে এই আইনকে হটতে হয়েছিল। আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল: ঐ আইন অনুসারে চলতে বললে হিংসা প্রয়োগ করা অথবা আইনের বিধান অনুযায়ী সাজা ভোগ করা এবং শাসনকর্তা অথবা আইন প্রণয়নকারীদের হৃদয়তন্ত্রীতে আমাদের জন্য সহানুভূতির সুর বেজে না ওঠা পর্যন্ত এইভাবে আমাদের ভিতরকার আত্মার শক্তির পরিচয় দিতে থাকা। যে লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করে আমরা চলা শুরু করি তার সাধনের জন্য আমাদের অনেক সময় লেগেছে। তার কারণ হল এই যে আমাদের সত্যাগ্রহ শুদ্ধতম পর্যায়ের ছিল না। সব সত্যাগ্রহী এই শক্তির পূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করেন না এবং আমাদের মধ্যে সকলে সর্বদা যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কারণ হিংসা থেকে প্রতিনিবৃত্ত থেকেছেন তাও নয়। এই শক্তির প্রয়োগ করতে হলে দারিদ্র্যবরণে প্রস্তুত থাকা চাই। অর্থাৎ আমাদের খাওয়াপরার সংস্থান আছে কি না তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা চলবে না। অতীত সংগ্রামকালে সকল সত্যাগ্রহী (হয়ত বা কেউই) অতদূর যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। কেউ কেউ ছিলেন তথাকথিত সত্যাগ্রহী। কোন রকম বিশ্বাস ব্যতিরেকেই তাঁরা এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, কারও কারও ছিল মিশ্র উদ্দেশ্য—ক্বচিৎ কারও অশুভ অভিসন্ধিও ছিল। অনেককে আবার খুব চোখে চোখে না রাখলে সংগ্রাম চলার মধ্যেই তাঁরা সানন্দে হিংসার শরণ নিতেন। এই সব কারণে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কিন্তু নিখুঁতভাবে শুদ্ধতম আত্মার শক্তি প্রয়োগ করতে পারলে অবিলম্বে ফল পাওয়া যায়। এই অনুশীলনের জন্য ব্যক্তির আত্মার দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন যাতে আদর্শ সত্যাগ্রহী যেন সম্পূর্ণ মাত্রায় না হলেও প্রায় আদর্শ মানুষ হন। হঠাৎ আমাদের সকলের পক্ষে এ রকম মানুষ হয়ে পড়া সম্ভব না হলেও আমার মূল বক্তব্য যদি যথার্থ হয় (আর আমি জানি যে এ যথার্থ) তাহলে আমাদের ভিতর যত অধিক পরিমাণে সত্যাগ্রহ বৃত্তি থাকবে আমরা সেই পরিমাণে আদর্শ মানুষ হব। আমি তাই মনে করি যে এর ব্যবহার অবধারিত। এই শক্তি বিশ্বজনীন হলে আমাদের সামাজিক আদর্শে বিপ্লব সংসাধিত হবে এবং পশ্চিমের জাতিসমূহ আজ যে ক্রমবর্ধমান জঙ্গীবাদ ও একনায়কত্ববাদের দ্বারা পীড়িত ও যার পেষণে তাদের প্রায় মুমূর্ষু দশা এবং এমন কি প্রাচ্য দেশসমূহেও যে ব্যাধির প্রকোপের সম্ভাবনা বিদ্যমান সেই প্রাণঘাতী ব্যাধির নিরাময় হবে। অতীতের সংগ্রাম যদি এমন কয়েকজনও ভারতীয়ের সৃষ্টি করে থাকে যাঁরা যথাসম্ভব শুদ্ধ সত্যাগ্রহী হবার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন তাহলে তাঁরা যে কেবল সম্যক অর্থে নিজেদের সেবা করেছেন তা-ই নয়, তাঁরা বৃহত্তর মানবতারও সেবা করেছেন বলতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সত্যাগ্রহ মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি। শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পর এই শিক্ষা দেওয়া হবে না, এই শিক্ষা দেওয়া হবে সাধারণ শিক্ষার পূর্বেই। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অ আ ক খ লিখতে শেখার পূর্বেই এবং বহির্বিশ্বের সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে আরম্ভ করার আগেই আত্মা, সত্য ও প্রেম ইত্যাদি সম্বন্ধে শিশুর জানা উচিত, বোঝা উচিত আত্মায় কোন্ কোন্ শক্তি সুপ্ত রয়েছে। জীবনসংগ্রামে সহজেই ঘৃণাকে প্রেম দ্বারা, অসত্যকে সত্য দ্বারা এবং হিংসাকে কৃচ্ছ্রবরণের দ্বারা জয় করা যায়—শিশুর মনে গোড়া থেকেই এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা যথার্থ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৩-১১-১৯২৭

॥ ৫ ॥

হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য

আত্মরক্ষার জন্য আমি অধ্যাত্ম-অনুশীলনের পুনঃপ্রবর্তন করব। আত্মরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী উপায় হল আত্মশুদ্ধি। যে ভয় আজ আমাদের আতঙ্কিত করছে তার পরবশ হয়ে আমি ভারসাম্য হারাতে চাই না। হিন্দুরা যদি শুধু নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখেন ও নিজ ঐতিহ্য অনুসারে কাজ করে চলেন তাহলে তাঁদের তর্জন-গর্জনে ভীত হবার কারণ নেই। তাঁরা যথার্থ অধ্যাত্ম-অনুশীলনের পুনরারম্ভ করা মাত্র মুসলমানরাও সাড়া দেবেন। সাড়া না দিয়ে তাঁদের উপায় নেই। আমি যদি নিজেদের এবং সেই কারণে মুসলমানদের উপর বিশ্বাসী একদল হিন্দু যুবক পাই তাহলে তাঁরা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের পক্ষে ঢাল স্বরূপ হবেন। এই তরুণ হিন্দুর দল না মেরে মরার প্রক্রিয়া শেখাবেন। অপর কোন পন্থার কথা আমার জানা নেই। দুঃখ ও বিপদ চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে আসছে দেখলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তপস্যায় বসতেন। রক্তমাংসের দেহধারী মানুষের অসহায় অবস্থার কথা উপলব্ধি করে তাঁরা সেই অসহায়তা থেকে মুক্তিলাভের জন্য ঈশ্বর অভীষ্ট পূর্ণ না করা পর্যন্ত তাঁর কাছে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আমার হিন্দু বন্ধু বলবেন, "তা যেন হল। কিন্তু সে অবস্থায় ঈশ্বর অস্ত্রচালনার জন্য কাউকে ধরাধামে পাঠাতেন।" এই উত্তরের সত্যতা অস্বীকার করা আমার কাজ নয়। বন্ধুটিকে আমি কেবল এইটুকুই বলতে চাই যে হিন্দু হিসাবে তিনি যেন অন্ততঃ কারণটিকে অস্বীকার না করেন ও যথোচিত পরিণাম লাভ করেন। যথেষ্ট তপস্যা করার পরই কেবল লড়াই করার সময় আসবে। আমার প্রশ্ন হল, আমরা কি যথেষ্ট পরিমাণে শুদ্ধ? মানুষের ব্যক্তিগত শুদ্ধতার কথা দূরে যাক অস্পৃশ্যতার পাপের জন্য কি আমরা স্বেচ্ছায় কোন প্রায়শ্চিত্ত করেছি? আমাদের ধর্মগুরুদের যা হওয়া উচিত তা কি তাঁরা হয়েছেন? কেবল মুসলমানদের আচরণের ছিদ্রান্বেষণ করার চেষ্টা করার সময় আমরা বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করছি বলতে হবে।

সফল সত্যাগ্রহের পূর্বশর্ত

অন্যায় ব্যাপার নিয়ে কোন সত্যাগ্রহ হতে পারে না। আর ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে সত্যাগ্রহ করাও ব্যর্থ হবে যদি সত্যাগ্রহের পক্ষাবলম্বীরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে ও নিগ্রহ বরণ করতে কৃতসঙ্কল্প এবং যোগ্য না হয়। আর সামান্যতম হিংসার শরণ নিলেও প্রায়শঃ ন্যায়সঙ্গত কারণের জন্য প্রারব্ধ সত্যাগ্রহও বিফল হয়। সত্যাগ্রহে চিন্তা, বাক্য বা কর্ম—কোন ক্ষেত্রেই কোন রকমের হিংসার স্থান নেই। ন্যায়সঙ্গত কারণে শুরু হলে এবং অসীম কষ্ট স্বীকারের ক্ষমতা ও হিংসা পরিহারের দৃঢ়তা থাকলে সত্যাগ্রহে বিজয় অনিবার্য।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৪-১৯২১

॥ ৭ ॥

অবৈর

প্রচণ্ডতম প্ররোচনার মধ্যেও যদি আমরা ধৈর্য ধারণ করতে না পারি তাহলে জয়লাভ অসম্ভব। অগ্নিলীলার মধ্যেও স্থির থাকা সৈনিকের অপরিহার্য গুণ। প্ররোচনার প্রচণ্ড বহ্নিশিখার মধ্যেও যদি অসহযোগকারী শান্ত ও অবিচলিত না থাকতে পারেন তাহলে তাঁর কোন মূল্য নেই।

একটা ব্যাপারে যেন ভুল করা না হয়। জনসাধারণ সুশৃঙ্খল সেনাদলের মত আচরণ না করলে আইন অমান্য করা সম্ভব নয়। আর যতক্ষণ না আমরা প্রতিটি ইংরেজের মনে এই আস্থা সৃষ্টি করতে পারছি যে তাঁর নিজের জন্মভূমি গ্রাম বা শহরটির মতই ভারতবর্ষে তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ততক্ষণ আমরা আইন আমন্ত্র শুরু করতে পারি না। আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়াই যথেষ্ট নয়। তাঁদের কাছে যে অস্ত্রশস্ত্র আছে তার ভরসায় নয়, আমার অহিংসার জীবন্ত আদর্শের কারণ প্রতিটি ইংরেজ নর-নারী নিজেদের নিরাপদ বোধ করবেন।

এটা কেবল সাফল্যেরই শর্ত নয়, বর্তমান রূপে আমাদের আন্দোলনকে জারী রাখার যোগ্যতারও শর্ত হল এই। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার অপর কোন পন্থা নেই।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৮-১৯২১

॥ ৮ ॥

সাহস ও শৃঙ্খলা প্রয়োজন

আমরা যে অহিংসার শপথ নিয়েছি তা আমাদের অপমানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলে না। সুতরাং হামাগুড়ি দিয়ে চলা, নাকে খত দেওয়া, ইউনিয়ন জ্যাককে সেলাম করার জন্য যাওয়া অথবা সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশে অপর কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে আমাদের আদর্শের দাবি হল এই যে আমাদের গুলি করলেও আমরা পূর্বোক্ত ঐসব হীন কাজ করতে অস্বীকার করব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে জালিয়ানওয়ালাবাগের জনসাধারণের উপর যখন গুলি চালানো হয় তখন পালিয়ে যাওয়া বা এমন কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়তে পারে না। তাঁদের কাছে যদি অহিংসার বাণী পৌঁছাত তাহলে তদনুযায়ী তাঁদের কর্তব্য হত গুলিবর্ষণের সময় উন্মুক্ত বক্ষে বন্দুকের দিকে এগিয়ে গিয়ে এই বিশ্বাস নিয়ে সানন্দে মৃত্যুবরণ করা যে তাঁদের এই মৃত্যুর ফলে দেশ স্বাধীন হবে। অহিংসার কাছে অত্যাচারীর বল-বিক্রম হাসির ব্যাপার এবং অবৈর ও অবিচলিতার দ্বারা অহিংস সৈনিক বলদর্পীকে হতবুদ্ধি করে দেয়। জেনারেল ডায়ার যা চান আমাদের দিয়ে তাই করিয়ে নিয়েছেন বলে আমরা তাঁর হাতের পুতুল হয়ে পড়ি। তিনি চেয়েছিলেন যে আমরা যেন তাঁর বন্দুকের গুলির সামনে থেকে পালাই, আমরা যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলি ও নাকে খত দিই। ওসব হল "ভয় দেখানোর খেলার" এক-একটা অঙ্গ। ঋজু দৃষ্টি নিয়ে যখন আমরা এর সম্মুখীন হই তখন ছায়ার মতই এ অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে সবারই হয়ত সে জাতীয় সাহস হবে না। তবে এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকেরও যদি প্রত্যাঘাত না করে পাথরের মত খাড়া দাঁড়াবার সাহস না হয় তাহলে এই বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জিত হবে

না। শূন্যে প্রবলবেগে কোন অস্ত্রকে আন্দোলিত করলে যেমন তা ভারসাম্য হারায় তেমনি অত্যাচারীর মদমত্ততায় সাড়া না দিলে সেই মদমত্ততা ফিরে গিয়ে তাঁকেই আঘাত করে।

উপরে বর্ণিত শান্ত সাহস যেমন চাই, আইন অমান্য করার জন্য তেমনি চাই নিখুঁত শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছায় আদেশ পালন করার শিক্ষা। আইন অমান্য অহিংসার সক্রিয় অভিব্যক্তি। আইন অমান্য নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ দুর্বলের নেতিবাচক অহিংসার সঙ্গে শক্তিশালীর অহিংসার পার্থক্য দেখায়। আর দুর্বলতা যেহেতু স্বরাজের অভিমুখে নিয়ে যেতে পারে না সেইজন্য নেতিবাচক অহিংসা আমাদের লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হবে না।

সুতরাং আমাদের ভিতর কি প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা আছে? জনৈক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আমাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন ও প্রস্তাব সমূহ পালনের অনুকূল মানসিকতা কি আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে? গত বারো মাসে আমরা অত্যন্ত প্রগতি করলেও এমন অগ্রগতি হয়নি যার বলে সহজ আত্মপ্রত্যয়সহ আইন অমান্য শুরু করা যায়। যেসব নিয়ম আমরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রণয়ন করেছি এবং আমাদের বিবেকের সমর্থন ছাড়া যেসব নিয়মের পিছনে অপর কোন অনুমোদন নেই সেগুলি হওয়া উচিত মানের ঋণের মত। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বিধিবিধান অথবা যেসব নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার জন্য আমরা জরিমানা দিয়ে রেহাই পেতে পারি তাদের চেয়ে পূর্বোক্ত মানের ঋণের বন্ধন প্রবলতর বিবেচিত হওয়া উচিত। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে আমরা যদি নিজেদের তৈরী আইন-কানুন পালন করার মত শৃঙ্খলা না শিখি অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন না করি তাহলে যাকে শান্তিময় বলা যায় সে জাতীয় আইন অমান্য করার যোগ্যতা আমাদের জন্মায় না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-১০-১৯২১

॥ ৯ ॥

নম্রতার প্রয়োজনীয়তা

অহিংসবৃত্তি অপরিহার্যভাবে নম্রতার অভিমুখে নিয়ে যায়। অহিংসার অর্থ হল যুগ-যুগান্তের শিলাস্তূপ ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা। আমরা যদি তাঁর সাহায্য চাই তাহলে নম্র ও অনুতপ্ত চিত্তে তাঁর সম্মুখীন হতে হবে। অসহযোগবাদীরা কংগ্রেসে তাঁদের বিস্ময়কর সাফল্যের উপর নির্ভর করবেন না। আমাদের হতে হবে আম্রবৃক্ষের মত ফলভারে অবনত। এই বৃক্ষের সৌন্দর্য হল তার মহৎ বিনম্র ভাব। কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে অসহযোগিতাবাদীরা কোথাও কোথাও তাঁদের বিরোধীদের প্রতি উদ্ধত ও অসহিষ্ণু আচরণ করছেন। আমি জানি যে গর্বে স্ফীত হলে অসহযোগিতাবাদীরা তাঁদের সব মহিমা ও গৌরব হারাবেন। এযাবৎ যতটা প্রগতি হয়েছে তা অসন্তোষজনক না হলেও গর্ব বোধ করার বিশেষ কোন কারণ নেই। আত্মাদর তো দূরের কথা এমন কি গৌরব বোধ করার জন্যও আমরা যে পরিমাণ ত্যাগ করেছি এক্ষেত্রে তার থেকে অনেক বেশী আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অসহযোগ আত্মশ্লাঘা, আস্ফালন করা অথবা ধাপ্পাবাজির আন্দোলন নয়। এ হল আমাদের আন্তরিকতার অগ্নিপরীক্ষা। এর জন্য প্রয়োজন কঠিন ও নীরব আত্মোৎসর্গ। আমাদের সততা ও জাতিসেবামূলক কাজ করার প্রতি এ এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এ আন্দোলনের লক্ষ্য হল আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করা। আর যতটাই আমরা একাজ করব দেখতে পাব যে আমরা যা অনুমান করেছিলাম তার থেকে বেশী করতে হবে। আমাদের অপূর্ণতা সম্পর্কে এই চেতনা যেন আমাদের বিনয়ী করে।

হিংসা প্রয়োগে নয়, অসহযোগিতাবাদী তাঁর ধৃষ্টতাবিহীন নম্রতার দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করার ও দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াস করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ কাজই তাঁর আদর্শের পক্ষ সমর্থন করে। নিজ অবস্থার যথার্থতার উপর আস্থাই তাঁর শক্তির ভিত্তি। আর তাঁর বিরোধীর ভিতরও এ সম্বন্ধে আস্থা তখনই সর্বাপেক্ষা অধিক জাগ্রত হয় যখন অসহযোগিতাবাদী তাঁর বিরোধী ও নিজ কর্মের মাঝখানে নিজের বক্তৃতাকে সর্বাপেক্ষা কম রাখেন। বক্তৃতা, বিশেষ করে তা আবার যখন উত্তেজনাকর হয় তখন তা বিশ্বাসের অভাবের সূচক

এবং বিরোধীপক্ষ এতে কার্যের সততা সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এতএব নম্রতা ত্বরিৎ সাফল্যের চাবিকাঠি। আমি আশা করি প্রত্যেক অসহযোগিতা-বাদী নম্র ও সংযমী হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১-১৯২১

॥ ১০ ॥

জেলে কাজ করা প্রসঙ্গে

জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু জানতে চেয়েছেন যে, সরকার এখন যখন শত শত লোকের জেলে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন আর হাজার হাজার লোক যখন এই জেলে যাবার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন তখন বন্দীদের জেলে কোন রকম কাজ করতে অস্বীকার করাটা কি সঙ্গত হবে না? আমার আশঙ্কা এ প্রস্তাব নৈতিক ভূমিকা যথাযথভাবে বুঝতে না পারার কারণ করা হয়েছে। কারাব্যবস্থা বাতিল করার জন্য আমরা আন্দোলন শুরু করিনি। এমন কি স্বরাজ হলেও কারাগার থাকবে। অতএব আমাদের অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন দেশের অনৈতিক আইনসমূহ ভঙ্গ করার এলাকার বাইরে যেন সম্প্রসারিত না হয়। অহিংস আইন অমান্যকে যদি অসিংস হতে হয় তাহলে তার রূপ হবে স্বেচ্ছায় কঠোরভাবে জেলের অনুশাসন মেনে চলা। কারণ কোন বিশেষ বিধিবিধান অমান্য করার অর্থই হল স্বেচ্ছায় এই অমান্যজনিত শাস্তি গ্রহণ করা। আর যে মুহূর্তে কোন মানুষ একযোগে আইন ও তার উল্লঙ্ঘনজনিত শাস্তির বিরোধিতা করে সেই মুহূর্ত থেকে সে আর অহিংস থাকে না। সে তখন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার বাহন হয়ে পড়ে। নিজেকে যিনি অহিংস প্রতিরোধকারী বলে দাবি করেন তিনি হবেন একাধারে বিশ্বপ্রেমিক ও রাষ্ট্রের বন্ধু। অরাজকতাবাদী রাষ্ট্রের শত্রু ও সেইজন্য মনুষ্যবিদ্বেষী। যুদ্ধের ভাষা আমি এইজন্য ব্যবহার করেছি যে তথাকথিত বৈধানিক পদ্ধতি একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে অহিংস আইন অমান্য শুদ্ধতম বৈধানিক আন্দোলন। অবশ্য যদি এর শান্তিময় অর্থাৎ অহিংস চারিত্রধর্ম নিছক একটা ছদ্মবেশ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এ এক হীন ও জঘন্য ব্যাপারে পর্যবসিত হয়। সততার সঙ্গে যদি অহিংস থাকা যায় তাহলে

হিংসার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় প্রচণ্ডতম অমান্যকেও নিন্দা করার প্রয়োজন নেই। সাহসিকতা সহকারে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত না থাকলে কোন বৃহৎ বা দ্রুতগতির আন্দোলন চালানো যায় না, আর বিরাট ঝুঁকি নেবার অবকাশ না থাকলে জীবনেও কোন রস থাকবে না। বিশ্বের ইতিহাসে কি দেখা যায় না যে ঝুঁকি নেবার সুযোগ না থাকলে জীবনে কোন রোমাঞ্চ বা উন্মাদনাই থাকত না? শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরা, সমাজের নেতৃবর্গ কিঞ্চিৎ মাত্র বিপদের সম্ভাবনা অথবা কোন হিংস্র সংঘর্ষের সূত্রপাত মাত্রই ত্রাস ও ক্রোধে হাত তুলে দাঁড়ান—এটা বর্তমানের দূষিত আবহাওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন। মানুষের ভিতরকার পশুকে আমরা অবশ্যই তাড়াতে চাই, কিন্তু তার জন্য তাকে পৌরুষবিহীন করতে চাই না। আর নিজের স্থান করে নেবার জন্য মানুষের ভিতরকার পশুটি থেকে থেকে নিজের কুৎসিত চেহারা প্রকট করবেই। একাধিকবার আমি বলেছি যে, যে-কোন অবস্থাতে রক্ত দেখলেই আমি বিচলিত হই না। অসহযোগকারী ও তাঁদের সমর্থকেরা যখন নিজেদের ঘোষিত আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করে অপরের রক্তপাত করেন তখন আমি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাই। আমি জানি যে প্রতিটি সৎ অসহযোগকারীই এ ব্যাপারে অনুরূপভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

এবার পুরাতন প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা যাক। অহিংস প্রতিরোধকারী হিসাবে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে আমরা বাধ্য। জেলের প্রশাসন ব্যবস্থা যতক্ষণ না দুর্নীতিপরায়ণ ও অনৈতিক হয়ে উঠছে বা তদনুরূপ মনে হচ্ছে ততক্ষণ কারাগারের নিয়মশৃঙ্খলা অবশ্যই মানতে হবে। তবে কোন রকম স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত করা, কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা কিংবা এই জাতীয় অপরাপর অসুবিধার কারণ কারাগারের প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমূলক বলা চলে না। কয়েদীদের যখন অপমান করা হয় অথবা যখন তাদের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করা হয় কিংবা যদি তাদের নোংরা মনুষ্যবাসের অযোগ্য জায়গায় রাখা হয় বা এমন খাদ্য দেওয়া হয় যা মানুষ খেতে পারে না, তখন কারাগারের প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্নীতিমূলক হয়ে পড়েছে বলা যেতে পারে। প্রত্যুত আমি আশা করি যে জেলে অসহযোগীদের আচরণ কঠোরভাবে সত্যাশ্রয়ী মর্যাদামণ্ডিত অথচ আনুগত্যপরায়ণ হবে। জেলার অথবা ওয়ার্ডারদের আমরা আমাদের শত্রু বলে মনে করব না। তাঁরা আমাদেরই মত মানুষ এবং তাঁরা একেবারে মানবীয় সম্পর্ক বিরহিত নন।

আমাদের ভদ্র ব্যবহার যাবতীয় সংশয় ও তিক্ততার নিরাকরণ করতে বাধ্য। আমি জানি যে একদিকে এই জাতীয় শৃঙ্খলা ও অপর দিকে প্রচণ্ড বিদ্রোহের পথ অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু স্বরাজের তো কোন কুসুমাকীর্ণ পন্থা নেই। দেশ স্বেচ্ছায় এক সঙ্কীর্ণ অথচ সরল পথ বেছে নিয়েছে। সরলরেখার মত এইটিই স্বল্পতম দূরত্বের পথ। তবে সরলরেখা অঙ্কন করতে হলে যেমন ধীর স্থির ও অভিজ্ঞ হাতের প্রয়োজন তেমনি আমাদের বেছে নেওয়া রাস্তায় যদি অভ্রান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে হয় তার জন্য চাই শৃঙ্খলায় দৃঢ়তা ও লক্ষ্যের প্রতি অচঞ্চল আনুগত্য।

॥ ১১ ॥

আদর্শ কয়েদী

"জেলের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অসহযোগীরা কি বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেবেন যা সাধারণ কয়েদীদের উত্তেজিত করে হিংসাচরণে প্রবৃদ্ধ করতে পারেন? অসহযোগীরা কি খাদ্য সরবরাহের উন্নতি অথবা অন্যবিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনশন করবেন? হরতাল ও ঐ জাতীয় অন্যান্য দিনে তাঁরা কি জেলের মধ্যে কাজকর্ম বন্ধ করবেন? বিবেকবিরোধী না হলেও কি অসহযোগীরা জেলের নিয়মকানুন ভঙ্গ করার অধিকারী?" কলকাতার জনৈক অসহযোগকারী বন্ধুর কাছ থেকে আমি উপরোক্ত মর্মে একটি তারবার্তা পেয়েছি। ভারতবর্ষের অপর এক প্রান্ত থেকে আর একজন অসহযোগকারী বন্ধু অসহযোগী কয়েদীদের শৃঙ্খলা-বিরোধী আচরণের কথা শুনে আমাকে কারাবিধি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এই দুটি ঘটনা সত্ত্বেও আমি এমন সব অসহযোগী কয়েদীদের কথা জানি যাঁরা যথোচিত প্রেরণাচালিত হয়ে নিষ্ঠা সহকারে তাঁদের উপর আরোপিত নিয়মশৃঙ্খলা পালন করছেন।

যখন হাজার হাজার ব্যক্তি জেলে যাচ্ছেন তখন নিজেদের অহিংসার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিভাবে কারাগারে অসহযোগী কয়েদীরা নিজ ভূমিকা নিতে পারেন সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে বোঝার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে। অসহযোগের সীমারেখা সম্বন্ধে সচেতন না হলে এটা কর্তব্যের বদলে বরং স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়ে দাঁড়ায় এবং সেইজন্য তা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। উচিত ও অনুচিতের পার্থক্যকারী সীমারেখা অনেক সময়

এত সূক্ষ্ম যে তা ধরা পড়ে না। তবে এ সীমারেখা ভুল হবার নয় এবং একে ভঙ্গ করা সম্ভবপরও।

তাহলে যাঁরা ন্যায়ের পথে চলার জন্য কারাগারে গেছেন তাঁদের সঙ্গে অন্যায়ের কারণ কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের পার্থক্য কোথায়? • উভয় শ্রেণীর কয়েদীই প্রায়শঃ একই পোশাক পরেন, একই খাদ্য খান এবং বাহ্যতঃ একই ধরনের অনুশাসনের অধীন। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিরা যেখানে একান্ত অনিচ্ছায় অনুশাসন মেনে চলেন ও গোপনে এবং এমন কি পারলে প্রকাশ্যেও সেই বিধিবিধান ভঙ্গ করেন, প্রথমোক্তরা সেখানে স্বেচ্ছায় ও যথাসাধ্য কারাবিধি মেনে চলেন এবং মুক্ত থাকার সময়ের তুলনায় অধিকতর মাত্রায় নিজেদের আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকট করেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কয়েদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যাঁরা সম্ভ্রান্ত তাঁরাও বাইরের তুলনায় কারাগারের মধ্যে অধিকতর মাত্রায় সেবা দিতে সক্ষম। কারাবিধি যতটা কঠোরতা সহকারে পালন করা হয় সেবা করার শক্তিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

একথা যেন স্মরণ থাকে যে আমরা জেলখানার উচ্ছেদ চাইছি না। আমার মনে হয় এমন কি স্বরাজ হলেও জেলখানা রাখতে হবে। সত্যিকার অপরাধীদের যদি আমরা বুঝতে দিই যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তারা সব ছাড়া পাবে অথবা তাদের সঙ্গে খুব সদ্ব্যবহার করা হবে তাহলে আমরা বিপদে পড়ব। আমার ইচ্ছা যে স্বরাজ হলে সমস্ত কারাগার যেন সংশোধনাগারে (reformatory) পরিণত হয়। কিন্তু সেখানেও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। তাই আমরা যদি বিশৃঙ্খলতার প্রোৎসাহন দিই তাহলে আসলে স্বরাজের আবির্ভাবকেই বিলম্বিত করব। প্রত্যুত এই অনুমানের আধারে দ্রুত স্বরাজ আসার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যে সভ্য জাতি হিসাবে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে উচ্চমানের শৃঙ্খলার অনুবর্তী হতে সক্ষম।

যে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করি আইন অমান্য একদিকে যেমন সেই রাষ্ট্রের সব অন্যায় ও অনৈতিক আইনের বিরোধিতা করা অনুমোদন করে তেমনি এই আনুগত্যবিহীনতার জন্য যে শাস্তি প্রাপ্য তাও নম্রভাবে ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার কথা বলে। সেইজন্য খুশী মনে কারাবিধি ও তৎসম্পর্কিত কষ্ট মেনে নিতে হবে।

অতএব একথা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে যে আইন অমান্যকারী যে মুহূর্তে কারাগারে আসেন সেই মুহূর্তে তাঁর অমান্যকারীর ভূমিকা শেষ হয় এবং শুরু

হয় তাঁর আনুগত্যের পালা। তাঁর অমান্যের সৌম্য রূপের কারণ কারারুদ্ধ থাকাকালীন তিনি কোন বিশেষ সুবিধা দাবি করবেন না। নিজের আদর্শ আচরণের দ্বারা কারাভ্যন্তরে তিনি এমন কি তাঁর চতুর্দিকস্থ সাধারণ কয়েদীদেরও সংশোধন করবেন এবং জেলার ও অন্যান্য কারাকর্তৃপক্ষের হৃদয় দ্রব করবেন। শক্তি ও জ্ঞান থেকে উদ্ভূত এ জাতীয় নম্র ব্যবহার শেষ অবধি অত্যাচারীর অত্যাচারকে অদৃশ্য করে দেয়। এইজন্যই আমি বলে থাকি যে স্বেচ্ছায় নিগ্রহ বরণ হল অন্যায় ও অবিচার দূর করার সর্বাপেক্ষা দ্রুত ও শ্রেষ্ঠ প্রতিবিধান।

এবারে তাহলে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে কারাগারের বিধান ভঙ্গ করে 'বন্দেমাতরম্' বা অন্য কোন প্রকারের ধ্বনি দেওয়া বেআইনী কাজ এবং অসহযোগীর এরকম করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে তাঁর পক্ষে গোপনে কোন কারাবিধান ভঙ্গ করাও অনুচিত। অসহযোগী তাঁর সাথী কয়েদীদের নীতিভ্রষ্ট করার মত কিছু করবেন না। তাঁকে অপমান করার কোন প্রয়াস হলে অথবা প্রহরীরা নিজেরাই কয়েদীদের দেয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিয়ম ভঙ্গ করলে (প্রায়ই তারা এরকম করে থাকে), অথবা তাঁকে মনুষ্যের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় এমন আহার্য দিলে (এটাও প্রায়ই ঘটে থাকে) কেবল তিনি প্রকাশ্যে কারাবিধি লঙ্ঘন করার অধিকারী হবেন। কোন অবশ্য আচরণীয় ধর্মীয় প্রথা পালনে বাধা দিলে আইন অমান্যের অবকাশ আসে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-১২-১৯২১

॥ ১২ ॥

সত্যাগ্রহী বন্দীদের আচরণ

আমাদের সকলে উপলব্ধি করি আর না-ই করি অসহযোগের প্রক্রিয়া হল হৃদয় স্পর্শ করা ও যুক্তির প্রতি আবেদন করার পদ্ধতি, উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দ্বারা বিরোধীকে ভয় দেখানোর প্রক্রিয়া নয়। অহিংস আন্দোলনে উচ্ছৃঙ্খলতার কোন স্থান নেই।

সত্যাগ্রহী বন্দীদের অনেক সময় আমি যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে তুলনা করি। একবার শত্রুপক্ষীয় দ্বারা ধৃত হলে যুদ্ধবন্দীরা তাদের সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ

করে। যে সৈনিক যুদ্ধবন্দীরূপে ধরা পড়েছেন তাঁর পক্ষে শত্রুর সঙ্গে প্রতারণামূলক আচরণ করা অপমানজনক ব্যাপার। সরকার সত্যাগ্রহী বন্দীদের যুদ্ধবন্দীরূপে বিবেচনা করেন না, এ যুক্তি আমার বক্তব্যকে প্রভাবিত করতে পারবে না। আমরা যদি আমাদের আদর্শ অনুযায়ী আচরণ করি তাহলে অচিরাৎ আমরা শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠব। কারাগারকে আমাদের একটি নিরপেক্ষ স্থান ভাবতে হবে যেখানকার বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের কথঞ্চিৎ সহযোগিতা করা কেবল উচিতই নয়, কর্তব্যও বটে।

আমরা যদি একদিকে স্বেচ্ছায় কারাবিধান ভঙ্গ করি এবং অন্যদিকে তজ্জনিত শাস্তি ও কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি তাহলে আমাদের আচরণ হবে চূড়ান্ত রকমের অযৌক্তিক ও একে আদৌ আত্মসম্মানসূচক আখ্যা দেওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে নিষিদ্ধ বস্তুসামগ্রী নিজেদের কম্বল অথবা কাপড়-চোপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে খানাতল্লাসীর বিরোধিতা করা যায় না। আমার জ্ঞাতসারে সত্যাগ্রহে এমন কিছু নেই যাতে আমরা কোন বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলতে পারি বা অন্যবিধ ছলনার আশ্রয় নিতে পারি। আমরা যখন এই কথা বলি যে আমরা যদি কারাকর্তৃপক্ষের জীবন অস্বাস্তকর করে তুলি তাহলে তাঁরা শান্তিরক্ষার্থে আইনানুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবেন, তখন হয় আমরা সরকারকে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রশংসা করি আর নচেৎ তাঁদের নির্বোধ বিবেচনা করে থাকি। প্রচ্ছন্ন প্রশংসা করা হয় তখন যখন আমরা মনে করি যে কারাকর্তৃপক্ষদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা সত্ত্বেও সরকার নীরবে কেবল দেখতেই থাকবেন এবং আমাদের মনোবল একেবারে ভঙ্গ করার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যাপারে দ্বিধা করবেন। অর্থাৎ প্রশাসকদের আমরা এতটা বিবেচক ও মানবীয় চারিত্রধর্ম-বিশিষ্ট মনে করি যে আমরা যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি করলেও তাঁরা আমাদের কঠোর দণ্ড দেবেন না। প্রত্যুত তাঁরা ভদ্রতার যাবতীয় ধারণা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইতস্তত করবেন না ও করেনও নি এবং তাঁরা যে কেবল ন্যায়সঙ্গত শাস্তিই দেন তা-ই নয়, সময় সময় তাঁরা অন্যায় শাস্তিও দিয়ে থাকেন।

তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমরা যদি সত্যাগ্রহীর উপযুক্ত সমান সততা ও মর্যাদা সহকারে আচরণ করতাম তাহলে আমরা যাবতীয় সরকারী বিরোধিতাকে নিরস্ত্র করে ফেলতে পারতাম এবং এতগুলি কয়েদীর এ জাতীয়

নিখুঁত মর্যাদাপূর্ণ আচরণ সরকারকে অন্ততঃ লজ্জায় এতগুলি সম্মানভাজন ও নির্দোষ মানুষকে গ্রেপ্তার করার ভুল স্বীকারে বাধ্য করত। কারণ তাঁরা কি একথা বলেন না যে আমাদের অহিংসা হিংসারই ছদ্মাবরণ মাত্র? সুতরাং প্রতিটি বার উচ্ছৃঙ্খল হবার সময় আমরা কি তাঁদের ক্রীড়নকে পরিণত হই না?

আমার মতে তাই কয়েদী হওয়া মাত্র সত্যাগ্রহী হিসাবে আমাদের নিম্নোক্ত বাধ্য-বাধকতা জন্মায়ঃ

১। একান্ত সততা সহকারে কাজ করা।

২। কারাব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

৩। যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত নিয়ম-কানুন পালন করে অপরাপর কয়েদীদের কাছে সুদৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

৪। এমন কোন সুবিধা না চাওয়া বা দাবি জ্ঞাপন না করা যা সাধারণ কয়েদীরা পান না এবং নেহাত স্বাস্থ্যের কারণ যার প্রয়োজনীয়তা নেই।

৫। কিন্তু পূর্বোক্ত ধরনের ন্যূনতম সুবিধা চাওয়া থেকে বিরত না থাকা এবং সে সব না পেলে বিরক্ত না হওয়া।

৬। যথাসম্ভব সুযোগ্যভাবে নির্দিষ্ট যাবতীয় কাজকর্ম করা।

এ জাতীয় আচরণের ফলে সরকারের ভূমিকা অস্বস্তিকর ও অযৌক্তিক হয়ে পড়বে। সততার দ্বারা তাঁদের পক্ষে সততার সম্মুখীন হওয়া কঠিন। কারণ তাঁরা এই নীতিতে বিশ্বাস করেন না এবং এরকম বিরল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য তাঁরা প্রস্তুতও নন। তাঁরা আশা করেন উচ্ছৃঙ্খলতার এবং দ্বিগুণ উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা তাঁরা এর জবাব দেন। সন্ত্রাসবাদী অপরাধের তাঁরা চিকিৎসা করতে পেরেছেন কিন্তু এক নতিস্বীকার করা ছাড়া অহিংসার সম্মুখীন হবার অপর কোন পন্থা আবিষ্কার করতে পারেননি।

সত্যাগ্রহীর কারাবরণের তাৎপর্য হল এই যে নম্রভাবে কৃচ্ছ্রবরণের মাধ্যমে তিনি প্রতিকার পাবার আশা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে ন্যায়সঙ্গত কারণের জন্য নীরবে নিগ্রহ বরণ করার একটা নিজস্ব শক্তি আছে এবং এটা অস্ত্রবলের চেয়েও অধিকতর মহত্ত্বপূর্ণ। তবে এর অর্থ এই নয় যে আমাদের আত্মমর্যাদা আহত হলেও আমরা প্রতিরোধ করব না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কারাকর্মচারীরা আমাদের প্রতি কুবাক্য উচ্চারণ করলে কিংবা অনেক

সময় যেভাবে বন্দীদের উপর খাবার ছুঁড়ে দেয় তা করলে আমাদের মরীয়া হয়ে তার বিরোধিতা করতে হবে। অপমান করা বা গালাগালি দেওয়া কোন রাজকর্মচারীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং আমাদের এসবের প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু বন্দীদের খানাতল্লাসীর বিরোধিতা আমাদের করা উচিত নয়, কারণ এটা কারাবিধির অঙ্গ।

তবে নীরবে নিগ্রহ বরণ করা সম্বন্ধে আমি যা বললাম তার যেন এমন ব্যাখ্যা না করা হয় যে সত্যাগ্রহীদের মত নিরপরাধ বন্দীদের দাগী আসামী-দের পর্যায়ভুক্ত করলেও আমি কোন রকম আন্দোলন করতে নিষেধ করছি। আমার বক্তব্য শুধু এই যে বন্দী হিসাবে আমরা যেন বিশেষ সুখসুবিধা না চাই। আমাদের সানন্দে দাগী আসামীদের সঙ্গে থাকা উচিত এবং তাদের নৈতিক উন্নতি সাধনের একটা অবকাশ পেয়েছি এই ভেবে খুশী হওয়া উচিত। তবে যে সরকার নিজেকে সভ্য বলে দাবি করে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক সত্যাগ্রহী বন্দীদের এই শ্রেণী-বিভাজন স্বয়ং মেনে নেবে এইটাই আশা করা হচ্ছে।

॥ ১৩ ॥

সত্যাগ্রহের পূর্বশর্ত

পিছনে শক্তি থাকলেই কেবল জনসাধারণের বিরোধাচরণ কার্যকর হয়। বাবার কোন আচরণের বিরোধিতা করার সময় ছেলে কি করে? প্রথমে সে বাবাকে আপত্তিকর পথ পরিহার করার জন্য অনুরোধ করে অর্থাৎ সবিনয় আবেদন জানায়। পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও পিতা যদি কর্ণপাত না করেন তাহলে পুত্র এমন কি পিতৃগৃহ ত্যাগ করেও তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করে। ব্যাপারটি নিছক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত। আর পিতা পুত্র উভয়ের মধ্যেই সংস্কৃতির অভাব থাকলে তাঁরা ঝগড়া করেন। পরস্পরের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করেন এবং এমন কি সময় সময় হাতাহাতিও হয়ে যায়। অনুগত পুত্র চিরদিনই নম্র, শান্ত ও চিরপ্রেমময়। একমাত্র তার এই প্রেমই সময় এলে তাকে অসহযোগ করতে বাধ্য করে। স্বয়ং পিতাও এই প্রেমযুক্ত অসহযোগিতার তাৎপর্য বোঝেন। পুত্র তাঁকে পরিত্যাগ করুক বা পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটুক—এটা তাঁর পক্ষে অসহ্য এবং তাই পুত্রের অসহযোগের কারণ তিনি মনোবেদনা অনুভব করেন

ও তাঁর অনুতাপ হয়। তবে সর্বদাই যে এমনটা ঘটে তা নয় তবে পুত্রের অসহযোগিতার কর্তব্য সুস্পষ্ট।

রাজা ও প্রজার মধ্যেও এরকম অসহযোগিতা সম্ভবপর! বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এটা প্রজার কর্তব্যও হয়ে দাঁড়ায়। আর এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেইখানে যেখানে প্রজার স্বভাব হল নির্ভীক ও স্বতন্ত্রতাপ্রেমী। জনসাধারণ সেখানে রাষ্ট্রের আইন-কানুন সম্বন্ধে সচেতন এবং শাস্তি পাবার ভয় দ্বারা চালিত না হয়ে স্বেচ্ছায় তারা সেই সব আইন-কানুন মেনে চলে। যুক্তিশীলভাবে ও স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলা হল অসহযোগিতার প্রথম পাঠ।

দ্বিতীয় পাঠ হল সহিষ্ণুতার। অসুবিধাজনক হলেও আমাদের রাষ্ট্রের বহু আইন বরদাস্ত করা উচিত। ছেলের কাছে বাবার সব আদেশ যুক্তিযুক্ত মনে না হলেও সে তা পালন করে থাকে। এই সব আদেশ যখন সহ্য করার অনুপযুক্ত ও নীতিবিগর্হিত বলে বিবেচিত হয় তখনই কেবল সে তা অমান্য করে। বাবাও অবিলম্বে এই জাতীয় সশ্রদ্ধ অমান্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন। অনুরূপভাবে জনসাধারণ যখন রাষ্ট্রের বহুবিধ বিধান পালন করার দ্বারা নিজেদের সক্রিয় আনুগত্য সপ্রমাণ করতে সক্ষম হবেন তখনই কেবল তাদের অহিংস আইন অমান্যের অধিকার জন্মাবে।

তৃতীয় পাঠ হল নিগ্রহ বরণের। নিগ্রহ বরণের শক্তি যাঁর নেই তিনি অসহযোগ করতে পারেন না। যিনি প্রয়োজনে তাঁর সম্পত্তি এবং এমন কি পরিবারকে উৎসর্গ করতে শেখেননি তিনি কখনও অসহযোগ করতে পারেন না। কোন দেশীয় নৃপতি হয়ত অসহযোগের কারণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর অসহযোগী প্রজাদের সব রকমের শাস্তি দিতে পারেন। সেইখানেই হবে প্রেম ধৈর্য ও শক্তির পরীক্ষা। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে যিনি প্রস্তুত নন তিনি অসহযোগ করতে পারবেন না। কেবল দুই একজন পূর্বোক্ত ত্রিবিধ পাঠে পারঙ্গম হলে সমগ্র জনসাধারণ যে সত্যাগ্রহের উপযুক্ত বা তার জন্য প্রস্তুত এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং অসহযোগ শুরু করার পূর্বে বহুসংখ্যক জনসাধারণকে এইভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। তাড়াহুড়া করে অসহ-যোগিতা করার পরিণামে ক্ষতিই হবে। বহু স্বদেশপ্রেমী তরুণ আমি যেসব বিধিনিষেধের কথা বলেছি তার তাৎপর্য উপলব্ধি না করার দরুন অধীর হয়ে পড়েন। যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের মত অসহযোগ করতে হলেও পূর্ব-

প্রস্তুতি প্রয়োজন। শুধু ইচ্ছা করলেই কেউ অসহযোগকারী হতে পারেন না। শৃঙ্খলা অপরিহার্য।...আর প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলার অনুশীলন করার পর হয়ত দেখা যাবে যে আর হয়ত অসহযোগিতার প্রয়োজনই নেই।

বর্তমান অবস্থা দেখে আমার এই ধারণা হয়েছে যে কাথিয়াওয়াড়ের মত দেশের অপরাপর অংশেও ব্যক্তিগতভাবে আমাদের স্বদেশবাসীদের প্রস্তুত হতে হবে। প্রত্যেককে সেবা ত্যাগ সত্য অহিংসা সংযম ধৈর্য ইত্যাদি বৃত্তির অনুশীলন করতে হবে। এই সব বৃত্তির বিকাশের জন্য তাঁদের গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নীরবে জনসাধারণের ভিতর সৎকার্য করলে বহু সংস্কার আপনাআপনিই সংসাধিত হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১-১৯২৫

॥ ১৪ ॥

সত্যাগ্রহের সীমাবদ্ধতা

যাবতীয় আইন অমান্য সত্যাগ্রহের অংশ বা শাখা; কিন্তু তাবৎ সত্যাগ্রহই আইন অমান্য আন্দোলন নয়।...বাংলার রাজবন্দীদের ক্ষেত্রে কেমন করে সঙ্গতভাবে সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করা যায় এখন আমি তাই বলব। তাঁরা যদি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হন বা আমাকে উপহাস না করেন তবে আমি এই কথা বলে শুরু করতে চাই যে খাদির দ্বারা জনসাধারণের শক্তিবৃদ্ধি করে এবং খাদির মাধ্যমে বিদেশী বস্ত্রের বয়কট করে তাঁরা সত্যাগ্রহ করতে পারেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত হয়ে তাঁরা সত্যাগ্রহ করতে পারেন এবং উভয়ের মধ্যে বিবাদ হলে নিজেদের মাথা ফাটতে দিয়ে ও কোন প্রকাশ্য বিবাদ যখন থাকবে না তখন ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের নীরব সেবাকার্যের দ্বারা সত্যাগ্রহ করা চলতে পারে। এই জাতীয় গঠনমূলক পদ্ধতি যদি তাঁদের কাছে অত্যন্ত নীরস মনে হয় এবং বর্তমানে আমাদের চতুর্দিকে চিন্তা উক্তি ও কার্যের ক্ষেত্রে হিংসার যে পরিবেশ রয়েছে তৎসত্ত্বেও তাঁরা যদি আইন অমান্যের কম কোন কিছুতে সন্তুষ্ট না হন তাহলে আমি নিম্নোক্ত ব্যক্তিগত আইন অমান্যের নিদান দেব যা এমন কি এককভাবে যে-কেউ করতে পারেন। এর দ্বারাই যে অবিলম্বে রাজবন্দীরা মুক্তি পাবেন—এমন দাবি করা হচ্ছে না, তবে আমি অবশ্যই এই

আশা করি যে এ জাতীয় একক আত্মোৎসর্গের পরিণামে শেষ অবধি রাজবন্দীরা বাইরে আসতে পারবেন। একদল অথবা এমন কি একজন মাত্র ব্যক্তি ধরুন নাগপুর থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় লাটসাহেবের বাড়ির অভিমুখে রওনা হলেন। পদব্রজে এতটা আসা তাঁদের বা তাঁর পক্ষে যদি বিরক্তির বা অসম্ভব মনে হয় তাহলে তাঁরা বা তিনি বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে রেলভাড়া যোগাড় করে ট্রেনে কলকাতায় পৌঁছাতে পারেন। কলকাতায় পৌঁছানোর পর মাত্র একজন করে সত্যাগ্রহী পদব্রজে লাটসাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হবেন ও যতক্ষণ না তাঁকে বাধা দেওয়া হচ্ছে চলতে থাকবেন। বাধা পেলে তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে রাজবন্দীদের মুক্তি অথবা তাঁর নিজের গ্রেপ্তারের জন্য দাবি জানাবেন। এই আইন অমান্যের অহিংস চারিত্রধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সত্যাগ্রহী সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র থাকবেন এবং অপমান পদাঘাত ও এমন কি তার চেয়েও বেশী দুর্ব্যবহার হলেও নীরবে নিজের স্থানে অটল থেকে গ্রেপ্তার হবার সময় আসামাত্র তিলমাত্র প্রতিবাদ বিনা গ্রেপ্তার বরণ করবেন। তাঁর নিজের খাবার ও পানীয় জল তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে এবং নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে গীতা, কোরাণ, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা অথবা গ্রন্থসাহেব ও নিজের তকলী তাঁর কাছে থাকবে। এক পশলা ভাল বৃষ্টি যেমন মাত্র একদিনের মধ্যে ভারতবর্ষের সমতলভূমিকে একটি সুন্দর সবুজ গালিচায় রূপান্তরিত করে তেমনি এ জাতীয় অনেক যথার্থ সত্যাগ্রহী পাওয়া গেলে তাঁরা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হবেন।

ইতিমধ্যে কেউ যেন সত্যাগ্রহের কৃত্রিম অনুকরণ না করেন। কেউ যেন এর হাস্যকর নিদর্শন পেশ না করেন। সম্ভব হলে সত্যাগ্রহকে শান্তিতে এক পাশে সরিয়ে রেখে দেওয়া উচিত। অবাধ কর্মের জন্য অন্যান্য ক্ষেত্র মুক্ত রয়েছে। যে অসীম সমুদ্রের মধ্যে কোন আলোক-গৃহ নেই সেখানে অর্ণব-পোতের কর্ণধার যদৃচ্ছা বিচরণ করতে পারেন। কিন্তু আলোক-গৃহের অস্তিত্ব ও তার অবস্থিতি জানা সত্ত্বেও যে কর্ণধার যদৃচ্ছ বিচরণ করেন অথবা প্রতারণাকারী তারকাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে আলোক-গৃহের অবস্থান জানার জন্য যিনি চেষ্টা করেন না, তাঁকে তাঁর পদের অযোগ্য আখ্যা দিতে হবে। পাঠক যদি আমার কথা মানেন তাহলে তিনি যেন এই কথা বোঝার চেষ্টা করেন যে ভারতবর্ষের রাজনীতির অজানা সমুদ্রের মধ্যে আমি নিজেকে সত্যাগ্রহ নামক সেই আলোক-গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারী বলে দাবি

করি। এইজন্য আমি এই প্রস্তাব করেছি যে যাঁরা সত্যাগ্রহ করতে চান তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণকারীর পরামর্শ নিলে ভাল করবেন। তবে আমি একথাও জানি যে সত্যাগ্রহের উপর আমার কোন একচেটিয়া সত্ব নেই। আমার পদের স্বীকৃতির জন্য আমি তাই কেবল আমার সহকর্মীদের প্রশ্রয়ের উপরই ভরসা করতে পারি।

॥ ১৫ ॥

নীল-মূর্তি সত্যাগ্রহ

সত্যাগ্রহের স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি যেসব বিশদ বিবরণ চেয়েছিলাম তা আমাকে পাঠিয়েছেন। এর থেকে দেখা যায় যে বিবরণ প্রস্তুত করার সময় পর্যন্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ত্রিশ জন স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করেছেন। এর মধ্যে ২৯ জন হিন্দু, ১ জন মুসলমান। জনৈকা ৩৫ বৎসর বয়স্কা মহিলা ও তাঁর ৯ বৎসর বয়স্কা কন্যাও এর ভেতর আছেন। এই ত্রিশ জনের মধ্যে দুজন ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তি পেয়েছেন। যদি সংক্রামক হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে দুই একজনের ক্ষমা যাচ্ঞাতে কিছু যায় আসে না। প্রত্যেক আন্দোলনেই দুই একজন দলত্যাগী পাওয়া যায়। যাঁরা জেলে গেছেন তাঁরা কেউই বিখ্যাত ব্যক্তি নন। এতে কোন ক্ষতি হয়নি। বরং যে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন সত্য ছাড়া অপর কোন মর্যাদার পিয়াসী নয় এবং নিজ লক্ষ্যে অবিচল আস্থা ও একান্তভাবে অহিংস মানসিকতা আধারিত আত্মনিগ্রহ ছাড়া অপর কোন শক্তির ভিত্তি যার নেই তার পক্ষে এটা বরং একটা লাভই।

স্বেচ্ছাসেবকেরা যেন অধৈর্য না হন। ধৈর্যের অভাব হিংসারই একটি পর্যায়। জয়ের সঙ্গে সত্যাগ্রহীর কোন সম্বন্ধ নেই। বিজয় সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় কিন্তু তাহলেও তাঁকে জানতে হবে যে বিজয় আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। তাঁর কর্তব্য হল শুধু কৃচ্ছ্রবরণ করা।

প্রাপ্ত বিবরণ থেকে সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের আয়-ব্যয়ের হিসাবও পাওয়া গেছে। সত্যাগ্রহীদের বুঝতে হবে যে প্রত্যেকটি পয়সাকে তাঁদের কৃপণের ধনের মত ব্যবহার করতে হবে। আমার মতে তাঁদের টাকাপয়সার দায়িত্ব কোন স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করা উচিত এবং কোন সেবা-মনোবৃত্তিবিশিষ্ট হিসাব পরীক্ষক যাতে সেই হিসাব পরীক্ষা করেন তার ব্যবস্থা

করা উচিত। জনসাধারণের অর্থ নাড়াচাড়া করার ব্যাপারে যেন কঠোরতম সততা ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। জনসেবার সুস্থ প্রথা গড়ে তোলার জন্য এ এক অপরিহার্য শর্ত।

তৃতীয় যে কাগজটি পেয়েছি সেটি হল জনসাধারণের কাছে তাঁদের আবেদন। সত্যাগ্রহীদের আবেদনে সংযত শব্দপ্রয়োগ করতে হবে। আমার কাছে যে আবেদনপত্রটি এসেছে তাতে আপত্তির কিছু না থাকলেও এর উন্নতির অবকাশ আছে। "কেবল নীলই নয় তার তাবৎ পাপিষ্ঠ জাতের উচ্ছেদ করতে হবে"—এমন একটি বাক্য যা আবেদনের অন্তর্নিহিত ভাবকে নষ্ট করে। জেনারেল নীল আর নেই। আমাদের সম্বন্ধ তাঁর মূর্তিটির সঙ্গে—এমন কি ঠিক মূর্তিটির সঙ্গেও নয়। মূর্তিটি যে নীতির প্রতীক আমরা চাই তার বিলুপ্তি। কোন মানুষের ক্ষতিসাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর আত্মনিগ্রহ বরণের দ্বারা আমরা ইংরেজ সমেত সমগ্র জনমতের সমর্থন আমাদের পক্ষে এনে আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপূর্তি করতে চাই। এখানে ক্রোধ ও ঘৃণার ভাষার কোন স্থান নেই।

স্বেচ্ছাসেবকদের কর্তব্য সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

জনসাধারণেরও তাঁদের প্রতি একটা কর্তব্য আছে। তাঁরা জেলে না যেতে পারেন কিন্তু বহুভাবে তাঁরা এ আন্দোলনের দেখাশুনা, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও সহায়তা করতে পারেন। এই মূর্তি অপসারণের আন্দোলন আসলে এক গভীরমূল ব্যাধির উপসর্গ দূরীকরণের প্রয়াস। মূর্তিটির অপসারণ-মাত্র যদিও রোগের নিরাকরণ ঘটবে না, এর দ্বারা এর জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হবে এবং আসল রোগের মূলে উপনীত হবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। সময় সময় উপসর্গের চিকিৎসা করে দৃঢ়নিবদ্ধ ব্যাধির মূলে পৌঁছানো যায়। অতএব যতদিন সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকেরা অকলুষিতভাবে ও নৈষ্ঠিক সত্যাগ্রহের শর্তানুযায়ী এ যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন ততদিন তাঁরা জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবার অধিকারী।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩-১০-১৯২৭

॥ ১৬ ॥

সত্যাগ্রহের যোগ্যতা

আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি এবং সত্যাগ্রহীর একটা সামাজিক মর্যাদা সত্যাগ্রহের পূর্বশর্ত। অন্যায় ও অন্যায়কারীর পার্থক্য সত্যাগ্রহী কদাচ ভুললে চলবে না। অন্যায়কারীর প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ বা তিক্ততা থাকবে না। অন্যায়কারীর অন্যায় যত প্রবলই হোক না কেন সত্যাগ্রহী তাঁর প্রতি অকারণ আপত্তিকর বাক্য প্রয়োগ করবেন না। কারণ প্রতিটি সত্যাগ্রহীর মনে এই বিশ্বাস ওতপ্রোত থাকা চাই যে পৃথিবীতে এমন কোন পতিত ব্যক্তি নেই যাঁকে প্রেম দ্বারা পরিবর্তিত করা না যায়। সত্যাগ্রহী সর্বদা ভাল দ্বারা মন্দকে, প্রেম দ্বারা ক্রোধকে, সত্য দ্বারা মিথ্যাকে ও অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করার চেষ্টা করবেন। পৃথিবী থেকে অন্যায় দূর করার অপর কোন পন্থা নেই। সুতরাং নিজেকে সত্যাগ্রহী বলে দাবিকারী ব্যক্তি সর্বদা অভিনিবিষ্ট ও প্রার্থনাময় আত্মনিরীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা এই কথা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন যে তিনি স্বয়ং ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঐজাতীয় মানবীয় দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত কিনা—যে সব পাপের বিরুদ্ধে তিনি এক ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ করতে উদ্যত হয়েছেন স্বয়ং তিনি তার প্রভাবাধীন কিনা। আত্মশুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তে সত্যাগ্রহীর বিজয়ের অর্ধেক নিহিত। সত্যাগ্রহী এই বিশ্বাস নিয়ে চলেন যে সত্য ও প্রেমের মৌন ও বাহ্য অভিব্যক্তিহীন ক্রিয়া বাগ্‌বিস্তার ও ঐজাতীয় দৃষ্টিগ্রাহ্য ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অধিকতর স্থায়ী ও অবিনশ্বর ফল প্রসব করে।

সত্যাগ্রহ যদিচ নীরবে কার্যসাধনক্ষম তবুও সত্যাগ্রহীকে কিছুটা প্রত্যক্ষ কার্যে রত হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ সত্যাগ্রহী যে পাপ দূরীভূত করতে চান ব্যাপক ও নিবিড় আন্দোলনের দ্বারা প্রথমে তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করবেন। কোন সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনমত ভাল মত জাগ্রত হয়ে উঠলে এমন কি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিও আর তার আচরণ করতে বা প্রকাশ্যে তার সমর্থন করার সাহস পাবেন না। জাগ্রত ও বুদ্ধিযুক্ত জনমত সত্যাগ্রহীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র। সর্বজনগ্রাহ্য জনমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে যখন কোন ব্যক্তি কোন সামাজিক অনাচারকে সমর্থন করেন তখন তাঁকে সামাজিক বহিষ্কার করার সুস্পষ্ট অবকাশ এসেছে বলা চলে। তবে যাঁকে সামাজিক

ভাবে বহিষ্কার করা হচ্ছে তাঁর ক্ষতি করা কদাচ সমাজচ্যুত করার এই লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হবে না। সামাজিক বহিষ্কারের অর্থ হল দোষী ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পূর্ণ অসহযোগ—এর বেশীও নয় কমও নয়। এর তাৎপর্য হল এই : যে ব্যক্তি সজ্ঞানে সমাজকে উপেক্ষা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন সমাজের সেবা পাবার কোন অধিকার তাঁর নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে এইটুকুই যথেষ্ট। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এবং প্রত্যেকটি পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থারও তারতম্য হতে পারে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৮-১৯২৯

॥ ১৭ ॥

সত্যাগ্রহের কয়েকটি বিধান

শব্দগত অর্থে সত্যাগ্রহের মানে হল সত্যের প্রতি আগ্রহ। এই আগ্রহের ফলে সত্যাগ্রহী অতুলনীয় শক্তির অধিকারী হন। সত্যাগ্রহ শব্দটির ভিতর এই ক্ষমতা বা শক্তি অন্তর্নিহিত। খাঁটি সত্যাগ্রহ নিজ স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়। শাসকবর্গ, অপরাপর নাগরিক এবং এমন কি সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধেও যথার্থ সত্যাগ্রহের প্রয়োগ হতে পারে।

এ জাতীয় এক বিশ্বজনীন শক্তি স্বভাবতই আপন-পর, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী কিংবা শত্রুমিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। সত্যাগ্রহে যে শক্তির প্রয়োগ করা হয় কদাচ তা দৈহিক হতে পারে না। এতে হিংসার কোন স্থান নেই। অতএব অহিংসা বা প্রেমশক্তিরই কেবল সার্বত্রিক প্রয়োগ সম্ভবপর। অর্থাৎ এ হল আত্মশক্তি।

প্রেম অপর কাউকে দাহ না করে আপনাকে আপনি দহন করে। সুতরাং সত্যাগ্রহী অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধকারী সানন্দে এমন কি মৃত্যুবরণ করবেন।

অতএব একথা স্পষ্ট যে অহিংস প্রতিরোধকারী বর্তমান রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য সম্ভাব্য সকল রকমে প্রয়াস করলেও চিন্তা, বাক্য বা কর্মে কোন ইংরেজের স্বেচ্ছায় কোন প্রকারের দৈহিক ক্ষতিসাধন করবেন না। সত্যাগ্রহের এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পাঠককে সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত বিধানাবলী বুঝতে সাহায্য করবে :

ব্যক্তি হিসাবে

১। সত্যাগ্রহী অর্থাৎ আইন অমান্যকারী কোন রকম ক্রোধ পোষণ করবেন না।

২। বিরোধীর ক্রোধের প্রতিক্রিয়া তিনি সহ্য করবেন।

৩। এরকম করার সময় তিনি বিরুদ্ধবাদীর প্রহারও বরদাস্ত করবেন কিন্তু কখনও প্রত্যাঘাত করবেন না। তবে ক্রোধপরবশ হয়ে কেউ কোন হুকুম দিলে শাস্তি পাবার ভয়ে বা ঐ জাতীয় কোন কারণে তিনি তার কাছে নতিস্বীকার করবেন না।

৪। কর্তৃপক্ষস্থানীয় কোন ব্যক্তি আইন-অমান্যকারীকে গ্রেপ্তার করতে চাইলে তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দেবেন এবং তাঁরা যদি তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে চান তাহলে তাতে বাধা দেবেন না।

৫। ট্রাস্টী বা ন্যাসী হিসাবে আইন-অমান্যকারীর রক্ষণাবেক্ষণাধীন কোন সম্পত্তি থাকলে তিনি তা সমর্পণ করতে অস্বীকার করবেন। ন্যাসের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে তিনি জীবনপাত করবেন। তবে তিনি কদাচ প্রত্যাঘাত করবেন না।

৬। কটূক্তি ও শাপশাপান্ত না করাও প্রত্যাঘাত না করার মধ্যে পড়ে।

৭। অতএব আইন-অমান্যকারী কখনও তাঁর বিরোধীকে অপমান করবেন না ও এই একই কারণে আজকাল অহিংসার আদর্শবিরোধী যেসব নূতন নূতন ধুয়ো উঠেছে তাও উচ্চারণ করবেন না।

৮। আইন-অমান্যকারী ইউনিয়ন জ্যাককে অভিবাদন করবেন না। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার এর অথবা দেশী কিংবা ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অপমান করবেন না।

৯। আন্দোলন চলাকালীন কেউ কোন রাজকর্মচারীকে অপমান অথবা আক্রমণ করলে আইন-অমান্যকারী নিজের জীবন বিপন্ন করেও ঐ জাতীয় কর্মচারীদের অপমান ও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

বন্দী হিসাবে

১০। বন্দী হিসাবে আইন-অমান্যকারী কারাকর্মচারীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবেন এবং কারাগারের যেসব বিধিবিধান আত্মসম্মানবিরোধী নয়

সে-সবই পালন করবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে তিনি কারাকর্তৃপক্ষকে সাধারণ রীতিতে নমস্কার জানালেও কোন রকম অপমানকর চক্রাকারে আবর্তন করতে অথবা "সরকার—সেলাম" বা অনুরূপ কোন ধ্বনি দিতে অস্বীকার করবেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রাঁধা ও পরিবেশিত যে খাদ্য তাঁর ধর্মের প্রথাবিরুদ্ধ নয় তা তিনি গ্রহণ করবেন এবং অপমানজনকভাবে অথবা নোংরা পাত্রে পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করবেন।

১১। আইন-অমান্যকারী নিজের ও সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করবেন না। নিজেকে তিনি কোন প্রকারেই অপর সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করবেন না এবং তাঁর শরীর সুস্থ-সমর্থ রাখার জন্য অপরিহার্য নয় এমন কোন সুখ-সুবিধা তিনি চাইবেন না। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ চাইবার অধিকার তাঁর আছে।

১২। যেসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া আত্মমর্যাদার পরিপন্থী নয় তার দাবিতে আইন-অমান্যকারী প্রায়োপবেশন করবেন না।

দল রূপে

১৩। ব্যক্তিগতভাবে প্রীতিপ্রদ মনে হোক বা না-ই হোক, দলনেতার সব নির্দেশ আইন-অমান্যকারী সানন্দে পালন করবেন।

১৪। দলনেতার কোন নির্দেশ তাঁর কাছে অপমানকর বিদ্বেষপ্রসূত বা এমন কি মূর্খতাপ্রসূত—যাই মনে হোক না কেন প্রথমে তিনি তা পালন করবেন এবং অপর উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাবেন। আইন-অমান্যকারীর দলে যোগদান করবার পূর্বে তাঁর একথা বিবেচনা করার অধিকার আছে যে এই দল তাঁর সন্তুষ্টিবিধান করতে পারবে কিনা। কিন্তু একবার দলের অন্তর্ভুক্ত হবার পর বিরক্তিকর যাই মনে হোক না কেন, দলের শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত থাকা তাঁর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সামগ্রিক বিচারে দলের ভূমিকা যদি কোন আইন-অমান্যকারীর কাছে অন্যায় বা অনৈতিক মনে হয় তাহলে দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু দলের মধ্যে থাকাকালীন দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অধিকার তাঁর নেই।

১৫। আইন-অমান্যকারী তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গের ভরণপোষণের জন্য কোন রকম ভাতা ইত্যাদি পাবার আশা রাখবেন না। সেরকম কোন ব্যবস্থা যদি হয়ে যায় তবে তাকে আকস্মিক ব্যাপার মনে করাই সঙ্গত। আইন-

অমান্যকারী তাঁর পরিবার-পরিজনবর্গকে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে রেখে যাবেন। সাধারণ যুদ্ধেও যখন হাজার হাজার ব্যক্তি যোগদান করেন তখন কেউ কারও জন্য পূর্ব বন্দোবস্ত করতে পারেন না। সত্যাগ্রহে তাহলে আরও কত বেশী হবে! তবে আমাদের সার্বত্রিক অভিজ্ঞতা হল এই যে, সে সময়ে কদাচিৎ এরকম কেউ অনশনে কালাতিপাত করেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়

১৬। কোন আইন-অমান্যকারী জ্ঞাতসারে কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদের কারণ হবেন না।

১৭। এ জাতীয় বিবাদ সংঘটিত হলে তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন না। তবে যে দল দৃশ্যতঃ ন্যায়ের পক্ষে কেবল তাঁদের সাহায্য করবেন। হিন্দু হলে তিনি মুসলমান ও অপরাপরদের প্রতি বদান্য হবেন এবং হিন্দুদের আক্র-মণের হাত থেকে অহিন্দুকে রক্ষা করার জন্য জীবন বিসর্জন দেবেন। আর অপর পক্ষ আক্রমণকারী হলে তিনি প্রত্যাঘাত করার কোন কর্মসূচীর ভাগী-দার হবেন না—শুধু হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য জীবন দেবেন।

১৮। সাম্প্রদায়িক বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে এমন সব রকম পরিস্থিতি তিনি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলবেন।

১৯। সত্যাগ্রহীদের কোন শোভাযাত্রা বের হলে তা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবার মত কোন কিছু করবে না এবং কারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবার সম্ভাবনাযুক্ত কোন শোভাযাত্রায় সত্যাগ্রহীরা অংশগ্রহণ করবেন না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-২-১৯৩০

॥ ১৮ ॥

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

সত্যাগ্রহে সংখ্যাবল আদৌ বিবেচ্য নয়। এখানে সত্যাগ্রহীর যোগ্যতাই সর্বদা প্রধান বিবেচ্য—বিশেষ করে হিংসাশক্তি যেখানে অত্যন্ত প্রবল।

তাছাড়া প্রায়ই একথা ভুলে যাওয়া হয় যে অন্যায়কারীকে ব্যতিব্যস্ত করা

আদৌ সত্যগ্রহীর কাম্য নয়। সত্যাগ্রহীর আবেদন তাঁর ভয়ের কাছে নয়, সর্বদা এ আবেদন হল তাঁর হৃদয়ের দরবারে। সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য হল অন্যায়-কারীকে স্বমতে দীক্ষিত করা, তাঁকে চাপ দিয়ে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করা নয়। তাঁর সকল ক্রিয়াকলাপে তিনি কৃত্রিমতা বর্জন করবেন। তাঁর কাজ-কর্মের উৎস হল স্বাভাবিক ও আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস।

উপরোক্ত মন্তব্য মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখলে পাঠক সম্ভবতঃ আমার মতে ভারতবর্ষের প্রতিটি সত্যাগ্রহীর যোগ্যতার নিম্নোক্ত তালিকার যথার্থতা উপলব্ধি করবেন।

১। ঈশ্বরে তাঁর অবশ্যই জীবন্ত বিশ্বাস থাকবে। কারণ তিনিই তাঁর একমাত্র আধারশিলা।

২। সত্য ও অহিংসা হবে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের মত এবং সেইজন্য মানব-স্বভাবের অন্তর্নিহিত শুভবৃত্তির উপর তাঁর আস্থা থাকবে। স্বয়ং কৃচ্ছ্রবরণ দ্বারা সত্য ও প্রেমের যে অভিব্যক্তি হবে তার মাধ্যমে তিনি মানব স্বভাবের এই অন্তর্নিহিত শুভবৃত্তির উদ্বোধন প্রয়াসী হবেন।

৩। নিজে তিনি পবিত্র জীবন যাপন করবেন এবং স্বীয় আদর্শের খাতিরে তিনি নিজ ধন-প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবেন।

৪। তিনি নিয়মিত খাদি পরিধান করবেন ও সুতা কাটবেন। ভারতের পক্ষে এটা অপরিহার্য।

৫। তিনি কোন রকম মাদক দ্রব্য সেবন করবেন না যাতে তাঁর বুদ্ধি কখনও আচ্ছন্ন না হয় ও মন সজাগ থাকে।

৬। সময় সময় যেসব নিয়মশৃঙ্খলা নির্দিষ্ট করা হবে তিনি সানন্দচিত্তে তা পালন করবেন।

৭। কোন কারাবিধান বিশেষভাবে তাঁর আত্মমর্যাদাকে আহত করার জন্য তৈরী না হলে তিনি সেগুলি মেনে চলবেন।

সত্যাগ্রহীর যোগ্যতার এই তালিকা কেবল দিশা-নির্দেশক, সম্পূর্ণ নয়।

হরিজন, ২৫-৩-১৯৩৯

॥ ১৯ ॥

শান্তি সৈনিকের যোগ্যতা

কিছুদিন পূর্বে আমি শান্তিসেনার সংগঠন করার কথা বলেছিলাম। এর সদস্যরা দাঙ্গা, বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে। আমার মনে এই পরিকল্পনা ছিল যে, এই ধরনের শান্তি সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হলে পুলিস এমন কি সৈন্যবাহিনীরও আর প্রয়োজন থাকবে না। একথা খুব উচ্চাশার পরিচায়ক মনে হতে পারে। এর পরিপূর্তি সম্ভব নাও হতে পারে। তবে কংগ্রেসকে যদি তার অহিংস সংগ্রামে জয়ী হতে হয়, তবে এই জাতীয় পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামলানোর ক্ষমতা তাকে গড়ে তুলতে হবে।

তা হলে এবার দেখা যাক যে প্রস্তাবিত শান্তিসেনার সদস্যদের কি কি গুণ থাকা দরকার।

১। অহিংসায় তাঁর জীবন্ত বিশ্বাস থাকা চাই। ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আস্থা ছাড়া এ সম্ভব নয়। ভগবানের কৃপা এবং শক্তি ছাড়া কোন অহিংস ব্যক্তি কিছুই করতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতিরেকে তিনি ক্রোধ, ভয় এবং প্রতিহিংসাবৃত্তিশূন্য হয়ে মরতেও পারবেন না। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং তাই তাঁর উপস্থিতিতে ভয়ের কোন কারণ নেই—এই বিশ্বাস থেকে পূর্বোক্ত সাহসের জন্ম হয়। ঈশ্বরের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে তথাকথিত বিরোধী পক্ষ বা গুণ্ডাদের জীবনকেও সম্মান করা। মানুষের ভিতরকার পশুস্বভাব যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন তার ক্রোধের উপশম করার জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতি খুবই সহায়ক হয়।

২। শান্তি দূত পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হবেন। অর্থাৎ তিনি যদি হিন্দু হন তা হলে ভারতের অন্যান্য ধর্মমতকেও তিনি শ্রদ্ধা করবেন। সুতরাং তাঁকে এ দেশের বিভিন্ন ধর্মের মূল সূত্রগুলি জানতে হবে।

৩। সাধারণত শান্তি স্থাপনা করার এই কাজ স্থানীয় লোকেদের পক্ষে নিজ নিজ এলাকাতেই করা সহজ।

৪। একক ভাবে বা দলবদ্ধ হয়ে এ কাজ করা যায়। সুতরাং কেউ যেন সঙ্গী-সাথীর জন্য অপেক্ষা না করেন। তবে নিজের পাড়ায় সঙ্গী-সাথী জুটাতে

চাওয়া স্বাভাবিক এবং এইভাবে সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে শান্তি সৈনিকের একটি দল খাড়া করার চেষ্টা অবশ্য করতে হবে।

৫। শান্তি দূত নিজের পাড়া বা কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সেবাকার্য দ্বারা জনসংযোগ করতে থাকবেন। এতে লাভ হবে এই যে, কোন বিসদৃশ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দাঙ্গাকারী জনতা তাকে একেবারে অপরিচিত আগন্তুক, সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে মনে করবেন না।

৬। এ কথা বলাই বাহুল্য, শান্তি সৈনিকের চরিত্র সন্দেহাতীত হবে এবং পক্ষপাতহীন আচরণের জন্য তাঁর খ্যাতি থাকা চাই।

৭। সাধারণত বিপদ আসার পূর্বে তার আভাস পাওয়া যায়। এই রকম খবর পাওয়া গেলে শান্তিসেনা আগুন লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। পূর্ব থেকেই তাঁরা অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য লেগে পড়বেন।

৮। শান্তিসেনার আন্দোলনের প্রসার ঘটলে এর জন্য কয়েকজন সর্বক্ষণের কর্মী থাকা ভাল, তবে এ একেবারে অপরিহার্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক সৎ নর-নারীর সমাবেশ করা। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে। নিজেদের নিয়মিত কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা অবসর সময় নিজ নিজ এলাকার নর-নারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবেন। অথবা অন্য ভাবেও এঁরা শান্তিসেনার পক্ষে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী অর্জন করতে পারেন।

৯। প্রস্তাবিত শান্তিসেনাদের একটা নির্দিষ্ট পোশাক থাকা দরকার; তা হলে প্রয়োজনের সময় কোনরকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই এঁদের চিনে বার করা যাবে।

এগুলি হচ্ছে সাধারণ ধরনের সুপারিশ। এর ভিত্তিতে প্রত্যেকটি কেন্দ্র নিজেদের গঠনতন্ত্র তৈরি করে নিতে পারেন।

হরিজন, ১৮-৬-১৯৩৮

॥ ২০ ॥

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে জনসাধারণকে ভবিষ্যতে এক বা একাধিক প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কেবল দৈহিক হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার কর্মসূচীর কেন্দ্রস্থলে আমি কোন রকম দ্বিধা না করেই চরখা ও তৎসংশ্লিষ্ট আর সব কিছুকে রাখতে চাই। তাড়াতাড়ি সাড়া পাওয়া গেলে এই পর্যায় স্বল্পকাল স্থায়ী হতে পারে। তবে জনসাধারণ যদি সোৎসাহে সাড়া না দেন তাহলে এটা দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা হতে পারে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের চতুর্বিধ* গঠনমূলক কর্মসূচী ছাড়া আমার অপর কোন কার্যক্রমের কথা জানা নেই। জনসাধারণ যদি আন্তরিক ভাবে এই কার্যসূচী গ্রহণ না করেন তাহলে আমি এই কথাই বুঝব যে তাঁদের ভিতর অহিংসার অস্তিত্ব নেই অথবা আমার ধারণা অনুযায়ী অহিংসা নেই কিংবা তাঁদের বর্তমান নেতৃত্বের উপর আস্থা নেই। আমি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে কথা বলছি তাছাড়া তো আমার কাছে পরীক্ষার অপর কোন মানদণ্ড নেই। আম যে নূতন আলোক পেয়েছি তা আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছে যে পূর্বোক্ত প্রকারের শৃঙ্খলার রূপায়ণের ব্যাপারে অতীতের মত আমার আর দুর্বলতা প্রকাশ করা চলবে না। যেখানে যেখানে প্রস্তাবিত শর্তসমূহ যথোচিতভাবে পালিত হয়েছে সেখানে আইন অমান্য করার পরামর্শ দেবার পথ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেই আইন অমান্য অবশ্য ব্যক্তিগত হবে। তবে অহিংসার পরিপ্রেক্ষিতে তা হবে অতীতের যে কোন ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের তুলনায় অনেক বেশী কার্যকর। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে অতীতের আন্দোলনগুলি অল্পাধিক দোষযুক্ত ছিল। তবে তার জন্য আমার মনে কোন অনুতাপ নেই। কারণ তখন তার চেয়ে শ্রেয় কোন পন্থার কথা আমার জানা ছিল না। ভুল বুঝতে পারা মাত্র তার সংশোধন করার মত বুদ্ধি ও নম্রতা আমার ছিল। এইজন্য জাতি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে। এবারে কিন্তু এ ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন সাধন করার সময় এসে গেছে।

হরিজন, ১০-৬-১৯৩৯

---

* পরবর্তীকালে অষ্টাদশবিধ হয়। (অনুঃ)

॥ ২১ ॥

সত্যাগ্রহী ও শরীরচর্চা

অহিংস আচরণের জন্য এমন কতকগুলি কর্তব্য পালন করতে হয় যা শুধু শরীর চর্চাকারীদের পক্ষেই করা সম্ভবপর। সুতরাং অহিংস আচরণকারী ব্যক্তি কোন্ ধরনের শরীর চর্চা করবেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সম্বন্ধে যে-সব বিধি-বিধান প্রযোজ্য তার অতি অল্প সংখ্যকই অহিংস প্রতিষ্ঠানের বেলায় কার্যকরী। সশস্ত্র সেনাবাহিনীর অস্ত্রসম্ভার লোক দেখানোর জন্য নয়, নিঃসন্দেহে ধ্বংসাত্মক কার্যে ব্যবহারের জন্য। অহিংস সংগঠনের ঐ জাতীয় অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না এবং সেইজন্য তার সদস্যেরা তলোয়ারকে লাঙ্গলের ফলা ও বর্শাকে নিড়ানীতে রূপান্তরিত করবেন এবং এই সবকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্ররূপে প্রয়োগের চিন্তাও করবেন না। হিংস সৈনিকের শিক্ষার প্রারম্ভ হবে তাঁকে গুলি করতে শিখিয়ে।

অহিংস সৈনিক এসব বিলাসে মত্ত হবার সময়ই পাবেন না। অসুস্থের পরিচর্যা করে, জীবন বিপন্ন করে সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তিদের উদ্ধার করে, যেসব মহল্লায় চোর-ডাকাতের ভয় আছে সেখানে পাহারা দিয়ে এবং প্রয়োজন পড়লে নিজের জীবন দিয়ে এসব দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করে অহিংস সৈনিক তাঁর যা কিছু প্রশিক্ষণ তা পাবেন। এমন কি উভয়ের উর্দিতেও পার্থক্য থাকবে। হিংসাশ্রয়ী ব্যক্তি এমন উর্দি পরবেন যা তাঁর আত্মরক্ষার সহায়ক এবং যা লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অহিংসানিষ্ঠ ব্যক্তির উর্দি হবে অনাড়ম্বর, নম্রতার প্রতীক এবং দেশের দরিদ্রদের পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর পোশাকের লক্ষ্য হবে গরম, শীত ও বর্ষার হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা। সশস্ত্র সৈনিক যতই ভগবানের নাম নিন না কেন, তাঁর আসল রক্ষাকর্তা হল তাঁর অস্ত্রশস্ত্র। এই অস্ত্রশস্ত্রের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি কুণ্ঠিত হবেন না। অহিংসনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রথম ও শেষ ঢাল ও বর্ম হবে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস। আর উভয়ের মানসিকতায়ও দুই মেরুর ব্যবধান হবে। হিংসাশ্রয়ী ব্যক্তি সর্বদা তাঁর শত্রুর বিনাশের পরিকল্পনা করবেন ও ঈশ্বরের কাছে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রার্থনা করবেন। এই প্রসঙ্গে ইংরেজদের জাতীয় সঙ্গীতের কথা বিবেচ্য। শত্রুর অসাধু চাতুরী বানচাল করার জন্য ও তার বিনাশ

সাধনের জন্য এতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়। লক্ষ লক্ষ ইংরেজ শ্রদ্ধাভরে দণ্ডায়মান হয়ে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে এই সঙ্গীত গেয়ে থাকেন। ঈশ্বর যদি করুণাবতার হন তাহলে তিনি এ জাতীয় প্রার্থনায় কর্ণপাত করবেন বলে মনে হয় না। তবে যাঁরা এই গান গেয়ে থাকেন তাঁদের মন এর দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য এবং যুদ্ধের সময় এর দ্বারা তাঁদের মনের বিদ্বেষ ও ক্রোধ প্রচণ্ড বেগে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। সশস্ত্র যুদ্ধজয়ের অন্যতম শর্ত হল শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষকে প্রচণ্ডভাবে প্রজ্বলিত রাখা।

অহিংসনিষ্ঠের অভিধানে বাহ্য শত্রু বলে কোন শব্দ নেই। তথাকথিত শত্রুর প্রতিও তাঁর মনে সংবেদনশীলতা ছাড়া অপর কিছু থাকবে না। তিনি বিশ্বাস করবেন যে কোন মানুষ স্বেচ্ছায় দুষ্ট নয়, এমন কোন লোক নেই যিনি ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না এবং ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার এই বৃত্তিকে যদি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করা যায় তাহলে অবশ্যই তা অহিংসায় পরিণত হবে। সুতরাং তিনি এই বলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন যে তিনি যেন সেই তথাকথিত শত্রুকে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান দেন ও তাঁকে আশীর্বাদ করেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি সর্বদা এই প্রার্থনা জানাবেন যে তাঁর ভিতরকার করুণাধারা যেন সদা প্রবাহিত থাকে ও তাঁর নৈতিক শক্তি যেন সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যার দ্বারা তিনি নির্ভয়ে মরণ বরণ করতে পারেন।

সুতরাং উভয়ের মানসিকতায় এইভাবে মেরুর ব্যবধান থাকবে বলে তাঁদের শরীর চর্চার পদ্ধতিতেও সমান পার্থক্য থাকবে।

সামরিক শিক্ষা কেমন সে সম্বন্ধে আমাদের সবার কম-বেশী ধারণা আছে। কিন্তু কদাচিৎ আমরা চিন্তা করেছি যে অহিংস প্রশিক্ষণ ভিন্ন ধরনের হবে। আর একথাও আমরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করিনি যে অতীতে পৃথিবীর কুত্রাপি এজাতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হত কিনা। আমার অভিমত এই যে অতীতে এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হত এবং এখনও এলোমেলো ভাবে এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হঠযোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এই উদ্দেশ্যের সাধক। এইসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরের যে অনুশীলন হয় তার দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য, শক্তি, তৎপরতা এবং শীতাতপ সহের শক্তি বিকশিত হয়।······যদিও হঠযোগের পদ্ধতিতে উন্নতির অবকাশ আছে তবুও এই ব্যাপার দেখাবার জন্য আমি হঠযোগের উল্লেখ করছি যে অহিংস প্রশিক্ষণের এই প্রাচীন পদ্ধতি এখনও

চলছে। আর আমার একথাও জানা নেই যে এই বিজ্ঞানের জনকের গণ অহিংসার প্রয়োগের কোন পরিকল্পনা ছিল কিনা। হঠযোগ অনুশীলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ। এর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল দেহকে শক্তিশালী ও শুদ্ধ করে তোলা যাতে মন আয়ত্তাধীন হয়। বর্তমানে আমরা যে গণ অহিংসার কথা চিন্তা করছি তা সকল ধর্মের লোকের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং তাই এর বিধি-বিধান এমনভাবে রচনা করতে হবে যে, সেগুলি যেন অহিংসায় বিশ্বাসী সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। তাছাড়া আমরা অহিংস সেনাবাহিনী অর্থাৎ সত্যাগ্রহ সঙ্ঘ সৃষ্টি করার কথাও ভাবছি বলে পুরাতনকে আমাদের ভিত্তিস্বরূপ স্বীকার করে নিয়েই আমাদের নূতনের গোড়াপত্তন করতে হবে। অতএব সত্যাগ্রহীর যে শরীর চর্চার প্রয়োজন তার কথা বিবেচনা করা যাক। সত্যাগ্রহীর দেহ মন যদি সুস্থ না হয় তাহলে সম্ভবতঃ তিনি পূর্ণ নির্ভীকতার পরিচয় দিতে অক্ষম হবেন। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দিবারাত্র খাড়া হয়ে থাকার শক্তি তাঁর থাকা চাই। শীত, রোদ ও বৃষ্টির মধ্যে থাকলেও তিনি অসুখে পড়বেন না। তিনি বিপজ্জনক জায়গায় যাবার শক্তি রাখবেন, আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, নির্জন অরণ্য ও মৃত্যুর বিভীষিকাপূর্ণ এলাকায় একাকী ভ্রমণের সাহস তাঁর থাকবে। বিনা অনুযোগে তিনি প্রচণ্ড প্রহার, ক্ষুধা ও আরও নিগ্রহ বরদাস্ত করবেন এবং নিঃসঙ্কোচে নিজের কর্তব্যকেন্দ্রে অটল হয়ে থাকবেন। আপাতদৃষ্টিতে যে দাঙ্গাহাঙ্গামার কেন্দ্রকে অগম্য স্থান বলে মনে হয় সেখানে প্রবেশ করার বুদ্ধি ও যোগ্যতা তাঁর থাকবে। অগ্নিশিখায় আবৃত অট্টালিকার উপরতলার অধিবাসীদের উদ্ধার করার জন্য মুখে ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা ও যোগ্যতা তাঁর থাকবে। বন্যাপ্রবাহে ভাসমান মানুষকে রক্ষা করার জন্য ও কূপের মধ্যে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস তাঁর থাকবে।

এই তালিকাকে অনন্ত করা যায়। এর সারমর্ম হল এই যে বিপন্ন ব্যক্তি-দের উদ্ধার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার যোগ্যতা আমাদের অর্জন করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় নিগ্রহ হাসিমুখে বরণ করতে হবে। এই মূল নীতি যিনি স্বীকার করবেন সহজেই তিনি সত্যাগ্রহীর উপযুক্ত শরীর চর্চার বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে সমর্থ হবেন। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এই প্রশিক্ষণের বনিয়াদ হল ঈশ্বর-বিশ্বাস। এর অবর্তমানে অন্য যতই প্রশিক্ষণ

পাওয়া যাক না কেন সঙ্কট-মুহূর্তে তা কাজে লাগবে না।

কংগ্রেসে এমন অনেকে আছেন যাঁরা ঈশ্বরের নামোচ্চারণে লজ্জাবোধ করেন—এই কথা বলেকেউযেন আমার পূর্বোক্ত উক্তিকে তাচ্ছিল্য না করেন; সত্যাগ্রহ-বিজ্ঞানকে যেভাবে বুঝেছি ও বিকশিত করেছি আমি কেবল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছি। যে নামেই মানুষ তাঁকে জানুক না কেন, সত্যাগ্রহীর একমেব অস্ত্র হল ঈশ্বর। তাঁকে ছাড়া মারাত্মক ভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিরোধীর সম্মুখে সত্যাগ্রহী সম্পূর্ণভাবে নির্বল। অধিকাংশ মানুষ দৈহিক শক্তির সম্মুখে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে যিনি একমাত্র রক্ষাকর্তা বলে জানেন তিনি এই ধরাতলের প্রবলতম শক্তির সামনেও নতিস্বীকার করবেন না।

ঈশ্বর-বিশ্বাসের মত সত্যাগ্রহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্যও অপরিহার্য। ব্রহ্মচর্য ব্যতিরেকে সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রভাবে দণ্ডায়মান হবার প্রভাব বা আভ্যন্তরীণ শক্তি সত্যাগ্রহীর হবে না। যৌন সংযমের দ্বারা বীর্য সংরক্ষণের সীমিত অর্থে এখানে ব্রহ্মচর্য শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে—শব্দটির আমি যে ব্যাপক সংজ্ঞার্থ দিয়েছি তার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে না। সাদাসিধা ভোজ্যে জীবনধারণ করে এবং বাহ্য উপাচারের সহায়তা গ্রহণ ব্যতিরেকেও যিনি শরীর শক্ত-সমর্থ রাখতে চান তাঁকে তাঁর এই মহামূল্যবান বীর্যের সংরক্ষণ করতেই হবে। মানুষের এ এক অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। যিনি চিরকাল এর সংরক্ষণ করতে সমর্থ হন তিনি এর থেকে নূতন করে শক্তি পেয়ে থাকেন। যিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে একে ব্যয় করেন শেষ অবধি তিনি নির্বীর্য হয়ে পড়েন। ঠিক সময়ে তিনি আর শক্তি পাবেন না। এই শক্তির সংরক্ষণের উপায় সম্বন্ধে আমি অনেক জায়গায় লিখেছি। পাঠক সেই লেখা পড়ে তদনুযায়ী আচরণ করতে পারেন। যিনি দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয় সম্ভোগে ব্যাকুল অথবা মাংসের পুত্তলীর প্রতি যাঁর প্রবল আকর্ষণ তিনি কখনও এই অমূল্য শক্তির সংরক্ষণ করতে পারবেন না। যাঁরা ভাবেন যে কঠোর নিয়ম পালন ব্যতিরেকেই এই শক্তির সংরক্ষণ করা সম্ভবপর তাঁরা ক্লান্ত না হয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার দেবার পরিকল্পনা করছেন। আর দেহের দিক থেকে সংযত থেকেও যিনি চিন্তায় পাপের প্রশ্রয় দেন, তাঁর অবস্থা ব্রহ্মচর্যের ঢক্কানিনাদ না করে সংযত গৃহস্থের জীবন-যাপনকারীর চেয়ে খারাপ। কারণ যিনি চিন্তায় কামবাসনার প্রশ্রয় দেন চিরকাল তিনি অতৃপ্ত থাকবেন এবং নীতিভ্রষ্ট ও

পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটবে। এরকম ব্যক্তি কদাচ পরিপূর্ণ সত্যাগ্রহী হতে পারেন না। সম্পদ ও যশের কাঙালদের পক্ষেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

সত্যাগ্রহীর শরীর চর্চার এই হল ভিত্তি। এই ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান সহজেই রচনা করা যেতে পারে।

এবার নিশ্চয় একথা স্পষ্ট হবে যে সত্যাগ্রহীর শরীর চর্চায় তলোয়ার ও বল্লমের মত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের স্থান নেই। কারণ আমরা যেসব অস্ত্রশস্ত্র দেখেছি তার থেকে বহুগুণ বেশী মারাত্মক মারণাস্ত্রের অস্তিত্ব আজ বিদ্যমান এবং প্রতিদিন নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার হচ্ছে। সত্য বা কাল্পনিক সব রকম ভয়কে জয় করার শিক্ষা যাঁর পেতে হবে একটি তলোয়ার তাঁকে আর কোন্ ভয় থেকে বাঁচাবে? তলোয়ার চালাতে শিখে কেউ সব ভয় জয় করেছে—এমন কথা আমি আজও শুনিনি। অস্ত্রশস্ত্র চালাতে জানতেন বলে মহাবীর বা তাঁর মত আর সবাই অহিংসার স্মরণ নেননি। এসবের ব্যবহার জানা সত্ত্বেও তাঁরা সব ভয় ঝেড়ে ফেলেছিলেন বলেই অহিংসার শরণ নিয়েছিলেন।

একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে যিনি সর্বদা তলোয়ারের উপর নির্ভর করে এসেছেন তাঁর পক্ষে একে পরিহার করা কঠিন। তবে যিনি জ্ঞাতসারে তলোয়ার বর্জন করবেন তাঁর অহিংসা সম্ভবতঃ তলোয়ারের প্রয়োগ সম্বন্ধে অজ্ঞ অথচ একে ভয় করব না বলে চিন্তাকারী ব্যক্তির চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে যথার্থ অহিংস হতে হলে মানুষকে পূর্বাহ্নে অস্ত্রশস্ত্রের মালিক ও ব্যবহারকারী হতে হবে। কূট তর্ক প্রয়োগে কেউ বলতে পারেন যে একমাত্র চোরই সাধু, ব্যাধিগ্রস্তই সুস্থ ও উচ্ছৃঙ্খলই ব্রহ্মচারী হতে পারে। আসল কথা হল এই যে আমরা গতানুগতিক পন্থায় চিন্তা করতে অভ্যস্ত এবং তার বাইরে যেতে চাই না। আর আমরা অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পারি না বলে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না ও চোরা ফাঁদে পড়ে যাই।

হরিজন, ১৩-১০-১৯৪০

॥ ২২ ॥

পোড়ামাটি

আমার যে ভাইটি আমার সঙ্গে যুদ্ধরত সে যাতে জল পান করতে না পারে তার জন্য আমার কুয়াতে বিষ মেশানো বা কুয়া বুজিয়ে ফেলার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই। ধরে নেওয়া যাক যে সনাতন রীতিতেই আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করছি, আর এতে কোন আত্মত্যাগের অবকাশও নেই, কারণ এই পদক্ষেপ আমাকে পবিত্র করে না। আর আত্মত্যাগ শব্দটি থেকেই বোঝা যায় যে এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল শুদ্ধি বা পবিত্রতা। এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক কাজ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মত। অতীতের যোদ্ধাদের যুদ্ধ করার একটা সুস্থ নিয়ম ছিল। কূপ দূষিত করা ও খাদ্যশস্য নষ্ট করা তখন নিষিদ্ধ ছিল। তবে আমি অবশ্যই বলব যে আমার কুয়া শস্য ও ঘর-গৃহস্থালী ইত্যাদি অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে যাবার মধ্যে সাহসিকতা ও ত্যাগ আছে। সাহসিকতা এইজন্য যে আমার পদক্ষেপের দ্বারা স্বেচ্ছায় আমি শত্রুর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রেখে যাই যাতে সে আমার বিরুদ্ধে আরও লড়তে পারে। আর ত্যাগ এইজন্য বলছি যে শত্রুর জন্য কিছু রেখে যাওয়ার মানসিকতা আমাকে শুদ্ধ ও মহান করে তোলে।

হরিজন, ১২-৪-১৯৪২

॥ ২৩ ॥

গঠনমূলক প্রস্তুতি

সাহসীর অহিংসার পরিবেশ কি করে গড়ে তোলা যায় সে সম্বন্ধে রাজকোটের কর্মীদের উপদেশ দান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বললেন :

"চতুর্দশবিধ গঠনমূলক কার্যক্রমকে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে কর্মীরা অভিনিবেশ সহকারে প্রয়াস করার সময় এককভাবে কায়মনোবাক্যে অহিংসার কতটা অনুশীলন করেন তার উপরই এটা নির্ভর করছে। বেশী কাজ ও কম কথা—এই হবে আপনাদের লক্ষ্য। গঠনমূলক কার্যসূচীর কেন্দ্রস্থলে

রয়েছে চরখা। এলোমেলো ভাবে যদৃচ্ছ চরখা চালালে হবে না, এর গণিত ও যন্ত্রকৌশল সহ যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করতে হবে। কার্পাস, তার বিভিন্ন জাতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে হবে। এ ছাড়া অক্ষরজ্ঞান প্রসারের কর্মসূচী রয়েছে। আপনাদের অনন্যনিষ্ঠ হয়ে এই কর্মসূচীর রূপায়ণে ব্রতী হতে হবে। অপর কিছু সম্বন্ধে আলোচনা করা চলবে না। কাজ করতে হবে বিধিবদ্ধভাবে এবং নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে। রাজনীতির কথা—এমন কি অহিংসার কথাও বলবেন না, জনসাধারণের কাছে বলবেন অক্ষর পরিচয়ের উপকারের কথা। মদ্যাদি নেশার বস্তু ও জুয়া খেলার অভ্যাস বন্ধ করার কর্মসূচীও রয়েছে। স্বাস্থ্যরক্ষা সাফাই বিজ্ঞানের নিয়ম ও ঘরোয়া সহজ ঔষধ এবং স্বল্পব্যয়ের টোটকা ইত্যাদির প্রচারের দ্বারা লোকের রোগ জ্বালা উপশমের ব্যবস্থা করতে হবে। বুদ্ধিমান গ্রামবাসীদের এসব শেখাতেও হবে।

"রাজকোটে এমন কোন বাড়ি থাকবে না যার সঙ্গে নিছক সেবার দৃষ্টি-কোণ থেকে আপনাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁদের নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করতে হবে। হরিজনরা রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গেও জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করুন।

"এই সব গঠনমূলক কাজ করতে হবে এই কাজেরই খাতিরে। তবুও খেয়াল রাখবেন যাতে এর দ্বারা অহিংস দায়িত্বশীল সরকার গঠনের শক্তি বিকশিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি এই ভাবে কাজ শুরু করেছিলাম। তাঁদের সেবা করার মাধ্যমে আমি কাজ আরম্ভ করি। আমি জানতাম না যে আমি তাঁদের আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত করছি। আর এও আমি জানতাম না যে নিজেকে আমি এর উপযুক্ত করে গড়ে তুলছি। আর শেষ অবধি কি হয়েছিল তা আপনাদের সবার জানা আছে।

"এই গঠনমূলক কাজ নিরন্তর চলতে পারে, তার জন্য ক্লান্তিবোধ করবেন কেন? ইংলণ্ডের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের কথা কি আপনারা জানেন? তাঁরা যদি একশ' বছর ধরে যুদ্ধ করে থাকেন তাহলে আমাদের হাজার বছর ধরে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কারণ আমরা এক মহাদেশের বাসিন্দা। আমরা যে স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের অবদান রেখে গেছি—এই-ই হবে আমাদের পারিতোষিক।

"আমি চাই যে এই ব্যাপক গণ-গঠনমূলক কাজে আপনারা আত্মনিয়োগ

করুন। আর বীরের অহিংসার প্রশিক্ষণের ভিত্তিও এই। কর্মসূচী সামগ্রিক এবং অবিভাজ্য। যাঁরা মনেপ্রাণে এতে বিশ্বাস করেন না তাঁরা যেন আমার সঙ্গ বর্জন করেন এবং নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেন।"

হরিজন, ১০-৬-১৯০৯

॥ ২৪ ॥

কৃচ্ছ্রসাধনের বিধান

কৃচ্ছ্রসাধনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতিরেকে কোন দেশ কদাচ উঠতে পারেনি। সন্তান যাতে বাঁচতে পারে তার জন্য মা কষ্ট সহ্য করেন। শস্য জন্মাবার শর্ত হল এই যে বীজের দানাটির অস্তিত্ব মুছে যাবে। মৃত্যুর ভিতর থেকে হয় জীবনের আবির্ভাব। কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে শুদ্ধ হবার এই শাশ্বত বিধান পূর্ণ না করেই কি ভারতবর্ষ পরবশ্যতার বন্ধনমুক্ত হতে পারবে?

আমার পরামর্শদাতাদের বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে ভারতবর্ষ বিশেষ পরিশ্রম ব্যতিরেকেই তার লক্ষ্যে উপনীত হবে। কারণ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি না হোক—এই তাঁদের মুখ্য চিন্তা। অসহযোগের ফলে বহু লোককে কষ্ট বরণ করতে হবে বলে তাঁরা একে ভয় করেন। এই যুক্তিচালিত হলে হ্যাম্পডন জাহাজের টাকা দেওয়া বন্ধ করতেন না আর ওয়াট টেলারও বিদ্রোহের মানোন্নয়ন করতেন না। শত দুঃখ কষ্ট বরণ করতে হোক না কেন মানুষ ন্যায়পথে চলা অক্ষুণ্ণ রেখেছে—এর বহুবিধ নিদর্শন ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের ইতিহাসে আছে। এর ফলে অজ্ঞ ব্যক্তিদের নিগ্রহ ভোগ করতে হবে কিনা এই সব ঘটনার নায়কেরা বসে বসে সে কথা চিন্তা করেননি। আমাদের ইতিহাস ভিন্ন ভাবে লেখার কথা আমরা চিন্তা করব কেন? ইচ্ছা করলে আমরা পূর্বগামীদের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আরও ভালভাবে কোন কাজ করতে পারি। কিন্তু আমাদের সত্তার একমেব অপরিহার্য বিধান কৃচ্ছ্রসাধনার নীতি বর্জন করা অসম্ভব। আরও ভালভাবে কাজ করার পন্থা হল পারলে আমাদের তরফ থেকে হিংসা বর্জন করা ও এইভাবে প্রগতির মাত্রা বাড়ানো এবং কৃচ্ছ্র সাধনার প্রক্রিয়ায় অধিকতর শুদ্ধতার প্রবর্তন করা। সিন্‌ফিন্ আন্দোলনের লোকেরা আজ যেমন গায়ের

জোরে অন্যায়কারীদের নিজেদের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করাচ্ছেন, অধৈর্যতা বশতঃ আমরা তেমন করব না। অথবা গত বছর হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন নিজেদের প্রতিবেশীদের উপর চাপ দিয়ে নিজ পন্থানুসরণে বাধ্য করেন, তেমনটাও আমরা করব না। কৃচ্ছ্রবরণকারী কতটা কৃচ্ছ্রবরণ করছেন তার ভিত্তিতেই প্রগতির পরিমাপ হবে। কৃচ্ছ বরণ যত শুদ্ধ হবে প্রগতির পরিমাণও হবে তত বেশী। এইজন্য যীশুর আত্মত্যাগ দুঃখময় জগৎকে মুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছিল। প্রতিবেশীরা স্বেচ্ছায় বা অপর কোন্ ভাবে নিগ্রহ বরণ করছেন এগিয়ে চলার পথে যীশু তা বিবেচনা করেননি। এইভাবে হরিশ্চন্দ্রের কৃচ্ছ্রসাধনা সত্যের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছিল। তিনি নিশ্চয় জানতেন যে রাজত্ব ত্যাগ করার জন্য তাঁর প্রজাদের অকারণ কষ্ট পেতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি, কারণ সত্যের অনুসরণ ছাড়া অপর কোন কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ইতিপূর্বেই আমি বলেছি যে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের আমি ততটা নিন্দা করি না যতটা করি ইংরেজদের হত্যা ও আমাদের হাতে সম্পত্তির বিনষ্টিসাধনকে। অমৃতসরের বীভৎসতা লাহোরের অপেক্ষাকৃত ধীর কিন্তু প্রচণ্ডতর ভয়ঙ্করতা থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয়। অথচ লাহোরে অপেক্ষাকৃত ধীর প্রক্রিয়ায় জনসাধারণকে নির্বীর্য করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। তবে উর্ধ্বে ওঠার পূর্বে আমাদের আরও বহুবার এ জাতীয় প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে যতক্ষণ না আমরা স্বেচ্ছায় নিগ্রহ বরণ করতে ও এতে আনন্দ পেতে শিখছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে লাহোরবাসীদের যে নিষ্ঠুর অপমান সহ্য করতে হয় কদাচ তার জন্য তাঁরা দায়ী নন, তাঁরা একজনও ইংরেজকে আঘাত করেননি বা কদাচ কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করেননি। শাসকশক্তি কিন্তু সজ্ঞানে পরশাসনের শৃঙ্খল অপসারণ-কামী জনসাধারণের মনোবল চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আর আমাকে যদি বলা হয় যে এসব ঘটেছে আমার সত্যাগ্রহ প্রচারের ফলে তাহলে আমি জবাব দেব যে যতক্ষণ আমার শ্বাস থাকবে ততক্ষণ আমি আরও জোরে সত্যাগ্রহের প্রচার করব এবং জনসাধারণকে বলব যে এর পরের বার জোর করে দোকানের জিনিসপত্র বিক্রি করে দেওয়া হবে এই হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে নয় ও'ডায়ারের ঔদ্ধত্যের জবাব

দিতে হবে অত্যাচারীর আরও বীভৎস কৃতির জন্য প্রস্তুত থেকে, তারা যেন জনসাধারণের অজেয় আত্মা ছাড়া আর সব সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়।

গত বছর আমি যে হিসাবের ভুলের নিন্দা করেছিলাম তার সঙ্গে জনসাধারণের উপর আরোপিত নিগ্রহের কোন সম্পর্ক ছিল না। জনসাধারণ যে সব ভুল করেছিল এবং সত্যাগ্রহের বাণী সম্যকভাবে বুঝতে না পারার জন্য তাঁদের দ্বারা যেসব হিংসার অনুষ্ঠান হয়েছিল আমি তারই সমালোচনা করেছিলাম। তাহলে নিগ্রহ বরণ করার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগের অর্থ কি? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সরকার আমাদের উপর শাসন করছে তার প্রতি সহযোগ প্রত্যাহার করে নেবার জন্য যে সব ক্ষতি ও অসুবিধা হবে আমরা স্বেচ্ছায় তা মেনে নেব। থোরোর মতে অন্যায়কারী সরকারের আওতায় ক্ষমতা ও সম্পদের মালিক হওয়া অপরাধ। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য বরণই পুণ্যকার্য, সংক্রান্তিকালে আমরা হয়ত ভুল করতে পারি। কোন কোন কষ্ট হয়ত এড়ানো যায়। কিন্তু সমস্ত জাতি নির্বীর্য হয়ে যাবার বদলে এও বরং কাম্য।

অন্যায়কারী তার পাপ সম্বন্ধে সচেতন না হওয়া পর্যন্ত অন্যায়ের প্রতিবিধান করার জন্য অপেক্ষা করতে আমরা অস্বীকার করব। আমাদের বা অপর কারও কষ্ট হবে এই কথা ভেবে কদাচ আমরা অন্যায়ের সহকারী হব না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অন্যায়কারীকে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

বাবা কোন অন্যায় করলে সন্তানদের কর্তব্য হল পিতৃগৃহ ত্যাগ করা। কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যদি নীতিবিগর্হিতভাবে সেই শিক্ষায়তন পরিচালনা করেন তাহলে ছাত্রদের কর্তব্য হল সেই বিদ্যালয় বর্জন করা, কোন পৌরসংস্থার প্রধান দুর্নীতিপরায়ণ হলে অপরাপর সদস্যদের তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে দুর্নীতির সম্পর্করহিত হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে কোন সরকার যদি মারাত্মক অন্যায় করে তাহলে প্রজাদের কর্তব্য হল পূর্ণ বা আংশিকভাবে তার প্রতি সহযোগিতা প্রত্যাহার করা যাতে শাসক অন্যায় থেকে নিবৃত্ত হন। আমি যে সব পরিস্থিতির কল্পনা করেছি তার প্রত্যেকটিতেই মানসিক বা শারীরিক—কোন না কোন রকমের নিগ্রহ বরণের সম্পর্ক আছে। এ জাতীয় নিগ্রহ বরণ ব্যতিরেকে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৬-১৯২০

॥ ২৫ ॥

সমালোচকদের প্রতি

অতীতের মত আবার আমি স্বীকার করছি যে অসহযোগ করার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি অবশ্যই আছে। তবে গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখে জড়বৎ নিষ্ক্রিয় থাকায় যে অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা বিদ্যমান তার তুলনায় অসহযোগ সংগঠিত করলে যে হিংসার আশঙ্কা আছে মনে হচ্ছে তা যৎসামান্য। কিছু না করার অর্থ নিঃসন্দেহে হিংসাকে সেধে আহ্বান করা।

অসহযোগ আন্দোলনকে নিন্দা করে প্রস্তাব মঞ্জুর করা বা প্রবন্ধ লেখা সহজ। কিন্তু প্রবল অন্যায়বোধের কারণ উত্তেজিত জনসাধারণকে সংযত রাখা সহজ ব্যাপার নয়। যাঁরা অসহযোগের বিরুদ্ধে বলছেন বা কাজ করছেন তাঁদের আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন তাঁদের আরাম কেদারা ছেড়ে নেমে আসেন ও জনসাধারণের কাছে গিয়ে তাঁদের মনোভাবের কথা জেনে তারপরও যদি অসহযোগের বিরোধী থাকেন তাহলে যেন এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখেন। আমার মত তাঁরাও দেখবেন যে হিংসা পরিহারের একমাত্র পন্থা হল জনসাধারণের এই বিক্ষিপ্ত মনোভাবের প্রতিবিধান করা। আমি তো অসহযোগ ছাড়া প্রতিবিধানের অপর কোন পথ পাইনি। এ পন্থা যুক্তিযুক্ত ও হানিকর নয়। যে সরকার প্রজাদের কথা শুনবে না তাকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করা জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আন্দোলন হিসাবে অসহযোগ কেবল তখনই সাফল্যলাভ করতে পারে যখন জনসাধারণের মনোভাব এতটা খাঁটি ও প্রবল হয় যে তারা চরম কৃচ্ছ্রবরণের জন্য প্রস্তুত হয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৫-১৯২০

॥ ২৬ ॥

সাফল্যের প্রথম শর্ত

…অসহযোগের এই সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা বড জিনিস হল জনসাধারণের ভিতর নিয়ম শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করা এবং কর্মীদের ভিতর পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনা করা। সাফল্যজনক অসহযোগ আদর্শ সংগঠন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। পাঞ্জাবে আমাদের সভাগুলিতে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ দেখে মনে হয়েছে যে জনসাধারণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিতে চায়—কিন্তু কিভাবে এটা করবে তা তাদের জানা নেই। অধিকাংশ ব্যক্তিই সরকারী যন্ত্রের জটিলতা সম্বন্ধে অনবহিত। একথাও তাঁরা বুঝতে পারেন না যে নীরবে হলেও প্রতিটি নাগরিক নিশ্চিতভাবে নিজের অজ্ঞাতসারে প্রচলিত সরকারকে ধারণ করে রাখেন। অতএব নিজ সরকারের প্রতিটি কার্যকলাপের জন্য প্রত্যেকটি নাগরিক দায়ী। আর সরকারের কাজকর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত বরদাস্ত করা যায় ততক্ষণ সরকারকে এইভাবে সমর্থন দেওয়া যুক্তিযুক্তও বটে। কিন্তু সরকারের এইসব কাজ যখন তাঁকে এবং তাঁর জাতির ক্ষতিসাধন করে তখন সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া তাঁর কর্তব্য হয়ে পড়ে।

তবে পূর্বেই আমি যেমন বলেছি যে কি করে এটা সুশৃঙ্খলভাবে করতে হয় সব নাগরিক সেকথা জানেন না। ক্রোধ থেকে হয় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি আর বুদ্ধিযুক্ত প্রতিরোধ শৃঙ্খলার জনক। অতএব যথার্থ সাফল্যের প্রথম শর্ত হল হিংসার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। সরকারের প্রতিনিধি অথবা আমাদের দলে যোগদানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অর্থাৎ সরকার-সমর্থকদের উপর হিংসাচরণ করার অর্থ হল প্রতি পদে আমাদের আদর্শের অপহ্নব, অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ও নিরীহ প্রাণের অকারণ অপচয়। সুতরাং যাঁরা চান যে অসহযোগ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সফল হোক তাঁদের দেখতে হবে যে তাঁদের আশেপাশে যেন সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৮-৭-১৯২০

॥ ২৭ ॥

অতুলনীয় অস্ত্র

জনসাধারণের হাতে অসহযোগ এক অতুলনীয় ও শক্তিশালী অস্ত্র। যে অন্যায়কারী সরকার অসত্য ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে অবিচারের প্রশ্রয় দেয় তার সমর্থন করা ধর্মীয় অবক্ষয়ের নিদর্শন। অতএব যতক্ষণ না সরকার অবিচার ও অসত্যাচরণের দুষ্টক্ষত থেকে নিজেকে নিরাময় করে না তোলে ততক্ষণ সমাজে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রেখে সরকারকে সকল রকম সহযোগিতা দান থেকে বিরত থাকা জনসাধারণের কর্তব্য। সুতরাং অসহযোগের প্রথম পর্যায় এইভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যাতে সমাজের শান্তি ন্যূনতম পরিমাণে ব্যাহত হয় এবং আন্দোলনে যোগদানকারীদেরও যথাসম্ভব স্বল্প স্বার্থত্যাগ করতে হয়। আর তাঁরা যদি পাপাসক্ত এক সরকারকে সাহায্য করতে অথবা তার কোন অনুগ্রহ নিতে অনিচ্ছুক হন তাহলে একথা স্পষ্ট যে তাঁদের সেই সব সরকারী উপাধি ও খেতাব বর্জন করতে হবে যা আর আদৌ গৌরবের বস্তু নয়। আইনজীবীরা আসলে আদালতের অবৈতনিক কর্মচারী এবং তাঁরা তাই যে আদালত এক অন্যায়কারী সরকারের মর্যাদার সংরক্ষক তাকে সমর্থন করা বন্ধ করবেন ও জনসাধারণ তাঁদের বাদ-বিসম্বাদ বেসরকারী মধ্যস্থতার সাহায্যে মিটিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখবেন। অনুরূপভাবে অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সরকারী বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে নেবেন এবং তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সরকারনিরপেক্ষ জাতীয় বা বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। নিজের পশুবল সম্বন্ধে সচেতন এক উদ্ধত সরকার হয়ত জনসাধারণের এই জাতীয় বয়কট এবং বিশেষ করে আদালত ও বিদ্যালয় যা কিনা জনসাধারণের উপকারের জন্য স্থাপিত হয়েছে বলে মনে করা হয়, তার বয়কটের প্রস্তাবে হাসতে পারে। আমার কিন্তু এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে এ জাতীয় পদক্ষেপের নৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সম্ভবতঃ ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে নিজের বিবেকের কণ্ঠরোধকারী সরকারও এড়াতে পারবে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৮-১৯২০

॥ ২৮ ॥

তলোয়ারের নীতি

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে যেখানে ভীরুতা ও হিংসা এতদুভয়ের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার অবকাশ আসবে সেখানে আমি হিংসার শরণ নেবার পরামর্শ দেব। এইজন্য আমার জ্যেষ্ঠপুত্র যখন জিজ্ঞাসা করল যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি এক রকম মারাত্মকভাবে প্রহৃত হই তখন যদি সে উপস্থিত থাকত তাহলে তার কি করা উচিত ছিল—আমাকে মরতে দিয়ে তার পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, না আমাকে রক্ষা করার জন্য তার যে দৈহিক শক্তি ছিল ও যে শক্তি সে প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিল তাকে কাজে লাগানো তার উচিত—আমি তাকে বলেছিলাম যে এমন কি হিংসা প্রয়োগ করেও আমাকে রক্ষা করা তার কর্তব্য হত। এই কারণেই আমি বুয়র যুদ্ধ অর্থাৎ তথাকথিত জুলু বিদ্রোহ এবং বিগত মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এইজন্য যাঁরা হিংস পদ্ধতিতে বিশ্বাসী তাঁদের জন্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলে থাকি। আমি চাই যে ভারতবর্ষ ভীরুর মত তার অসম্মানের অসহায় দর্শক হবার পরিবর্তে যেন নিজ মর্যাদা রক্ষার্থে অস্ত্রের শরণ নেয়।

তবে আমি বিশ্বাস করি যে অহিংসা হিংসার থেকে বহুগুণ শ্রেয়, ক্ষমা শাস্তি দেবার চেয়েও পৌরুষজনক—ক্ষমা বীরস্য ভূষণম্। তবে যেখানে শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে সেইখানেই কেবল নিবৃত্ত থাকার নাম ক্ষমা। কোন অসহায় জীব যখন ক্ষমা করার ভান করে তখন তা নিরর্থক। বিড়ালের নখর দন্তের কবলে ছিন্নভিন্ন হবার সময় ইঁদুরের বিড়ালকে ক্ষমা করার কথাই ওঠে না। তাই যাঁরা জেনারেল ডায়ার ও তাঁর সঙ্গীদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার কথা বলেন তাঁদের মনোভাব আমি বুঝতে পারি। পারলে তাঁরা জেনারেল ডায়ারকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতেন। তবে ভারত যে অসহায় একথা আমি বিশ্বাস করি না। নিজেকেও আমি অসহায় জীব মনে করি না। আমি কেবল ভারতবর্ষ ও আমার নিজের শক্তিকে অপেক্ষাকৃত ভাল উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে চাই।

আমাকে যেন ভুল না বোঝা হয়। দৈহিক বল শক্তির উৎস নয়। অদম্য ইচ্ছাশক্তি থেকে এর জন্ম। দৈহিক বলের দিক থেকে একজন গড়পড়তা জুলু

সাধারণ একজন ইংরেজের চেয়ে অনেক বলশালী। কিন্তু একটি ইংরেজ শিশুকে দেখেই বয়স্ক জুলু ভয়ে পালাবে। এর কারণ হল এই যে জুলুটি সেই ইংরেজ শিশুর বন্দুককে বা তার হয়ে যে বন্দুক চালাবে তাকে ভয় পায়। নিজের শক্ত-সমর্থ শরীর সত্ত্বেও সে মৃত্যুর ভয়ে ভীত। ভারতবর্ষে আমরা হয়ত এক মুহূর্তেই বুঝতেই বুঝতে পারব যে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর এক লক্ষ ইংরেজের কাছে ভয় পাবার কারণ নেই। অতএব সুনির্দিষ্ট ক্ষমাশীলতা এক্ষেত্রে আমার শক্তির নিশ্চিত স্বীকৃতির দ্যোতক হবে। আর সেই জাতীয় সচেতন ক্ষমাশীলতার দ্বারা আমাদের ভিতর এক প্রবল শক্তি-প্রবাহের সৃষ্টি হবে যার ফলে ডায়ার বা ফ্রাঙ্ক জনসনের পক্ষে ভারতের সমুন্নত শিরোপরি অপমান স্তূপীকৃত করা সম্ভবপর হবে না। এখনকার মত আমার বক্তব্যকে লোকগ্রাহ্য করতে পারছি না বলে আমি আদৌ বিচলিত নই। ক্রুদ্ধ ও প্রতিশোধপরায়ণ না হতে পারার মত হীন আমরা হতে পারছি না। তবে আমি একথা বলা বন্ধ করব না যে শাস্তি দেবার অধিকার বর্জন করলে ভারতের লাভ হবে বেশী। আমাদের আরও ভাল কাজ করতে হবে, পৃথিবীতে আরও মহান অবদান রেখে যেতে হবে।

আমি কল্পনাবিলাসী নই। নিজেকে আমি বাস্তব আদর্শবাদী বলে দাবি করি। অহিংসার ধর্ম কেবল মুনি-ঋষিদের জন্য নয়। এটা সাধারণ মানুষদের জন্যও বটে। হিংসা যেমন পশুর ধর্ম, অহিংসাও তেমনি মানবজাতির বিধান। আত্মা পশুর ভিতর সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং তাই দৈহিক শক্তি ছাড়া অপর কোন বিধানের কথা সে জানে না। মানুষের মর্যাদা তার কাছ থেকে এক উচ্চতর বিধান—আত্মার শক্তির প্রতি আনুগত্য দাবি করে।

এইজন্য আমি ভারতের কাছে আত্মোৎসর্গের প্রাচীন বিধান উপস্থাপিত করার সাহস করেছি। কারণ সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ ও আইন অমান্য ইত্যাদি এর শাখাপ্রশাখা আত্মোৎসর্গের বিধানের নূতন নাম ছাড়া আর কিছু নয়। হিংসার পরিবেশের মধ্যে যে সব ঋষিরা অহিংসার এই বিধানের আবিষ্কার করেন তাঁরা নিউটনের চেয়ে কম প্রতিভাধর ছিলেন না। তাঁরা স্বয়ং ওয়েলিংটনের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। অস্ত্রের ব্যবহার নিজেরা জানা সত্ত্বেও এর অকিঞ্চিৎকরতা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন এবং শ্রান্ত-ক্লান্ত বিশ্বকে এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে এর মুক্তি হিংসার পথে নয়, আছে অহিংসার মাধ্যমে।

সক্রিয় অবস্থায় অহিংসার অর্থ হল সজ্ঞানে কষ্ট সহ্য করা। এর অর্থ অন্যায়-কারীর ইচ্ছার কাছে দুর্বলের মত নতিস্বীকার করা নয়—অত্যাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের সমগ্র আত্মার শক্তি নিয়ে প্রতিরোধ করা হল এর তাৎপর্য। আমাদের সত্তার এই বিধান অনুসারে কাজ করতে গিয়ে নিজের সম্মান ধর্ম ও আত্মাকে রক্ষা করার জন্য এবং অন্যায়কারী সাম্রাজ্যের পতন বা তার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে এককভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে সেই সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভবপর।

অতএব ভারতবর্ষ দুর্বল বলে আমি তাকে অহিংসার শরণ নিতে বলছি না। নিজের শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই যেন ভারত অহিংসার আচরণ করে, নিজ শক্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি জাগাবার জন্য ভারতের পক্ষে অস্ত্রশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই। নিজেদের আমরা মাংসপিণ্ড বলে মনে করি বলেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আমি চাই ভারতবর্ষ এই কথা বুঝতে শিখুক যে সে এমন এক আত্মার অধিকারী যা অমর এবং যা যাবতীয় দৈহিক দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম ও সমগ্র বিশ্বের সম্মিলিত দৈহিক শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারে। চতুর্দিকে নিরাপদ সাগরতরঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত লঙ্কার অধিবাসী অমিত শক্তিশালী দশমুণ্ড রাবণের বিরুদ্ধে কেবল বানরসেনার সাহায্যে সাধারণ মানুষ রাম যে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার তাৎপর্য কি? এর অর্থ কি দৈহিক শক্তির উপর আধ্যাত্মিক শক্তির বিজয় নয়? যাই হোক বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে আমি যতদিন না ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের কর্তৃত্বের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে নিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী নই। ইংরেজদের মেশিনগান, ট্যাঙ্ক ও বিমান বহরের সামনে ভারতবর্ষ নিজেকে অক্ষম ও পঙ্গু বিবেচনা করে। এইজন্য নিজের দুর্বলতার কারণ ভারতবর্ষ অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করেছে। তবে তাহলেও এর দ্বারা সেই একই লক্ষ্য সাধিত হবে। অর্থাৎ যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি এর আচরণ করলে ইংরেজের অবিচারের পাষাণভার থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পাবে।

…জঙ্গী নীতি গ্রহণ করলে ভারত সাময়িক জয়লাভ করতে পারে। সে অবস্থায় ভারত আর আমার হৃদয়ের গৌরব স্বরূপ হয়ে থাকবে না। সব কিছুই আমি ভারতবর্ষের কাছ থেকে পেয়েছি বলে আমি তার সঙ্গে এত দৃঢ়সংলগ্ন। আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে ভারত বিশ্বকে এক নূতন বাণী শোনাবে। ইউরোপকে ভারত অন্ধভাবে অনুকরণ করবে না। ভারত জঙ্গী

নীতি গ্রহণ করলে সে হবে আমার পক্ষে এক পরীক্ষার মুহূর্ত। আমার বিশ্বাস সে সময় আমার ভিতর দুর্বলতা দেখা দেবে না। আমার ধর্মের কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। কর্তব্যে আমার স্থিরবিশ্বাস থাকলে আমার ভারত-ভক্তিকেও তা অতিক্রম করবে।…অহিংসা-ধর্মের দ্বারা ভারতবর্ষের সেবা করার জন্যই আমার জীবন উৎসর্গীত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-১৯২০

॥ ২৯ ॥

করবন্ধ প্রসঙ্গে

কৃষকরা অহিংস করবন্ধের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করার উপযুক্ত শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত এবং তাদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করার (যা একান্তভাবে সাময়িক হবে) এবং গরু-বাছুর ও তৈজসপত্র জোরজবরদস্তি করে বিক্রি করে দেবার দৃশ্য শান্ত প্রতিরোধমূলক দৃষ্টিতে দেখতে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া যায় না। পবিত্র প্যালেস্টাইনে যা হয়েছিল তার কথা তাঁদের বলতে হবে। আরবদের জরিমানা করে সৈন্যদের দিয়ে ঘেরাও করা হয়। তাদের মাথার উপর বিমান বহর গর্জন করছিল। বলশালী আরবদের গৃহপালিত পশু কেড়ে নিয়ে আটক করা হয়। পশুদের খোরাক এবং এমন কি জল পর্যন্ত বন্ধ করা হয়। বিমূঢ় ও অসহায় আরবরা যখন জরিমানা ও অতিরিক্ত খেসারৎ যোগাড় করল তখন যেন তাদের ব্যঙ্গ করার জন্য তাদের মৃত ও মুমূর্ষু পশুগুলি ফেরত দেওয়া হল। ভারতবর্ষে এর চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার ঘটতে পারে এবং নিঃসন্দেহে ঘটবেও। গৃহপালিত পশুগুলিকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে ও তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করছে—ভারতীয় কৃষকেরা এ দৃশ্য দেখেও সম্পূর্ণ অহিংস থাকতে ও তা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত কি? আমি জানি যে অন্ধ্র দেশে ইতিমধ্যে এ জাতীয় ঘটনা ঘটেছে। এ জাতীয় অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও কৃষকসমাজ যদি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় শান্তিপূর্ণভাবে থাকেন তাহলে বলতে হবে যে তাঁরা কর বন্ধের জন্য প্রায় প্রস্তুত।

আমি বলছি কর বন্ধের জন্য এই "প্রায় প্রস্তুত" অবস্থা আমলাদের হাত থেকে আমাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। সুতরাং কেবল কৃষক সম্প্রদায়

অহিংস থাকলে কাজ হবে না। নিঃসন্দেহে যুদ্ধের দশ ভাগের নয় ভাগই অহিংসা হলেও পুরোটা নয়। কৃষকরা অহিংস থাকলেও অস্পৃশ্যদের ভাই বলে মনে না করতে পারেন, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইহুদী ও পার্শী অর্থাৎ নিজ ধর্মবহির্ভূত অপর সম্প্রদায়ের লোকেদের সহোদর জ্ঞান না করতে পারেন। এ ছাড়া চরখা ও খদ্দরের আর্থিক ও নৈতিক মূল্য সম্বন্ধেও তাঁরা অবহিত না হয়ে থাকতে পারেন। আর এসব না হলে তাঁরা স্বরাজ অর্জন করতে পারবেন না। এখন এসব না করলে স্বরাজের পর করার আশা নেই। তাঁদের শেখাতে হবে যে এই সব জাতীয় গুণের অনুশীলনের অর্থই হল স্বরাজ।

সুতরাং অহিংস করবন্ধ কেবল কঠোর অনুশীলনের পর শুরু করার মত কর্মসূচী। আর নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রের আইন-ভঙ্গকারীর পক্ষে যেমন আইন অমান্যকারী হওয়া কঠিন তেমনি যাঁরা তুচ্ছতম অজুহাতে ইতিপূর্বে কর দেননি তাঁদের পক্ষেও অহিংস করবন্ধ আন্দোলনে ভাগ নেওয়া সম্ভব নয়। অহিংস করবন্ধ প্রত্যুত অসহযোগের অন্তিম পর্যায়। আইন অমান্যের অপরাপর প্রক্রিয়ার অনুশীলন করার পূর্বে আমাদের তাই এর শরণ নেওয়া উচিত নয়। আর গোড়াতেই বৃহৎ অথবা একাধিক এলাকায় কর বন্ধ আরম্ভ করা চরম বুদ্ধিহীনতার নিদর্শন হবে।

॥ ৩০ ॥

আদালত ও বিদ্যালয় বয়কট

অসহযোগ কমিটি প্রথম পর্যায়ে আইনজীবীগণ কর্তৃক আদালত ও অভিভাবক ও ছাত্রগণ কর্তৃক সরকারী স্কুল-কলেজ বয়কট করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আদালত ও শিক্ষায়তন বয়কট করার পরামর্শ দেবার জন্য আমাকে যে প্রকাশ্যে উন্মাদ আখ্যা দেওয়া হয়নি তার একমাত্র কারণ হল এই যে জনসেবক ও যোদ্ধা হিসাবে আমার কিছুটা নাম আছে।

তবে আমার এই পাগলামির একটা প্রক্রিয়া আছে বলে আমি দাবি করি। সরকার যে আদালতের মাধ্যমে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং শিক্ষায়তনের মাধ্যমে কেরানী ও অন্যান্য কর্মচারী তৈরী করে এটা বুঝতে খুব একটা চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। আদালত ও বিদ্যালয়ের কর্ণধার সরকার যখন মোটামুটি ন্যায়পরায়ণ হয় তখন এই দুই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কল্যাণকারী হয়ে

থাকে। আর সরকার অন্যায়কারী হলে এরা হয় মৃত্যু-ফাঁদ।

আমার নিবেদন এই যে জাতীয় অসহযোগের জন্য আইনজীবীগণ কর্তৃক আদালত বর্জন করা প্রয়োজন। আদালতের মাধ্যমে আইনজীবীরা যেভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তেমনটি বোধ হয় আর কেউ করেন না। আইন-ব্যবসায়ীরা জনসাধারণের কাছে আইনের ব্যাখ্যা করে কর্তৃপক্ষের সমর্থন করেন। এইজন্য আইনজীবীদের "আদালতের কর্মকর্তা" আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁদের অবৈতনিক পদাধিকারীও বলা যেতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে আইনজীবীরাই সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম সংগ্রাম করছে না নিঃসন্দেহে একথা অংশতঃ সত্য। কিন্তু তার কারণ এই পেশার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দুষ্টতার অপনোদন হয়ে যায় না। সুতরাং জাতি যখন সরকারকে পঙ্গু করে দিতে ইচ্ছুক তখন আইনজীবীর পেশা যদি সরকারকে জাতির ইচ্ছার সামনে নত করার ব্যাপারে জাতিকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে এ পেশা মুলতবী রাখতে হবে। কিন্তু সমালোচকদের বক্তব্য হল এই যে আমি যে ফাঁদ বিছিয়েছি উকিল ও ব্যারিস্টাররা যদি তাতে পা দেন তবে সরকার খুবই খুশী হবেন। আমি কিন্তু একথা বিশ্বাস করি না। সাধারণ অবস্থায় যে কথা সত্য অসাধারণ পরিস্থিতিতে তা সত্য নয়। সাধারণ সময়ে সরকার আইনজীবীগণ কর্তৃক তাঁদের কর্মপদ্ধতির তীব্র সমালোচনাকে ভয় করেন। কিন্তু যখন প্রবল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চলছে তখন কোন আইনজীবী আদালতকে এইভাবে কাজে লাগাবেন—এটা তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।

তাছাড়া আমার পরিকল্পনায় ওকালতি মুলতবী রাখার অর্থ আইনজীবীদের সব রকম কাজকর্ম বন্ধ রাখা নয়। আইনজীবীরা হাত-পা গুটিয়ে বিশ্রাম নেবেন—এমন প্রস্তাব করা হয়নি। তাঁরা তাঁদের মক্কেলদের আদালত বর্জনে অনুপ্রাণিত করবেন—এইটাই তাঁদের কাছে আশা। বাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তির জন্য তাঁরা সালিশী ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করবেন। যে জাতি অনিচ্ছুক সরকারের কাছ থেকে জোর করে ন্যায়বিচার আদায়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার পারস্পরিক বাদ-বিবাদে নিরত থাকার মত সময় থাকে না। আইনজীবীরা তাঁদের মক্কেলদের এই সত্য বুঝিয়ে দেবে না। পাঠকরা হয়ত জানেন না যে বিগত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের বহু খ্যাতনামা আইনজীবীরা তাঁদের পেশা মুলতবী রেখেছিলেন। এইভাবে নিজেদের পেশা সাময়িকভাবে মুলতবী রেখে তাঁরা

কেবল অবকাশ-রঞ্জনের সময়টুকুর জন্ম নয়, পুরো সময়ের শ্রমিক হয়ে পড়েন। সত্যকার রাজনীতি খেলার ব্যাপার নয়। পরলোকগত শ্রীযুক্ত গোখলে খেদ করে বলতেন যে রাজনীতিকে আমরা অবসন্ন বিনোদন কার্যের উর্ধ্বে ওঠাতে পারিনি। গুরুগম্ভীর প্রকৃতির প্রশিক্ষিত ও সব সময়ের কর্মী আমলাদের সঙ্গে অপেশাদার রাজনীতিবিদদের লড়তে হওয়ায় দেশের কতটা ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই।

বিদ্যালয় প্রসঙ্গে

আমার মতে আমরা যদি আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা মুলতবী রাখতে না পারি তাহলে আমাদের যুদ্ধজয়ের যোগ্যতা হয়েছে বলে বলা চলবে না।

আমার মতে বিদ্যালয়সমূহ ফাঁকা করে দেবার পিছনে কোন ত্যাগের ব্যাপার নেই। সম্পূর্ণভাবে সরকার নিরপেক্ষ হয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করতে না পারলে আমরা অসহযোগ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে অযোগ্য বুঝতে হবে। নিজের এলাকায় শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব হবে প্রতিটি গ্রামের। আমি সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী নই। সত্যকার জাগরণ এলে শিক্ষার্জন একদিনের জন্যও ব্যাহত হবার কথা নয়। যেসব শিক্ষকেরা বর্তমানে সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন তাঁরা যদি পদত্যাগ করার মত উদারতা প্রদর্শন করেন তাহলে তাঁরাই জাতীয় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের শিশুদের প্রয়োজনমত শিক্ষা দিতে পারেন এবং এইভাবে তাদের অধিকাংশ নিস্পৃহ কেরানী হবার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। এ ব্যাপারে আলিগড় কলেজ নেতৃত্ব দেবে—আমি এই আশায় আছি। আমাদের মাদ্রাসাগুলি খালি হয়ে যাবার ফলে প্রচণ্ড নৈতিক শক্তি সৃষ্টি হবে। আমার সন্দেহ নেই যে হিন্দু অভিভাবক ও ছাত্ররা তাঁদের মুসলমান ভ্রাতাদের উদাহরণ অনুকরণ করবেন।

প্রত্যুত অভিভাবক ও ছাত্ররা অক্ষরজ্ঞানের চেয়ে ধর্মীয় ভাবনায় উদ্দীপনকে প্রমুখ স্থান দিচ্ছেন—এর চেয়ে ভাল শিক্ষা আর কি হতে পারে? তাই যে সব তরুণদের স্কুল-কলেজ ছাড়িয়ে আনা হচ্ছে অবিলম্বে তাদের জন্ম যদি চারুচর্চামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নাও করা যায় তাহলে তাঁদের যে উদ্দেশ্যে সরকারী শিক্ষানিকেতন ছাড়ানো হল তার পরিপূর্তির জন্ম স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করালে তাঁদের মূল্যবান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা হয়েছে বলতে হবে। কারণ আইন-

জীবীদের মত ছাত্রদের ক্ষেত্রেও সরকারী শিক্ষা মুলতবী রাখতে বলার সময় আমি আদৌ অলস জীবনযাপন করার কথা ভাবি না। বিদ্যালয় বর্জনকারী ছাত্ররা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-১৯২০

॥ ৩১ ॥

সামাজিক বয়কট প্রসঙ্গে

অসহযোগ শুদ্ধির আন্দোলন হবার ফলে আমাদের যাবতীয় দুর্বলতা এবং এমন কি আমাদের সবলতার আতিশয্যসমূহও এর কারণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সামজিক বয়কট এক প্রাচীন প্রথা। এটা জাতিভেদ প্রথার সমকালীন। এ এক রকমের মারাত্মক বিধান যা অত্যন্ত কুশলতা সহকারে কার্যকরী করা হয়েছে। এ প্রথা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে জাতি তার আতিথ্য বা সেবা দিতে বাধ্য নয়। প্রতিটি গ্রাম যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ একম্ ছিল, তখন এ প্রথা কাজ করেছে এবং এই বিধানের বিরোধিতার ঘটনা বিশেষ ঘটেনি। কিন্তু আজকের মত যদি অসহযোগের গুণাগুণ সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত হয় এবং যখন এর নূতন প্রয়োগ একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলছে তখন অধিকাংশের ইচ্ছার সম্মুখে অল্পসংখ্যকদের নতিস্বীকার করতে বাধ্য করার জন্য সামাজিক বয়কটের শরণ নিলে তা ক্ষমার অযোগ্য হিংসার নিদর্শন-রূপে পরিগণিত হবে। জোর করে এ জাতীয় বয়কট কার্যকর করতে গেলে সমগ্র আন্দোলনই ধ্বংস হতে বাধ্য। সামাজিক বয়কটকে যেখানে শাস্তিস্বরূপ মনে না করা হয় এবং যেখানে একে সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষার সাধন বলে বিবেচনা করা হয় সেখানেই এ কার্যকরী ও সার্থক হতে পারে। তাছাড়া কোন অহিংস আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে সামাজিক বয়কটকে গ্রহণ করতে হলে এতে অমানুষিকতার স্বাদ কদাচ থাকা উচিত নয়। একে সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে হবে। যার প্রতি এটা প্রযুক্ত হচ্ছে এর ফলে তার অসুবিধা হলে যিনি এর প্রয়োগ করছেন এর জন্ত তাঁর মনেও বেদনা জাগা চাই। অতএব ঝাঁসী থেকে যে খবর পাওয়া গেছে যে জনৈক ব্যক্তিকে প্রয়োজনে চিকিৎসকের সাহায্য দেওয়া হয়নি তা অমানুষিকতার নিদর্শন এবং নৈতিক বিধান অনুসারে

হত্যার প্রয়াসের সমতুল্য। কোন মানুষকে খুন করা আর মুমূর্ষু মানুষের চিকিৎসা বন্ধ করার মধ্যে আমি কোন তফাৎ দেখতে পাই না। আমার মনে হয় এমন কি যুদ্ধের বিধানেও প্রয়োজনে শত্রুকে চিকিৎসকের সাহায্য দেবার নির্দেশ আছে। গ্রামের একমাত্র কুয়া থেকে কোন লোককে জল নিতে না দেবার অর্থ তার উপর গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশজারী করার মত। যাঁরা তাঁদের সঙ্গে সব বিষয়ে একমত নন তাঁদের উপর এই জাতীয় চরম চাপ দেবার অধিকার নিশ্চয় অসহযোগী কেউ দেননি। অধৈর্য ও অসহিষ্ণুতা নিঃসন্দেহে এই মহান ধর্মীয় আন্দোলনকে মেরে ফেলবে। জোর করে কাউকে শুদ্ধ করা যায় না। আর হিংসা প্রয়োগে কাউকে আমাদের অভিমতকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য করার কথা ভাবা আরও অবাস্তব। যে গণতন্ত্রের অনুশীলন আমরা করতে চাই এসব পদক্ষেপ তার একেবারেই বিরোধী।

আমি তাই আশা করি যে অসহযোগের কর্মীরা সামাজিক বয়কটের ফাঁদ সম্পর্কে সতর্ক হবেন। তবে সামাজিক বয়কটের বিকল্প সামাজিক মেলামেশা নয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যিনি সুস্পষ্ট দৃঢ় জনমত উপেক্ষা করেন তিনি সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকারী নন। বিবাহ, ভোজ ইত্যাদি তাঁর সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা ভাগ নেব না বা তার কাছ থেকে কোন রকম উপহারও নেব না। তবে তাঁর সামাজিক সেবা পাবার অধিকার আমরা খর্ব করব না। কারণ তাঁকে এটা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। ভোজ ইত্যাদিতে যোগদান করা সুযোগ-সুবিধার ব্যাপার—ইচ্ছা করলে কেউ এতে যেতেও পারেন আবার নাও যেতে পারেন। তবে ভুলবশতঃ ঠিক কাজ করা এবং ক্বচিৎ কখনও সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমি যেমন সীমাবদ্ধভাবে এই অস্ত্রের প্রয়োগের কথা বলেছি তদনুযায়ী এর প্রয়োগ করাও প্রাজ্ঞতার পরিচায়ক। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই অস্ত্রের প্রয়োগকারী নিজ দায়িত্বে এর প্রয়োগ করবেন। এখনও এর প্রয়োগ কর্তব্যের মর্যাদা পায়নি। এ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকলে কারও এর প্রয়োগের অধিকার নেই।

॥ ৩২ ॥

সহানুভূতিমূলক ধর্মঘট

পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম পন্থায় সহানুভূতিমূলক ধর্মঘট করলে তা আমাদের আদর্শের অপ্রমেয় ক্ষতিসাধন করবে। অহিংসার কর্মসূচীতে সরকারকে বিব্রত করে কোন কিছু হাসিল করার পরিকল্পনা আমরা কঠোর ভাবে বর্জন করব। আমাদের কার্যকলাপ যদি শুদ্ধ হয় এবং সরকারের পদক্ষেপ যদি হয় অশুদ্ধ তাহলে সরকার স্বয়ং নিজের পদক্ষেপের সংশোধন করে না নিলে স্বতঃই আমাদের শুদ্ধতার কারণে বিব্রত হবেন। সুতরাং শুদ্ধতার আন্দোলন উভয় পক্ষেরই কল্যাণকারী হয়ে থাকে। নিছক ধ্বংসের আন্দোলন কিন্তু ধ্বংসকারীকে অশুদ্ধ অবস্থাতেই রেখে দেয় এবং যাঁদের তিনি ধ্বংস করতে চান তাঁদেরই পর্যায়ে তাঁকে টেনে নামায়।

এইজন্য আমাদের সহানুভূতিমূলক ধর্মঘটসমূহকেও আত্মশুদ্ধির অর্থাৎ অসহযোগের ধর্মঘট হতে হবে। তাই কোন অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য আমরা যখন কোন ধর্মঘটের ডাক দিই তখন তার তাৎপর্য হল এই যে আমরা অন্যায় কার্যে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকব এবং এইভাবে অন্যায়কারীকে তার নিজের ভরসায় ছেড়ে দেব। অর্থাৎ অন্যায় কাজ চালিয়ে যাবার অযৌক্তিকতা বুঝতে তাঁকে বাধ্য করব। এ জাতীয় ধর্মঘট তখনই কেবল সফল হতে পারে যখন ধর্মঘটের পিছনে আর কাজে ফিরে না যাবার দৃঢ় ইচ্ছা থাকে।

অতএব বহু বৃহৎ সফল ধর্মঘটের ব্যবস্থাপক হিসাবে আমি ধর্মঘটী নেতৃবৃন্দের পথপ্রদর্শনের জন্য নিম্নোক্ত সূত্রগুলির পুনরুক্তি করছি :

১। যথার্থ কোন অভিযোগ ব্যতিরেকে ধর্মঘট করা হবে না।

২। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি নিজেদের অতীতের সঞ্চয় থেকে বা তুলো ধোনা, সুতা কাটা বা কাপড় বোনার মত সাময়িক কোন কাজ নিয়ে নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করতে পারেন তাহলে ধর্মঘট করা উচিত হবে না। জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে বা অপর কোন ধরনের দানের উপর ধর্মঘটীরা নির্ভর করবে না।

৩। ধর্মঘট শুরু করার পূর্বে ধর্মঘটীরা তাঁদের অপরিবর্তনীয় ন্যূনতম দাবি

স্থির করবেন ও সেটা সাধারণ্যে ঘোষণাও করবেন।

দাবি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও এবং ধর্মঘটকারীদের অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রতিরোধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পরিবর্তে অন্য লোকেরা কাজ করতে প্রস্তুত হলে কোন ধর্মঘট ব্যর্থ হতে পারে। অতএব যখন দেখা যাবে যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য অন্য অনেকে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন তখন মজুরী বৃদ্ধি বা অপর কোন সুখ-সুবিধা পাবার জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্মঘট করবেন না। কিন্তু যে জনদরদী বা স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তি প্রতিবেশীর দুঃখ-দরদের ভাগ নিতে চান তিনি পূর্বোক্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও ধর্মঘট করবেন। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে আমি যে ধরনের অহিংস ধর্মঘটের কথা বলছি তাতে ভীতি প্রদর্শন, অগ্নিসংযোগ বা ঐ জাতীয় হিংসাচরণের কোন স্থান নেই। সুতরাং যদি জানা যায় যে চট্টগ্রামের সন্নিহিত সাম্প্রতিক রেল দুর্ঘটনা কোন ধর্মঘটীর দুষ্কৃতি, তাহলে আমি অতিশয় দুঃখিত হব। আমি যেসব মানদণ্ডের কথা বলেছি তদনুযায়ী বিচার করলে একথা স্পষ্ট হবে যে ধর্মঘটের পৃষ্ঠপোষকদের ধর্মঘটীদের সহায়তার জন্য কংগ্রেস বা অপর কোন সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সাহায্য চাইবার বা সে টাকা নেবার পরামর্শ নেওয়া সমীচীন হয়নি। সহানুভূতিমূলক ধর্মঘটে যোগদানকারীদের সহানুভূতির পরিমাণ সেই পরিমাণে খর্ব হয়েছে যে পরিমাণে তাঁরা বাইরের অর্থসাহায্য পেয়েছেন বা গ্রহণ করেছেন। সহানুভূতি প্রকটকারীরা যে পরিমাণ অসুবিধা ও ক্ষতি বরদাস্ত করেন তার উপরই সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটের গুণাগুণ নির্ভরশীল।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-৯-১৯২১

॥ ৩৩ ॥

প্রশ্নের উত্তরে

হিংসা পরিহার করার জন্য মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও একান্ত অনভিপ্রেত হিংসা এসে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় আমি একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারি না। এর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভূমিকাও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটির ভয়ে সত্যাগ্রহীকে কর্তব্য থেকে বিরত করা যায় না। প্রয়োজন হলে আমি লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন

দেবার ঝুঁকি নেব যতক্ষণ অবশ্য তাঁরা স্বেচ্ছায় নিগ্রহ বরণ করবেন এবং নিরপরাধ ও নিষ্কলঙ্ক শিকার হবেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জনসাধারণের ভুল-ভ্রান্তিই চিন্তার বিষয়। সবল ও শক্তিমানের কাছ থেকে ভ্রম এবং এমন কি উন্মত্ততাও আশা করা যায়। আর বিজয়ের মুহূর্ত এসেছে এই সময়ে যখন শক্তিমান তার উন্মত্ত ক্রোধের শরণ নেয়নি। পক্ষান্তরে এটা স্বতঃপ্রণোদিত মর্যাদাপূর্ণ শান্ত এক আনুগত্যের কাল, তবে এ আনুগত্য অন্যায়কারী কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার কাছে নয়। অতএব সাফল্যের চাবিকাঠি রয়েছে প্রতিটি ইংরেজ ও রাজকর্মচারীর জীবন নিজেদের প্রিয়জনেদের জীবনের মতই পবিত্র জ্ঞান করার মধ্যে। বিগত প্রায় চল্লিশ বছরের চৈতন্যযুক্ত অস্তিত্বের কালে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার থেকে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে জীবন দেবার মত মহার্ঘ দান আর নেই। জোর দিয়ে আমি এই কথা বলছি যে যে মুহূর্তে ইংরেজরা অনুভব করবেন যে এই দেশে তাঁরা শোচনীয়ভাবে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের করায়ত্ত অতুলনীয় ধ্বংস সাধনের আয়ুধের কারণ নয়, ভারতীয়েরা এমন কি যাঁদের চূড়ান্ত অন্যায়কারী বলে মনে করেন তাঁদেরও জীবন নিতে অনিচ্ছুক বলেই ইংরেজদের জীবনের কোন রকম ক্ষতি হচ্ছে না সেই মুহূর্তে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজদের স্বভাবের একটা পরিবর্তন ঘটবে। আর সেই মুহূর্ত থেকে ভারতবর্ষে যেসব মারাত্মক ছুরি-ছোরা পাওয়া যায় তাতে মরচে পড়া শুরু হবে।……

অসযোগকে আমি এমন শক্তিশালী ও পবিত্র উপায় বলে মনে করি যে নিষ্ঠাসহকারে যদি এর প্রয়োগ করা যায় তাহলে তার তাৎপর্য হবে সর্বাগ্রে ঈশ্বরের রাজত্ব চাওয়া যার পর আর সব কিছুই অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে যাবে। জনসাধারণ তাহলে তখন তাঁদের যথার্থ শক্তি উপলব্ধি করতে পারবেন। তাঁরা শৃঙ্খলা, আত্মসংযম, সম্মিলিতভাবে কার্য করার পদ্ধতি, অহিংসা, সংগঠন ও অপর যা কিছু জাতিকে কেবল মহান নয়, মহান ও মঙ্গলজনক করে তোলে তা শিখতে পারবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৬-১৯২০

॥ ৩৪ ॥

কবির উৎকণ্ঠা

লর্ড হার্ডিঞ্জ ডঃ ঠাকুরকে এশিয়ার কবি বলেছেন। তিনি যদি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর কবি না হয়ে থাকেন তাহলে দ্রুতবেগেই তা হচ্ছেন। তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দায়িত্বেরও বৃদ্ধি হয়েছে। ভারতের বাণীর কাব্যমণ্ডিত ভাষ্যরচনা করাই নিঃসন্দেহে তাঁর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা। কবি তাই সমীচীনভাবেই এই বিষয়ে উৎকণ্ঠিত যে ভারতবর্ষ যেন নিজের নামে কোন মিথ্যা বা দুর্বল বাণী প্রচার না করে। স্বভাবতই তিনি তাঁর স্বদেশের সুনামের সম্বন্ধে চিন্তিত। তিনি বলছেন যে বর্তমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য তিনি প্রভূত প্রয়াস করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে এতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অসহযোগের কলকোলাহলের মধ্যে তিনি তাঁর বীণায় গাইবার মত কোন সুর খুঁজে পাননি। তিনটি জোরালো চিঠিতে তিনি তাঁর সংশয়কে ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে অসহযোগ তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষের পক্ষে মর্যাদাজনক নয় এবং এটা নেতি ও হতাশার মতবাদ। তাঁর আশঙ্কা এ হল বিচ্ছেদ, বর্জন, সঙ্কীর্ণতা ও নেতির মতবাদ।

ভারতবর্ষের সম্মানের জন্য কবির এই আত্যন্তিক আগ্রহদৃষ্টে প্রতিটি ভারতবাসীর গর্ব বোধ হবে। ভালই হয়েছে তিনি তাঁর সুন্দর অথচ স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সন্দেহের কথা আমাদের জানিয়েছেন।

যথোচিত বিনম্রতাসহকারে আমি কবির সন্দেহের উত্তর দেবার চেষ্টা করব। তাঁকে অথবা যেসব পাঠক তাঁর বাগ্মিতার দ্বারা প্রভাবিত তাঁদের হয়ত আমি স্বমতে আনতে পারব না। তবে কবি এবং সমগ্র দেশকে আমি এই আশ্বাস দিতে চাই যে যেসব জিনিস সম্বন্ধে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন অসহযোগ তা নয় এবং তাঁর দেশ অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করার জন্য তাঁর লজ্জিত হবার কারণ নেই। যাঁরা সত্যের অনুসরণ করছেন বলে বলছেন বাহ্য-দৃষ্টিতে তাঁরা সফল না হলেও যেমন তা সত্যের পরাজয় বোঝায় না তেমনি বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যায় যে এ ব্যর্থ হয়েছে তবে তার দ্বারা এই মতবাদের অসাফল্য সূচিত হবে না। অসহযোগ হয়ত

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এসে থাকতে পারে। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীকে তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে হিংসা ও অসহযোগের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কবির মনে এ আশঙ্কা জাগাও উচিত নয় যে অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে একটি চীনের প্রাচীর খাড়া করতে চায়। পক্ষান্তরে অসহযোগের উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর আধারিত যথার্থ সম্মানজনক ও স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা। আজকের এই সংগ্রাম বাধ্যতামূলক সহযোগিতা ও একতরফা সম্মিলনের বিরুদ্ধে—সভ্যতার ছদ্মবেশধারী অস্ত্রবলে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া আধুনিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে পাপের সহযোগিতা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হল অসহযোগ।

···ছাত্রদের সরকারী স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলার বিরুদ্ধে কবির যে প্রতিবাদ তা আসলে তাঁর অসহযোগের মূল নীতি সম্বন্ধে আপত্তিরই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। নেতিবাচক সব কিছুর প্রতিই তাঁর একটা ত্রাস আছে। ধর্মের নিষেধাত্মক অনুজ্ঞার বিরুদ্ধে তাঁর সমগ্র আত্মা যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাঁর আপত্তি তাঁরই অননুকরণীয় ভাষায় উদ্ধৃত করব :

"রথী বর্তমান আন্দোলনের সপক্ষে বলতে গিয়ে প্রায়ই বলেন, কোন কিছুর প্রবর্তনকালে, সেই আদর্শ গ্রহণের চেয়ে বর্জনের স্পৃহাই প্রবল থাকে। কর্মের গতি সেই পথেই চলে জানি, তবু একেই আমি সত্য বলে মানতে পারিনে। ······ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষ্য হল মুক্তি। বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য নির্বাণ অর্থাৎ বিলুপ্তি। বলা যেতে পারে, এ দুটো নামে ভিন্ন, তবে একই জিনিস, কিন্তু নামের মধ্য দিয়েই আমরা মনের বিভিন্ন ভঙ্গী ও সত্যের বিশেষ বিশেষ রূপের পরিচয় পাই। মুক্তি আমাদের মনকে আকর্ষণ করে সত্যের অস্তিত্বের দিকে আর নির্বাণ করে তার বিপরীত দিকে।···ওঁ অর্থাৎ শাশ্বত হ্যাঁ—বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, নাস্তিবাদের পথে, অস্তিত্বকে ধ্বংস করেই আমরা স্বাভাবিকভাবে সেই সত্যে পৌঁছাব। সেইজন্য তাঁর দুঃখবাদ দুঃখনিবৃত্তির উপরই জোর দেয়, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আনন্দকেই লাভ করতে চায়।"

পূর্বোক্ত এবং অনুরূপভাবাপন্ন পঙ্‌ক্তিতে পাঠক কবিমানসের চাবিকাঠি

খুঁজে পাবেন। আমার বিনম্র মতানুসারে কোন জিনিস গ্রহণ করার মত বর্জন করাও একটা আদর্শ। সত্য গ্রহণের মত অসত্য বর্জনও প্রয়োজন। সকল ধর্মমতেরই শিক্ষা এই যে দুটি পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব আমাদের উপর কাজ করে এবং মানবের প্রয়াস এক ক্রমিকতাযুক্ত চিরকালীন গ্রহণ ও বর্জনের সমবায়। ভালর সঙ্গে সহযোগিতার মত অন্যায়ের অসহযোগও একটা কর্তব্য। বিনম্রভাবে আমি এই কথা নিবেদন করতে চাই যে নির্বাণকে নিছক এক নেতিমূলক স্থিতি বলে বর্ণনা করে কবি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অজ্ঞাতে একটা অবিচার করেছেন। দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক মনে হলেও আমি একথা বলব যে নির্বাণের মত মুক্তিও নেতিবাচক স্থিতি। দেহবন্ধন মুক্তির ফলেই আসে আনন্দ। এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানা যাক যে উপনিষদের শেষ কথা হল নেতি। উপনিষদ রচনাকারীগণ ব্রহ্মের বর্ণনার জন্য নেতির চেয়ে ভাল শব্দ খুঁজে পাননি।

আমার তাই মনে হয় যে কবি অসহযোগের নেতিবাচক দিক নিয়ে অকারণ আতঙ্কিত হয়েছেন। আমরা 'না' বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। সরকারকে কোন প্রসঙ্গে না বলা রাজদ্রোহমূলক এবং এমন কি প্রায় দেবস্থান অপবিত্রকরণের মত হীন কার্য বলে পরিগণিত হত। সহযোগিতা করতে সজ্ঞানে অস্বীকার করার এই প্রক্রিয়া বীজ বপনের পূর্বে কৃষক কর্তৃক আগাছা নিড়ানর মত। বীজ বপনের মত আগাছা নিড়ানও সমপরিমাণ প্রয়োজনীয়। প্রত্যুত ফসলের গাছ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিড়ানির যন্ত্রপাতিও যে প্রায় রোজই কাজে লাগে এটা যে কোন অভিজ্ঞ কৃষক জানেন। জাতির অসহযোগ হল সরকারকে জাতির সঙ্গে জাতির শর্তে সহযোগিতা করতে আমন্ত্রণ জানানো। এটা প্রত্যেক জাতিরই অধিকার এবং প্রত্যেক সরকারেরই কর্তব্য। অসহযোগের মাধ্যমে জাতি এই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে যে আর সে কারও অভিভাবকত্বে থাকতে রাজী নয়। জাতি এবার হিংসার অস্বাভাবিক অধর্মীয় নীতির পরিবর্তে অসহযোগের নির্দোষ স্বাভাবিক ও ধর্মসঙ্গত পন্থার শরণ নিয়েছে। আর ভারত যদি কখনও কবির ধ্যানের স্বরাজ অর্জন করে তা করবে কেবল অহিংস অসহযোগের পন্থায়। তিনি তাঁর শান্তির বাণী সমগ্র বিশ্বে প্রচার করুন এবং এই দৃঢ় প্রত্যয় মনে রাখুন যে ভারতবর্ষ যদি নিজ সঙ্কল্পে অবিচল থাকতে পারে তাহলে তার অসহযোগের মাধ্যমেই তাঁর বাণীর মূর্ত প্রতীক হবে। স্বদেশপ্রেমের যে ভাষ্যের জন্য কবি ব্যাকুল অসহযোগের উদ্দেশ্য তারই রূপায়ণ। ইউরোপের পদপ্রান্তে

প্রণিপাতকারী ভারতবর্ষ মানবতাকে কোনই আশার বাণী শোনাতে পারবে না। জাগ্রত ও শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষ নিপীড়িত বিশ্বকে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী শোনাবে। অসহযোগের উদ্দেশ্য তাকে এমন একটা মঞ্চ দেওয়া যেখান থেকে ভারত সেই বাণী প্রচার করবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৬-১৯২১

॥ ৩৫ ॥

সত্যাগ্রহীর অসহযোগ

প্রশ্ন : বোম্বেতে কথা উঠেছে যে বিনা আমন্ত্রণে আপনি লাটসাহেবের কাছে গিয়েছিলেন—প্রত্যুত একরকম উপর-পড়া হয়েই তাঁর কাছে হাজির হয়েছিলেন। কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে এটা কি একতরফা সহযোগিতার নিদর্শন নয়? আশ্চর্য লাগছে যে লাটসাহেবের কাছে আপনার কি দরকার থাকতে পারে?

উত্তর : আমার উত্তর হল এই যে আমার যদি শক্তি থাকে তাহলে আমার বিরোধীরও কাছে উপযাচক হয়ে যাবার যোগ্যতা আমার আছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও আমি এইরকম করেছি। জেনারেল স্মাট্‌সের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত জেনেও আমি তাঁর সঙ্গে বার বার সাক্ষাৎকার-প্রার্থী হয়েছি। সে দেশের সেই ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরু হলে ভারতীয় বাসিন্দাদের যে কষ্ট হবে তা এড়ানোর ব্যবস্থা করার জন্য আমি তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। একথা সত্য যে হঠকারিতাচালিত হয়ে আমার সেই সব আবেদনে তিনি কর্ণপাত করেননি। কিন্তু এর ফলে আমার কোন লোকসান হয়নি। আমার নম্রতার ফলে আমার শক্তি বেড়েছিল। ভারতবর্ষে আমরা যখন স্বাধীনতার জন্য, সত্যকার লড়াই লড়ার জন্য শক্তিশালী হব তখনও আমি এই রকম করব। মনে রাখবেন আমাদের সংগ্রাম অহিংস। নম্রতা এর পূর্বশর্ত। এ সংগ্রাম সত্যাশ্রয়ী এবং সত্য সম্বন্ধে এই চেতনা আমাদের যেন দৃঢ় করে। কোন মানুষের ধ্বংসসাধনে আমরা ব্রতী হইনি। আমাদের কোন শত্রু নেই। পৃথিবীতে কারও বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। নিজেরা নিগ্রহ বরণ করে আমরা প্রতিপক্ষের মত পরিবর্তন করতে চাই। প্রস্তরকঠিন হৃদয়ের

অথবা একান্ত স্বার্থপর ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তনের প্রয়াসেও আমি হতাশা বোধ করি না। তাই তাঁদের সঙ্গে দেখা করার প্রতিটি সুযোগকেই আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

তবে একটি বিষয়ে পার্থক্য করা প্রয়োজন। অহিংস অসহযোগের অর্থ হল যে প্রথা বা ব্যবস্থার সঙ্গে অসহযোগ করছি তার সুযোগ গ্রহণ না করা। সুতরাং এই ব্যবস্থার আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আদালত উপাধি আইনসভা ও অন্যান্য দপ্তরের সুযোগ-সুবিধা আমরা বর্জন করি। আমাদের অসহযোগের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও স্থায়ী অংশ হল বিদেশী বস্ত্র বর্জন। যে দুষ্টচক্র আমাদের গুঁড়া গুঁড়া করে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে তার মূলে হল এই বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার। অসহযোগের অন্যান্য কার্যক্রম সম্বন্ধেও চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দুর্বলতা ও যোগ্যতার অভাবের দরুন আপাততঃ আমরা আমাদের পূর্বোক্ত কর্মসূচীর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রেখেছি। তাই আমি যদি পূর্বোক্ত ব্যাপারের কোনটির জন্য কোন রাজকর্মচারীর কাছে যাই আমি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছি বলা যাবে। পক্ষান্তরে খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাবার জন্য অথবা সরকারী চাকুরি বর্জন কিংবা সরকারী বিদ্যালয় থেকে বাড়ির ছেলেদের ছাড়িয়ে আনার যৌক্তিকতা বোঝাবার জন্য আমি যদি সাধারণতম সরকারী কর্মচারীর কাছে যাই তাহলে অসহযোগকারী হিসাবে আমি আমার কর্তব্য পালন করছি বলতে হবে। এই নিশ্চিত এবং প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি যদি তাঁদের কাছে না যাই তাহলে আমার কর্তব্যচ্যুতি হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৫-১৯২৬

॥ ৩৬ ॥

অহিংস আইন অমান্য প্রসঙ্গে

একমাত্র অহিংস আইন অমান্যের উপর আস্থা রাখা সমীচীন নয়। এর শরণ নেওয়া ছুরির ব্যবহার করার মত, কদাচিৎ যার প্রয়োগ করতে হয়। সার বস্তুতে পৌঁছে কাটা বন্ধ করার বদলে যে ব্যক্তি কেবল ছুরি চালিয়েই চলেন তিনি দেখতে পাবেন যে বাইরের শক্ত খোলা বাদ দিয়ে তিনি যে সারবস্তু পেতে

চাইছিলেন তার আর দেখা নেই। যাবতীয় বিকাশের আইন-কানুন যদি আমরা মেনে চলি তাহলেই কেবল অহিংস আইন অমান্য সুস্থ প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী হবে। এইজন্য 'আইন অমান্যের' পরিবর্তে পরিপূর্ণ ও সেই কারণে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য দিতে হবে অহিংস অভিধাটির উপর। বিনয়, শৃঙ্খলা শুভাশুভ বিচার ও অহিংসা বর্জিত আইন অমান্য নিশ্চিত ধ্বংসের পথ। প্রেম মণ্ডিত আইন অমান্য জীবনের প্রাণবন্ত স্রোতস্বতী। অহিংস আইন অমান্য বিকাশের দ্যোতক চমৎকার বৈচিত্র্য, মরণের নিদর্শন বিরোধ এ নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১-১৯২২

॥ ৩৭ ॥

অহিংস আইন অমান্যের অধিকার

অহিংস আইন অমান্য করা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার—একথা আমি যদি সবাইকে বোঝাতে পারতাম তাহলে বড় ভাল হত। মনুষ্যধর্মচ্যুত না হয়ে কেউ এ অধিকার বর্জন করতে পারে না। অহিংস আইন অমান্যের পর কিছুতেই অরাজকতা আসতে পারে না। হিংস আইন অমান্যের পরিণামে এমনটা ঘটতে পারে। হিংস আইন অমান্যের প্রচেষ্টাকে প্রতিটি রাষ্ট্র শক্তি-প্রয়োগে দমন করে থাকে। এবং এভাবে এ নিশ্চিহ্নও হয়ে যায়। কিন্তু অহিংস আইন অমান্যকে দমন করার অর্থ হল বিবেককে বন্দী করার প্রয়াস করা। অহিংস আইন অমান্যের পরিণাম হল শক্তি ও শুদ্ধতা অর্জন। অহিংস আইন অমান্যকারী কখনও অস্ত্র ব্যবহার করেন না এবং তাই যে সরকার জনমতের প্রতি কর্ণপাত করতে ইচ্ছুক তার কাছে তিনি নিরীহ বলে বিবেচিত হন। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রী সরকারের কাছে তিনি বিপজ্জনক। কারণ যে ব্যাপার নিয়ে তিনি সরকারের বিরোধিতা করছেন তার প্রতি জনমত আকৃষ্ট করে তিনি স্বৈরতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটান। সুতরাং সরকার যখন উদ্দণ্ড অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ে তখন অহিংস অসহযোগ করা নাগরিকদের পবিত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যে নাগরিক সেই অবস্থাতেও সরকারের সঙ্গে লেন-দেন করেন তিনি সরকারের সেই দুর্নীতি ও উদ্দণ্ডতার ভাগীদার হন।

সেইজন্য কোন বিশেষ আইন-কানুনের ক্ষেত্রে অহিংস আইন অমান্যের

প্রয়োগ করা সমীচীন হবে কি না সে প্রশ্ন উঠতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটু বিলম্ব করা বা সতর্ক হওয়ার পরামর্শও দেওয়া সম্ভব। তবে অসহযোগের অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। নিজের আত্মমর্যাদা বিসর্জন না দিয়ে এই জন্মগত অধিকার বর্জন করা যায় না।

অহিংস আইন অমান্যের অধিকার সম্বন্ধে জোর দেবার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োগের ব্যাপারে সম্ভাব্য সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হিংসা বা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর অবস্থা বুঝে এর প্রয়োগক্ষেত্র ও ব্যাপকতাকেও যতটুকু না হলে নয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-১-১৯২২

॥ ৩৮ ॥

আক্রমণাত্মক বনাম আত্মরক্ষামূলক

আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক অহিংস আইন অমান্যের সঠিক পার্থক্য বুঝে নেওয়া উচিত। আক্রমণাত্মক, নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠামূলক অথবা প্রতিরোধকারী অহিংস আইন অমান্যের মূলে থাকবে অহিংসা। এ ক্ষেত্রে সেই সব সরকারী আইন ভঙ্গ করা হবে যার উল্লঙ্ঘন করা নৈতিক ভ্রষ্টাচারের পর্যায়ে পড়ে না এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবে যার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অতএব সরকারী খাজনা অথবা রাষ্ট্রের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত আচার-আচরণের যে সব আইন-কানুন আছে সে সব ভঙ্গ করা যদিও স্বয়ং কোন কষ্টের কারণ হয় না এবং যদিও এর পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই তবু এদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠামূলক আক্রমণাত্মক অথবা প্রতিরোধকারী অহিংস আইন অমান্যের নিদর্শন বলা যেতে পারে।

পক্ষান্তরে আত্মরক্ষামূলক অহিংস আইন অমান্য হল অনভিপ্রেতভাবে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অহিংসভাবে সেই সব আইন ভঙ্গ করা যেগুলি মূলতঃ খারাপ এবং যা পালন করা মানুষের মর্যাদা বা মনুষ্যত্ববিরোধী। অতএব শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা, অনুরূপ উদ্দেশ্যে জনসভার অনুষ্ঠান, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এমন সব রচনা প্রকাশ করা বা হিংসার

প্রশ্রয় দেবে না ইত্যাদি আত্মরক্ষামূলক অহিংস আইন অমান্যের পর্যায়ে পড়ে। কোন প্রতিষ্ঠান বা বস্তুর প্রভাব থেকে জনসাধারণের মন ফিরিয়ে আনার জন্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পিকেটিং করাও এর আওতায় পড়ে। তবে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক—উভয় ধরনের অহিংস আইন অমান্যের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শর্তাবলী পূর্ণ করা সমভাবে প্রয়োজনীয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-২-১৯২২

চতুর্থ খণ্ড ঃ ভাইকম সত্যাগ্রহ

॥ ৩৯ ॥

ভাইকম*

সত্যাগ্রহ চলাকালীন এর সংগঠকরা আবেদন-নিবেদন, জনসভা, প্রতিনিধিদল প্রেরণ ইত্যাদি যাবতীয় পদ্ধতি দ্বারা রাজ্য কর্তৃপক্ষ ও জনমতকে সপক্ষে আনার জন্য যাবতীয় প্রয়াস করবেন বলে আমি সত্যাগ্রহীদের যে পরামর্শ দিয়েছি তাতে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সমালোচকরা বলছেন যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বলে আমি তাঁদের প্রতি পক্ষপাত করছি। আর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদেশী বলে আমি তাঁদের প্রতি বিরূপ। যে শাসকই জনমতের বিরোধিতা করেন তিনি আমার কাছে বিদেশী। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়েরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যান যদিও সত্যাগ্রহ তখন চলছে। ব্রিটিশ ভারতে আমরা সরকারের সংশোধন বা সমাপ্তি চাই বলে আমরা অসহযোগ করছি এবং তাই এখানে আবেদন-নিবেদনের প্রক্রিয়া নিরর্থক প্রয়াস।

* ১৯২৪ ও ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে "অস্পৃশ্যদের" জন্য দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ভাইকমস্থ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের কোন কোন পথঘাট উন্মুক্ত করার জন্য ভাইকম সত্যাগ্রহ করা হয়েছিল।—সম্পাদক।

ত্রিবাঙ্কুরে সত্যাগ্রহীরা সামগ্রিকভাবে কোন প্রথাকে আক্রমণ করছেন না। তাঁরা আদৌ এর কোন অংশকে আক্রমণ করছেন না। তাঁরা পুরোহিতদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। এখানে ত্রিবাঙ্কুর রাজসরকারের ভূমিকা গৌণ। অতএব সত্যাগ্রহীরা যদি রাজসরকারের কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে আসার চেষ্টা না করেন এবং প্রতিনিধিদল প্রেরণ ও সভা-সমিতির অনুষ্ঠান দ্বারা জনসমর্থন পাবার প্রয়াস না করেন তাহলে তাঁরা তাঁদের পথ থেকে বিচ্যুত হবেন। প্রত্যক্ষ কার্যসূচীতে সর্বদাই অন্তবিধ যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি নিষিদ্ধ নয়। আর আবেদন-নিবেদন সব ক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহীর পক্ষে দুর্বলতার দ্যোতক নয়। প্রত্যুত যিনি বিনম্র নন, তিনি আদৌ সত্যগ্রহীও নন।

ত্রিবাঙ্কুরের বাইরে থেকে এক জনসাধারণের সহানুভূতি ছাড়া অপর কিছু না পাঠানোর যে পরামর্শ দিয়েছি তার সপক্ষে বিস্তারিত যুক্তি প্রদর্শনের জন্য আমাকে বলা হয়েছে।······এ জাতীয় সাহায্য পাবার ও এমন কি পেলেও গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আমার একটি মৌলিক আপত্তি আছে। হয় জনকয়েক ত্যাগব্রতী কর্মী বহুল সংখ্যক দুর্বল ব্যক্তির হয়ে সত্যাগ্রহ করেন আর নচেৎ প্রবল বাধাবিপত্তির মুখে জনকয়েক এটা করে থাকেন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে (ভাইকমের সত্যাগ্রহ এই পর্যায়ে পড়ে) অনেকে ইচ্ছুক হলেও দুর্বল এবং কিছুসংখ্যক লোক 'অস্পৃশ্যদের' জন্য তাঁদের সব কিছু ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম। এ জাতীয় ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃ তাঁদের বাইরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ধরুন তাঁরা যদি বাইরের সাহায্য নেন তাহলে তার দ্বারা 'অস্পৃশ্য' স্বদেশবাসীদের সেবা করবেন কিভাবে? নিজেদের মধ্য থেকে শক্তিশালী লোক উঠে না দাঁড়ালে ওখানকার দুর্বল হিন্দুরা শক্তিশালী বিরোধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবেন না। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সাহায্যকারীরা গিয়ে যে কৃচ্ছ্র বরণ করবেন তা স্থানীয় বিরোধীদের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারবে না এবং এই প্রক্রিয়ায় খুব সম্ভবতঃ 'অস্পৃশ্যদের' অন্তিম পরিণাম প্রথমের চেয়ে খারাপই হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সত্যাগ্রহ এক অতীব শক্তিশালী হৃদয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। এর আবেদন হৃদয়ের কাছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক গিয়ে ভাইকমে উপস্থিত হলে সাফল্য সহকারে এ জাতীয় আবেদন সৃষ্টি করতে পারবেন না।

আর ভিতর থেকে সংগঠিত কোন আন্দোলনের বাইরের আর্থিক

সহায়তার প্রয়োজন ঘটে না। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রত্যেকটি দুর্বল কিন্তু সহানুভূতিপরায়ণ হিন্দু কারাবরণ বা অন্যবিধ নিগ্রহ বরণ না করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য করতে পারেন এবং এটা তাঁদের করা উচিতও। এজাতীয় সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁদের সহানুভূতির অর্থ আমি বুঝে উঠতে পারি না। •

প্রবল বাধা-বিপত্তির মধ্যে যেখানে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সত্যাগ্রহ করেন সেখানেও বাইরের সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। প্রকাশ্য সত্যাগ্রহ ব্যক্তিগত অর্থাৎ গার্হস্থ্য সত্যাগ্রহেরই একটা সম্প্রসারণ। অনুরূপ একটি গার্হস্থ্য সত্যাগ্রহের কল্পনা করে নিয়ে প্রকাশ্য সত্যাগ্রহের প্রতিটি উদাহরণের পরীক্ষা করতে হবে। ধরে নিন আমার পরিবার থেকে আমি অস্পৃশ্যতার অভিশাপের উচ্ছেদ চাই। ধরে নিন আমার মা-বাবা আমার মতের বিরুদ্ধে এবং আমার হৃদয়ে প্রহ্লাদের মত বিশ্বাসের আগুন জ্বলছে। এমতাবস্থায় ধরে নিন আমার বিশ্বাসের জন্য আমার মা-বাবা আমাকে শাসাচ্ছেন এবং এমন কি আমাকে শাস্তি দেবার জন্য রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা নিচ্ছেন। এক্ষেত্রে আমি কি করব? আমার মা-বাবা আমার উপর যে শাস্তি দিচ্ছেন তার অংশগ্রহণের জন্য আমার বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাব কি? অথবা আমার কর্তব্য হবে আমার পিতা আমাকে যত শাস্তি দেবেন নীরবে তা সহ্য করা এবং তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত করার জন্য ও অস্পৃশ্যতার পাপের সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করার জন্য একান্তভাবে নিগ্রহ বরণ ও প্রেমের নীতির উপর নির্ভর করা? ছেলের কাছে বাবা যেকথা বুঝতে চাইছেন না সেকথা তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্য কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বা এমন কোন ভদ্রলোক যিনি পরিবারের বন্ধু তাঁর সাহায্য আমি নিতে পারি। তবে নিগ্রহ বরণ করার সৌভাগ্য ও কর্তব্যে অপর কাউকে আমি অংশগ্রহণ করতে দেব না। গার্হস্থ্য সত্যাগ্রহের এই কাল্পনিক উদাহরণটির ক্ষেত্রে যে কথা সত্য প্রকাশ্য সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রেও সে কথা সমপরিমাণ সত্য। সুতরাং ভাইকমের সত্যাগ্রহীরা মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু হন অথবা আমি যে খবর পেয়েছি তদনুযায়ী তাঁরা সংশ্লিষ্ট হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই হন, এ কথা স্পষ্ট যে তাঁরা জনসাধারণের সহানুভূতি ছাড়া বাইরে থেকে অপর কোন রকমের সাহায্য নেওয়া পরিহার করবেন। এ কথা হয়ত সত্য যে এ জাতীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এই বিধান ষোল আনা মানতে পারব না এবং হয়ত বা বর্তমান ক্ষেত্রেও সর্বদা এই নিয়ম অনুযায়ী চলা যাবে না। তবে এই বিধানের কথা

আমরা যেন বিস্মৃত না হই এবং যথাসম্ভব যেন এতদানুযায়ী আচরণ করি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৪-১৯২৪

॥ ৪০ ॥

ভাইকম সত্যাগ্রহ

নেতা ও সংগঠক হিসাবে শ্রীযুক্ত জর্জ জোসেফ নামক জনৈক খ্রীষ্টান ভদ্রলোককে শ্রীযুক্ত মেননের স্থলাভিষিক্ত করায় কোন কোন মহল থেকে আপত্তি উঠেছে। আমার বিনম্র মতে আপত্তি অত্যন্ত সমীচীন। শ্রীযুক্ত জর্জ জোসেফকে 'নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে' এবং তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করছেন খবর পেয়েই আমি ৬ই এপ্রিল তাঁকে নিম্নোক্ত মর্মে পত্র লিখেছিলাম :

> "ভাইকমের ব্যাপারে আমার মনে হয় আপনার হিন্দুদের উপরই এ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত। আপনার সহানুভূতি এবং লেখনী দ্বারা আপনি তাঁদের সহায়তা করতে পারেন। কিন্তু আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব নেবেন না অথবা স্বয়ং সত্যাগ্রহ তো করবেনই না। নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব যদি দেখেন তো লক্ষ্য করবেন যে হিন্দু সদস্যদেরই অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দূর করতে আবেদন জানানো হয়েছে। তবে শ্রীযুক্ত এনড্রুজের কাছ থেকে আমি এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়েছি যে এ ব্যাধি সিরিয়ান খ্রীষ্টানদেরও আক্রমণ করেছে।"

দুর্ভাগ্যক্রমে এ পত্র তাঁর কাছে পৌছানোর পূর্বেই শ্রীযুক্ত মেনন গ্রেপ্তার হন এবং শ্রীযুক্ত জর্জ জোসেফ তাঁর স্থান নেন। তবে হিন্দুরা যেভাবে অস্পৃশ্যতার প্রথাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন এবং তার জন্য প্রতিটি হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত শ্রীযুক্ত জোসেফের তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। তিনি যে কৃচ্ছ্র সাধন করবেন তার ভাগ হিন্দু সর্বসাধারণ পাবার অধিকারী নয়। অথচ মালব্যজীর মত কেউ এই প্রায়শ্চিত্ত করলে তার ভাগীদার হিন্দুরা হতে পারেন। অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের পাপ। এর জন্য তাঁদের কষ্টবরণ করতে হবে, তাঁদের শুদ্ধ হতে হবে—নিগৃহীত ভাই-বোনেদের কাছে তাঁদের যে ঋণ তা শোধ করতে হবে। এ লজ্জা তাঁদের এবং তাই এই কলঙ্ক অপনোদনের গৌরবও তাঁদেরই অর্জন

করতে হবে। প্রত্যুত একজন মাত্র পবিত্রপ্রাণ হিন্দুর নীরব প্রেমময় কষ্টবরণ কোটি কোটি হিন্দুর হৃদয় দ্রব করার পক্ষে যথেষ্ট হবে। কিন্তু 'অস্পৃশ্যদের' তরফ থেকে হাজার হাজার অহিন্দু কষ্টবরণ করলেও তার কোন প্রতিক্রিয়া হিন্দুদের মনে নাও জাগতে পারে, যতই সদিচ্ছাপ্রণোদিত ও মহৎ হোক না কেন বাহ্য হস্তক্ষেপে তাঁদের দৃষ্টিহীনতা ঘুচবে না। কারণ এর দ্বারা তাদের মনে অপরাধবোধ জাগবে না। পক্ষান্তরে তাঁরা হয়ত এজাতীয় হস্তক্ষেপের জন্য এ পাপকে আরও বেশীমাত্রায় আঁকড়ে থাকবেন। যথার্থ ও স্থায়ী হতে হলে প্রতিটি সংস্কার প্রয়াসের সৃষ্টি ভিতর থেকে করতে হবে।······

একটি তার দ্বারা জানানো হয়েছে, 'কর্তৃপক্ষ পথ অবরোধ করছেন। আমরা কি এইসব অবরোধ ভাঙ্গতে বা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারি? আমরা কি অনশন করতে পারি? কারণ মনে হচ্ছে অনশন কার্যকরী হবে।'

আমার উত্তর হল: আমরা যদি সত্যাগ্রহী হই তাহলে অবরোধ ডিঙ্গানোর বা ভাঙ্গার কথা ভাবব না। অবরোধ ভাঙ্গলে বা ডিঙ্গিয়ে পার হলে অবশ্যই গ্রেপ্তার হব কিন্তু তাকে অহিংস আইন অমান্য বলা যাবে না। তা হবে মূলতঃ বেআইনী বা দণ্ডার্হ অপরাধ। অনশন করাও উচিত হবে না। দেখছি উপবাসের ব্যাপারে শ্রীযুক্ত জোসেফকে যা লিখেছিলাম তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হয়েছে। এখানে আমি তার সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করছি:

> "অনশন পরিহার করুন কিন্তু গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকুন।"
>
> "আপনার তারের জবাবে পূর্বোক্ত তার পাঠানো হয়েছে। সত্যাগ্রহে উপবাসের সুনির্দিষ্ট সীমা আছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আপনারা অনশন করতে পারেন না কারণ এটা তাঁর উপর এক ধরনের হিংসাচরণ হবে। তাঁর আদেশ উপেক্ষা করে তাঁর কাছ থেকে সাজা নিতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন সাজা দিতে অস্বীকার করেন এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেন যাতে আপনার পক্ষে তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করা ও তাই তার কারণ শাস্তি পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন আপনি স্বয়ং নিজেকেও পীড়ন করতে পারেন না। উপবাস কেবল তাঁরই বিরুদ্ধে করা যায় যিনি ভালবাসেন। মদ্যপ পিতার জন্য যেমন সন্তান উপবাস করেন তেমনি কোন কিছু আদায় করার জন্য নয়, অপর পক্ষের সংশোধনের উদ্দেশ্যেই অনশন করা হয়। বোম্বাই ও তারপর বরদৌলিতে আমি যে অনশন করি তা এই জাতীয়

ছিল। যাঁরা আমাকে ভাবলাসেন তাঁদের সংশোধনের জন্য আমি অনশন করেছিলাম। তবে জেনারেল ডায়ারের মত যিনি আমাকে শুধু অপছন্দই করেন না, আমাকে তাঁর শত্রু বলে বিবেচনা করেন তাঁর সংশোধনের জন্য আমি উপবাস করব না। ব্যাপারটা কি এবার স্পষ্ট হল?"

এখানে নিশ্চয় এটা বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন নেই যে উপরিউক্ত মন্তব্য সাধারণ ধরনের। **অত্যাচারী ও যিনি ভালবাসেন** শব্দ দুটিও এখানে সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। যিনি কোন অন্যায় করেন তাঁকে বলা হয়েছে অত্যাচারী। আপনার প্রতি যাঁর সহানুভূতি তাঁর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে তিনি 'ভালবাসেন'। আমার মতে ভাইকমের আন্দোলনে সংস্কারের পরিপন্থীরাই হলেন 'অত্যাচারী'। সরকার এই দলে পড়তেও পারে আবার নাও পড়তে পারে। এক্ষেত্রে আমি সরকার বলতে কেবল শান্তিরক্ষাকামী পুলিসের কথাই চিন্তা করেছি। সরকার বা যে সব বিরোধী 'ভালবাসার' শ্রেণীভুক্ত এখানে কোনক্রমেই তাঁদের কথা ভাবিনি। ভাইকমের সত্যাগ্রহীদের সমর্থকরা এই পর্যায়ভুক্ত। সত্যাগ্রহীর উপবাস করার দুটি শর্ত আছে। প্রায়োপবেশন হবে যিনি ভালবাসেন তাঁর বিরুদ্ধে এবং তাঁর হৃদয় পরিবর্তনের জন্য—তাঁর কাছ থেকে কোন দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে নয়। ভাইকম আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রায়োপবেশনের সার্থকতা কেবল তখনই দেখা দিতে পারে যখন স্থানীয় সমর্থকরা তাঁদের নিগ্রহ বরণ করার প্রতিশ্রুতিপালনে অস্বীকৃত হন। আমার পিতাকে কোন পাপমুক্ত করতে আমি অনশন করতে পারি, কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অনশন করব না। সময় সময় ভারতবর্ষে দেখা যায় যে ভিক্ষুকেরা দান না পেলে উপবাস করছে। কিন্তু সে উপবাস ততটুকুই সত্যাগ্রহ শব্দবাচ্য যতটুকু ভাল কাপড়চোপড় পাবার দাবিতে মা-বাবার সামনে উপবাসকারী শিশুর অনশন সত্যাগ্রহ নামের যোগ্য। প্রথমোক্ত অনশন ধৃষ্টতামূলক এবং শেষোক্ত শিশুসুলভ। বরদৌলিতে আমি যে অনশন করেছিলাম তা ছিল সেই সব সহকর্মীদের বিরুদ্ধে যাঁরা চৌরীচৌরাতে আগুন জ্বেলেছিলেন এবং এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের হৃদয় পরিবর্তন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করছেন না বলে যদি ভাইকমের সত্যাগ্রহীরা উপবাস করেন তাহলে আমার বিনম্র অভিমত এই যে তা হবে উপরোক্ত ধরনের ভিক্ষুকের উপবাসের মত। আর সে অনশন যদি কার্যকরীও হয় তার থেকে কর্তৃপক্ষের হৃদয়বত্তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—এর দ্বারা অনশনের উদ্দেশ্য বা অনশনকারীদের আদর্শের সার্থকতার নিদর্শন

মিলবে না। সত্যাগ্রহীর প্রাথমিক লক্ষ্য তাঁর কার্যের পরিণাম নয়। এ হল তাঁর কার্যের ঔচিত্য। নিজের উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্যে উপনীত হবার উপায়ের প্রতি যেন তাঁর যথোচিত আস্থা থাকে এবং তিনি যেন এই বিশ্বাস নিয়ে চলেন যে শেষ অবধি সাফল্য অর্জিত হবেই।...

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৫-১৯২৪

॥ ৪১ ॥

ভাইকম সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে

সত্যাগ্রহীরা হতাশ হবেন না। তাঁরা কখনও নৈরাশ্যের কবলে পড়বেন না। আমি যেটুকু তামিল শিখেছিলাম তার মধ্যে একটি প্রবাদের কথা আজিও খুব ভাল করে মনে আছে। এর অর্থ হল, "অসহায়ের সহায় একমাত্র ঈশ্বর।" সত্যাগ্রহের মহান তত্ত্ব ঐ সত্যের বিশ্বাসের উপর আধারিত। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র--প্রত্যুত যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র ঐ সত্যের প্রমাণে পূর্ণ। ত্রিবাঙ্কুরের রাজদরবার তাঁদের নিরাশ করে থাকতে পারেন। আমি তাঁদের হতাশ করতে পারি। কিন্তু ঈশ্বরের উপর ভরসা থাকলে তিনি সত্যাগ্রহীদের কখনও নিরাশ করবেন না। তাঁরা যদি আমার উপর ভরসা করে থাকেন তবে জেনে রাখুন যে তাঁরা ভগ্ন বেতসপত্রের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের থেকে অনেক দূরে আমি রয়েছি। আমি তাঁদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারি; কিন্তু কষ্ট তাঁদের সহ্য করতে হবেই। আর তাঁরা যদি পবিত্র হন তাহলে তাঁদের এই কষ্টবরণের মধ্যে দিয়ে জয় আসবেই। ভগবান তাঁর অনুগামীদের প্রচণ্ড অগ্নিপরীক্ষা নেন কিন্তু ভক্তের সাধ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন না। যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে তিনি ভক্তদের ফেলেন তা উত্তীর্ণ হবার মত শক্তিও তাঁদের দেন। ভাইকম সত্যাগ্রহীদের কাছে তাঁদের সত্যাগ্রহ এমন একটা প্রয়াস নয়, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নিগ্রহ বরণের পর সফল না হলে যা ছেড়ে দেওয়া চলতে পারে। সত্যাগ্রহীর প্রয়াসের কোন সময় সীমা নেই আর তাঁর নিগ্রহ বরণ করার শক্তিরও সীমা নেই। অতএব সত্যাগ্রহে পরাজয় বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সত্যাগ্রহীর তথাকথিত পরাজয় বিজয়ের উষালগ্ন হতে পারে। তা হয়ত জন্মের বেদনা।

ভাইকমের সত্যাগ্রহীরা যে লড়াই লড়ছেন তার গুরুত্ব স্বরাজের সংগ্রামের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা বহুকালের এক অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, সামাজিক প্রথা এবং কর্তৃত্বের সমর্থন রয়েছে এর পিছনে। ধর্মের ছদ্মবেশে যে অধর্ম চলেছে এবং জ্ঞানের পোশাক পরে যে অজ্ঞানের রাজত্ব করছে তার বিরুদ্ধে এই ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। আর রক্তপাত ব্যতিরেকে যদি এ যুদ্ধ চালাতে হয় তবে প্রচণ্ডতম অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যেও তাঁদের ধৈর্যধারণ করতে হবে। জলন্ত অগ্নির সম্মুখেও তাঁরা ভীত হবেন না।

কংগ্রেসের কাছ থেকে তাঁরা কোন সাহায্য না পেতে পারেন। কোথা থেকেও তাঁরা কোন অর্থসাহায্য না পেতে পারেন এবং তাঁদের হয়ত উপবাসও করতে হতে পারে। এই সব প্রচণ্ড পরীক্ষার মধ্যেও তাঁদের বিশ্বাস যেন উজ্জ্বল থাকে।

তাঁদের পথ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের'। তাই বিরোধীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁদের চলবে না। বিরোধীরা যা করছেন তা ছাড়া অন্য পথ তাঁদের জানা নেই। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে সবাই যেমন সাধু প্রকৃতির নন, বিরোধীরাও তেমনি সবাই অসাধু প্রকৃতির নন। নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের উপর যাকে একটা আঘাত বলে তাঁদের আন্তরিকভাবে মনে হচ্ছে তাঁরা সততা সহকারে তার বিরোধিতা করছেন। ভাইকম সত্যাগ্রহ কৃচ্ছ্রবরণের যুক্তিস্বরূপ। ক্রোধ এবং বিদ্বেষ বিরহিত কৃচ্ছ্রবরণের সূর্যশিখার সম্মুখে কঠিনতম হৃদয় দ্রব হবে ও চরমতম অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯ ২-১৯২৫

॥ ৪২ ॥

সত্যাগ্রহ বনাম জবরদস্তি

একজন নিষ্ঠাবান কিন্তু অধৈর্য কর্মী মন্দির ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অন্যান্য স্থান হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত করার কাজ করছেন। তিনি কিছুটা সফলকাম হলেও গর্ব করার মত কিছু করতে পারেন নি। সেই জন্য অধৈর্য হয়ে তিনি লিখেছেন :

"এইসব সনাতনপন্থীরা কবে এই সংস্কারের সূত্রপাত করবেন তার জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। বাধ্য না হলে তাঁরা কখনও নড়বেন না। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাই আপনার কাছে এই অনুরোধ যে একটা বিষয়ে আপনি আপনার অভিমত জানাবেন। ব্যাপারটা হল কর্মী ও হরিজনরা যদি সনাতনপন্থীদের মন্দিরে যাবার পথে সত্যাগ্রহ করে বাধা দেন তাহলে তার পরিণাম কার্যকরী হবে কিনা? আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হয়নি। তাই আমার বিনম্র অভিমত হল এই যে এসবের পিছনে আর সময় নষ্ট করা মূল্যবান সময়ের নিছক অপব্যয় হবে।"

এভাবে পথ বন্ধ করা নিছক জবরদস্তি হবে। আর ধর্ম বা কোন সংস্কারের ব্যাপারে জবরদস্তি করা উচিত নয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আত্মশুদ্ধির আন্দোলন। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে শুদ্ধ করা যায় না। সুতরাং সনাতনপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রকম জবরদস্তি প্রয়োগ করা উচিত নয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পূর্বে আমাদের মধ্যে অনেকেই সনাতনপন্থীদের মত ছিলাম। সে সময় কেউ আমাদের মন্দিরে যাবার পথ বন্ধ করুন এটা আমরা চাইতাম না। কারণ আজ ভিন্ন রকম মনে হলেও সে সময় আমরা মনে করতাম যে হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এইজন্য আমাদের সনাতনপন্থীদের মন্দিরে প্রবেশে বাধা দেওয়া কর্তব্য নয়।

পত্রলেখকদের আমি আর একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। কথাটি হল প্রায়ই সত্যাগ্রহ শব্দটি একান্ত শৈথিল্য সহকারে ব্যবহৃত হয় এবং এর অর্থ হয় প্রচ্ছন্ন হিংসা। শব্দটির স্রষ্টা হিসাবে আমাকে একথা বলতেই হবে যে এতে চিন্তা বাক্য বা কর্মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, প্রকাশ্য বা গোপন কোন রকম হিংসার স্থান নেই। প্রতিপক্ষের অকল্যাণ কামনা করা অথবা তাঁর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাঁকে বা তাঁর সম্বন্ধে কঠোর কথা বলা সত্যাগ্রহের নিয়মবিরুদ্ধ। উত্তেজনার সময় বিরুদ্ধপক্ষীয়ের প্রতি যে প্রত্যক্ষ হিংস আচরণ করা হয় সম্ভবতঃ পরমুহূর্তে তার জন্য মানুষ অনুতাপ করে বা তার কথা বিস্মৃত হয়। তাই সত্যাগ্রহের পরিভাষায় সময় সময় ঐজাতীয় প্রত্যক্ষ হিংস আচরণের থেকেও বিরোধীর অকল্যাণ কামনা ও কঠোর উক্তি ইত্যাদি অধিকতর বিপজ্জনক। সত্যাগ্রহের প্রকৃতি সৌম্য, কখনও এ কাউকে আঘাত করে না। সত্যাগ্রহ যেন ক্রোধ ও

বিদ্বেষের পরিণাম না হয়। এতে বাহ্যাড়ম্বর ধৈর্যচ্যুতি অথবা বাগাড়ম্বরের স্থান নেই। জোর-জবরদস্তির একেবারে বিপরীতধর্মী এ। হিংসার পরিপূর্ণ বিকল্প হিসাবেই এর কল্পনা করা হয়েছিল।

তবুও আমি পত্রলেখকের এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত যে "অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন"। তবে এ ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদেরই বিরুদ্ধে। সনাতনপন্থীরা আন্তরিকভাবে একথা বিশ্বাস করেন যে তাঁরা যেভাবে অস্পৃশ্যতা মানেন তার পিছনে শাস্ত্রের সমর্থন আছে এবং এর নিরাকরণ করলে তাঁদের ও হিন্দুধর্মের মহা সর্বনাশ হবে। এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কি করে লড়া যায়? একথা স্পষ্ট যে মন্দিরে জোর করে হরিজনদের ঢোকালে তাঁদের এ বিশ্বাস কখনও দূর হবে না। মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে সনাতনপন্থীদের এই বিশ্বাসে দীক্ষিত করে তোলা যে হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ করতে না দেওয়া অন্যায়। তাদের হৃদয়ের প্রতি অর্থাৎ তাঁদের সদ্‌গুণাবলীর প্রতি আবেদন করেই কেবল এই জাতীয় মত পরিবর্তন সম্ভবপর। আবেদনকারীর প্রার্থনা, অনশন এবং নিজের উপর অন্যবিধ উপায়ে কৃচ্ছ্রবরণ করে নিয়ে অর্থাৎ নিজের পবিত্রতার মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়ে এই জাতীয় আবেদন করা যায়। এ পদ্ধতি কখনও ব্যর্থ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। কারণ এ পদ্ধতি স্বয়ং এর লক্ষ্য। সংস্কারকামী তাঁর আদর্শের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। তাহলে তিনি আর বিরোধীর প্রতি ধৈর্যচ্যুত হবেন না, অধৈর্য হবেন নিজের প্রতি। এমন কি তিনি আমৃত্যু প্রায়োপবেশনের জন্য প্রস্তুত হবেন। তবে সকলের এই জাতীয় প্রায়োপবেশন করার অধিকার বা শক্তি থাকে না। ঈশ্বর অতীব আনুগত্য আদায়কারী। তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে তিনি নম্রতা আদায় করে নেন। এমন কি প্রায়োপবেশনও চাপ দেবার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। তবে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত না হয়। মানুষ ভাল ও মন্দ জেকিল ও হাইডের সংমিশ্রণ। তবে আত্মনিগ্রহের ক্ষেত্রে বিকৃতির সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প।

হরিজন, ১৫-৪-১৯৩৩

পঞ্চম খণ্ড : বারদোলীর সত্যাগ্রহ★

॥ ৪৩ ॥

অসহযোগ না সৌম্য প্রতিরোধ ?

সরকারী মহলে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে যে বারদোলীতে যে আন্দোলন চলছে তা অসহযোগ জাতীয়। সেইজন্য অসহযোগ ও সৌম্য প্রতিরোধের পার্থক্য বোঝা দরকার। উভয় ধরনের আন্দোলনই সত্যাগ্রহ নামক ব্যাপক শব্দটির অন্তর্ভুক্ত যার ভিতর সত্য ও অহিংসা ভিত্তিক সকল প্রয়াসই পড়ে। অপরাপর কর্মসূচীর সঙ্গে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত ও সেই বৎসরই নাগপুরের অধিবেশনে সমর্থিত স্বরাজলাভের কর্মসূচী অসহযোগ শব্দটির অন্তর্ভুক্ত। এতদানুযায়ী স্বরাজ অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে তদানীন্তন সরকারের কাছে কোন আবেদন-নিবেদন বা তার সঙ্গে কোনরকম বার্তালাপ নিষিদ্ধ। বারদোলীর আন্দোলন আর যা-ই হোক না কেন, একথা স্পষ্ট যে এটা প্রত্যক্ষতঃ স্বরাজ অর্জনের কোন লড়াই নয়। তবে একথা সত্য যে অনেক প্রত্যক্ষ প্রয়াসের তুলনায় বারদোলীর মত এ জাতীয় প্রতিটি জাগরণ ও প্রচেষ্টা স্বরাজলাভ ত্বরান্বিত করে। কিন্তু বারদোলীর লড়াই-এর উদ্দেশ্য হল একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের নিরাকরণ। এই অভিযোগ মিটে গেলে এ লড়াইও শেষ হবে। ওখানে প্রথমে সেই সনাতন আবেদন-নিবেদনের

---

* গুজরাতের একটি এলাকা হল বারদোলী। সেখানকার জনসাধারণ খুবই সুশৃঙ্খল হওয়ায় গান্ধীজী সেখানে ব্যাপক গণ আইন অমান্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা স্থির করেন। তবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক আন্দোলনের সূচনা দেখা দেওয়ায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এ পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বারদোলী আবার সুযোগ পায়। এই সময় এখানে নিয়মিত সেটেলমেণ্ট হবার কথা ছিল এবং সরকার শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ করবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করেন। জনসাধারণ এই দাবি জানান যে করবৃদ্ধির পূর্বে তাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে সরকারের তরফ থেকে একটা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সরকার এতে রাজী না হওয়ায় করবন্ধের আন্দোলন শুরু হয় এবং সরকার জনসাধারণের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার না করা পর্যন্ত এ আন্দোলন জনসাধারণ কর্তৃক সাফল্য সহকারে পরিচালিত হয়।—সম্পাদক

পথই নেওয়া হয়েছিল। সেই চিরাচরিত পন্থা যখন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল তখন বারদোলীর জনসাধারণ সৌম্য প্রতিরোধ পরিচালনের জন্য শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলকে আমন্ত্রণ জানান। এই সৌম্য প্রতিরোধের অর্থ এমন কি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারী করা আইন-কানুনকে নম্রতা সহকারে অমান্য করাও নয়। এর অর্থ কেবল এইটুকু যে সংশ্লিষ্ট রায়তেরা যে করকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে ধার্য করা হয়েছে বলে মনে করেন, তার একাংশ না দেওয়া। এটা কোন খাতক কর্তৃক মহাজনের দাবি করা পাওনার একাংশ দিতে অস্বীকার করার মত। খাতক যদি মহাজনের দাবির একাংশ অন্যায় বিবেচনায় দিতে অস্বীকার করতে পারে তা হলে রায়তও অনুরূপভাবে যে খাজনা অন্যায় মনে করে তা দিতে অস্বীকার করতে পারে। তবে বারদোলীর জনসাধারণের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার প্রয়াস এখানে করা হচ্ছে না। আমার উদ্দেশ্য হল স্বরাজ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অসহযোগ এবং বারদোলীতে যে ধরনের নির্দিষ্ট একটা অভিযোগের নিরাকরণের জন্য সৌম্য প্রতিরোধ করা হয়েছে তার পার্থক্য দেখানো। আমার মনে হয় এ ব্যাপারটা এখন সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট করে বোঝানো সম্ভবপর হয়েছে। তবে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই ও তাঁর অধীনস্থ অধিকাংশ কর্মীরা যে নিষ্ঠাবান অসহযোগী সেকথা এখানে উঠছে না। তবে তাঁরা যাঁদের প্রতিনিধি তাঁদের অধিকাংশই এজাতীয় অসহযোগী নন। রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে অসহযোগ বর্তমানে মুলতবী রয়েছে। তবে অসহযোগীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যাঁরা অসহায়ভাবে সহযোগকারী তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হবার পথে বাধক হয় না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-৭-১৯২৮

॥ ৪৪ ॥

সত্যাগ্রহের সীমাবদ্ধতা

সর্দার শার্দূল সিং একজন শ্রদ্ধেয় কর্মী। বারদোলীতে সহানুভূতিসূচক আইন অমান্য শুরু করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়ে তিনি যে খোলা চিঠি দিয়েছেন তার একটা জবাব বিশেষ করে এই জন্য দেওয়া উচিত যে তার দ্বারা আমার অবস্থাটা স্পষ্ট করে বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। সরকার বারদোলীর সত্যাগ্রহকে

যেমন উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলন বলে চিত্রিত করছেন তা যদি সত্য হত তাহলে সহানুভূতিসূচক সত্যাগ্রহের চেয়ে বেশী আকর্ষক বা স্বাভাবিক ব্যাপার অপর কিছুই হত না। আর এর জন্য তাহলে সর্দারজী যে গণ্ডি টানার প্রস্তাব করেছেন তারও প্রয়োজনীয়তা হত না। কিন্তু সর্দারজী ঠিকই বলেছেন: "গুজরাতের প্রমুখ কর্মীদের ভিতর আমি বারদৌলীর কৃষকদের নিঃসঙ্গ করে রাখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছি। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই-এর বক্তৃতার বিবরণ ও আপনার লেখা থেকেও আমার মনে এই ধারণা হয়েছে। বন্ধুরা মনে করেন যে, এ ব্যাপারে নীতি নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি বাস্তব রাজনীতির সীমা বহির্ভূত।"

সর্দারজীর অভিমত যথার্থ। আন্দোলনকে একান্তভাবে স্থানীয় ও আর্থিক কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য এবং একে রাজনীতির সম্পর্কবিরহিত রাখার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই এমন কি শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ও অন্যান্য নেতাদেরও বারদৌলীতে যেতে দিতে চান না। তবে সরকার যখন এ আন্দোলনের উপর রাজনৈতিক রঙ চড়ালেন এবং দমননীতির দ্বারা একে অখিল ভারতীয় ব্যাপার করে তুললেন তখন বন্ধন শিথিল করতে হল এবং বল্লভভাই আর দেশের অন্যান্য স্থানের জনসেবকদের বারদৌলী যাওয়া আটকাতে পারলেন না। যদিও এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ বা অনুমতি চাওয়া হলেই তিনি বলেছেন যে "এখন না"।

সর্দারজীর প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল কি বলবেন আমি জানি না। তবে আমি কিন্তু "এখন না" বলতে পারি না। এমন কি সীমাবদ্ধ সহানুভূতিসূচক সত্যাগ্রহেরও সময় আসেনি। বারদৌলীর এখনও তার তেজের প্রমাণ দেওয়া বাকী। শেষ উত্তাপ যদি এ বরদাস্ত করতে পারে এবং সরকার যদি চূড়ান্ত সীমা অবধি যান তাহলে আমি বা শ্রীযুক্ত বল্লভভাই যাই করি না কেন, তার দ্বারা সত্যাগ্রহের প্রসার রোধ করা যাবে না বা বারদৌলীর আন্দোলনকে নিছক নূতন করে তদন্ত ও তার আনুষঙ্গিক ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। তখন সেই আন্দোলনের সীমা নির্ধারিত হবে সমগ্র ভারতের আত্মত্যাগ ও নিগ্রহবরণ করার ক্ষমতার দ্বারা। সেই পরিস্থিতি যদি আসে তবে তা হবে স্বাভাবিক এবং যত শক্তিশালী হোক না কেন কেউই তখন আর তাকে বিলম্বিত করতে পারবেন না। তবে সত্যাগ্রহের নীতি ও কর্মপদ্ধতি আমি যতটুকু বুঝি তাতে আমার ও শ্রীযুক্ত বল্লভভাই-এর কর্তব্য

হল মূল গণ্ডি অতিক্রম করার জন্য সরকারের তরফ থেকে প্রবল প্ররোচনা আসা সত্ত্বেও বারদৌলীর আন্দোলনের প্রাথমিক সীমারেখার মধ্যে থাকা।

আসল কথা হল এই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নির্দেশে চালিত হওয়া সত্যাগ্রহের পূর্ব শর্ত। এর নেতার বল নিজের নয় ঈশ্বরের শক্তি। বিবেকের নির্দেশে তিনি কাজ করেন। অতএব প্রায়ই তথাকথিত বাস্তব রাজনীতি তাঁর কাছে অবাস্তব ব্যাপার—যদিও শেষ অবধি তাঁর পদক্ষেপই সর্বাপেক্ষা অধিক বাস্তব রাজনীতি বলে প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষ এযাবৎকাল যত সব লড়াই-এর সম্মুখীন হয়েছে তাদের সবগুলির থেকে ভীষণতর এক লড়াই-এর মুখে দাঁড়িয়ে এ জাতীয় উক্তি করা হয়ত কারও কারও কাছে নির্বুদ্ধিতা ও কাল্পনিক ব্যাপার মনে হতে পারে। তবে আমি যাকে গভীরতম সত্য বলে মনে করি তা যদি দেশবাসীকে না জানাই তবে আমার নিজের ও স্বদেশবাসীর কাছে আমি মিথ্যাচার করব। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই বারদৌলীর জনসাধারণকে যা মনে করেন তাঁরা যদি তা-ই হন তাহলে সরকার তাঁদের অস্ত্রাগারের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করলেও শেষ অবধি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা ধৈর্য ধরে দেখি। তবে আইনসভার সদস্য ও আর যাঁরা একটা আপস করার ব্যাপারে আগ্রহী তাঁরা যেন বারদৌলীর জনসাধারণকে রক্ষা করব ভেবে কোন দুর্বল পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন। তাঁরা ঈশ্বরের হাতে নিরাপদই আছেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৮-১৯২৮

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ লবণ সত্যাগ্রহ★

॥ ৪৫ ॥

"কখনও বিফল হয় না"

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

'প্রেমের সংস্পর্শে ঘৃণা অদৃশ্য হয়।'

"ওয়ার্কিং কমিটির মতে পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের জন্য যাঁরা অহিংস পন্থার শরণ নেবার যৌক্তিকতা নীতিগতভাবে বিশ্বাস করেন তাঁদের উপরই অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। আর কংগ্রেসে যে কেবল এই জাতীয় নরনারীই আছেন্ তা নয়, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা কর্মসূচী হিসাবে অহিংসাকে গ্রহণ করার আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাও আছেন। সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে কর্মরত অহিংসাকে নীতিগতভাবে বিশ্বাসকারীদের এই অধিকার দিচ্ছে যে তাঁরা যখন যেখানে যতটুকু প্রয়োজন বুঝবেন অহিংস আইন অমান্য শুরু করতে পারবেন। ওয়ার্কিং কমিটি বিশ্বাস করে যে আন্দোলন যখন সত্যসত্যই শুরু হবে প্রতিটি কংগ্রেস কর্মী ও আর সকলে তখন অহিংস আইন অমান্যকারীদের সর্ববিধ উপায়ে যাবতীয় সহযোগিতা দেবেন এবং যত প্ররোচনারই কারণ ঘটুক না কেন, তাঁরা সম্পূর্ণ অহিংসা পালন করবেন। ওয়ার্কিং কমিটি এও আশা করে যে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হলে আইনজীবীদের মত যাঁরা স্বেচ্ছায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন এবং ছাত্রদের মত যাঁরা সরকারের কাছ থেকে তথাকথিত উপকার পাচ্ছেন তাঁরা সবাই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা

---

* ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের শাসনের কয়েকটি অভিশাপের নিরাকরণের জন্য গান্ধীজী অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। এইজন্য অমান্য করার উদ্দেশ্যে প্রতীক হিসাবে লবণ আইনকে বেছে নেওয়া হয়। দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে একমুষ্টি চাল বা অন্য খাদ্যশস্য যোগাড় করতে পারে তাকে কিঞ্চিৎ স্বাদু করার একমাত্র উপকরণ লবণের উপর কর ধার্য করাকে গান্ধীজী পাপাচার বলে মনে করতেন।—সম্পাদক।

থেকে ও সরকারের সাহায্য নেওয়া থেকে বিরত হয়ে স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন। ওয়ার্কিং কমিটি বিশ্বাস করে যে নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলে যাঁরা বাইরে রয়ে যাবেন এবং যাঁদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও সেবাবৃত্তি বিদ্যমান তাঁরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করবেন ও যথাসাধ্য এই আন্দোলনকে পরিচালিত করবেন।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পূর্বোক্ত প্রস্তাব একদিকে আমাকে স্বাধীনতার সনদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কঠিনতম শৃঙ্খলেও আবদ্ধ করেছে। বিগত বেশ কয়েক মাস যাবৎ একান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আমি এই সূত্রেরই আবিষ্কারের প্রয়াস করছিলাম। আমার কাছে পূর্বোক্ত প্রস্তাবটি রাজনৈতিক প্রয়াসের বদলে বরং ধর্মীয় প্রয়াসের আওতাভুক্ত। আমার অসুবিধা ছিল মৌলিক। আমি দেখছিলাম যে আমার পক্ষে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের মারফৎ অহিংসার রূপায়ণপ্রয়াস সম্ভবপর নয় যার মনোভাব বহুবিচিত্র। আর অহিংসার এই প্রয়োগ সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিষয় হতে পারে না। নিজের প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ হবার জন্য একে সমগ্র বিশ্বের প্রতি অসঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়।

যে মানুষের সামনে একাধিক পন্থা থাকে সে সদাই প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং অহিংসা যাঁদের কাছে কেবল একটা কর্মকৌশল হিংসা দ্বারা প্রলুব্ধ হলে তাঁদের সহজ বৃত্তি তাঁদের সহায়ক নাও হতে পারে। অহিংসা ছাড়া যাঁদের সামনে অপর কোন বিকল্প নেই তাঁদের ভিতর যদি সত্যকার অহিংসা থাকে তাহলে সে অহিংসা তাঁদের কখনও ব্যর্থমনোরথ করবে না। এইজন্য কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পাবার প্রয়োজনীয়তা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যে আমার বক্তব্যের একান্ত যৌক্তিকতা অনুধাবন করেছেন এর জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আশা করি কেউ ভুল বুঝবেন না। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রশ্ন নেই। পীতবর্ণের মানুষের সঙ্গে বাদামী রঙের মানুষের যেমন কোন পার্থক্য নেই তেমনি স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে যাঁরা অহিংসার শরণ নেওয়াকে নীতিগতভাবে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন তাঁরা নিছক কর্মকৌশল হিসাবে অহিংসাতে বিশ্বাসীদের তুলনায় কোন অংশে শ্রেয় নন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করছেন।

আমার উপর যে দায়িত্বভার ন্যস্ত হচ্ছে জীবনে অত বড় দায়িত্ব আমি আগে কখনও নিইনি। তবে এ এড়ানোও যায় না। তবে আমার চালকশক্তি

যদি অহিংসা হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ যে দ্রষ্টাপুরুষ জানতেন যে জগৎকে তিনি কি দিচ্ছেন, তিনি বলেছিলেন, "অহিংসার সংস্পর্শে ঘৃণা অদৃশ্য হয়।" অহিংসার সঠিক ইংরাজী অনুবাদ হল প্রেম বা করুণা—আর বাইবেলে তো বলাই হয়েছে :

"প্রেম প্রতিবেশীর কোন অকল্যাণ করতে পারে না,
সবাইকে বিশ্বাস করে,
সবার উপর ভরসা রাখে,
কখনও ব্যর্থ হয় না।"

অহিংস আইন অমান্য হল এই প্রেমেরই দৃঢ়ানুবদ্ধ দাবি। নিঃসন্দেহে এটা বিপজ্জনক ; কিন্তু চতুর্দিকের হিংসার অগ্নিশিখার তুলনায় কম। এই আত্মাবিধ্বংসকারী দহনজ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাবার একমেব অহিংস পন্থা হল অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন। এতে বিপদের আশঙ্কা কেবল একটি দিক থেকে এবং সেটি হল অহিংস আইন অমান্যের সঙ্গে সঙ্গে হিংসার অভিপ্রকাশ। সেই সংকট যদি আসে তাহলে আজ আমি তার প্রতিকারের পথও জানি—বারদোলীর মত করলে চলবে না। যেদিক থেকেই হিংসার বিস্ফোরণ ঘটুক না কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার লড়াই ততদিন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে যত দিন একজনও অহিংসার প্রতিনিধি জীবিত থাকবেন। এর বেশী কোন মানুষ করতে পারে না। আর এর কম করা নিষ্ঠার অপ্রতুলতার দ্যোতক।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-২-১৯৩০

॥ ৪৬ ॥

আমি যখন গ্রেপ্তার হব

একথা ধরে নিতে হবে যে অহিংস আইন অমান্য শুরু হলে আমার গ্রেপ্তার হওয়া অবধারিত। সুতরাং সে অবস্থায় কি করতে হবে তার আলোচনা করা প্রয়োজন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার হবার প্রাক্কালে সহকর্মীদের আমি সম্পূর্ণ অহিংস মৌন শোভাযাত্রা ছাড়া অপর যে কোন ধরনের প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে

দিয়েছিলাম। আমি এও বলেছিলাম যে গঠনমূলক কাজই একমাত্র দেশকে অহিংস আইন অমান্যের জন্য সংগঠিত করতে পারবে বলে অমিত উৎসাহ সহকারে এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার পরামর্শের প্রথমাংশ সম্পূর্ণভাবে এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। এতটা নিষ্ঠা সহকারে সে পরামর্শ পালিত হয় যে জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ বিদ্রূপভরে বলেছিলেন, "একটি কুকুরও ডাকে নি।" জেল থেকে আমি যখন শুনলাম যে দেশ সম্পূর্ণভাবে অহিংস ছিল তখন মনে হল যে এতদিনের অহিংসপ্রচার ফলপ্রসূ হয়েছে এবং বারদোলীর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সমীচীন হয়েছিল। আমি গ্রেপ্তার হবার পর "কুকুরেরা" চীৎকার করলে এবং হিংসার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে যে কি হত তা নিয়ে এখন চিন্তা-ভাবনা করা নিরর্থক। তবে একটি কথা আমি বলতে পারি এবং তা হল এই যে সে অবস্থায় লাহোরে স্বাধীনতার প্রভাব আসত না এবং অহিংসার শক্তিতে বিশ্বাসী কোন গান্ধীকেও আর সম্ভাব্য সকল প্রকারের অসমসাহসিক ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত পাওয়া যেত না।

সুতরাং এখন অদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা যাক। এবার আমি গ্রেপ্তার হলে মৌন নিষ্ক্রিয় অহিংসার প্রয়োজনীয়তা নেই। এবার সর্বাপেক্ষা সক্রিয় অহিংসার পরিচয় দিতে হবে যাতে ভারতের লক্ষ্যে উপনীত হবার ব্যাপারে আদর্শ হিসাবে যাঁরা অহিংসাকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে একজনও আর এই প্রয়াসের শেষে আজকের দাসত্ব-বন্ধনের অধীন থাকার জন্য মুক্ত বা জীবিত না থাকেন। অতএব আমার উত্তরাধিকারী অথবা কংগ্রেস কর্তৃক যে জাতীয় অহিংস আইন অমান্য বা প্রতিরোধের পরামর্শ দেওয়া হবে তদনুযায়ী কাজ করা হবে প্রত্যেকের কর্তব্য। আমি অবশ্য স্বীকার করছি যে বর্তমানে আমি কোন অখিল ভারতীয় উত্তরাধিকারীর কথা ভাবিনি। তবে আমার সহকর্মী ও এই আদর্শের প্রতি আমার এমন যথোচিত বিশ্বাস আছে যার কারণ আমি মনে করি যে সময়ে উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অহিংসার কার্যকারিতায় তাঁর ষোল আনা বিশ্বাস থাকা চাই—এইটুকুই কেবল দৃঢ় শর্ত। কারণ অহিংসার এই জীবন্ত বিশ্বাস ব্যতিরেকে তিনি সংকটের সময় অহিংস পন্থা আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন না।...

সম্যকভাবে এবং যথার্থই অহিংস আইন অমান্যের সূত্রপাত করলে আমি আশা করি যে এতে সমগ্র দেশের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে।

এ আন্দোলনের যাঁরা সাফল্য চান তখন তাঁদের প্রত্যেকের কর্তব্য হবে আন্দোলনকে অহিংস ও শৃঙ্খলাধীন রাখা। নেতা না ডাকা পর্যন্ত প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্যস্থলে খাড়া থাকবেন। এবার স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করছি। এ ব্যাপারে অতীতের অভিজ্ঞতা যদি কোন দিশারী হয় তাহলে এ আন্দোলন প্রধানতঃ স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত হবে বলা যায়। তবে অহিংসাকে নীতি বা কর্মসূচী—যেভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন প্রত্যেকেই গণআন্দোলনকে সাহায্য করবেন। পৃথিবীর সর্বত্র গণআন্দোলনের ফলে নূতন নূতন নেতার আবির্ভাব হয়েছে। এক্ষেত্রেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার কারণ নেই। সুতরাং সম্ভাব্য সকল প্রকারে হিংসাশক্তিকে সংযত রাখার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে এবার একবার অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে আর বন্ধ করা যাবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত একজনও আইন-অমান্যকারী মুক্ত বা জীবিত থাকেন ততক্ষণ আন্দোলন বন্ধ করাও হবে না। সত্যাগ্রহের অনুগামী নিজেকে নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থায় দেখতে পাবেন :

১। কারাগারে বা অনুরূপ অবস্থায় ; অথবা

২। অহিংস আইন অমান্য করণত অবস্থায় ; অথবা

৩। নেতার নির্দেশে স্বরাজকে ত্বরান্বিতকারী চরখা বা অপর কোন গঠনমূলক কাজের সেবায়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-২-১৯৩০

॥ ৪৭ ॥

পদযাত্রার প্রাক্কালে

[লবণ সত্যাগ্রহ উপলক্ষে দাণ্ডির উদ্দেশ্যে পদযাত্রা আরম্ভ করার পূর্বদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর সবরমতী আশ্রমের কাছে নদীতটে যে বিশাল জনসমাবেশ হয়েছিল তাকে লক্ষ্য করে গান্ধীজী নিম্নোক্ত কথাগুলি বলেন।]

...আমি এবং আমার সঙ্গীরা গ্রেপ্তার হলে আপনারা কি করবেন তার আলোচনার মধ্যেই আমি আমার আজকের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। আগেই আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তদনুযায়ী জালালপুর পর্যন্ত পদযাত্রা করার কর্মসূচী

পূর্ণ করতেই হবে। এর জন্য কেবল গুজরাত থেকে সেচ্ছাসেবক নেওয়া হবে। গত এক পক্ষকাল যাবৎ আমি যা দেখেছি ও শুনেছি তাতে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে অহিংস আইন অমান্যকারীদের প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে বইবে।

তবে আমরা সবাই গ্রেপ্তার হবার পরও যেন শান্তিভঙ্গের অনুরূপ কোন ঘটনা না ঘটে। একান্তভাবে অহিংস আন্দোলনের রূপায়ণের জন্য আমরা আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগের সঙ্কল্প নিয়েছি। ক্রোধপরবশ হয়ে কেউ যেন অন্যায় না করেন। এইটাই আমার আশা ও প্রার্থনা। আমি চাই আমার এই কথাগুলি দেশের প্রত্যন্তপ্রদেশেও যেন প্রচারিত হয়। আমি ও আমার সহকর্মীরা যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই তাহলে আমাদের কর্তব্য সাধিত হবে। তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাজ হবে আপনাদের পথনির্দেশ করা এবং আপনাদের কর্তব্য হবে তদনুযায়ী চলা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের এই হল অর্থ। অবশ্য সে অবস্থাতেও আন্দোলনের পরিচালন-রজ্জু থাকবে আমার সেই সব সহকর্মীদের হাতে যারা নীতিগতভাবে অহিংসায় বিশ্বাসী। কংগ্রেসের অবশ্য নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী যে-কোন কর্মসূচী গ্রহণের অধিকার থাকবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি জালালপুরে উপনীত হচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত যেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে আমাকে যে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে তার বিরোধী কিছু না করা হয়। তবে একবার আমি গ্রেপ্তার হলে সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব বর্তাবে কংগ্রেসের উপর। অতএব অহিংসাকে জীবনের আদর্শরূপে ধরে বিশ্বাসীরা তাই বসে থাকবেন না। আমি গ্রেপ্তার হওয়া মাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে আমার চুক্তি শেষ হবে। সে অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে যেন শৈথিল্য প্রকাশ না করা হয়। যেখানে সম্ভব লবণ আইন অহিংস ভাবে ভঙ্গ করতে হবে। তিনটি উপায়ে এইসব আইন ভঙ্গ করা যায়। যেখানে লবণ তৈরীর সুযোগ আছে সেখানেও তা তৈরী করা বেআইনী। এই রকম বেআইনী লবণ (খনিজ লবণ এবং নুনমাটিও এর ভিতর পড়ে) কাছে রাখা ও বিক্রী করাও বেআইনী। এবং এই জাতীয় লবণ ক্রয় করাও অনুরূপভাবে অপরাধজনক কাজ। সমুদ্রতট থেকে প্রাকৃতিক লবণ বহন করে নিয়ে যাওয়াও একইভাবে বেআইনী কার্য। এজাতীয় লবণ ফেরী করাও নিষিদ্ধ। সংক্ষেপে বলতে গেলে আপনারা পূর্বোক্ত যে-কোন একটি বা সকল পদ্ধতিতে লবণের একচেটিয়া সরকারী অধিকার ভঙ্গ করতে পারেন।

তবে কেবল এতেই সন্তুষ্ট হলে চলবে না। যেখানে কংগ্রেসের অনুমোদন

আছে ও যেখানে স্থানীয় কর্মীদের মনে আত্মবিশ্বাস আছে সেখানে অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। এ ব্যাপারে আমার কেবল একটি শর্ত আছে এবং তা হল স্বরাজ অর্জন করার জন্য আমরা একমাত্র সত্য ও অহিংসসম্মত পন্থায় অগ্রসর হব—এই যে সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করেছি তা যেন নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হয়। বাদবাকী সব কিছুর ব্যাপারে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে নিজ নিজ ব্যক্তিগত দায়িত্বে যে কেউ যা ইচ্ছা করতে পারবেন। যেখানে স্থানীয় নেতা আছেন তাঁর নির্দেশ শোনা জনসাধারণের কর্তব্য। যেখানে কোন নেতার অস্তিত্ব নেই ও মুষ্টিমেয় জনসাধারণের এই কর্মসূচীতে আস্থা আছে সেখানে যদি তাঁদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস থাকে তাহলে তাঁরা যতটুকু পারেন করবেন। এরকম করার অধিকার তাঁদের আছে। না, বরং এই কথা বলা উচিত যে এরকম করা তাঁদের কর্তব্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বহু ব্যক্তির কথা পাওয়া যায় যাঁরা নিছক আত্মবিশ্বাস, সাহস ও ধৃতিশক্তির বলে নেতার পদে উন্নীত হয়েছেন। আমরাও যদি সত্য সত্য স্বরাজ চাই ও স্বরাজের জন্য যদি আমরা আকুল হয়ে থাকি তাহলে আমাদেরও অনুরূপ আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। সরকার কর্তৃক আমাদের গ্রেপ্তার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহলে আমাদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের বুকেও বল বাড়বে।

একথা কেউ যেন না ভাবেন যে আমি গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর আপনাদের পথ দেখাবার আর কেউ থাকবেন না। আমি নয়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আপনাদের নেতা। নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে। যদিও একথা সত্য যে যাঁরা নির্ভীকতা ও আত্মাবলুপ্তির পাঠ পেয়েছেন তাঁদের নেতার কোন প্রয়োজন নেই। এই সব সদ্‌গুণ আমাদের ভিতর না থাকলে জওহরলালও আমাদের ভিতর এর সৃষ্টি করতে পারবেন না।

এছাড়া অন্য ভাবেও অনেক কিছু করা যায়। মদ ও বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা যেতে পারে। উপযুক্ত শক্তি থাকলে আমরা কর দিতে অস্বীকার করতে পারি। আইনজীবীরা আদালত বর্জন করতে পারেন। মামলা-মোকর্দমা না করে জনসাধারণও আদালতকে অকেজো করে দিতে পারেন। সরকারী কর্মচারীরা চাকুরি থেকে ইস্তফা দিতে পারেন। চতুর্দিকের হতাশার মধ্যে মানুষ কাজ চলে যাবার ভয়ে শিউরে ওঠে। এরকম মানুষ স্বরাজলাভের অনুপযুক্ত। কিন্তু এই হতাশাই বা কেন? দেশের মোট সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা কয়েক লাখের বেশী নয়। বাদবাকীদের কিভাবে

চলছে? তাঁরা কোথায় যাবেন? এমন কি স্বাধীন ভারতও আর বেশী সংখ্যক সরকারী কর্মচারীকে পুষতে পারবে না। সে সময় জেলার কালেক্টর আজকের মত এতগুলি ব্যক্তিগত চাকর-বাকর চাইবেন না। তিনি নিজেই নিজের সেবক হবেন। ভারতের মত দরিদ্র দেশ কিভাবে কালেক্টরদের কাগজপত্র বইবার জন্য, ঝাড়ু দেওয়া, রান্নাকরা, পায়খানা-সাফাই ও ডাক নিয়ে যাবার জন্য পৃথক পৃথক চাকরের ব্যবস্থা করবে? বুভুক্ষু দেশবাসী কিছুতেই এই জাতীয় ব্যয়ভার বহন করতে সমর্থ হবেন না। আমাদের যদি তাই বুদ্ধি থাকে তাহলে যেন সরকারী চাকুরির মোহমুক্ত হই—তা সে চাকুরি বিচারক বা চাপরাশী যারই হোক না কেন। কোন বিচারকের হয়ত চাকুরি ছাড়তে অসুবিধা হবে। কিন্তু চাপরাশীর অসুবিধা কোথায়? সততা সহকারে পরিশ্রম করলে তিনি যে কোন জায়গায় পেটের ভাতের যোগাড় করতে পারেন। স্বাধীনতার সমস্যার সর্বাপেক্ষা সহজ সমাধান হল: কর দিয়ে, খেতাব গ্রহণ করে, সরকারী বিদ্যালয় ইত্যাদিতে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে যাঁরা কোন না কোন ভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন তাঁরা সর্বক্ষেত্রে বা যত রকমে পারেন সরকারের সঙ্গে সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার অন্যান্য পন্থাও ভেবে বার করা যেতে পারে। আর মহিলারাও এ সংগ্রামে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগোতে পারেন।

আমার এই বক্তব্যকে আপনারা আমার উইল মনে করতে পারেন। পদযাত্রায় বা জেলে যাবার পূর্বে এই আমার একমাত্র বক্তব্য যা আপনাদের শোনাতে চাই। কাল সকালে বা যদি তার আগেই আমি গ্রেপ্তার হয়ে যাই তখন যে সংগ্রাম শুরু হবে আমি চাই তা যেন মুলতবী বা বন্ধ করা না হয়। সাগ্রহে আমি এই সংবাদের জন্য অপেক্ষা করব যে আমাদের দল গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দশটি দল পদযাত্রা চালিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। আজ আমি যে কাজ শুরু করতে যাচ্ছি তা শেষ করার মানুষ ভারতে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমাদের আদর্শের পবিত্রতা ও যে অস্ত্র আমরা গ্রহণ করেছি তার শুদ্ধতায় আমার আস্থা আছে। আর পন্থা যেখানে শুদ্ধ সেখানে নিঃসন্দেহে ভগবান তাঁর আশীষধারা নিয়ে উপস্থিত থাকেন। আর এই ত্রিবেণীসঙ্গম যেখানে হয় সেখানে পরাজয় অসম্ভব। সত্যাগ্রহী মুক্ত বা কারারুদ্ধ যাই থাকুন না কেন তিনি চিরবিজয়ী। যখন তিনি সত্য ও

অহিংসা বর্জন করেন এবং বিবেকের বাণীতে কর্ণপাত করেন না, তখনই তাঁর পরাজয় ঘটে। সুতরাং যদি একজনও সত্যাগ্রহীর পরাজয় বলে আদৌ কিছু ঘটে তাহলে তার জন্ম দায়ী তিনি স্বয়ং। ভগবান আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন এবং কাল যে সংগ্রাম শুরু হচ্ছে তার পথের সকল বাধা দূর করুন। এই যেন হয় আমাদের প্রার্থনা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৩-১৯৩০

॥ ৪৮ ॥

বিদ্রোহী হবার কর্তব্য

ত্রিশ কোটি ব্যক্তি তিনশ লোকের ভয়ে নতিস্বীকার করে আছে এ দৃশ্য স্বৈরতন্ত্রী শাসক এবং তাঁর শিকার উভয়ের পক্ষেই অনীতির পরিচায়ক। এই পাপ প্রথার দোষ যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁদের কর্তব্য হল এর কোন কোন অঙ্গ অতীব আকর্ষণীয় মনে হওয়া সত্ত্বেও অনতিবিলম্বে এর ধ্বংসসাধন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-কোন ঝুঁকি নেওয়া তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

তবে সমভাবে একথাও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে এই প্রথার তিনশত জনক বা সঞ্চালককে ত্রিশ কোটি যদি ধ্বংস করতে চায় তবে তাও তাদের পক্ষে কাপুরুষতার দ্যোতক। এই প্রথার এই সব সঞ্চালক বা তাঁদের ভাড়াটে কর্মচারীদের বিনাশ করার উপায় খুঁজে বার করতে যাওয়া নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাঁরা তো নিছক পরিস্থিতির দাস। শুদ্ধতম ব্যক্তিও এই প্রথার অংশভাগী হলে এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন এবং এই পাপের অধিকতর প্রচারের কারণ হবেন। সুতরাং স্বভাবতই এর ঐ সব সঞ্চালকদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত বা তাঁদের আঘাত করে এর প্রতিবিধান হবে না। এর প্রতিবিধান করতে হলে এই প্রথার সঙ্গে অসহযোগ করতে হবে, এর সঙ্গে সম্ভাব্য সকল প্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বন্ধ করতে এবং এর তথাকথিত উপকার গ্রহণে অস্বীকার করতে হবে। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে অহিংস আইন অমান্য অসহযোগেরই অপরিহার্য অঙ্গ। কোন শাসন-ব্যবস্থার হুকুম ও নির্দেশ পালন করে আমরা তার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা কার্যকরীভাবে সহযোগিতা করি। কোন অন্যায়মূলক প্রশাসন ব্যবস্থা কদাচ এজাতীয় আনুগত্যের অধিকারী নয়। এর প্রতি আনুগত্যের

অর্থ হল পাপের ভাগী হওয়া। সুতরাং সৎ ব্যক্তি তাঁর সমগ্র আত্মা দিয়ে কোন কুপ্রথা বা অসৎ প্রশাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা করবেন। তাই পাপাশ্রয়ী রাষ্ট্রের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে। হিংসার পথে বিদ্রোহী হলে সে বিদ্রোহ এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চালিত হয় যাঁদের স্থান অপরে গ্রহণ করতে পারেন। এ পন্থায় পাপ অক্ষত থেকে যায় এবং এমন কি অনেক সময় এর পরিপুষ্টি ঘটে। অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন এর একমাত্র এবং সর্বাপেক্ষা সক্রিয় প্রতিকার এবং যিনি পাপের সঙ্গে সংস্পর্শ রাখতে চান না তাঁর পক্ষে এ পন্থা বাধ্যতামূলক।

অহিংস আইন অমান্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ এযাবৎ এই প্রতিকারের পন্থা আংশিক প্রয়োগ হয়েছে এবং সর্বদা হিংসার সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়। কারণ অত্যাচার যখন প্রবল হয় তখন তার ফলভোগীদের মধ্যে খুবই আক্রোশের সৃষ্টি হয়। দুর্বলতার জন্য এই আক্রোশ থাকে সুপ্ত এবং সামান্যমাত্র অজুহাত পেলেই প্রচণ্ডভাবে তার বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিশৃঙ্খল প্রাণঘাতী সুপ্ত শক্তিকে সুশৃঙ্খল প্রাণদায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করার সার্বভৌম পদ্ধতি হল অহিংস আইন অমান্য এবং এর প্রয়োগে পূর্ণ সাফল্য অবধারিত। এর প্রয়োগে যে পরিণামের সম্ভাবনা আছে তার তুলনায় সম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকি কিছুই না। বিশ্ব যখন এর প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হবে এবং এর সফল রূপায়ণ সম্বন্ধে যখন বেশ কয়েকটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যাবে তখন অহিংস আইন অমান্যে বিপদের ঝুঁকি আকাশে ওড়ার বিজ্ঞান যথেষ্ট প্রগতি করার ফলে বিমানবিহারে যেটুকু বিপদের আশঙ্কা বিদ্যমান, তার থেকেও কম হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৩-১৯৩০

॥ ৪৯ ॥

আইন অমান্য ও হিংসা

সব ঠিক থাকলে আমি ৫ই এপ্রিল দাণ্ডি পৌঁছাব। আমার তাই মনে হয় যে সত্যাগ্রহ শুরু করার পক্ষে ৬ই এপ্রিল তারিখটি সব চেয়ে সুবিধাজনক হবে, কিন্তু কর্মীরা এর জন্য প্রস্তুতি করতে থাকলেও চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবেন।

নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও এর অর্থ এই নয় যে প্রস্তুতি না থাকলেও এবং স্থানীয় প্রধান সেবক অন্তরের প্রেরণা বোধ না করলেও প্রত্যেক জেলা ও প্রদেশকে অবিলম্বে অহিংস আইন অমান্য শুরু করতে হবে। আত্মবিশ্বাস বোধ না করলে বা পরিস্থিতির উপর আস্থা না হলে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কলকোলাহলে যোগ দিতে অস্বীকার করবেন। এমতাবস্থায় নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কাউকে দোষী করা যাবে না। কিন্তু পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করার পরিবর্তে যিনি পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে গা ভাসিয়ে দেন তিনি নিন্দিত হবেন।

আমরা চাই গণঅহিংস আইন অমান্য। এটা সৃষ্টি করা যায় না। আপন নামের মর্যাদা রাখতে হলে এবং সফল হতে হলে এ হবে স্বতঃস্ফূর্ত। আর যেখানে পূর্বে ক্ষেত্র কর্ষণ করা হয়নি ও সেই ক্ষেত্রে সার ও জল সিঞ্চন করা হয়নি সেখানে নিশ্চয় জনসাধারণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে না। সর্বত্রই হিংসার আবির্ভাবের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। একথা সত্য যে আমি এবারে বলেছি যে হিংসার আবির্ভাব হলেও অহিংস প্রতিরোধ চলতে থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমভাবে সত্য যে আমাদের তরফ থেকে হিংসার অনুষ্ঠান হলে আন্দোলনের ক্ষতি হবে ও এর অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। দুটি বিরুদ্ধ শক্তি পাশাপাশি কাজ করে কখনও পরস্পরকে পুষ্ট করতে পারে না। অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনার মূলে আছে হিংসাকে নিষ্ক্রিয় করে শেষ অবধি একে সম্পূর্ণভাবে স্থানচ্যুত করে সেই জায়গায় অহিংসাকে প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমকে বিদ্বেষের স্থলাভিষিক্ত করা ও দ্বন্দ্বের স্থলে মিলনের সূত্রপাত করা।

সুতরাং হিংসার আবির্ভাব সত্ত্বেও আন্দোলন মুলতবী না রাখার অর্থ কেবল

এইটুকু যে হিংসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিলে অহিংসার অনুগামীরা নিজেদের সেই আগুনে আহুতি দেবেন। সরকারের সংগঠিত হিংসা অথবা ক্রুদ্ধ জনগোষ্ঠী বা জাতির ইতস্ততঃ দৃশ্যমান হিংসা—কোন ক্ষেত্রেই তাঁরা অসহায় দর্শকের ভূমিকায় থাকবেন না। সুতরাং প্রতিটি প্রদেশে কর্মীরা মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভবপর ততখানি সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং তারপর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এরকম করার অর্থ যদি কল্পনীয় সব রকমের ঝুঁকি নেওয়া হয় তবে তাও স্বীকার। এর অর্থ হল এই যে প্রতিটি প্রদেশে পূর্ণ স্বরাজ-প্রাপ্তির মাধ্যম হিসাবে নীতিগতভাবে অহিংসায় বিশ্বাসী বলে যাঁরা স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার কাছে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৩-১৯৩০

॥ ৫০ ॥

আত্মনিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

আজ সকালেই প্রার্থনার সময় আমি আমার সঙ্গীদের বলছিলাম যে এবার যেহেতু যে জেলায় অহিংস আইন অমান্য করতে হবে আমরা সেই জেলায় প্রবেশ করেছি সেইজন্য আমরা অধিকতর শুদ্ধি ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দেব। তাঁদের আমি এই বলে সতর্ক করেছিলাম যে এই জেলা অধিকতর সংগঠিত এবং এখানে বহুসংখ্যক অন্তরঙ্গ সহকর্মী আছেন বলে আমরা হয়ত মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা পাব। এই মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসায় যাতে মাথা না ঘুরে যায় তার জন্য আমি আমার সহযাত্রীদের সাবধান করে দিয়েছিলাম। আমরা দেবদূত নই। আমরা খুবই দুর্বল এবং সহজেই প্রলুব্ধ হই। আমাদের বহু দোষ-ত্রুটি আছে। ঈশ্বর মহান। আজই আমাদের কয়েকটি দোষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের দোষত্রুটি নিয়ে আমি যখন আলোচনা করছিলাম তখন জনৈক সহযাত্রী স্বয়ং নিজের দোষের স্বীকারোক্তি করেন। আমি বুঝতে পারলাম যে তাড়াহুড়া করে আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিনি। স্থানীয় কর্মীরা সুরাত থেকে মোটরলরীতে করে আমাদের জন্য দুধ আনিয়েছেন এবং আমাদের জন্য আরও এমন সব খরচ করেছেন আমি যা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আমি তাই

তীব্রভাবে এসবের বিরুদ্ধে বললাম। তবে তাতে আমার দুঃখ গেল না। পক্ষান্তরে যে অন্যায় করা হয়েছে তার কথা ভেবে সে দুঃখ বেড়ে গেল।

সমালোচনার অধিকার

এই আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হচ্ছে যে বড়লাটকে আমার সেই পত্র লেখার অধিকার আছে কি যাতে আমি আমাদের দেশবাসীর গড়পড়তা আয়ের পাঁচ হাজার গুণেরও বেশী বেতন নেবার জন্য তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছি? কোন্ যুক্তিতে তিনি এত উচ্চ বেতন নেওয়া সমর্থন করতে পারেন? আর আমরাই বা কি করে আমাদের আয়ের তুলনায় তাঁর এত বেশী বেতন নেওয়া বরদাস্ত করতে পারি? তবে এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উপর দোষারোপ করা যায় না। তাঁর হয়ত এত টাকায় প্রয়োজনীয়তা নেই। ভগবান তাঁকে বিত্তবান ব্যক্তি করেই দিয়েছেন। আমার চিঠিতে আমি এই অনুমান ব্যক্ত করেছি যে সম্ভবতঃ তাঁর পুরো বেতনটাই তিনি জনহিতকর কার্যে ব্যয় করেন। তারপর আমি জানতে পেরেছি যে আমার অনুমান বহুলাংশে সত্য হবারই সম্ভাবনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এই উচ্চ বেতন দেওয়ার প্রতিবাদ করব। মাসে একুশ হাজার টাকা কেন, সম্ভবতঃ একুশ শত টাকা দেওয়ার প্রস্তাবেরও আমি প্রতিরোধ করব। তবে কখন্ আমি এজাতীয় প্রতিরোধ করতে পারব? স্বয়ং আমি জনসাধারণের কাছ থেকে অবিবেচনাপ্রসূত খাজনা নিয়ে নিশ্চয় এই প্রতিরোধ করতে পারব না। জনসাধারণের গড় আয়ের সঙ্গে আমার জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ের যদি একটা সামঞ্জস্য থাকে তাহলেই কেবল আমার পক্ষে এর প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হবে। ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমরা পদযাত্রা করছি। বুভুক্ষু, নগ্ন ও কর্মহীনদের তরফ থেকে আমরা কাজ করছি বলে আমরা দাবি করছি। আমাদের দেশবাসীদের গড় দৈনিক আয় সাত পয়সার* প্রায় পঞ্চাশগুণ বেশী যদি আমরা নিজেদের জন্য খরচ করি তাহলে বড়লাটের ঐ উচ্চ বেতনের বিরূপ সমালোচনা করার অধিকার আমাদের থাকে না। কর্মীদের আমি সব খরচের হিসাব দিতে বলেছি। আর যেভাবে কাজ-কর্ম চলছে তাতে আমি যদি দেখি যে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জন্য দেশবাসীর কাছ থেকে সাত

* বর্তমানের এগার পয়সা।—অনুঃ

পয়সার পঞ্চাশগুণ বেশী খরচ করছি তাহলে আমি আশ্চর্য হব না। সমগ্র দুনিয়া তোলপাড় করে খুঁজে আমার জন্য যদি বাছাই করা কমলালেবু ও আঙ্গুর আনা হয়, আমার ১২টি কমলালেবুর প্রয়োজন হলে যদি ১২০টি আমার সামনে হাজির করা হয় এবং আধ সের দুধ পান করার আমার প্রয়োজন হলে যদি দেড় সের যোগাড় করা হয় তাহলে তার পরিণাম পূর্বোক্ত ব্যয়বাহুল্য ছাড়া আর কি হতে পারে? আমরা কাজে না লাগালে যাঁরা যোগাড় করে এনেছেন তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন এই অজুহাতে আমরা যদি এই সব দামী জিনিস খাই তাহলে তার পরিণাম আর কি হতে পারে? আপনারা আমাদের পেয়ারা ও আঙ্গুর দেন এবং এইজন্য আমরা সে সব খাই যে সেগুলি নাকি কোন ধনী কৃষকের কাছ থেকে পাওয়া উপহার। এর পর যখন অবিচলিত বিবেকে কোন বন্ধুর দেওয়া দামী চকচকে কাগজে ঝর্না কলম দিয়ে বড়লাটকে সেই চিঠি লিখি তখনকার পরিস্থিতি কল্পনা করুন! এজাতীয় আচরণ আপনাদের ও আমার পক্ষে কি সমীচীন? এই পরিস্থিতিতে লিখিত চিঠি কি তিলমাত্র প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে?

মূক জনগণের ন্যাসী

এইভাবে জীবনযাপন করার অর্থ ভগতের সেই চিরস্মরণীয় উক্তির জীবন্ত প্রতীক হওয়া: "অপহৃত খাদ্য গ্রহণ করার অর্থ কাঁচা পারা খাওয়া"। আর দরিদ্র দেশের সঙ্গতির বাইরে জীবনযাপন করা মানে অপহৃত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা। অপহৃত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে এ যুদ্ধ কখনও জয় করা যাবে না। আর নিজেদের সঙ্গতির বাইরে থাকব বলে আমি এই পদযাত্রা শুরু করিনি! হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন বলে আশা করছি। এই রকম অপব্যয়মূলক জীবনযাত্রার মধ্যে তাঁদের ধরে রাখা অসম্ভব হবে। আমার জীবন এত ব্যস্ত হয়ে গেছে যে পদযাত্রী আশীজনের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখতে পারছি না এবং তাঁদের সবাইকে তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনে উঠতেও পারব না। তাই সর্বসমক্ষে আমার হৃদয় খোলা ছাড়া অপর কোন পথ আমার সামনে নেই। আমার উক্তির মূল তাৎপর্য আপনারা উপলব্ধি করবেন এই আমার আশা। আর তা যদি না করতে পারেন তবে এই প্রয়াসের দ্বারা স্বরাজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। আমাদের জনগণের যথার্থ ন্যাসী হতে হবে।

আমাদের দুর্বলতা আমি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছি। তাও তো আমি সবিস্তারে এই সব দুর্বলতার কথা বলিনি। তবে যতটুকু বলেছি তার থেকে বড়লাটকে ঐ চিঠি লেখার যোগ্যতা যে আমাদের নেই তা নিশ্চয় আপনারা উপলব্ধি করেছেন।

এবার স্থানীয় সহকর্মীরা যেন আমার হৃদয়বেদনা বোঝেন। আমরা দুর্বল, প্রলোভনের দ্বারা আমরা সর্বদা প্রভাবিত হই এবং পদে পদে আমাদের পতন ঘটে। তাই কেন আপনারা আমাদের প্রলুব্ধ করবেন এবং প্রশংসায় আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবেন? এই বদভ্যাস আমরা গ্রামে যেন প্রবর্তন না করি। লাখ দশেক লোক ত্রিশ কোটিকে শোষণ করছে এই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে যখন পরস্পরকে শোষণ করতে চাইব তখন কি হবে? তাহলে কুকুরের দল আমাদের মৃতদেহ চাটবে।

প্রতিটি পাইপয়সার হিসাব

সামনে যেসব বাতি জলছে তা আমি যে অপব্যয়ের কথা ভাবছি তার নিদর্শন। আপনাদের জড়তামুক্ত করা আমার লক্ষ্য। স্বেচ্ছাসেবকেরা যেন ব্যয়িত প্রতিটি পয়সার হিসাব দিতে পারেন। সরকারের বদলে আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার যোগ্যতা আমার বেশী। সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ শুরু করার জন্য আমার বহু বছর সময় লেগেছে। কিন্তু নিজেদের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ শুরু করতে আমার অত দিনও লাগবে না। বর্তমান সত্যাগ্রহে যে ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তার তুলনায় সেই সত্যাগ্রহের ঝুঁকি কিছুই নয়।

সুতরাং আমি চাই যে আমাদের মত সেবকদের আপ্যায়ন করার সময় আপনারা বেহিসাবী হবার বদলে বরং কৃপণ হবেন। অপরিহার্য কারণবশতঃ কোন জিনিস দিতে না পারলে তার জন্য আমি অভিযোগ করব না। আমার জন্য ছাগলের দুধ যোগাড় করতে গিয়ে আপনারা যেন দরিদ্র মায়েদের তাঁদের শিশুদের দুধ থেকে বঞ্চিত না করেন। এরকম করলে সে দুধ আমার কাছে হবে বিষতুল্য। আর সুরাত থেকে দুধ ও শাকসব্জী আনারও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে এসব ছাড়াই আমরা চালাতে পারি। সামান্য অজুহাতেই মোটরগাড়ীর ব্যবহার করবেন না। এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে হাঁটতে পারলে আর গাড়ীতে চড়বেন না। এ যুদ্ধ টাকা দিয়ে চালাবার নয়। টাকা দিয়ে

কোন গণ-আন্দোলন জারী রাখার কল্পনা করা অসম্ভব ব্যাপার। আর যাই হোক না কোন টাকার ছড়াছড়ি করে আন্দোলন চালানো অন্ততঃ আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এ আন্দোলনে ব্যয়বাহুল্যের স্থান নেই। অত্যন্ত ব্যয়বহুল ত্বরিৎ গতির প্রচার ছাড়া যদি আমাদের সভায় জনসমাবেশ ঘটানো না যায় তাহলে আমি বরং আধ ডজন নর-নারীর কাছে বক্তৃতা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকব। আমাদের উচ্চ শ্রেণীর কর্মদক্ষতার উপর সাফল্য নির্ভরশীল নয়। এটা নির্ভর করে ভগবানের উপর এবং সতর্ক ও বিনয়ীদেরই কেবল তিনি সাহায্য করেন।

অপমানজনক দৃশ্য

কাউকে আমাদের নীচ মনে করা উচিত নয়। আমি দেখেছি যে রাত্রে পথ চলার জন্য আপনারা একটি বড় আকারের ভারি বাতির ব্যবস্থা করেছেন, সেটি একটি টুলের উপর রেখে সেই টুল মাথায় নিয়ে একজন দরিদ্র মজুরকে পথ চলতে হচ্ছে। এ এক অপমানজনক দৃশ্য। মানুষটিকে আবার জোরে চলার হুকুম দেওয়া হচ্ছিল। সে দৃশ্য চোখে দেখা যাচ্ছিল না। আমি তাই পায়ের গতি বাড়িয়ে সমগ্র দলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। তাতে অবশ্য কোন ফলই হল না। লোকটিকে আমার পিছনে দৌড়াতে বাধ্য করা হল। অপমানের ভরা পূর্ণ হল। ঐ বোঝা যদি বইতেই হবে তবে আমাদের মধ্যে কেউ তা বইছেন—এটা দেখলে আমি খুশী হতাম। তাহলে শীঘ্রই আমরা ঐ টুল ও ভারি বাতি বাদ দিতাম। কোন শ্রমিক তাঁর মাথায় এত বড় বোঝা বইবেন না। ন্যায়সঙ্গত কারণেই আমরা বেগার প্রথার বিরোধী। কিন্তু এ ব্যাপারটা বেগার ছাড়া আর কি? মনে রাখবেন যে স্বরাজ হলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের কেউ ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হন—এইটা আমরা চাইব। তাই আমরা যদি শীঘ্র আমাদের আচরণ সংশোধন না করি তাহলে জনসাধারণের কাছে আপনারা ও আমরা যে স্বরাজের কথা বলছি তা আসবে না।

যে কথা আপনাদের সামনে আজ বললাম তার থেকে আপনারা যেন এই সিদ্ধান্তে না উপনীত হন যে আমার লড়াই চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প দুর্বল হয়েছে। সহকর্মীরা বা অপরে যেভাবেই চলুন না কেন এ লড়াই চলবে। আমি একা থাকি বা হাজার হাজার সহকর্মীর সহযোগিতা পাই পিছনে ফেরার প্রশ্ন আমার কাছে নেই। পরাজিত হয়ে আশ্রমে ফেরার চেয়ে আমি বরং কুকুরের মত

মৃত্যুবরণ করব ও চাইব যে আমার মৃতদেহের অস্থি নিয়ে কুকুর টানাটানি করুক।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-৪-১৯৩০

॥ ৫১ ॥

হিসাবরক্ষায় শুদ্ধতা

সরল জনসাধারণ পবিত্র বিশ্বাস চালিত হয়ে যেসব সেচ্ছাসেবক নুন বিক্রি করছেন বা অন্যভাবে চাঁদা তুলছেন তাঁদের ঝুলিতে পয়সা টাকা ও নোট দিচ্ছেন। অননুমোদিত কোন স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের জন্য চাঁদা তুলবেন না বা চড়া দামে নুন বিক্রি করবেন না। সব চাঁদার সঠিক হিসাব রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে সেই হিসাব প্রকাশ করতে হবে। হিসাব পরীক্ষকেরা সপ্তাহে একবার হিসাবের খাতা-পত্র পরীক্ষা করে দেখবেন। সততার জন্য খ্যাত ধনী ব্যক্তিরা যদি কোষাধ্যক্ষ হয়ে চাঁদা আদায় এবং আদায়ীকৃত অর্থের দায়িত্ব নেন ও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করেন তাহলে খুব ভাল হবে। সক্রিয় কর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। শীঘ্রই হয়ত স্থানীয় সংগঠনের পক্ষে টাকা-পয়সা রাখা বা তার সঠিক হিসাব রাখা কঠিন হবে। স্বভাবতই সর্বত্র জনসাধারণ এ আন্দোলনের ব্যয়নির্বাহের দায়িত্ব নিয়েছেন। দায়িত্ব সহকারে ও বিধিবদ্ধভাবে যেন এ কাজ করা হয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৪-১৯৩০

॥ ৫২ ॥

জাতির উদ্দেশ্যে বাণী

[গান্ধীজী গ্রেপ্তার হতে পারেন এই মর্মে প্রবল গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তাই ৯ই এপ্রিল দাণ্ডিতে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে যে বাণী দেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হল।]

গুজরাতের জনসাধারণ যেন একযোগে মাথা খাড়া করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আট ও ভীমরাদে আমি নিজের চোখে হাজার হাজার নরনারীকে নির্ভীকভাবে

লবণ আইন ভঙ্গ করতে দেখেছি। এত বিপুল সংখ্যক লোকের উপস্থিতি সত্ত্বেও আমি কোন অশিষ্টতা বা হিংসার নিদর্শন লক্ষ্য করিনি। সরকারী কর্মচারীরা সব রকমের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও জনসাধারণ একান্তভাবে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস থেকেছেন।

এখানে গুজরাতে বহুদিনের লোকপ্রিয় জনসেবকেরা একের পর এক গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবুও জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে অহিংস আছেন। আতঙ্কের কাছে নতিস্বীকার করতে তাঁরা অস্বীকার করেছেন এবং ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় অহিংস আইন অমান্যে অংশগ্রহণ করে তাঁরা পূর্বোক্ত গ্রেপ্তারের প্রতি তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আর এই রকম হওয়াটাই উচিত ছিল।

শুভ মুহূর্তে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে শেষ অবধি সেই আন্দোলনকে যদি অহিংসার মনোবৃত্তি চালিত হয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে শীঘ্রই যে কেবল আমরা আমাদের দেশে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখব তাই নয়, ভারতবর্ষ এবং তার গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের উপযুক্ত একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য নিদর্শন আমরা বিশ্বের সামনে পেশ করতে সমর্থ হব।

বলিদান ব্যতিরেকে স্বরাজ অর্জিত হলে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আমি তাই চাই দেশের জনসাধারণ সর্ববৃহৎ বলিদান করার জন্য প্রস্তুত হোন। সত্যকার বলিদানে যাবতীয় কৃচ্ছ্র এক পক্ষকেই বরণ করতে হয়। হত্যা না করে মৃত্যুবরণ করা, প্রাণ দিয়ে অমর হবার কলায় পারঙ্গমতা অর্জন করতে হয়। ভারত যেন এই মন্ত্রের উপযুক্ত হতে পারে।

বর্তমান মুহূর্তে ভারতবর্ষের আত্মসম্মান—প্রত্যুত তার সব কিছুই সত্যাগ্রহীদের করমুষ্টিতে ধৃত এক মুঠি লবণের প্রতীকের মধ্যে বিধৃত। তাই সেই মুঠি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাক, কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ যেন নুন ফিরে না দেন।

সরকার যদি নিজেকে সভ্য বলে দাবি করেন তাহলে যাঁরা বেআইনী লবণ তৈরী করছেন তাঁদের যেন কারারুদ্ধ করেন। গ্রেপ্তার হবার পর অহিংস আইন অমান্যকারীরা সানন্দে তাঁদের নুন দিয়ে দেবেন—যেমন তাঁরা তাঁদের দেহ কারাকর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করেন।

কিন্তু দৈহিক বলপ্রয়োগ করে বেচারী নিরীহ সত্যাগ্রহীদের কাছ থেকে নুন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা নিছক বর্বরতা মাত্র এবং এর অর্থ ভারতবর্ষকে অপমান করা। এ অপমানের জবাব হচ্ছে মুঠি শিথিল না করে হাত ভেঙ্গে

ফেলতে দেওয়া। এর পরও কিন্তু যিনি নিগৃহীত হলেন তিনি বা তাঁর সাথীরা কেউ অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ পোষণ করবেন না। হিংসার জবাব হিংসা নয়, এর উত্তর হল ঈশ্বরের নাম নিয়ে মর্যাদা ও শান্তভাবে কষ্ট সহ্য করা।

আমার গ্রেপ্তারের জন্য আমার সঙ্গী অথবা জনসাধারণ যেন বিচলিত না হন। কারণ এ আন্দোলনের পরিচালক আমি নই—ঈশ্বর। তিনি সর্বদা সবার হৃদয়ে বিরাজিত এবং তাঁর উপর আস্থা থাকলে তিনি আমাদের সঠিক পন্থা প্রদর্শন করবেন। আমাদের পথ ইতিপূর্বেই আমাদের জন্য ছকে রাখা হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম যেন বেআইনী লবণ সংগ্রহ বা তৈরী করে। বোনেরা মদের দোকান, আফিঙের আড্ডা ও বিদেশী কাপড়ের ব্যবসায়ীদের দোকানে পিকেটিং করবেন। প্রতিটি কুটিরের বালক বৃদ্ধ মিলে সবাই তকলীতে সুতা কাটবেন ও প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে সুতা কেটে কাপড় বুনিয়ে নেবেন। বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করতে হবে। হিন্দুরা অস্পৃশ্যতা পরিহার করবেন। হিন্দু মুসলমান শিখ পার্শী ও খ্রীষ্টানরা মনের মিল গড়ে তুলবেন। সংখ্যালঘুরা সন্তুষ্ট হবার পর যা থাকবে সংখ্যাগুরুরা তাই নিয়ে যেন সন্তুষ্ট হন। ছাত্ররা যেন সরকারী স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং সরকারী কর্মচারীরা চাকুরি ছেড়ে যেন জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহলে দেখতে পাব যে পূর্ণ স্বরাজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৫-১৯৩০

॥ ৫৩ ॥

আমরা যেন অনুতাপ করি

"কিন্তু যে বিদ্বেষ-ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং কথা ও কাজে যে বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তা এতই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে তা দেখে এই চিন্তা মনে জাগছিল যে সমস্ত দেশ জুড়ে এই প্রবল পরিমাণ বিদ্বেষ জাগানো সমীচীন কিনা? সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আলাপ আলোচনা, গান ও শ্লোগানের মাধ্যমে বিদ্বেষের যে প্রবল প্রবাহের দেখা পাওয়া যায় তাতে এত অধিক সংখ্যক মানুষের ভিতর এই পরিমাণ অধোগতির পরিচয় পেয়ে মন পীড়িত হয়। "অধোগতি" শব্দটি আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব

নিয়েই ব্যবহার করেছি। মনে হয় যেন মিথ্যা কথা বলাটাই স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতার পরিচায়ক। সরকারী কর্মচারী, পুলিসের লোক ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের একেবারে মিথ্যা অজুহাতে এবং যে ঘটনা ঘটেনি তার অপরাধে পথেঘাটে ও সর্বত্র আক্রমণ করা এক নিত্যকার দৃশ্য ছিল। বিশেষ করে বিলাতী পণ্য ও অপর কয়েক ধরনের বিদেশী পণ্যের ব্যবসায়ীদের উপর যে ব্যাপক ও অসহ্য নিষ্ঠুরতা ও অবিচার করা হয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কোন পণ্যের ব্যবসায় না করতে বা কাউকে বিশেষ কোন বস্তু ব্যবহার না করতে বলা এক কথা। কিন্তু কারও উপর সম্ভাব্য সকল রকমে জোর করা, তাকে গালিগালাজ করা, তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করা ও যত রকমে পারা যায় তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা অন্য কথা। আর আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এইসব ক্ষেত্রে অহিংসা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে, যে পরিমাণ বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল ও যে পরিমাণ নিষ্ঠুরতার আচরণ হয়েছিল তা আদৌ অহিংসা নয় এবং ওসব গান্ধীজীর শিক্ষার বিরোধীও। সাধারণ আন্দোলনের বিরোধীদের বাধা দেওয়া ও সব রকমে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা নিত্যকার ব্যাপার ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী অনুসৃত হলেও একটি বিষয় স্পষ্ট ছিল যে মানুষকে হয় কারও এজাতীয় হুকুম মেনে চলতে হবে আর নচেৎ শিশু নারী বা বয়স্ক ব্যক্তিদের ছোট বা বড় দল যেভাবে তাঁকে নিগৃহীত করবে তা বরদাস্ত করতে হবে। তাঁদের মতে কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন মত থাকার মানেই হচ্ছে ইংরেজ বা সরকারের ধামাধরা হওয়া ও দেশদ্রোহিতার পরিচায়ক। আজ বহু পরিবারে এই বিদ্বেষ-ভাবনার মানসিক শিকার দেখতে পাওয়া যাবে।

"কিন্তু এর থেকেও গুরুতর বিপদের ব্যাপার ঘটেছে। রক্ত অর্থাৎ আইন ভাঙার স্বাদ এতই আকর্ষণীয় যে আজ সবার মুখেই এই সত্যাগ্রহের কথা। বিদ্যালয়, পরিবার, কোন গোষ্ঠী, বন্ধুদের মধ্যে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে বা কোন দপ্তরে—যখনই যেখানে আপনার কোন বিষয়ে মতভেদ হবে দেখতে পাবেন আপনার দিকে সত্যাগ্রহ সঙ্গীন উঁচিয়ে রয়েছে। নিয়োগকারী ও কর্মচারী, ভাড়াটে ও বাড়িওয়ালা, বাবা-মা ও সন্তান, ছাত্র ও শিক্ষক, ভাই ও বন্ধু সর্বক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহের এই উঁচানো সঙ্গীনের অস্তিত্ব দেখা

যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধি-বিধান ভাঙ্গা আজ খুবই সহজ, খুবই সরল। কলেজের কোন অধ্যাপক যদি শৃঙ্খলার কথা বলেন, যদি মিউনিসিপ্যালিটির কোন কর্মচারী অতিরিক্ত কর ধার্য করার প্রস্তাব করেন, ছাত্রদের যদি গোলমাল করতে নিষেধ করা হয়, ফেরিওয়ালাদের যদি রাস্তা আটকাতে মানা করা হয়, কাউকে যদি কোথা থেকে বদলি করা হয়—অর্থাৎ এমন কিছু যদি করতে যাওয়া হয় যা কারও পছন্দ নয় তাহলেই সত্যাগ্রহের এই ছুরি আপনার দিকে তাক করা হবে। সত্যাগ্রহ কোথায় প্রয়োগ করতে হবে এবং কোথায় নয় এই বিচার-বুদ্ধি যেন সমগ্র জাতি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। যে-কোন জাতি ও দেশের পক্ষে এটা বিপদের লক্ষণ। ব্যাপারটা ঠিক যেন এক দেশ থেকে অপর দেশে দ্রুতবেগে কোন বোমাবর্ষী বিমান চালিয়ে নিয়ে যাবার মত। সত্যাগ্রহের এই অপপ্রয়োগ ঠিক যেন যে দেশলাইয়ের কাছ থেকে আলো পাওয়া যেতে পারে তাকে ঘর জ্বালানোর কাজে লাগাবার মত। সত্যাগ্রহের অস্ত্রে এই বিপদের আশঙ্কাও বিদ্যমান। ভাল করার জন্য যেমন সত্যাগ্রহের ব্যবহার করা যায় তেমনি চূড়ান্ত ধ্বংস-সাধনের জন্যও এর অপপ্রয়োগ হতে পারে। আমার তাই মনে হয় যে যতক্ষণ না সত্যাগ্রহকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলে বিশ্বের দরবারে দাবি-জ্ঞাপনকারীরা এই ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হন, তাহলে তাঁরা দেখবেন যে সমস্ত ব্যাপার কেবল তাঁদের বিরুদ্ধেই নয় সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সবিনয়ে আমি এই কথা নিবেদন করতে চাই যে আমার মতে কিছুসংখ্যক উপযুক্তরূপে প্রশিক্ষিত ও বিদ্বেষ-ভাবনা-বর্জিত নেতার এখন আর কিছু না করে কয়েকটি বছর প্রতিটি প্রদেশ নগর ও গ্রামে গিয়ে যথার্থ সত্যাগ্রহ বা সত্যকার অহিংসা কি এবং কখন কিভাবে এর প্রয়োগ করতে হয় জনসাধারণকে তা বোঝানো উচিত। আমার মতে প্রতিটি প্রদেশে অহিংসার একটি নিয়মিত বিদ্যালয় চলা উচিত এবং সেখানকার শিক্ষক হবেন এমন সব উচ্চমনা ব্যক্তি যাঁরা বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এর মূল্য উপলব্ধি করেন। রাজনীতির ছাত্রদের এঁরা শিক্ষা দেবেন এবং এই সব ছাত্র আবার শিক্ষালাভান্তে পূর্ণ সময়ের কর্মী হিসাবে সমগ্র দেশে পরিভ্রমণ করে সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার করবেন ও বস্তুতঃ এর তাৎপর্য কি তা শেখাবেন। আমার মতে দেশকে বাঁচাতে হলে এইটাই একমাত্র পথ।"

করাচীর লর্ড মেয়র জামশেদ মেহতা একজন যথার্থ দেশপ্রেমী। কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি যতখানি একাত্ম তা না হলে এবং কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতিকে তাঁর মিউনিসিপ্যালিটির যাবতীয় সম্পদ দিয়ে সাহায্য না করলে সম্প্রতি মাত্র পঁচিশ দিনের মধ্যে করাচীতে যে কংগ্রেস নগর খাড়া করা হয়েছিল তা সম্ভবপর হত না। আন্দোলন চলাকালীন সত্যাগ্রহীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথাও সর্বজনবিদিত। সুতরাং তাঁর মত একজন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন সমালোচনা এলে অবশ্যই স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা করা উচিত।...তাঁর যে পূর্বোক্ত সমালোচনা আমি উদ্ধৃত করেছি সেটি তাঁর যে রচনা থেকে নেওয়া তার প্রথমাংশে তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে নিগ্রহ বরণ করার জন্য সত্যাগ্রহীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু প্রশংসাপত্র পাওয়ায় আমাদের অহঙ্কারে ফুলে ওঠা উচিত নয়। আমরা যতটুকু অহিংসা পালন করেছি তা করা আমাদের কর্তব্য ছিল।

সুতরাং এই সতর্কীকরণ এসেছে স্বদেশ ও মানবতার একজন যথার্থ সহৃদয়ের কাছ থেকে এবং তাই এর যথার্থ মূল্য দিতে হবে ও এর থেকে লাভবান হতে হবে। করাচী সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছেন অন্যান্য স্থানের পক্ষেও তা অল্পবিধ প্রযোজ্য।

অহিংসাকে শক্তিশালী আযুধ হতে হলে মন থেকে এর সূত্রপাত করতে হবে। মনের সহযোগিতা-বিহীন নিছক দেহের অহিংসা দুর্বল বা কাপুরুষের অহিংসা এবং তাই এ শক্তিবিহীন। জামশেদজী ঠিকই বলেছেন যে এটা অধোগতিকারী ব্যাপার। হৃদয়ে বিদ্বেষ ও ঘৃণা রেখে আমরা যদি এই ছলনা করি যে প্রতিহিংসা নিচ্ছি না তাহলে তার প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর হবেই যার পরিণাম স্বরূপ আমাদের ধ্বংস অপরিহার্য। কারণ নিছক দৈহিক অহিংসা অর্থাৎ কারও ক্ষতিকারক বৃত্তির না হওয়ার জন্য হৃদয়ে সক্রিয় প্রেমের অনুশীলন না করতে পারলেও অন্ততঃ কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করার স্বভাব পরিহার করা কর্তব্য। সুতরাং বিদ্বেষ-সৃষ্টিকারী যাবতীয় সঙ্গীত ও বক্তৃতা নিষিদ্ধ করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে নির্বিচারে কর্তৃপক্ষের নির্দেশের বিরোধিতা করার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল অমিত স্বেচ্ছাচার ও তজ্জনিত আত্মবিনাশ।

জামশেদজীর সমালোচনা যদি তাঁর প্রশংসার কারণ সমষ্টিতেরও অধিক না

হত, অর্থাৎ যথার্থ অহিংসার মোট পরিমাণ যদি অযথার্থ অহিংসার অধিক না হত তাহলে আজকের মত ভারত অগ্রগতি করতে সমর্থ হত না। কিন্তু করাচীর লর্ড মেয়রের প্রশংসার চেয়েও নিঃসন্দেহে এই ঘটনা অধিকতর মূল্যবান যে গ্রামবাসীরা সহজ বৃত্তিবশে এমন চমৎকারভাবে অহিংসা পালন করেছে অতীতে যার সম্ভাবনার কথা কখনও চিন্তাও করা যায়নি। তাঁদের অহিংসার ফলেই জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছে।

অহিংসার রহস্যজনক পরিণামের পরিমাপ তার দৃষ্টিগোচর পরিণামের দ্বারা করা চলবে না। কিন্তু বিদ্বেষ-বিষ যতদিন সমাজকে কলুষিত করছে ততদিন আমাদের বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। এই সংগ্রাম হৃদয় পরিবর্তনের এক বিপুল প্রয়াস। আমাদের লক্ষ্য ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তনের কম নয়। হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ করে মুখে যদি শুধু আমরা বলি যে অহিংসার অনুসরণ করছি তাহলে কদাচ আমরা এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারব না। সুতরাং যাঁরা অহিংসার পথে চলতে চান কিন্তু হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ করেন এবার যেন তাঁরা ভ্রান্ত পন্থা পরিহার করে এযাবৎ নিজের দেশ ও নিজের প্রতি যে অন্যায় করে এসেছেন তার জন্য অনুশোচনা করেন।

॥ ৫৪ ॥

অহিংসার শক্তি

জনৈক পত্রলেখক লিখেছেন :

"যতটুকু দেখছি ভারতবর্ষের বর্তমান সংগ্রামে বিশ্বজনমত তাকে যে সমর্থন দিয়েছে তা অতীব দুর্বল ও অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং গান্ধীজী যে দাবি জানিয়েছেন যে আমরা বিশ্বের জনমতের কাছ থেকে পূর্ণতম সহযোগিতা পেয়েছি, এর পরিপ্রেক্ষিতে তা কি বিস্ময়কর নয়? সর্বাঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশ্বের এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারকামী এক নিরস্ত্র জাতির তুলনা চলে একমাত্র দুর্বল ও অসহায় রমণীর সঙ্গে প্রচণ্ড বিরূপতার মধ্যেও যিনি দুর্বৃত্তের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। কল্পনা করুন যে এই রমণীটিকে হৃদয়হীন দুর্বৃত্ত বার বার লাঠির আঘাত করছে। এতে কি যে-কোন মানুষের রক্ত ক্রোধে টগবগ করে ফুটে উঠবে না? তবুও কি ভারতের প্রতি যে

আচরণ করা হয়েছিল তার কারণ পৃথিবীতে কোথাও এ রাজনৈতিক ক্রোধের নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে? আর এই নৈতিক ক্রোধের অনুপস্থিতি কি পৃথিবীর অসম বিকশিত মানবতা বোধের পরিচায়ক নয়? একথা যদি স্বীকার করে নিই তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে অহিংসার অস্ত্র কি এমন একটা বিশ্বে কার্যকরী হতে পারে যা এই রকম মানবতার ভাবনা বিবর্জিত? গান্ধীজী কেন এই সত্যটা দেখতে পাচ্ছেন না যে সত্য ও অহিংসার সাফল্যের জন্য যে নৈতিক উষ্মার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, নিরস্ত্র ভারতবর্ষের রক্তপাত ঘটতে দেখেও বিশ্বের তা হয়নি।"

আমি যদি কোথাও একথা বলে থাকি যে ভারতবর্ষ বিশ্বের জনমতের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে তাহলে অসতর্ক অতিরঞ্জন হিসাবে আমার সে কথা বাতিল করা উচিত। আমি এরকম বিবৃতি দিয়ে থাকলে আমাকে সেটি দেখাতে অনুরোধ করছি। এ জাতীয় কোন কথা বলেছি বলে আমার তো মনে পড়ছে না।

ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধরত নিরস্ত্র ভারতের সঙ্গে দুর্বৃত্তের করুণা-নির্ভর অসহায় রমণীর তুলনা করে পত্রলেখক নারীদের শক্তি ও অহিংসা—উভয়ের প্রতিই অবিচার করেছেন। অন্ধ স্বার্থপরতা চালিত হয়ে পুরুষ যদি নারীসমাজের আত্মাকে চূর্ণবিচূর্ণ না করত এবং নারীরাও যদি "ভোগের" কাছে নতিস্বীকার না করত তাহলে তাঁরা বিশ্বকে তাঁদের ভিতর সুপ্ত অসীম শক্তির পরিচয় দিতে পারতেন। বিগত সংগ্রামের সময় নারী যা দেখিয়েছে তা তার শক্তির এক ভগ্নাংশ অপূর্ণ দর্শন মাত্র। নারী যখন পুরুষের সমান অধিকার পাবে এবং নিজ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করতে সমর্থ হবে তখন বিশ্ব বিস্মিত গৌরবে নারীশক্তির পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করবে।

আর একথা বলাও ভুল যে যিনি অহিংসার অস্ত্রে সজ্জিত তিনি দুর্বল। পত্রলেখক স্পষ্টতঃ অহিংসার যথার্থ প্রয়োগ ও অমিত শক্তির ক্ষেত্রে অপরিচিত। বড় বেশী হলে তিনি যান্ত্রিকভাবে এবং শ্রেয়তর কোন অস্ত্র না পাওয়ার কারণই একে ব্যবহার করেছেন। তিনি যদি অহিংসার ভাবনায় ওতপ্রোত হতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে দুর্ধর্ষ মানুষকে তো বটেই এমন কি সর্বাপেক্ষা বন্য পশুকেও এর দ্বারা বশ করা যায়।

সুতরাং গত বৎসরের ঘটনাবলীতে যদি বিশ্ববাসীর রক্ত টগবগ করে ফুটে

না উঠে থাকে তবে তার কারণ এ নয় যে পৃথিবীর লোক পশুপ্রকৃতির বা হৃদয়হীন। এর কারণ হল এই যে আমাদের অহিংসা ব্যাপক হলেও এবং যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তার উপযুক্ত হলেও তা শক্তিশালী ও জ্ঞানীর অহিংসা ছিল না। জীবন্ত বিশ্বাস থেকে এর উদ্‌গম হয়নি। এটা ছিল একটা কর্মকৌশল, লক্ষ্য সিদ্ধির সাময়িক উপায় মাত্র। আমরা প্রতিশোধ না নিলেও অন্তরে ক্রোধ পোষণ করেছি। আমাদের বক্তৃতা হিংসার সম্পর্করহিত ছিল না এবং আমাদের চিন্তায় তো হিংসার আরও প্রাধান্য ছিল। শৃঙ্খলাধীন ছিলাম বলে আমরা সাধারণতঃ হিংসাচরণ করিনি। এই সীমিত অহিংসার নিদর্শন দৃষ্টেই পৃথিবী চমৎকৃত হয়েছিল এবং কোন প্রচার ব্যতিরেকেই আমাদের যোগ্যতা ও প্রয়োজনানুযায়ী সমর্থন ও সহানুভূতি দিয়েছিল। বাকীটা ত্রৈরাশিক নিয়মের ব্যাপার। সাম্প্রতিক সংগ্রামের সময় সীমিত ও যান্ত্রিক অহিংসা-চরণের দ্বারা আমরা যদি ঐ পরিমাণ সমর্থন পেয়ে থাকি তাহলে অহিংস আদর্শের শীর্ষদেশে উঠতে পারলে আমরা আরও কত সমর্থন পাব? তাহলে নিশ্চয় বিশ্ববাসীর রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠবে। আমি জানি যে এখনও আমরা ঈশ্বরের করুণাসম্ভব সেই ঘটনা থেকে অনেক দূরে। কানপুর, কাশী ও মির্জাপুরে আমাদের দুর্বলতার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আমরা অহিংসায় ওতপ্রোত হলে সরকারী যন্ত্রের সঙ্গে লড়াই-এর সময় অহিংস ও আমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদের সময় হিংস হব না। অহিংসায় জীবন্ত বিশ্বাস থাকলে দিনে দিনে এর বিকাশ হতে হতে সমগ্র বিশ্ব এতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এইটাই হবে সব চেয়ে শক্তিশালী প্রচারকার্য যা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। আমি এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে বেঁচে আছি যে আমরা সেই প্রাণবন্ত অহিংসার পরিচয় দেব।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-৫-১৯৩১

॥ ৫৫ ॥

কংগ্রেসের ভিতর গুণ্ডাবাজি

কংগ্রেস এক বিপুলায়তন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গত বারো মাসে কংগ্রেস উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছে। বিধিবদ্ধভাবে কংগ্রেসের সদস্য-তালিকাভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ এর উপর কর্তৃত্ব করেছে এবং এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইতিপূর্বের তুলনায় বিপুল পরিমাণ গুণ্ডামিও কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছে। এটা অপরিহার্য ছিল। লড়াই-এর শেষ পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক বাছাই করার সাধারণ নিয়মকানুন একরকম মুলতবী রাখা হয়। এর পরিণামে কোন কোন জায়গায় গুণ্ডাবাজির অস্তিত্ব অনুভব করা গেছে। কোথাও কোথাও কংগ্রেস কর্মীদের ধমকানো হয়েছে যে চাহিদানুরূপ টাকা না দিলে তাঁদের বিপদ ঘটবে। অবশ্য পেশাদার গুণ্ডারাও হয়ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাদের পেশা চালিয়ে থাকতে পারে।

যে ব্যাপক গণ-জাগরণ ঘটেছিল তার তুলনায় আমি যে ঘটনাগুলির কথা ভাবছি তাদের সংখ্যা এত অল্প যে এতে বিস্মিত হতে হয়। আমি বিশ্বাস করি যে এই প্রশংসনীয় পরিস্থিতির কারণ হল কংগ্রেসের অহিংসা নীতি, যদিও আমরা একান্ত স্থূলভাবে সেই নীতির অনুসরণ করেছি। তবে গুণ্ডাবাজিরও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। তাই সেই সব ঘটনা থেকে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং যাতে এর আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য।

প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে আমার যে সব পন্থার কথা মনে হচ্ছে স্বভাবতই ও নিঃসন্দেহে সেগুলি অহিংসার বিজ্ঞানসম্মত এবং অধিকতর বুদ্ধিযুক্ত ও সুশৃঙ্খল প্রয়োগ। প্রথমতঃ অহিংসায় যে পরিমাণ বিশ্বাসের নিদর্শন আমরা দেখিয়েছি তার থেকেও দৃঢ়তর বিশ্বাস যদি আমাদের থাকত তাহলে স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করার যে নিয়মকানুন আছে তার বিরোধী একজন পুরুষ বা নারীকেও আমরা আমাদের মধ্যে গ্রহণ করতাম না। একথা বললে চলবে না যে তাহলে শেষ পর্যায়ের আন্দোলনের জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবকও পাওয়া যেত না এবং তাই আমাদের একেবারেই ব্যর্থ হতে হত। আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বিপরীত শিক্ষাই দেয়। এমন কি একজন সত্যাগ্রহী দিয়েও অহিংস যুদ্ধ চালানো

যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অসত্যাগ্রহী দিয়েও অহিংস যুদ্ধ চালানো যায় না। আর অহিংসা থেকে এক চুল সরে গিয়ে সন্দেহজনক সাফল্য অর্জন করার চেয়ে আমি বরং অবিকৃত অহিংসার শরণ নিয়ে শোচনীয় পরাজয়ও কাম্য মনে করব। অহিংসার ব্যাপারে আপস-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ না করলে শেষ অবধি সর্বনাশ ছাড়া আমি আর কিছু চোখে দেখছি না। কারণ সংকট-মুহূর্তে অহিংসার মানদণ্ডে মাপলে দেখা যাবে যে আমাদের ভিতর অপূর্ণতা রয়েছে এবং তাই অকস্মাৎ যখন বিশৃঙ্খলার শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে আগুয়ান হবে তখন দেখা যাবে যে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমরা শোচনীয়ভাবে অপ্রস্তুত।

কিন্তু নির্বিচারে স্বেচ্ছাসেবক নেবার মত ভুল করার পর কি করে অহিংস পন্থায় এর সংশোধন করা যায়? অহিংসার অর্থ হল অতীব উচ্চগ্রামের সাহস এবং সেই কারণে নিগ্রহবরণের প্রস্তুতি, তাই কয়েকটি মূল্যবান জীবন গেলেও তর্জন-গর্জন প্রতারণা ও তার চেয়েও খারাপ কোন কিছুর কাছে নতিস্বীকার করা চলবে না। শাসানি দিয়ে যারা চিঠি লেখে তাদের একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাদের শাসানিতে কর্ণপাত করা হবে না। তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যাধির কারণ আবিষ্কার করে তার যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে। এমন কি গুণ্ডারাও আমাদেরই অংশ এবং তাই সৌম্যভাবে ও সহানুভূতি সহকারে তাদের ব্যাধির চিকিৎসা করতে হবে। মানুষ গুণ্ডামি ভালবাসে বলে সচরাচর তার শরণ নেয় না। সমাজদেহের গভীরতর রোগের নিদর্শন এ। সরকারী গুণ্ডাবাজির ক্ষেত্রে আমরা যে বিধান প্রয়োগ করি আভ্যন্তরীণ গুণ্ডামির ক্ষেত্রেও সেই রকম করতে হবে। আর সেই অতীব সুসংগঠিত গুণ্ডাবাজির সঙ্গে অহিংস পন্থায় লড়াই করার ক্ষমতা আছে বলে আমাদের যদি মনে হয়ে থাকে, তাহলে সেই একই পন্থায় আভ্যন্তরীণ গুণ্ডাবাজির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি আমাদের আরও কত বেশী সেই বোধ কেন আমাদের ভিতর জাগবে না?

সন্ধির সময় অপর যে কোন নাগরিকের মত কংগ্রেস কর্মীদের পুলিসের সাহায্য নেবার অধিকার থাকলেও একথা স্পষ্ট যে এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আমাদের পুলিসের সহায়তা নেওয়া চলে না। আমি যে পন্থার কথা বলতে চাই তা হল সংস্কার সাধন, হৃদয় পরিবর্তন ও প্রেমের পথ। পুলিসের সহায়তা নেওয়ার তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বৈরীভাব না হলেও শাস্তি দেওয়া, ভয় দেখানো ও ভালবাসার অভাবের পথ। সুতরাং উভয় পন্থা একযোগে চলতে পারে না।

সংস্কারের পথ কোন না কোন পর্যায়ে দুরূহ বলে মনে হলেও আসলে এইটাই সর্বাপেক্ষা সহজ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-৫-১৯৩১

॥ ৫৬ ॥

নম্রতা শিক্ষার মাধ্যম

সত্যাগ্রহের একটা মূলনীতি হল এই যে সত্যাগ্রহী যে অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করতে চান সত্যাগ্রহীর শরীর ও ভৌতিক সম্পত্তির উপর তার কর্তৃত্ব চললেও তাঁর আত্মার উপর কারও নিয়ন্ত্রণ চলে না। সত্যাগ্রহীর দেহ বন্দী হলেও তাঁর আত্মা অবিজিত ও অজেয় থাকতে পারে। এই মৌলিক সত্যের জ্ঞান থেকেই সমগ্র সত্যাগ্রহ বিজ্ঞানের জন্ম। সত্যাগ্রহের শুদ্ধতম রূপের রূপায়ণের জন্য যানবাহন, পথখরচ অথবা হিজরতের প্রয়োজন ঘটে না। আর হিজরৎ যদি করতেই হয় তবে তা করা হবে পদব্রজে। হিজরৎকারীদের অদৃষ্টে যত কষ্টই লেখা থাক না কেন তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং সে প্রয়াস ব্যর্থ হলেও হাসিমুখে তা বরদাস্ত করতে হবে। এই রকম "কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করার" দৃষ্টিভঙ্গী যখন আমরা গড়ে তুলব তখন আমরা বহুবিধ ঝামেলা ও ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই পাব এবং স্বাধীনতা তখন আমাদের নাগালের মধ্যে আসবে। আর একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে এই জাতীয় "কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করার" দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত ব্যক্তিরা চিরকাল অনশনে থাকবেন। যে ঈশ্বর পিপীলিকার জন্য তার এক কণা খাদ্য ও হস্তির জন্য তার বিপুল পরিমাণ আহার্যের ব্যবস্থা করেন এই রকম মানুষের নিত্যকার খোরাকের বন্দোবস্ত করতেও তিনি ভুলবেন না। প্রকৃতির জীবেরা পরের দিনের খোরাকের জন্য চিন্তা করে না, রোজকার আহার্য পাবার জন্য তারা পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করে। একমাত্র মানুষই তার অলীক দম্ভ ও অহমিকার জন্য নিজেকে সমগ্র বসুন্ধরার প্রভু ও মালিক মনে করে এবং নিজের জন্য এমন সব জিনিস জমিয়ে চলে যা শীঘ্রই বিনষ্ট হবে। প্রতিনিয়ত কঠিন আঘাত দিয়ে প্রকৃতি তার দম্ভ দূর করার চেষ্টা করে; মানুষ কিন্তু নিজের দম্ভ পরিহার করে না। সত্যাগ্রহ মানুষকে নম্রতার পাঠ শেখানোর একটা নির্দিষ্ট মাধ্যম।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৫-১৯৩১

সপ্তম খণ্ড ঃ দেশীয় রাজ্যের সত্যাগ্রহ*

॥ ৫৭ ॥

রাজকোট সত্যাগ্রহ

আমার মনে হয় নির্বিচারে সব কাথিয়াওয়াড়ীদের যোগ দিতে দিয়ে রাজকোট সত্যাগ্রহের ব্যাপারে প্রারম্ভিক ভুল করা হয়েছিল। এর ফলে আন্দোলন কতকাংশে দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে আমরা সংখ্যাশক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করলাম, অথচ সত্যাগ্রহীর একমেব বিশ্বাস নির্বলের বল ঈশ্বরের উপর। সত্যাগ্রহী সর্বদা নিজের মনে এই কথা জপ করেন, "যাঁর নামে সত্যাগ্রহ শুরু করা হয়েছে এর সাফল্যের ভারও তাঁর উপর।" রাজকোটের জনসাধারণ এইভাবে ভাবিত হলে বড় বড় শোভাযাত্রা বা গণবিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রলোভনে আমরা পড়তাম না এবং সম্ভবতঃ তাহলে রাজকোটে যে ধরনের নৃশংস ঘটনাবলী ঘটেছিল তা ঘটত না। যথার্থ সত্যাগ্রহী বিরোধী পক্ষকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে না। তাঁর কার্যকলাপের ফলে কদাচ "শত্রুর" মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় না। সত্যাগ্রহের নীতি কঠোরভাবে কার্যকরী করে যদি রাজকোটে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা কয়েক শত বা এমন কি গুটিকয়েক যথার্থ সত্যাগ্রহীতে সীমাবদ্ধ করা যেত এবং তাঁরা যদি তাঁদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত

* রাজকোট কাথিয়াওয়াড়ের একটি দেশীয় রাজ্য এবং এর শাসক একজন দেশীয় নৃপতি। ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের মত রাজকোটের জনসাধারণ শাসন সংস্কারের দাবি করেছিল। কিন্তু সেই দাবির ফলে তাঁদের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সহায়তাপুষ্ট দমননীতির সম্মুখীন হতে হয়। গান্ধীজীর বাল্যকাল রাজকোটে কাটে এবং সেখানকার শাসকের সঙ্গে তাঁর বহু ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তিনি তাই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করার জন্য—বিশেষ করে রাজা জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন তা যাতে পালন করেন দেখার জন্য সেখানে গেলেন। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য গান্ধীজী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজকোটে অনশন করেন এবং বড়লাটের কাছে আবেদন জানান। তিনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে মধ্যস্থতা করেন। বড়লাটের সালিশীর রায় গান্ধীজীর পক্ষে যায়। কিন্তু গান্ধীজীর মনে হয় যে তার পূর্বোক্ত অনশনের মধ্যে কিছুটা চাপ দেবার মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল এবং তাই তিনি সালিশীর সুবিধা নিতে অস্বীকার করেন।—সম্পাদক।

যথাযথভাবে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতেন তাহলে তাঁরা বীরোচিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন।

হরিজন, ২০-৫-১৯৩৯

॥ ৫৮ ॥

রাজকোটের সালিশীর রায় সম্বন্ধে

[রাজকোটের বিবাদের ব্যাপারে গান্ধীজী অনশন করেছিলেন এবং তার ফলে গান্ধীজীর আবেদনক্রমে বড়লাটকে হস্তক্ষেপ করতে হয় ও তিনি সালিশী হিসাবে তাঁর রায় দেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর নিজের এই কাজকে যথার্থ সত্যাগ্রহীর অনুপযুক্ত মনে করেন এবং নিম্নোক্ত ভাষায় এর জন্য অনুতাপ করেন।]

সালিশীর এই রায় হাতে পেয়ে মনে হচ্ছে আমি ভীরু হয়ে পড়েছি এবং আমার ভয় হচ্ছে যে এই রায়ের বয়ান যদি নিজের কাছে রাখি তাহলে আপনারাও ভীরু হয়ে পড়বেন। সত্যাগ্রহী তাঁর শক্তির জন্য বাহ্য উপায়ের উপর নির্ভর করেন না। তাঁর শক্তি আসে অন্তর থেকে—তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা থেকে। সব পার্থিব অস্ত্র-শস্ত্র বর্জন করার পর ঈশ্বরই হন তাঁর ধর্মস্বরূপ। কিন্তু তিনি যদি গোপনে তাঁর পকেটে একটি আগ্নেয়াস্ত্র রাখেন তাহলে তাঁর অন্তরের শক্তি লুপ্ত হবে এবং আর তিনি নিজেকে অজেয় মনে করবেন না। সালিশীর এই রায় আমার মত অহিংসায় বিশ্বাসীর পক্ষে পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার মত। এটা আমার এবং আমার ঈশ্বরের মধ্যে থেকে বাধা সৃষ্টি করছে। এটা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয় এবং এর ফলে আমি ভীরুতে পর্যবসিত হয়েছি। সৎ খ্রীষ্টান যেমন তার পাপের বোঝা ফেলে দেন আমি তেমনি সালিশীর এই রায় বর্জন করেছি এবং তাই আবার আমার নিজেকে স্বাধীন অজেয় ও আমার স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম মনে হচ্ছে।

হরিজন, ৩-৬-১৯৩৯

॥ ৫৯ ॥

বিশ্বজনীন সত্যাগ্রহ

হবু সত্যাগ্রহীদের যোগ্যতার মানদণ্ড সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহে কঠোর হয়েছি। আমার এই কঠোরতার ফলে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা যদি অনুল্লেখযোগ্যতে পর্যবসিত হয় তাও আমি দুশ্চিন্তা করব না। সত্যাগ্রহ যদি এক বিশ্বজনীন নীতির বিশ্বজনীন প্রয়োগ হয় তাহলে মুষ্টিমেয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাধ্যমে কার্যকরী কর্মপদ্ধতি আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। আর আমি যখন একথা বলি যে আমি নূতন আলোকের শুধু অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছি তার অর্থ হল এই যে মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহী কিভাবে কার্যকরীভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে তার সুনিশ্চিত পন্থা আমি এখনও খুঁজে পাইনি। আমার সমগ্র জীবনে বার বার দেখেছি যে প্রথম পদক্ষেপের পরই আমি দ্বিতীয়বার কোথায় পা রাখতে হবে জানতে পেরেছি। এক্ষেত্রেও তেমনি হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে কাজের সময় এলে এর পরিকল্পনা তৈরী পাওয়া যাবে।

...অপর সব পন্থা ব্যর্থ হবার পূর্বে চরম পন্থা গ্রহণ করা সত্যাগ্রহের নীতি-বিরুদ্ধ। এরকম মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ততা স্বয়ং হিংসার পরিচায়ক।

একথা বলার হয়ত কিছুটা যুক্তি আছে যে আমি যেসব শর্তের কথা বলেছি সেগুলি পালনের উপর যদি জোর দিতে হয় তাহলে অহিংস আইন অমান্য করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এ আপত্তি কি যুক্তিসঙ্গত? যে কোন বিধানের সঙ্গে তাকে কার্যকরী করার প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। সত্যাগ্রহ এর ব্যতিক্রম নয়। তবে আমি অন্তর থেকে অনুভব করছি যে বর্তমানের দুঃসহ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সত্যাগ্রহের কোন সক্রিয় রূপের শরণ নিতে হবে এবং এই রূপকে যে অহিংস আইন অমান্য হতেই হবে তার কোন অর্থ নেই। ভারত এক দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয় কার্যকরী অহিংস কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে আর নচেৎ দেশ হিংসা ও অরাজকতায় ভরে যাবে।

হরিজন, ২৪-৬-১৯৩৯

অষ্টম খণ্ড ঃ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ*

॥ ৬০ ॥

চাপ দেওয়া হচ্ছে না

এ সপ্তাহে বাঙলা দেশের একটি বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বললেন যে তাঁর প্রদেশ লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও বিশেষ করে আমি তাঁদের চেপে রাখছি এবং এর ফলে জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এ অভিযোগ গুরুতর। ওয়ার্কিং কমিটির জন্য আমার মাথাব্যথা নেই। তবে আমি যতদূর জানি কোন প্রদেশ বা ব্যক্তিকে ওয়ার্কিং কমিটি

---

*ভারতবর্ষের পরামর্শ না নিয়েই ইংলণ্ড ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত করায় দেশের জনমত ক্ষুব্ধ হল। বিশেষ করে ক্রুদ্ধ হল এই জন্য যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে ইচ্ছুক ছিল না। সেইজন্য দেশবাসী মনে করল যে, সে যুদ্ধ চলছিল শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতর জন্য নয়। জনসাধারণই তাই সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস আইন অমান্য আরম্ভ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। গান্ধীজী তাঁদের সংযত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন, কারণ ইংরেজ সরকার যখন এক বিপদের সম্মুখীন তখন তাঁর মতে তাঁদের বিব্রত করা অনুচিত। এছাড়া তিনি মনে করছিলেন যে সেই সময় ভারতবর্ষের জনসাধারণও যথেষ্ট পরিমাণে অহিংস হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পুরো একটি বছর এইভাবে সংযত হয়ে থাকার পর যখন মনে হল যে জনসাধারণের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, তিনি বাক্ স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের অনুমতি দিলেন। চরিত্র, জনসেবা ও আইন অমান্যের ব্যাপারে অহিংসার কার্যকারিতায় বিশ্বাসের গভীরতা বিচার করে তিনি নিজে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করার জন্য কর্মী বাছাই করলেন এবং এঁরা যুদ্ধের প্রচার করে কারাবরণ করতে লাগলেন। ১৯৪০ ও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই জাতীয় সীমিত সত্যাগ্রহ চলল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার জন্য "ক্রিপস মিশন" পাঠাল। কিন্তু ক্রিপসের প্রয়াসও ব্যর্থ হওয়ায় গান্ধীজী "ভারত ছাড়" ধ্বনি তুললেন এর পরিণামে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা কারারুদ্ধ হলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হরিজন পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে তাঁর অনুগামী'দর নির্দেশ দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজীকে আবার হরিজন পত্রিকা প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়।—সম্পাদক

এযাবৎ চেপে রাখেনি। তবে সত্যাগ্রহের একমেব বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি এই কথা বলতে পারি যে কখনও আমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চেপে রাখিনি। সত্যাগ্রহে এভাবে চেপে রাখার স্থান নেই। এইভাবে অজ্ঞতার কারণ যদিও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে আমি রাজকোটের জনসাধারণকে চেপে রেখেছি আসলে কিন্তু আমি কখনও তাঁদের চেপে রাখিনি। আজকের মত অতীতেও তাঁরা অহিংসভাবে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন করতে পারতেন। বিশ্বাসের গভীরতা থাকলে এমন কি একজন ব্যক্তিও এটা করতে পারেন। তাঁর অন্যায় হয়ে থাকলে ক্ষতি হবে কেবল তাঁরই, তাঁর বিরোধীর নয়। এইজন্য সত্যাগ্রহকে আমি সব চেয়ে নির্দোষ এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিকারের মাধ্যম আখ্যা দিয়েছি।

রাজকোটের ক্ষেত্রে আমি যা করেছিলাম তা হল এই যে সেখানকার সত্যাগ্রহীরা আমাকে যে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন তার প্রয়োগ করে আমি অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন মুলতবী করেছিলাম। আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করার অধিকার তাঁদের ছিল। তবে তা হলে ব্যাপারটা তাঁদের পক্ষে সম্মানজনক হত না কারণ তাঁরাই আমাকে নেতৃত্বপদে বরণ করেছিলেন। তবে যাই হোক এই করেও যদি তাঁরা রাজকোটে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করার অধিকার অর্জন করতেন তাহলে তাঁরা আমার কাছ থেকে অভিনন্দনই পেতেন।

কোন কোন পাঠকের হয়ত মনে পড়বে ওয়ার্কিং কমিটি চিরলা পারলায় অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার সম্মতি দেননি। তবে একথাও বলেছিলেন যে চিরলা পারলার জনসাধারণ স্বীয় দায়িত্বে এ আন্দোলন শুরু করতে পারেন। অনুরূপভাবে বাঙলা দেশ বা অপর যে কোন প্রদেশে নিজ উদ্যোগ ও দায়িত্বে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করতে পারে। যা তাঁরা পেতে পারেন না তা হল আমার অনুমোদন বা সমর্থন। আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যদি ওয়ার্কিং কমিটির কর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় অগ্রাহ্য করেন তাহলে আরও যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গতভাবে যথাভিরুচি চলতে পারেন। তাঁদের প্রয়াস যদি সফল হয় তাহলে তাঁরা পূর্ণমাত্রায় গৌরব অর্জন করবেন এবং বর্তমান নের্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করতে পারবেন। সফল অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন চালাবার শর্ত আমি ইতিপূর্বেই দিয়েছি। কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যদি মনে করেন যে মুসলমান জনগণ কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন এবং তাঁদের যদি মনে হয়

যে হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, তাঁদের যদি এই বিশ্বাস জন্মে থাকে যে অহিংসা বা চরখা কোনটাই আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় নয় বা তাঁরা যদি মনে করেন যে চরখার সঙ্গে অহিংসার কোন সম্বন্ধ নেই এবং তারপরও যদি না তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাহলে তাঁরা নিজেদের ও দেশের কাছে অবিশ্বাসভাজন হবেন। আমি যে কথা বলেছি তা সবগুলি প্রদেশ ও ভারতবর্ষের যে কোন এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ সত্যাগ্রহী হিসাবে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করার অধিকার আমাকে দিতে হবে এবং তা হল এই যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে ও সত্যাগ্রহের যাবতীয় শর্ত না মেনে যিনিই অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করুন না কেন তিনিই যে আদর্শের সেবা করার কথা তিনি ভাবছেন তার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করবেন।

হরিজন, ২০-১-১৯৭০

॥ ৬১ ॥

গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা

বহু কংগ্রেসকর্মী অহিংসা নিয়ে খেলা করছেন। যে কোনভাবে অহিংস আইন অমান্য অর্থাৎ কারাগার ভরে ফেলার কথা তাঁরা চিন্তা করছেন। অহিংস আইন অমান্য যে মহান শক্তি এটা তার একটা শিশুসুলভ ব্যাখ্যা। শুনতে ভাল না লাগলেও আমাকে বার বার একথা বলতে হবে যে সৎ গঠনমূলক প্রয়াসের সহায়তা ও অন্যায়কারীর প্রতি হৃদয়ে শুভেচ্ছা না থাকলে কেবল জেলে যাওয়া হিংসার নিদর্শন এবং তাই সত্যাগ্রহে নিষিদ্ধ। মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভা যত অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে তার সম্মিলিত শক্তির থেকেও অহিংসার শক্তি অনেক বেশী বলবান। সুতরাং অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে অহিংসা নির্ণায়ক তত্ত্ব। লোকে বলেন যে জনসাধারণ রাতা-রাতি অহিংস হতে পারেন না। কখনও আমি বলিনি যে তা হয়। তবে একথা আমি বলেছি যে ইচ্ছা থাকলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের দ্বারা এটা সম্ভবপর। যাঁরা অহিংস আইন অমান্য করবেন তাঁদের সক্রিয়ভাবে অহিংস হতে হবে। আর যাঁরা এর জন্য নির্বাচিত হবেন তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য

জনসাধারণের জোরাল ইচ্ছা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকাই যথেষ্ট। কংগ্রেস কর্তৃক নির্দেশিত গঠনমূলক কার্যক্রম এর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। সুতরাং যাঁরা চান যে ভারতবর্ষ অহিংসার মাধ্যমে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হোক তাঁরা নিজেদের উদ্যমের প্রতিটি কণা, অহিংস সত্যাগ্রহ করার কথা না ভেবে সততা সহকারে গঠনমূলক কাজ করার জন্য নিয়োগ করবেন।

হরিজন, ১-৬-১৯৪০

॥ ৬২ ॥

সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়া

সংবাদপত্রে আপনারা হয়ত আমার দেওয়া এই বিজ্ঞপ্তি দেখেছেন যে ইংরাজী 'হরিজন' ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর দুই ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশন মুলতবী রাখা হয়েছে।···আপনাদের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে বার্তালাপের যে সুযোগ পেতাম তা আমি অতঃপর হারাব এবং আমার মনে হয় আপনাদের কাছেও এটা একটা লোকসান বলে বিবেচিত হবে। এই বার্তালাপের মূল্য হল এই যে এগুলি আমার গভীরতম চিন্তার যথার্থ বিবরণ। বিকৃত পরিবেশে চিন্তার এজাতীয় অভিব্যক্তি অসম্ভব। এখন যেহেতু আমি এ নিয়ে অহিংস আইন অমান্য করতে চাই না তাই আমার পক্ষে অবাধে লেখা অসম্ভব। আর সত্যাগ্রহের জনক হিসাবে আমার উক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে কেবল গঠনমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি সরকার অনুমোদিত বিষয় সম্বন্ধে লেখার সুযোগ পাবার জন্য আমার চিন্তাধারার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের আমি কণ্ঠরোধ করতে পারি না। ব্যাপারটা তাহলে হবে মাথা বাদ দিয়ে ধড়ের পরিচর্যা করার মত। আমার কাছে যাবতীয় গঠনমূলক কার্যক্রম অহিংসার একটা অভিব্যক্তি। তাই যদি অহিংসা প্রচার করার সুযোগ না পাই তাহলে আমাকে নিজেকেই অস্বীকার করতে হবে। কারণ সাম্প্রতিক অর্ডিন্যান্স মেনে নেবার অর্থ তা-ই হয়। সুতরাং স্বাধীন চিন্তাধারার কণ্ঠরোধ করার নির্দেশ যতদিন জারী থাকবে পত্রিকাগুলির প্রকাশন ততদিন মুলতবী রাখা হবে। এটা হল কণ্ঠরোধকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহীর শ্রদ্ধাযুক্ত প্রতিবাদ। সত্যাগ্রহের তাৎপর্য কি এই নয় যে অন্যায়কারী যখন এক ইঞ্চি চাইবে তখন

তাকে এক গজ দিয়ে দেওয়া, কেবল জামাটি চাইলে তার সঙ্গে উত্তরীয়টিও দিয়ে দেওয়া? প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রচলিত প্রক্রিয়াকে এইভাবে পাল্টে দেওয়া কেন? প্রচলিত প্রক্রিয়া হিংসার উপর আধারিত। আমার জীবন যদি শেষ অবধি হিংসানিয়ন্ত্রিত হত তাহলে আমি এই কারণে এক ইঞ্চিও দিতে অস্বীকার করতাম যে হয়ত তার পরিণামে পরে এক গজ চাওয়া হবে। অপর কিছু করলে তা আমার মূর্খতার পরিচায়ক হত। কিন্তু আমার জীবন যদি অহিংসানিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আমার কাছে এক ইঞ্চি চাইলে আমি কেবল এক গজ দিতে প্রস্তুতই থাকব না—দেবও। এটা করে জবরদখলকারীর মনে আমি একটা বিচিত্র এবং সম্ভবতঃ মধুর অনুভূতির সৃষ্টি করি। এছাড়া এ জাতীয় পদক্ষেপে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন এবং আমাকে নিয়ে যে কি করতে হবে বুঝে উঠতে পারবেন না।…

…কণ্ঠরোধকারী অর্ডিনান্সটি যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের কাছে আমি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করলাম তা আপনাদের অর্থাৎ আমার পাঠকদের কাছে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে একটি প্রত্যক্ষ পাঠস্বরূপ। নিজ জীবনে আপনারা যদি নীরবে এই পাঠের তাৎপর্যকে কার্যকরী করেন তাহলে প্রতি সপ্তাহে "হরিজন" পত্রিকার রচনাসমূহের মারফৎ যে সহায়তা পেতেন তার আর দরকার হবে না। প্রতি সপ্তাহে "হরিজন" না পেলেও আপনারা জানতে পারবেন যে এক ইঞ্চি চাইলে এক গজ দেবার নীতির পূর্ণ তাৎপর্যকে কিভাবে আমি কার্যান্বিত করব। জনৈক পত্রলেখক দাবি করেছেন যে, কোন অবস্থাতেই আমার "হরিজন" পত্রিকাগুলির প্রকাশন বন্ধ রাখা উচিত নয়। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে এর থেকে প্রতি সপ্তাহে তিনি যে খোরাক পান তার সহায়তায় তাঁর অহিংসা বেঁচে আছে। তিনি যা বলছেন তা-ই যদি হয়ে থাকে তাহলে তাঁর স্বতঃআরোপিত সংযম তাঁকে নীরস ও নির্জীব সাপ্তাহিক "হরিজন" পত্রিকার থেকে অনেক বেশী শিক্ষা দেবে।

হরিজন, ১০-১১-১৯৪০

নবম খণ্ড ঃ বিবিধ

॥ ৬৩ ॥

শিশুদের সঙ্গে সত্যাগ্রহ

[আশ্রমের শিশুদের আচরণের ত্রুটির জন্য গান্ধীজী সাত দিন অনশন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলি লেখেন।]

ছেলেদের মধ্যে এবং কতকাংশে মেয়েদের মধ্যেও আমি ত্রুটি আবিষ্কার করলাম। আমি জানি যে আমি যে ত্রুটির কথা বলছি কদাচিৎ কোন বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান তার থেকে মুক্ত। যেসব ভুল-ত্রুটি জাতির মনুষ্যত্ব ধ্বংস করছে এবং যুবকদলের চরিত্রভ্রষ্ট করছে তার প্রভাব থেকে আশ্রম মুক্ত থাকুক এটা আমি দেখতে চাই। ছেলেদের শাস্তি দেওয়া সমীচীন নয়। আমার অধীনে যে দুটি বিদ্যালয় চালিয়েছি তার থেকে অভিজ্ঞতা হয়েছে যে শাস্তি দিয়ে কারও সংশোধন করা যায় না। এতে বরং শিশুরা আরও কঠোরহৃদয় হয়ে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি এসব ক্ষেত্রে অনশনের শরণ নিয়েছি এবং আমার মতে এতে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। এদেশেও আমি এই পদ্ধতির শরণ নিয়েছি—তবে অপেক্ষাকৃত মৃদু ধরনের। এই পদ্ধতির ভিত্তি হল পারস্পরিক ভালবাসা। আমি জানি যে ছেলেমেয়েরা আমাকে ভালবাসে। আমি এও জানি যে আমার জীবন দিলেও যদি তাদের নিষ্কলঙ্ক করা যেত তাহলে সানন্দে তা দিতাম। অতএব ছেলেমেয়েদের নিজ দোষ সম্বন্ধে সচেতন করার জন্ত এরকম কোন কিছু আমি করতে পারি নি। এযাবৎ এর যে ফল লক্ষ্য করেছি তা উৎসাহজনক।

তবে যদি ফল না পাই তাহলে কি হবে? আমি তো কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা যেভাবে অনুভব করি তদনুযায়ীই চলতে পারি। ফলাফল তাঁর হাতে। ছোট বড় ব্যাপারের জন্ত এই নিগ্রহ বরণ সত্যাগ্রহের মূলকথা।

কিন্তু শিক্ষকেরা কেন প্রায়শ্চিত্ত করবেন না? আমি যতক্ষণ প্রধান ততক্ষণ তার প্রয়োজন নেই। আমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও উপবাস করলে সব কাজকর্ম

বন্ধ হয়ে যেত। বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তা খাটে। রাজা যেমন প্রজাদের পুণ্যের ভাগ নিজের বলে দাবি করতে পারেন তেমনি তাঁদের পাপের ভাগও নিতে হয়। যদি আমি আশ্রমের অনেক মহান চরিত্র বাসিন্দাদের জন্য গর্ব করি তাহলে অনুরূপভাবে ছোট্ট আশ্রমের ছোট্ট রাজা আমাকেও আশ্রমের সব চেয়ে নগণ্য শিশুটির পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতবর্ষের দীনতম ব্যক্তিটির দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে আমাকে যদি একাত্ম হতে হয় (হায়, ক্ষমতা থাকলে আমি বিশ্বের দীনতম ব্যক্তিটির সঙ্গে একাত্ম হতে চাইতাম!) তাহলে আমি যেন আমার রক্ষণাবেক্ষণাধীন শিশুদের পাপের সঙ্গে একাত্ম হই। আর নম্রতা সহকারে এটা করতে পারলে কোন না কোন দিন আমি সত্যরূপী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন পাব।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১২-১৯২৫

॥ ৬৪ ॥

সত্যাগ্রহ—যথার্থ বনাম মিথ্যা

সত্যাগ্রহের বহু রূপ আছে এবং অবস্থাবিশেষে অনশন সত্যাগ্রহের একটি রূপ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। জনৈক বন্ধু নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন:

"ধরুন কোন মানুষ তার দেনাদারের কাছ থেকে নিজের পাওনা টাকা আদায় করতে চায়। অসহযোগকারী হবার জন্য তিনি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন না এবং ঋণী ব্যক্তি সম্পদের ক্ষমতায় মত্ত হয়ে পাওনাদারের কথায় কর্ণপাত করেন না এবং এমন কি কোন সালিশীতেও রাজী হন না। এই অবস্থায় পাওনাদার যদি ঋণী ব্যক্তির দরজায় ধর্ণা দিয়ে বসে থাকেন তাহলে তা কি সত্যাগ্রহ হবে না? উপবাসকারী পাওনাদার তাঁর উপবাসের দ্বারা কারও ক্ষতিসাধন করেন না। রামচন্দ্রের স্বর্ণযুগ থেকে আমরা এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করছি। কিন্তু শুনলাম আপনি এই পদ্ধতিকে চাপ দেওয়ার নিদর্শন বলে মনে করেন। তা যদি করেন তবে দয়া করে কি তার কারণ ব্যাখ্যা করবেন?"

পত্রলেখককে আমি চিনি। অত্যন্ত শুদ্ধ মনোভাব চালিত হয়ে তিনি পত্র লিখেছেন। তবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে সত্যাগ্রহের ব্যাখ্যায় তাঁর ভুল হয়েছে। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কখনও সত্যাগ্রহ করা চলে না। টাকা আদায় করার জন্য যদি অনশন করাকে প্রোৎসাহিত করা যায় তাহলে বদলোকেদের চাপ দিয়ে নিজ মতলব হাসিল করার পদ্ধতির কোন দিন শেষ হবে না। আমি জানি যে দেশে এরকম বহু লোক আছে। জনাকয়েক অপপ্রয়োগ করে বলে যাঁরা ন্যায়সঙ্গতভাবে উপবাস করেন তাঁদের নিন্দা করা উচিত নয়—এই যুক্তি পেশ করা সঙ্গত নয়। উপবাস অর্থাৎ যথার্থ সত্যাগ্রহ ও মিথ্যা সত্যাগ্রহের মধ্যে সকলের নিজের নিজের মত সীমারেখা টানার অধিকার নেই। একজন যাকে যথার্থ সত্যাগ্রহ মনে করছেন খুব সম্ভব তা অন্য ব্যাপার হতে পারে। অতএব ব্যক্তিগত লাভের জন্য সত্যাগ্রহ করা চলতে পারে না, এর শরণ নেওয়া যেতে পারে একমাত্র অপরের কল্যাণার্থে। সত্যাগ্রহী সর্বদা নিগ্রহ বরণ করতে ও আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবেন। অসহযোগের সূত্রপাতের সময় এই পরিস্থিতির কল্পনা করা হয়েছিল যখন ভাল লোকেরা আদালতের সংস্পর্শ বর্জন করলে অসৎ লোকেরা তার থেকে অন্যায় লাভ করবে। তখন এই কথা ভাবা হয়েছিল যে ঐসব ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যেই অসহযোগের মাধুর্য।

কিন্তু বিরোধীর বিরুদ্ধে অনশন সত্যাগ্রহ চলতে পারে না। অনশন চলে একমাত্র মানুষের প্রিয়জনের বিরুদ্ধে এবং তাও তাঁরই কল্যাণের জন্য।

ভারতবর্ষের মত যে দেশে দয়া বা সহানুভূতির মনোভাবের অপ্রতুলতা নেই সেখানে টাকা উশুল করার জন্য অনশনের সহায়তা নেওয়া একটা উপদ্রব ছাড়া আর কিছু নয়। আমি এমন অনেক লোককে জানি যাঁরা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিছক মিথ্যা সহানুভূতির মনোভাব চালিত হয়ে টাকা দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের মত দেশে সত্যাগ্রহীকে সতর্কভাবে চলতে হবে। এটা সম্ভব যে অনশনের সহায়তায় কেউ কেউ হয়ত তাঁর প্রাপ্য অর্থ আদায় করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু সে জাতীয় ঘটনাকে আমি সত্যাগ্রহের বিজয় বলার বদলে বরং দুরাগ্রহ বা হিংসার জয় আখ্যা দেব। সত্যাগ্রহের জয় হয় সত্যের জন্য মৃত্যুবরণ করলে। সত্যাগ্রহের লক্ষ্যপূর্তির ব্যাপারে সত্যাগ্রহী সর্বদা অসম্পৃক্ত; কিন্তু যিনি নিজের টাকা উশুল করতে চান তিনি এরকম অনাসক্ত হতে পারেন না। আমার মনে তাই কোন সংশয় নেই যে

ব্যক্তিগত লাভের জন্য উপবাস করা ভীতিপ্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয় এবং এটা অজ্ঞতার পরিণাম।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩০-৯-১৯২৬

॥ ৬৫ ॥

শেষ শরণ হিসাবে অনশন

অহিংস ব্যক্তির হাতে শেষ অস্ত্র হল আত্মত্যাগের দ্বারা এমন কি মৃত্যুবরণ করা। এর বেশী মানুষ আর কিছু করতে পারে না। সুতরাং এই সহকর্মীটি এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে ধর্মযুদ্ধ চলছে তাতে আর যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁদের আমি এই কথা বলব যে সেরকম জরুরী আহ্বান এলে তাঁরা যেন সানন্দে "আমৃত্যু অনশন" করতে প্রস্তুত থাকেন। তাঁরা যদি মনে করেন যে গত সেপ্টেম্বর মাসে অযাচিতভাবে হরিজনদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাঁরাও সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ এবং যদি মনে হয় যে সাধারণ প্রয়াস সত্ত্বেও সেই অঙ্গীকার পালন করা সম্ভবপর হচ্ছে না, অহিংস হবার জন্য তাঁরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর কোন্ ভাবে সে উদ্দেশ্য সাধন করবেন?

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে বিপদাপন্ন হয়ে মানুষ যখন প্রতিবিধানের জন্য ঈশ্বরের দ্বারস্থ হয়ে দেখে যে তাঁর হৃদয় কঠিন হয়ে রয়েছে তখন ঈশ্বর কর্ণপাত না করা পর্যন্ত মানুষ 'আমৃত্যু অনশন' করেছে। ঈশ্বরের করুণা হওয়ায় এ জাতীয় উপবাসের পরও যাঁরা জীবিত থেকেছেন শাস্ত্রে তাঁদের কথা লিখিত আছে। কিন্তু বধির ঈশ্বরের কাছ থেকে জবাব পাবার জন্য যাঁরা নীরবে ও বীরত্ব সহকারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের কোন উল্লেখ শাস্ত্রে নেই। আমার মনে কোন সংশয় নেই যে অনেকে এইরকম বীরত্ব সহকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের ঈশ্বরবিশ্বাস বা অহিংসানিষ্ঠা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। আমরা যেভাবে চাই ঈশ্বর সর্বদা সেই ভাবে আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন না। তাঁর কাছে জীবন ও মৃত্যু অভিন্ন এবং কে এই কথা অস্বীকার করতে পারেন যে সহস্র সহস্র অজ্ঞাত বীর ও বীরাঙ্গনার নীরব মৃত্যুর কারণ যা কিছু পবিত্র ও মঙ্গলময় তা এই ধরণীতে টিকে থাকে।

হরিজন, ৪-৩-১৯৩৩

॥ ৬৬ ॥

চাপ দেবার জন্য অনশন

আমার উপবাস সম্বন্ধে যদি 'চাপসৃষ্টিকারী' শব্দটি আইনসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে সেই অর্থে যাবতীয় উপবাসেরই অল্পাধিক পরিমাণে একই পরিণাম—একথা প্রমাণ করা যায়। আসল কথা হচ্ছে এই যে যাবতীয় আধ্যাত্মিক প্রায়োপবেশনই তার প্রভাববলয়ের মধ্যে যাঁরা আসেন তাঁদের সর্বদা প্রভাবিত করে থাকে। সেইজন্য আধ্যাত্মিক অনশনকে "তপঃ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর যাঁদের তরফ থেকে এ অনুষ্ঠিত হয় প্রতিটি "তপঃই" অপরিহার্যভাবে তাঁদের উপর শুদ্ধির প্রভাব বিস্তার করে।

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অনশনের দ্বারা সত্যসত্যই চাপও দেওয়া যায়; এসব উপবাসের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন। কারও কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য অথবা ঐ জাতীয় কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য উপবাস করলে তার পরিণাম হবে চাপ দেওয়া বা অন্যায় প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা। কোন রকম দ্বিধা না করেই আমি এ জাতীয় অন্যায় চাপ দেবার চেষ্টার বিরোধ করার পরামর্শ দেব। আমার বিরুদ্ধে যেসব অনশন করা হয়েছে বা করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমি স্বয়ং সাফল্য সহকারে এ জাতীয় প্রতিরোধ দিয়েছি। আর যদি এই যুক্তি দেওয়া হয় যে স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থ ভাবনার মধ্যে সীমারেখা প্রায়শঃ অত্যন্ত ক্ষীণ তাহলে আমি বলব যে অনশনের উদ্দেশ্য যিনি স্বার্থজড়িত অথবা অন্যপ্রকারে নিম্নমানের মনে করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত উপবাসকারীর মৃত্যু হলেও তিনি দৃঢ়তা সহকারে এর কাছে নতিস্বীকার করতে অস্বীকার করবেন। যে উপবাসের লক্ষ্য হীন বলে জনসাধারণ মনে করেন তাকে অগ্রাহ্য করার স্বভাব যদি জনসাধারণের গড়ে ওঠে তাহলে সেই সব উপবাসের চাপসৃষ্টিকারী ও অন্যায় প্রভাববিস্তারকারী চারিত্রধর্মের অবসান ঘটবে। যাবতীয় মানবীয় বিধি-ব্যবস্থার মত উপবাসও ন্যায়সঙ্গত ও অন্যায় উভয় ভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে। তবে অপপ্রয়োগের আশঙ্কা আছে বলেই সত্যাগ্রহের অস্ত্রশালার এই মহান্ অস্ত্রকে বর্জন করা চলে না। হিংসার কার্যকরী বিকল্প হিসাবে সত্যাগ্রহ পরিকল্পিত হয়েছে। এর এই প্রয়োগ এখনও শৈশবাবস্থায় রয়েছে এবং তাই

এখনও এ পূর্ণ নয়। তবে নম্র সত্যান্বেষীর মনোবৃত্তি চালিত হয়ে সত্যাগ্রহ-রূপী অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছি—আমার এই দাবি নস্যাৎ না করে আধুনিক সত্যাগ্রহের জনক হিসাবে আমি এর বহুবিধ প্রয়োগের কোনটিকেই বর্জন করতে পারি না।

হরিজন, ৬-৫-১৯৩৩

॥ ৬৭ ॥

সত্যাগ্রহে অনশনের স্থান

আজকাল সত্যাগ্রহের নামে অনেক উপবাস করা হয়। এ জাতীয় বহু অনশন অর্থহীন এবং অনেকগুলিকে অশুদ্ধও আখ্যা দেওয়া চলে। অনশন এক অগ্নিগর্ভ অস্ত্র। এর একটা নিজস্ব বিজ্ঞান আছে। আমি যতদূর জানি কারও এ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান নেই। একে নিয়ে অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে তার ফলস্বরূপ যিনি উপবাস করছেন তাঁর তো ক্ষতি হবেই, যে উদ্দেশ্যের জন্য অনশন করা হচ্ছে তাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সুতরাং অনধিকারী কেউ এ অস্ত্রের প্রয়োগ করবেন না। অনশন একমাত্র তিনিই করতে পারেন যাঁর সঙ্গে যাঁর বিরুদ্ধে অনশন করা হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আছে। যে উদ্দেশ্য সাধনে অনশন হচ্ছে তার সঙ্গে যিনি উপবাস করছেন তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকবে। ভগৎ ফুলসিংজীর সাম্প্রতিক অনশন এই জাতীয় ছিল। মোঠ গ্রামের জনসাধারণের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই গ্রামের হরিজনদেরও তিনি সেবা করেছিলেন। সেই গ্রামের অধিবাসীরা হরিজনদের প্রতি অন্যায় করেছিলেন। ন্যায়বিচার পাবার কোন উপায়ই আর যখন দেখা গেল না তখন ফুলসিংজীর মত মানুষের সামনে অনশন করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। তিনি তা করলেন এবং সফলও হলেন। তবে সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর এবং আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।

আমার যাবতীয় প্রকাশ্য উপবাস এই পর্যায়ের। তবে এই সবগুলির মধ্য থেকে সম্ভবতঃ রাজকোটের উপবাস থেকে সর্বাধিক শিক্ষণীয় আছে। অনেকেই ঐ উপবাসকে সরাসরি নিন্দা করেছেন। গোড়ার দিকে এটা ছিল পবিত্র ও প্রয়োজনীয়। বড়লাটকে যখন আমি হস্তক্ষেপ করতে বললাম তখন নিন্দার

কারণ ঘটল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি যদি ঐটুকু না করতাম তাহলে এর পরিণাম চমৎকার হত। তবে যাই হোক পরিণামে যে লক্ষ্যের জন্য অনশন, তার জয় হয়েছিল। মনে হয় যে ঈশ্বর আমার চোখ খুলে দিতে চেয়েছিলেন বলেই যেন আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং রাজকোটের উপবাস সত্যাগ্রহীর পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় অধ্যয়নের বিষয়। উপবাসের যে নীতি আমি নির্ধারণ করেছি তা যদি স্বীকৃত হয় তাহলে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়ে লক্ষ্য করতে হবে তা হল এই যে অনশনকারীর সতর্ক দৃষ্টির অভাবে কিভাবে একটি শুদ্ধ কাজও কলুষিত হয়ে যেতে পারে। শুদ্ধ উপবাসে স্বার্থপরতা ক্রোধ বিশ্বাসের অভাব অথবা অধৈর্যের কোন স্থান নেই। একথা স্বীকার করলে মোটেই অতিরঞ্জন করা হবে না যে আমার রাজকোটের অনশনে এসব দোষই এসে গিয়েছিল। যেহেতু অনশন ত্যাগ করা নির্ভর করছিল পরলোকগত ঠাকুরসাহেব কর্তৃক কয়েকটি শর্ত পূরণ করার উপর, তাই আমার পরিশ্রমের ফল পাবার স্বার্থপরায়ণ ইচ্ছা আমার ভিতর জেগেছিল এবং এইটাই ঐ উপবাসে আমার স্বার্থপর ভূমিকা। আমার ভিতর যদি ক্রোধ না থাকত তাহলে সাহায্যের জন্য আমি বড়লাটের প্রত্যাশী হতাম না। আমার ভিতরকার প্রেমশক্তি আমাকে ওরকম করতে বাধা দিত। কারণ ঠাকুরসাহেব যদি আমার ছেলের মতই হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর সম্বন্ধে কেন আমি তাঁর উপরওয়ালার কাছে অভিযোগ করব? ঠাকুরসাহেব আমার প্রেমদ্বারা দ্রবীভূত হবেন না এই কথা মনে করেই আমি আমার বিশ্বাসের অভাবের পরিচয় দিয়েছি এবং অনশন ভঙ্গ করার জন্য আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। এই সব ত্রুটির ফলে স্বভাবতই আমার উপবাস অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। রাজকোটের অনশনের বহুবিধ সুফল সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক এবং তাই সে কাজ এখানে করছি না। তবে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে উপবাসকারীকে কতখানি সতর্ক ও প্রার্থনাপরায়ণ হতে হবে এবং কিভাবে একটুখানি অসতর্কতার দরুন কোন সৎ আদর্শেরও ক্ষতি হয়ে থাকে। একথা এখন স্পষ্ট যে সত্য ও অহিংসার বল ছাড়াও সত্যাগ্রহীর এই বিশ্বাস থাকবে যে ঈশ্বর তাঁকে এই শক্তি দেবেন যাতে উপবাসে কিঞ্চিৎমাত্র অশুদ্ধতা এসে যাওয়া মাত্র অবিলম্বে তা পরিহার করতে তাঁর মনে তিলমাত্র দ্বিধা হবে না। অসীম ধৈর্য, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, লক্ষ্য সম্বন্ধে একাগ্রতা, সম্পূর্ণ স্থৈর্য ও ক্রোধশূন্যতা সেই অনশনে থাকবেই। তবে একসঙ্গেই কোন

মানুষের পক্ষে এসব গুণে গুণী হয়ে ওঠা সম্ভব নয় বলে যিনি অহিংসার বিধান অনুসরণে আত্মনিয়োগ করেন নি, তাঁর সত্যাগ্রহমূলক অনশন করতে যাওয়া উচিত নয়।

হরিজন, ১৩-১০-১৯৪০

॥ ৬৮ ॥

অনশন প্রসঙ্গে

অনশন সত্যাগ্রহের অস্ত্রশালার অব্যর্থ অস্ত্র—আমি একথা বলেছি। সত্যাগ্রহের জনক হিসাবে আমি এর প্রয়োগ করেছি।

তবে এ সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতি আমি ব্যক্ত করতে চাই। ন্যায়বিচার পাবার অন্য সব পন্থার কারণ দেওয়া সত্ত্বেও সাফল্য পাওয়া যায় নি কেবল তখনই একমাত্র শেষ কারণ হিসাবে সত্যাগ্রহী অনশন করবেন। অনশনে অনুকরণের কোন স্থান নেই। যাঁর অন্তরে শক্তি নেই তিনি স্বপ্নেও অনশন করার কথা ভাববেন না এবং সাফল্যের আসক্তি নিয়েও অনশন করা চলবে না। তবে অন্তরের বিশ্বাস-চালিত হয়ে সত্যাগ্রহী একবার যদি অনশন শুরু করেন তবে তাঁর কার্যের ফল হোক বা না-ই হোক তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হবে। তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে অনশনে কোন ফল হয় না বা হতে পারে না। ফলের আশায় অনশন করলে সাধারণতঃ তা ব্যর্থ হয়। আর বাহ্যতঃ তিনি ব্যর্থ না হলেও যথার্থ অনশনের ফলে প্রাপ্তব্য হৃদয়ের আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত হন।

কেউ অনশনকালে ফলের রস পান করবেন কিনা সেটা নির্ভর করে তাঁর দেহের সহনশক্তির উপর। তবে যেটুকু নেহাৎ না হলে নয় তার বেশী ফলের রস কেউ পান করবেন না। যিনি কেবল জল পান করে থাকেন সম্ভবতঃ তিনি সব চেয়ে বেশী আভ্যন্তরীণ শক্তির অধিকারী।

নিজের বেতন বৃদ্ধি জাতীয় ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অনশন করা অনুচিত। কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেদের গোষ্ঠীর বেতন বৃদ্ধির জন্য অনশন করা চলতে পারে।

হাস্যকর অনশন প্লেগের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ক্ষতিকারক। তবে

অনশন যখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তখন তা আর পরিহার করা যায় না। সুতরাং যখন প্রয়োজন মনে করি তখন আমি উপবাস করি এবং কোনমতেই তখন আর তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারি না। আমি নিজে যা করি অনুরূপ অবস্থায় অপরকে তার থেকে নিবৃত্ত করতে পারি না। তবে একথা সকলেরই জানা আছে যে খুব ভাল জিনিসেরও সময় সময় অপব্যবহার হয়ে থাকে। রোজই এরকম ঘটতে দেখা যায়।

হরিজন, ২১-৪-১৯৪৬

॥ ৬৯ ॥

(খ) নারীসমাজ ও পিকেটিং

ভারতের নারীদের প্রতি

লড়াই-এ যোগ দেবার জন্য কোন কোন ভগ্নী যে অধৈর্য হয়ে উঠছেন আমার কাছে এটা একটা সুলক্ষণ মনে হচ্ছে। এর থেকে এই সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে যে লবণ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, কেবল এতেই আবদ্ধ থাকাকে তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করছেন না। তাঁরা যে নিগ্রহ বরণ করতে চাইছেন লবণ আইন ভঙ্গের মধ্যে তার অবকাশ না পেলে তাঁরা জনারণ্যে হারিয়ে যাবেন।

এই অহিংস যুদ্ধে নারীদের অবদান পুরুষদের থেকে অধিক হবে। মহিলাদের অবলা আখ্যা দেওয়া অপমানজনক। এটা পুরুষদের নারীদের প্রতি অবিচারের দ্যোতক। বল বলতে যদি কেবল পশুবল বোঝায় তবে অবশ্য নারী পুরুষের চেয়ে কম পশুভাবাপন্ন। আর বল বলতে যদি চরিত্রবল বোঝায় তাহলে নারী পুরুষের থেকে বহুগুণে শ্রেয়। নারীর স্বজ্ঞা, স্বার্থত্যাগ-বৃত্তি, সহ্যশক্তি ও সাহস কি পুরুষের চেয়ে অধিক নয়? নারী ছাড়া মানুষের অস্তিত্বই থাকত না। অহিংসা যদি আমাদের সত্তার বিধান হয় তাহলে মানুষের ভবিষ্যৎ নারীদের হাতে।

আজ বহুদিন যাবৎ আমার চিন্তা এই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। আশ্রমের মহিলারা যখন পুরুষ কর্মীদের সঙ্গে যাবার জন্য জিদ ধরলেন তখন আমার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল যে কেবল লবণ আইন ভঙ্গ করার থেকে

অনেক বড় কাজ এই আন্দোলনে তাঁরা করবেন।

মনে হয় সেই কাজ আমি এবার খুঁজে পেয়েছি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষদের দ্বারা মদ ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা যদিও একটা সীমা পর্যন্ত আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছিল তবুও হিংসার আবির্ভাব হওয়ায় শেষ অবধি ব্যর্থ হয়। সত্যকার প্রভাব সৃষ্টি করতে হলে আবার পিকেটিং শুরু করতে হবে। শেষ অবধি এই পিকেটিং যদি শান্তিপূর্ণ থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার এইটাই হবে দ্রুততম পন্থা। জুলুম করে একাজ করা যাবে না, করতে হবে হৃদয় পরিবর্তন করে—নৈতিক প্রবর্তনা দ্বারা। আর নারী ছাড়া হৃদয়ের দরবারে কার্যকরী আবেদন আর কে করতে পারেন?

সুরা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করা এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন শেষ অবধি আইনের সহায়তায় করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ না নীচে থেকে দৃঢ় চাপ দেওয়া হবে ততক্ষণ আইন তৈরী হবে না।

এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না যে উভয় কর্মসূচীই জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। মাদক দ্রব্য এতে আসক্ত ব্যক্তিদের নৈতিক সুখ-শান্তি ধ্বংস করে। আর বিদেশী বস্ত্র জাতির আর্থিক বনিয়াদ নষ্ট করে ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে করে দেয় বেকার। উভয় ক্ষেত্রেই দুর্দশার ছোঁয়া লাগে সংসারে এবং তাই এর আঁচ পোহাতে হয় নারীদের। যাঁদের স্বামী মদ্যপ তাঁরাই জানেন যে একদা যে সংসার শান্তি ও শৃঙ্খলার লীলাভূমি ছিল মাদক দ্রব্যের প্রভাবে সেই সংসারের কী সর্বনাশ ঘটেছে। দেশের পর্ণকুটিরের বাসিন্দা লক্ষ লক্ষ নারী বেকারত্বের অর্থ কি তা জানেন।

ভারতবর্ষের নারীসমাজ যেন এই কার্যক্রম দুটি গ্রহণ করেন এবং এতে বিশেষজ্ঞ হন। তাহলে স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁদের অবদান পুরুষদের চেয়ে বেশী হবে। যে শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের রাজত্বে তাঁরা এযাবৎ অপরিচিত ছিলেন এই দুটি কর্মসূচীর রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করলে তাঁরা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়ী ও ক্রেতা এবং মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ী ও ব্যবহার-কারীদের কাছে নারী-সমাজের এই অবদানের ফলে তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত না হয়ে পারে না। আর যাই হোক না কেন মহিলারা এই চার শ্রেণীর উপর হিংসা করেছেন বা করতে পারেন—এ আশঙ্কা জাগার কোনই সম্ভাবনা নেই। এবং

এই জাতীয় শান্তিময় ও প্রতিরোধবিহীন আন্দোলনের প্রতি সরকারও বেশী দিন অনবহিত থাকতে পারেন না।

শুধু নারীদের দ্বারা প্রারব্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হবার উপরই এ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। পুরুষদের কাছ থেকে তাঁরা যতটা প্রয়োজন সাহায্য নিতে পারেন এবং এ সাহায্য পাবার অধিকারও তাঁদের আছে। কিন্তু পুরুষেরা এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নারীদের অধীন হবেন।

এই আন্দোলনে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে হাজার হাজার নারী অংশ-গ্রহণ করতে পারেন।

আমার এই আবেদনে উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে সক্রিয়ভাবে একাত্ম করার একটা অবকাশ পাবেন এবং নৈতিক ও ভৌতিক—উভয় দিক থেকেই তাঁদের সাহায্য করার সুযোগ পাবেন।...

এই দুই সংস্কারের নৈতিক পরিণামও উল্লেখযোগ্য। আর রাজনৈতিক পরিণামও কম মহত্ত্বপূর্ণ নয়। মাদক দ্রব্য বন্ধ করার অর্থ হল পঁচিশ কোটি টাকার রাজস্ব হ্রাস। আর বিদেশী বস্ত্র বর্জন করার অর্থ ভারতবাসীর অন্ততঃ ষাট কোটি টাকার সাশ্রয়। আর্থিক দিক থেকে এই দুই কৃতি হবে লবণ আইন রদ করার থেকেও মহত্ত্বপূর্ণ। আর এই দুই কর্মসূচীর নৈতিক পরিণামের পরিমাপ করা অসম্ভব।

তবে কোন কোন ভগ্নী বলতে পারেন যে, "মাদক দ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করায় কোন উত্তেজনা বা রোমাঞ্চ নেই।" মনে-প্রাণে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে যথেষ্টর চেয়েও বেশী উত্তেজনা ও রোমাঞ্চের খোরাক তাঁরা পাবেন। আন্দোলন শেষ হবার পূর্বেই হয়ত তাঁদের কারাগারে আশ্রয় নিতে হতে পারে। অপমানিতা হওয়া ও দৈহিক আঘাত পাওয়াও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এ জাতীয় অপমান বা আঘাত সহ্য করা তাঁদের পক্ষে গৌরবজনক হবে। তাঁদের যদি এ রকম নিগ্রহ বরণ করতে হয় তবে এই অন্যায়ের অবসান ত্বরান্বিত হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১০-৪-১৯৩০

॥ ৭০ ॥

পুরুষের ভূমিকা

উভয় শ্রেণীর পিকেটিং-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে তাঁদের (নারীদের) এক বিশিষ্ট ও অদ্বিতীয় কর্মক্ষেত্রের সন্ধান দেবার জন্য। মাদক দ্রব্য ও তাড়ির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে বর্তমানে জাতি নবজন্মের যে বেদনা ভোগ করছে তার সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করে এ বাবদ যে অর্থাগম হচ্ছে তা ছেড়ে দেবার জন্য তাঁদের অনুরোধ করে আমরা এই কাজে নারীদের সহায়তা করতে পারি। আমাদের নারীজাতির প্রতি আরও অধিক মাত্রায় এবং ব্যাপকভাবে সম্মান দেখিয়েও আমরা এতে সাহায্য করতে পারি। সাধারণ পরিবেশে এইভাবে উন্নত হলে মাদক দ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্রের বিক্রেতা ও এইসব পণ্যের ব্যবহারকারীর উপরও তার প্রভাব পড়বে। তখন হৃদয়ের উপর অবলাদের আবেদন কেউ প্রতিরোধ করতে পারবেন না। আমার মতে এইসব সদ্‌গুণাবলীর ক্ষেত্রে নারীদের স্থান পুরুষদেরও উচ্চে। আর অহিংসাও এরকম একটি সদ্‌গুণ। পুরুষ যখন প্রচণ্ড পরিশ্রম করে বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই আদর্শে উপনীত হয়, নারীরা তখন সহজ সাবলীলভাবে এর প্রয়োগ করে। নারীদের প্রয়োজন মত তাঁদের বুদ্ধি পরামর্শ দিলেও আমরা যদি তাঁদের পিকেটিং-এর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করি তাহলে তাঁরা নিজেরা অপেক্ষাকৃত সহজে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবেন।…

আমরা যা করতে পারি ও যা করা উচিত সেসম্বন্ধে এইটুকুই যথেষ্ট। এবার আমাদের যা আদৌ করা উচিত নয় তার কথা বলব। বোম্বাই থেকে আমি এই অভিযোগ পেয়েছি যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মত জোর করে অপরের মাথা থেকে বিদেশী টুপি কেড়ে নেওয়া শুরু হয়েছে। অভিযোগ কতটা সত্য তা আমি জানি না। তবে যতটা সত্যই হোক না কেন এর পুনরাবৃত্তি অনুচিত। এমন কি ভাল করার জন্যও কারও উপর জোর করা উচিত নয়। কোন রকমের জোর-জবরদস্তি করলে আমাদের লক্ষ্যের ক্ষতি হবে। আমার মনে হয় যে আমরা লক্ষ্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কিন্তু আন্দোলনে যদি জোর-জবরদস্তির সূত্রপাত করে একে যদি দূষিত করে ফেলা হয় তাহলে আত্মশুদ্ধির

এই সপ্তাহে যা কিছু চমৎকার কাজ করা হয়েছে তা ব্যর্থ হবে। এ আন্দোলন হৃদয় পরিবর্তনের, এমন কি অত্যাচারীর উপরও জোর-জবরদস্তি করার অবকাশ এখানে নেই। আমাদের বন্ধু ও সাথীরা ভাল কাজে যোগ না দিলে বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা সত্যাগ্রহ করতে পারি। অন্তরে সেই শক্তি ও পবিত্রতা থাকলে আপনার সাথী কোন ভাল কথা না শুনলে অনশন করেও তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে পারেন। আমার ভিতর সেই শক্তি ও পবিত্রতা থাকলে সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে আমি এটা করতাম। আমি স্বীকার করছি যে এই শক্তি ও পবিত্রতা যতটা প্রয়োজন তা আমার ভিতর এখনও সৃষ্টি হয় নি। এটা কোন যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। আপনাদের ভিতর থেকে কেউ যেন এর প্রেরণা দেয় এবং তখন পৃথিবীতে কারও সাধ্য নেই যে আপনাকে ঠেকায়। এখনও সেরকম প্রবল প্রেরণা আমি বোধ করছি না। নিজেদের ভিতর এটা বোধ করলে আপনারা এমন করতে পারেন। ১৯২১ সনে বোম্বাই যখন উন্মাদ হয়ে যায় তখন আমি এমন করেছিলাম। ১৯১৭ সনেও আমি এমন করেছিলাম যখন বস্ত্রকলের শ্রমিক ভাই-এরা এক দুর্বল মুহূর্তে ঈশ্বরের নামে গ্রহণ করা শপথ ভঙ্গ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার পদক্ষেপ হয়েছিল স্বতঃপ্রণোদিত এবং পরিণামও হয়েছিল বিদ্যুতের মত।

কিন্তু এটা হল হৃদয় পরিবর্তনের একটা প্রক্রিয়া। তাই আমাদের লোকেরা যখন কারও উপর জোর-জবরদস্তি করেন আমি তখন খুবই বিচলিত বোধ করি এবং এর ফলে আমি আর কোন সেবাকার্য করতে পারি না। এবারে যাই হোক না কেন লড়াই চলতে থাকবে। আর পিছু ফেরার কথা ওঠে না। কিন্তু সেটা এক কথা আর আমার সেবা করার ক্ষমতা থাকা অন্য কথা। আন্দোলন মুলতবী না করার প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি; কিন্তু আন্দোলন চলাকালীন রোগ বা দুর্বলতার কারণ আমি মারা পড়ব না বা অবসন্ন হয়ে পড়ব না—এমন কথা আমি বলতে পারি না। আমি স্বীকার করছি যে আমাদের তরফ থেকে হিংসার অনুষ্ঠান হলে আমি তার সামনে অতীব দুর্বল এবং ঐ জাতীয় কোন ঘটনা শোনার সময় কোন চিকিৎসক যদি আমার নাড়ি পরীক্ষা করেন তাহলে আমার হৃদস্পন্দনের অনিয়মিততা অবিলম্বে লক্ষ্য করবেন। এসব ঘটনার কথা শোনার পর আবার আমার হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হতে সত্যসত্যই আমার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে। এই সময়টা আমি ঈশ্বরের কাছে শক্তি

যাচ্ঞা করি। আমার এই দুর্বলতার উপর আমার কোন হাত নেই। আমি বরং এটা চাই। এই সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণতা আমাকে সেবা ও যথার্থ পথ প্রদর্শনের উপযুক্ত রাখে এবং এর কারণ আমি বিনয়ী ও ঈশ্বরের উপর চিরনির্ভরশীল থাকি। তিনিই একমাত্র জানেন যে কখন আমি আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন হিংসার কথা শুনে এইভাবে বিচলিত ও ব্যর্থতা বোধের শিকার হয়ে পড়ব ও অনির্দিষ্টকাল কিংবা সাময়িকভাবে উপবাস করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব। সত্যাগ্রহী যাঁদের ভালবাসেন এটা তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ অস্ত্র। ভারত যদি একদিকে অহিংসা, খাদি, অস্পৃশ্যতা পরিহার, সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ক্রমাগত ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করে এবং অন্যদিকে মুহূর্মুহু সেই শপথ ভঙ্গ করে ঈশ্বরদ্রোহী হয়, তাহলে যে ভারতবর্ষ মোহমুগ্ধ মুহূর্তে আমাকে মহাত্মা করেছে এবং যে ভারতবর্ষ আমাকে খুবই ভালবাসলেও বুদ্ধিপূর্বক ভালবাসে নি তার বিরুদ্ধে শেষ সত্যাগ্রহ করার জন্য কখন যে আমার ভিতরকার ঈশ্বর আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন তা আমি জানি না। এরকম পরিস্থিতি যেন কখনও না আসে। কিন্তু যদি আসেই তাহলে ভগবান যেন সেই চূড়ান্ত আত্মনিবেদনের উপযুক্ত শক্তি ও পবিত্রতা আমাকে দেন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৪-১৯৩০

॥ ৭১ ॥

কিভাবে পিকেটিং করতে হয়

১। মাদক দ্রব্য বা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার জন্য অন্ততঃ দশজন মহিলা প্রয়োজন। তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন নেত্রী বেছে নেবেন।

২। প্রথমে তাঁরা ব্যবসায়ীটির কাছে দল বেঁধে যাবেন এবং এই ব্যবসায় ছেড়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানাবেন এবং মাদক দ্রব্য বা বিদেশী বস্ত্র যার বিরুদ্ধে এই পিকেটিং তার সম্বন্ধে তথ্য পরিসংখ্যানযুক্ত বইপত্র তাঁকে দেবেন। বলা বাহুল্য এইসব পুস্তক-পুস্তিকা এমন ভাষায় হবে যা সেই ব্যবসায়ী বুঝতে পারেন।

৩। ব্যবসায়ীটি যদি সে ব্যবসায় বন্ধ করতে রাজী না হন তাহলে স্বেচ্ছা-

সেবিকারা যাতায়াতের পথ খোলা রেখে দোকানটিকে ঘিরে ফেলবেন এবং তারপর সম্ভাব্য ক্রেতাদের নিবৃত্ত হবার জন্ত ব্যক্তিগত আবেদন জানাবেন।

৪। স্বেচ্ছাসেবিকাদের কাছে এমন সব নিশান বা পিচবোর্ডের টুকরা থাকবে যাতে বিদেশী বস্ত্র বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করার কুফল সম্বন্ধে বড় বড় অক্ষরে সতর্কবাণী লিখিত থাকবে।

৫। স্বেচ্ছাসেবিকারা যথাসম্ভব গণবেশ (ইউনিফর্ম) পরে থাকবেন।

৬। মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাসেবিকারা পরিস্থিতির উপযুক্ত ভজন আদি গাইবেন।

৭। জোর-জবরদস্তি বা পুরুষদের হস্তক্ষেপে সেচ্ছাসেবিকারা বাধা দেবেন।

৮। কোন অবস্থাতেই অশালীন ব্যবহার অথবা গালাগালি, ধমক কিংবা অভব্য ভাষা প্রয়োগ করা হবে না।

৯। সর্বদা স্বেচ্ছাসেবিকাদের আবেদন হবে সবার মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের কাছে, ভীতি বা জোরের কাছে নয়।

১০। পুরুষেরা কখনও পিকেটিং-এর জায়গায় সমবেত হবেন না বা কারও চলাচলে বাধা সৃষ্টি করবেন না। তবে সাধারণভাবে সেই এলাকায় তাঁরা বিদেশী বস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাতে পারেন। সেই এলাকায় মাদক ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন এবং খাদির সপক্ষে প্রচারের জন্ত মহিলাদের শোভাযাত্রা সংগঠিত করিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার ব্যাপারে পুরুষেরা সাহায্য করবেন।

১১। পিকেটিং করতে যাওয়া এইসব স্বেচ্ছাসেবিকা গোষ্ঠীর পিছনে তকলি ও চরখার প্রচারের জন্ত উপযুক্ত শক্তিশালী সংগঠন থাকবে। তাঁরা নূতন নূতন ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারের অন্তান্ত সাধনের সম্বন্ধে চিন্তা করবেন।

১২। চাঁদা হিসাবে যা পাওয়া যাবে তার বিধিবদ্ধ হিসাব রাখার ব্যবস্থা থাকবে। মাঝে মাঝে হিসাব-পরীক্ষকদের দ্বারা এর পরীক্ষা করাতে হবে। নারীদের পর্যবেক্ষণাধীনে পুরুষেরা এসব করতে পারেন। সমগ্র পরিকল্পনার ভিতর এই কথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে পুরুষদের মনে নারীদের সম্বন্ধে যথার্থ শ্রদ্ধার ভাব ও তাঁদের অভ্যুত্থানের ইচ্ছা ক্রিয়াশীল।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৪-১৯৩০

॥ ৭২ ॥

পিকেটিং করার কয়েকটি নিয়ম

বিদেশী বস্ত্রের বা মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং-এর সময় স্মরণ রাখতে হবে যে এর লক্ষ্য হল বস্ত্রের ক্রেতা ও নেশাকারীদের হৃদয় পরিবর্তন করা। আমাদের উদ্দেশ্য হল নৈতিক ও আর্থিক সংস্কার সাধন। এর রাজনৈতিক পরিণাম একান্তভাবেই পরোক্ষ। ল্যাঙ্কাশায়ার যদি আর সেখানকার কাপড় না পাঠায় এবং মদ্যপায়ী ও আফিংখোরদের পাপাভ্যাস ছাড়াবার কাজে ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে যদি সরকার আবগারী রাজস্ব ব্যয় নাও করেন তবুও আমাদের পিকেটিং ও তদনুরূপ অন্যান্য প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত নিয়মগুলি পাঠ করতে হবে :

১। দোকানে পিকেটিং-এর সময় আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে ক্রেতার উপর।

২। ক্রেতা বা বিক্রেতা কারও উপর আপনারা কঠোর হবেন না।

৩। অযথা জনসাধারণ জুটিয়ে ভিড় করবেন না বা দোকান ঘিরে ফেলবেন না।

৪। আপনাদের প্রয়াস হবে নীরব।

৫। সংখ্যাশক্তির ভয় দেখিয়ে নয়, আপনাদের সৌম্য আচরণ দ্বারা আপনারা ক্রেতা-বিক্রেতার হৃদয় জয় করার প্রয়াস করবেন।

৬। আপনারা লোক বা যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেবেন না।

৭। ক্রেতা বা বিক্রেতা কারও উদ্দেশ্যে "হায় হায়" অথবা অনুরূপ কোন ধিক্কারসূচক ধ্বনি দেবেন না।

৮। প্রতিটি ক্রেতার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করতে হবে, তাঁদের ঠিকানা ও পেশা জানতে হবে এবং তাঁদের গৃহে ও হৃদয়ে প্রবেশ করতে হবে। এর অর্থ হল এই যে একদল কর্মী একটানা পিকেটিং করে যাবেন।

৯। ক্রেতা-বিক্রেতাদের অসুবিধা বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং যেখানে আপনারা এই অসুবিধা দূর করতে পারছেন .. .. উপরওয়ালা কর্মীদের জানাবেন।

১০। বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার সময় আপনাদের কাছে

কিছু খদ্দর বা নেহাৎ তা সম্ভব না হলে দামের বিবরণ সহ নমুনার বই থাকা উচিত এবং নিকটের কোন্ খদ্দরের দোকানে ক্রেতাকে নিয়ে যাবেন তাও জানা থাকা দরকার। ক্রেতা যদি খদ্দর কিনতে ইচ্ছুক না হন এবং কলের কাপড় কেনার জন্যই পীড়াপীড়ি করেন তাহলে তাঁকে আপনারা দেশী কলের কাপড়ের দোকানে পাঠিয়ে দেবেন।

১১। নিজেদের সঙ্গে আপনাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদি থাকবে যাতে ক্রেতাদের কাছে তা বিতরণ করা যায়।

১২। আপনাদের শোভাযাত্রায় যোগ দিতে হবে বা তা সংগঠিত করতে হবে। এ ছাড়া ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বা তার সাহায্য ছাড়াই বক্তৃতা দিতে হবে ও ভজন-সংকীর্তনের দল গড়ে তুলতে হবে।

১৩। প্রতিদিনের কাজের বিবরণ খুঁটিয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

১৪। আপনার প্রয়াস ফলবতী হচ্ছে না দেখলে নিরাশ হবেন না। কার্য-কারণের বিশ্বজনীন বিধানের উপর আস্থা রাখুন, মনে যেন বিশ্বাস থাকে যে কোন সৎ চিন্তা, বাক্য বা কর্ম ব্যর্থ যায় না। সৎ চিন্তা করা সৎ বাক্য বলা আমাদের হাতে; কিন্তু এর প্রতিদান দেবার ক্ষমতা ভগবানের হাতে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-৩-১৯৩১

॥ ৭৩ ॥

পিকেটিং করা

পিকেটিং সম্বন্ধিত আমার সাম্প্রতিক মন্তব্যে আমার সমালোচকেরা মর্মাহত হয়েছেন। যে জায়গায় পিকেটিং করা হচ্ছে সেখানে বাইরের লোকের প্রবেশের পথ বন্ধ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের জীবন্ত দেওয়াল খাড়া করাকে আমি যে এক ধরনের হিংসা বলে বর্ণনা করেছি তাকে তাঁরা অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের সময়কার উক্তি ও কর্মের পরিপন্থী বিবেচনা করছেন। যদি সত্যসত্যই তা হয়ে থাকে তাহলে আমার সাম্প্রতিক রচনাকেই প্রামাণ্য বিবেচনা করে তার দ্বারা আমার অপেক্ষাকৃত পুরাতন উক্তি ও কর্ম বাতিল হল ধরে নিতে হবে। বয়সের কারণ আমার দেহ ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত হলেও আশা করি আমার বুদ্ধির ক্ষেত্রে জরায় এই নিয়ম কার্যকরী

নয়। আমি বরং মনে করি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞানও বেড়েছে তবে তা হোক বা না-ই হোক, পিকেটিং সম্বন্ধিত আমার পূর্বোক্ত অভিমতের ব্যাপারে আমার মনে কোন অস্পষ্টতা নেই। কংগ্রেস কর্মীদের এটা যদি পছন্দ না হয় তবে তাঁরা আমার অভিমতকে বাতিল করতে পারেন। তবে তাঁরা যদি তা করেন তাহলে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এর নীতিকে লঙ্ঘন করবেন। কিন্তু আমার অতীত আচরণ ও বর্তমান বিবৃতির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই। দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রথম অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করার সময় আমার সঙ্গীরা পিকেটিং করার প্রশ্ন আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। জোহানস্‌বার্গের রেজিস্ট্রী অফিসে পিকেটিং করতে হয়েছিল এবং প্রস্তাব এসেছিল যে তার সামনে আমরা পিকেটিংকারীরা স্বেচ্ছাসেবকদের জীবন্ত দেওয়াল খাড়া করে দেব। এ প্রস্তাব হিংসামূলক বলে আমি কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা বাতিল করে দিলাম। সুতরাং একটি বড় চৌরাস্তার উপর পিকেটিংকারী স্বেচ্ছাসেবকরা দাঁড়িয়ে রইলেন যাতে কেউ তাঁদের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি না দিতে পারেন অথচ যাতে ইচ্ছা করলে যে কেউ কারও গাত্র স্পর্শ না করেই রেজিস্ট্রী দপ্তরে যেতে পারেন। লোকনিন্দার শক্তির উপর ভরসা করা হয়েছিল, 'দলত্যাগীদের' নাম প্রকাশ করে যার উদ্রেক করা হত। মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং-এর সময় এদেশে আমি ঐ পদ্ধতির অনুকরণ করি। পুরুষদের তুলনায় নারীরা অহিংসা শক্তির অধিকতর যোগ্য প্রতিনিধি বলে এ কাজ বিশেষ করে তাঁদের উপর ন্যস্ত করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের জীবন্ত দেওয়াল খাড়া করার কোন অবকাশ ঘটে নি। তবে আজকের মত সে সময়ও যে বহু বেআইনী কাজ করা হয় এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এমন একটি ঘটনার কথাও আমার মনে পড়ে না যেখানে আমার যে রচনাটি এত তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে তাতে নিন্দিত পিকেটিং-এর পদ্ধতিকে আমি প্রোৎসাহিত করেছি। আর স্বেচ্ছাসেবকদের জীবন্ত দেওয়ালকে নগ্ন হিংসা বিবেচনা করার পক্ষে কি সত্যসত্যই কোন বাধা আছে? কোন মানুষ যা করতে চাইছে বলপ্রয়োগে তাকে তা না করতে দেওয়া এবং তার ও সেই কাজের মাঝখানে জোর করে খাড়া হবার মধ্যে কি তফাৎ আছে? অসহযোগ আন্দোলনের সময় কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ আটকিয়েছিল আমাকে তখন তার সুস্পষ্ট নিন্দা করে বাণী পাঠাতে হয় এবং আমার যতদূর মনে পড়ছে ইয়ং ইণ্ডিয়াতে আমি

এর কঠোর নিন্দা করেছিলাম। অবশ্য হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে যাঁদের অভিমত আমার থেকে পৃথক তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই।

হরিজন, ২৭-৮-১৯৩৮

॥ ৭৪ ॥

পিকেটিং করা কখন শান্তিপূর্ণ?

জনৈক পত্রলেখক লিখছেন :

> "বোম্বাই-এ দেখছি যে 'শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করার' অস্ত্রের এই জন্য অসদ্ব্যবহার হচ্ছে যে এখানে অনেকে মনে করেন যে লক্ষ্য ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় যাই হোক না কেন এই শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করার অস্ত্রের প্রয়োগ করাতে দোষ নেই। যে বেচারীর বিরুদ্ধে এই জাতীয় পিকেটিং করা হয় তিনি পুলিস বা আইনের কোন সাহায্য পান না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ধরুন ক যেন কোন দোকানদার। খ ধরুন তাঁর কর্মচারী যাঁর কোন আইনসঙ্গত দাবি না থাকা সত্ত্বেও ক খ-এর দাবি না মানলে খ তাঁর দোকানে পিকেটিং করবেন বলে হুমকি দেন। আর সত্যসত্যই গ আর ঘ-কে 'নেতা' খাড়া করে দিয়ে ক-এর দোকানে পিকেটিং করা শুরু করেন এবং ক-এর খরিদ্দাররা যাতে আর তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা না করেন তার উদ্দেশ্যে তাঁদের মনে এইভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। এ জাতীয় পিকেটিং করার ঘটনায় কোন রকম শারীরিক শক্তিপ্রয়োগ না হলেও কি তাকে 'শান্তিপূর্ণ' আখ্যা দেওয়া যাবে?"

এ জাতীয় পিকেটিং করার ঘটনায় আইনগত মূল্য কি তা আমি বলতে না পারলেও এটুকু বলতে পারি যে একে শান্তিপূর্ণ অর্থাৎ অহিংস আখ্যা দেওয়া যায় না। আদর্শ বা লক্ষ্য ন্যায়সঙ্গত না হলে দৈহিক শক্তিপ্রয়োগ না করা হলেও যাবতীয় পিকেটিং করাকে হিংসামূলক আখ্যা দিতে হবে। সৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হলে যাবতীয় পিকেটিং-এর ঘটনা এক জঘন্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং তা মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে। সাধারণতঃ কোন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান অগ্রণী না হলে ব্যক্তিগতভাবে কেউ পিকেটিং করতে যাবেন না। অহিংস আইন অমান্যের মতই পিকেটিং করারও একটা সুনির্ধারিত

সীমারেখা আছে এবং কঠোরভাবে এ মেনে না চললে পিকেটিং করা অনুচিত ও নিন্দার্হ হয়ে পড়ে।

হরিজন, ২-১২-১৯৩৯

৭৫

সমাজ সংস্কারে সত্যাগ্রহ

ছাত্রদের মহান সত্যাগ্রহ

…রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মত সামাজিক ক্ষেত্রেও সত্যাগ্রহ সমভাবে প্রযোজ্য। সরকার, সমাজ বা নিজ পরিবারের পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী—ক্ষেত্রানুসারে সকলের উপরই এর প্রয়োগ চলতে পারে। কারণ এই আধ্যাত্মিক আয়ুধটির গুণই হচ্ছে এই যে হিংসার স্পর্শরহিত হয়ে শুধুমাত্র প্রেমভাব দ্বারা পরিচালিত হলে একে যত্রতত্র এবং যে কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়। খেড়া জেলার ধার্মাজের সাহসী ও তেজস্বী ছাত্রের দল কয়েকদিন আগে এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ পেশ করেছেন। বিভিন্ন বিবরণী থেকে এ ঘটনা সম্বন্ধে আমি নিম্নরূপ তথ্য পেয়েছি।

ধার্মাজের জনৈক ভদ্রলোক মাতার মৃত্যুর দ্বাদশ দিনে স্বজাতীয়দের একটি ভোজ দেন। এই প্রথার তীব্র বিরোধী সেখানকার যুব সম্প্রদায় ও স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসী পূর্বাহ্নে এ নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ করেন। তাঁরা মনে মনে স্থির করলেন যে এই সময়ে কিছু করা উচিত। এতদানুযায়ী তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নলিখিত তিনটি সংকল্পের ভিতর কয়েকটি বা সবগুলি গ্রহণ করলেন :

১। তাঁদের গুরুজনদের সঙ্গে তাঁরা সেই ভোজ খেতে যাবেন না বা কোনরকমে তার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না।

২। এই প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থ সেদিন তাঁরা উপবাস করবেন।

৩। এই পন্থানুসরণ করার জন্য গুরুজনরা যে কোন রূঢ় আচরণ করুন, তা তাঁরা সানন্দে বরণ করবেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েকটি নাবালকসহ বহু ছাত্র ভোজের দিন উপবাস

করলেন এবং এই অবাধ্যতার জন্ম তাঁদের তথাকথিত গুরুজনদের রোষবহ্নির দহন বরণ করে নিলেন। এর ফলে ছাত্রদের গুরুতর আর্থিক ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল। 'গুরুজনেরা' নিজ নিজ সন্তানের খরচ বন্ধ করে দেবার হুমকি দিলেন এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সাহায্য দিচ্ছিলেন, তাও বন্ধ করে দেবার শাসানি দিলেন। ছাত্ররা কিন্তু অটল রইল। দুইশত পঁচাশিজন ছাত্র এইভাবে জাতের ভোজে অংশগ্রহণ করেন নি এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সেদিন উপবাসী রয়ে গেলেন।

এইসব ছেলেদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে প্রত্যেক জায়গায় ছাত্ররা এইভাবে প্রমুখ অংশ গ্রহণ করবেন। তাঁদের কাছে যেমন স্বরাজের চাবিকাঠি রয়েছে, তেমনি তাঁদের পকেটে রয়েছে সমাজ সংস্কার ও ধর্মরক্ষার চাবি। নিজেদের অবহেলা ও উদাসীনতার জন্ম তাঁরা বোধ হয় এর খবর রাখেন না। তবে আমি আশা করি যে ধার্মাজের ছাত্তদের উদাহরণ নিজ শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করবে। আমার মতে পরলোকগতা মহিলাটির সত্যকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিলেন ঐ উপবাসী ছেলেগুলি। আর যাঁরা ভোজ খাওয়ালেন, তাঁরা অর্থের অপচয় করার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রদের সামনে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ধনী ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত অর্থকে মানব হিতৈষণায় নিয়োগ করা। তাঁদের বোঝা উচিত যে দরিদ্রদের পক্ষে বিবাহ বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বজাতীয়দের ভোজন করানো অসম্ভব। এই কুপ্রথা বহু দরিদ্রের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। ভোজের জন্ম ধার্মাজে যে অর্থব্যয় হল, তা যদি দরিদ্র ছাত্র বা গরীব বিধবাদের সাহায্যের জন্ম অথবা খাদি, গোরক্ষা কিংবা হরিজনদের উন্নতির জন্ম ব্যয়িত হত, তাহলে এর সদুপযোগ হত এবং মৃতাত্মাও শান্তি পেতেন। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে এই যে ভোজের কথা এখনই লোকে বিস্মৃত হয়েছে, এতে কারও উপকার হয় নি। উপরন্তু এ ধার্মাজের ছাত্রসম্প্রদায় ও বিবেকবান অধিবাসীদের দুঃখের কারণ হয়েছে।

কেউ যেন এমন কথা না ভাবেন যে, ভোজ বন্ধ করা যায় নি বলে ঐ সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্ররা স্বয়ং জানতেন যে তাঁদের সত্যাগ্রহ অবিলম্বে নয়নগোচর কোন ফল প্রসব করবে না। কিন্তু নির্ভয়ে আমরা একথা ধরে নিতে পারি যে তাঁদের সতর্কতাবৃত্তি যদি ঘুমিয়ে না পড়ে, তাহলে ওখানে কোন শেঠিয়া ভবিষ্যতে আর শ্রাদ্ধ-ভোজের আয়োজন করতে সাহসী হবেন না।

দীর্ঘকালের কোন সামাজিক কুপ্রথাকে একেবারেই বিলুপ্ত করা যায় না, সর্বদাই এর জন্য স্থৈর্য ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৩-১৯২৮

॥ ৭৬ ॥

সত্যাগ্রহের সীমাবদ্ধতা

অল্পবয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে বয়স্ক ব্যক্তিদের বিবাহ অবিলম্বে বন্ধ করতে উৎসুক জনৈক পত্রলেখক লিখছেন :

"এই পাপের কঠোর প্রতিবিধান আবশ্যক। পঁচিশজন সচ্চরিত্র যুবক এক সত্যাগ্রহী দল সংগঠন করবেন এবং এ জাতীয় বিবাহের খবর পেলে বিবাহের আট-দশ দিন পূর্বে অকুস্থলে যাবেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁরা উভয় পক্ষ, সমাজের মোড়লসহ সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। এ জাতীয় বিবাহের নিন্দাযুক্ত প্ল্যাকার্ড নিয়ে তাঁরা সেখানকার পথঘাটে কুচ করবেন ও প্রস্তাবিত বিবাহের বিরোধী একটা আবহাওয়া সেখানে গড়ে তুলবেন। সেখানকার জনসাধারণকে তাঁরা প্রস্তাবিত বিবাহকে শান্তিপূর্ণভাবে বয়কট করতে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং এর জন্য যদি গ্রেপ্তার বরণ করতে হয় বা অপর কোন ধরনের শাস্তি নিতে হয় তা তাঁরা সানন্দে বরণ করবেন।

"এইভাবে শীঘ্রই এই সত্যাগ্রহী দল সেই এলাকায় একটি শক্তি বলে পরিগণিত হবে এবং এ জাতীয় বিবাহের আর অনুষ্ঠান হবে না।"

এ প্রস্তাব দেখতে আকর্ষণীয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে একবারের বেশী এ পদ্ধতি কার্যকরী হবে না। লালসা ও কামবাসনা যেখানে যুক্ত হয় সেখানে নিরীহ মেয়েদের বলিদান পরিহার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। লালসাতুর বৃদ্ধ বর ও মেয়ের লোভী মা-বাবা সেই সত্যাগ্রহী দলের অভিযানের আভাস পেয়ে গোপনে তাঁরা বিবাহকার্য সমাধা করে সত্যাগ্রহী দলের হাত এড়াবেন। আর এ ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করার জন্য পুরোহিত, বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষের অভাব ঘটবে না। নবজীবনের পাঠকেরা একটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা নিশ্চয় জানেন। সেই ক্ষেত্রে বৃদ্ধটি অনুতাপের ভান করেন ও ফাঁকা প্রকাশ্য ক্ষমা

প্রার্থনা দ্বারা সবার চোখে ধূলা দেন। সমাজ সংস্কারকরা নিজেদের কৃতিত্বে খুব খুশী হয়েছিলেন বটে কিন্তু পরস্পরের প্রশংসাপর্ব শেষ করার পূর্বেই বৃদ্ধ গোপনে বিবাহকার্য সমাধা করে নিয়েছিলেন। একটি ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল বহু ক্ষেত্রেই তা হতে পারে। সুতরাং এ পাপের মোকাবিলা করার জন্য অন্য পথের কথা ভাবতে হবে। আমার মনে হয় এসব ক্ষেত্রে লালসার শিকার বৃদ্ধের তুলনায় মেয়েটির লোভী পিতার কাছে পৌঁছানো অপেক্ষাকৃত সহজ। এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করার খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লোভপরবশ হয়ে যেসব পিতা-মাতা তাঁদের কন্যাকে তৎপরতা সহকারে বিক্রয় করেন তাঁদের খুঁজে বার করে এ সম্বন্ধে বোঝাতে হবে এবং বিভিন্ন জাতির সংগঠনগুলিকেও এ জাতীয় বিবাহের নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ কথা স্পষ্ট যে একটিমাত্র কর্মীবাহিনীর পক্ষে একটি বিরাট এলাকায় একবারেই এ সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর নয়। তাঁদের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করতে হবে। কন্যাকুমারীর সত্যাগ্রহী-দল কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত এ জাতীয় আসুরিক বিবাহ বন্ধ করতে পারবেন না। সমাজ সংস্কারকদের তাই তাঁদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। অসম্ভবের প্রয়াসী হলে চলবে না।

প্রেম ও অহিংসার পরিণাম অতুলনীয়। তবে এদের কার্যকরী করার ব্যাপারে লোকদেখানো হৈ-চৈ হট্টগোল বা প্ল্যাকার্ডের প্রয়োজনীয়তা নেই। আত্মবিশ্বাস এর পূর্বশর্ত এবং এই আত্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে আত্মশুদ্ধি। নিষ্কলঙ্ক ও শুদ্ধ চরিত্রের ব্যক্তি সহজেই মানুষের ভিতর আস্থার ভাব জাগ্রত করবেন এবং এইভাবে স্বতঃই তাঁদের চতুর্দিকের পরিবেশ পবিত্র হয়ে উঠবে। বহুদিন ধরেই আমি মনে করি যে রাজনৈতিক সংস্কারের তুলনায় সমাজ সংস্কার অনেক কঠিন কায। প্রথমোক্ত সংস্কারের পক্ষে পরিস্থিতি তৈরী, জনসাধারণও সে ব্যাপারে আগ্রহশীল এবং বিদেশেও একটা ধারণা রয়েছে যে আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে এটা সম্ভবপর। পক্ষান্তরে সমাজ সংস্কারের প্রতি জনসাধারণ আদৌ আগ্রহশীল নয়। আন্দোলনের পরিণামও খুব একটা উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় না এবং এক্ষেত্রে প্রশংসা প্রশস্তি পাবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। সুতরাং সমাজ সংস্কারকদের বেশ কিছুদিন অধ্যবসায় সহকারে লেগে থাকতে হবে, তাঁদের ধৈর্য ও শান্তি সহকারে অপেক্ষা করতে হবে ও বাহ্যতঃ যে স্বল্প পরিমাণ সাফল্যলাভ হয় তাতেই সন্তোষ বোধ করতে হবে।

এখানে আমি একটি বাস্তব পরামর্শ দেব। বৃদ্ধের সঙ্গে অল্পবয়সী মেয়ের

বিবাহের বিরুদ্ধে পরিবেশ সৃষ্টি করার সর্বাপেক্ষা সক্রিয় উপায় হল আসল বিবাহের অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং এইভাবে বৃদ্ধ বর ও কন্যার লোভী পিতার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সামাজিক বয়কট শুরু করা।

অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রেও যদি এই জাতীয় সফল বয়কট করা যায় তাহলে মা-বাবা অর্থের বিনিময়ে তাঁদের কন্যাকে বিক্রয় করতে ইতস্তত করবেন এবং বৃদ্ধরাও আর যুবতীদের পাণিপীড়ন প্রয়াসী হবেন না।

তবে লালসার শিকার বৃদ্ধদের লালসার প্রভাবমুক্ত করা সহজ ব্যাপার হবে না। তাই তাঁরা যদি বিবাহ করতেই চান তাহলে তাঁদের বয়স্ক বিধবাদের বিবাহ করতে প্রবুদ্ধ করতে হবে। ইউরোপে বৃদ্ধরা সহজেই বয়স্ক বিধবাদের খুঁজে বিবাহ করে থাকেন।

সর্বশেষে আমি বলব যে এ জাতীয় বিবাহের বিরোধিতা করার সময় আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য যেন স্পষ্ট থাকে। বৃদ্ধদের লালসার কবলমুক্ত করা আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হতে পারে না। তাহলে প্রথমে লালসার শিকার যুবকদের সমস্যাকে হাতে নিতে হয়। সে এক সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম। আমাদের লক্ষ্য হবে শুধু লালসার শিকার বৃদ্ধ ও লোভী মা-বাবার হাত থেকে কচি মেয়েদের বাঁচানো। সমাজ সংস্কারকদের তাই মেয়ে বিক্রির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। মেয়ের মা-বাবার কাছে পৌছাতে হবে। সত্যাগ্রহীকে তাই তাঁর কর্মক্ষেত্র ছকে নিতে হবে এবং সেই এলাকার বিবাযোগ্যা মেয়েদের তালিকা তৈরী করে তাঁদের মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং নিজ কন্যার প্রতি কর্তব্যভাবনায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সমাজ সংস্কারক সাফল্যের প্রত্যাশী হলে যেন এই সীমার বাইরে না যান। পত্রলেখক তাঁর পত্রে যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন তা এই সীমারেখাকে অতিক্রম করে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-৯-১৯২৮

॥ ৭৭ ॥

অপরাধ ও সত্যাগ্রহের পথ

জনৈক গ্রামবাসী যাঁর বাড়ী থেকে চোরেরা গহনাগাঁটি নিয়ে যাবার সময় তাঁকে আঘাত করে যায় তাঁকে আহত অবস্থায় গান্ধীজীর কাছে নিয়ে আসা হল। উরলি গ্রামের অধিবাসীদের সম্বোধন করে গান্ধীজী বললেন যে, এ সমস্যার সম্মুখীন হবার তিনটি উপায় আছে। এর প্রথমটি হল পুলিসকে খবর দেবার সনাতন পন্থা। প্রায়ই এর ফলে পুলিশ কেবল আরও কিছুটা দুর্নীতিগ্রস্ত হবার সুযোগ পায় এবং যার ক্ষতি হয় তার কোনই সুরাহা হয় না। দ্বিতীয় পন্থা যা সাধারণভাবে গ্রামবাসীরা সবাই অনুসরণ করে থাকে তা হল নিষ্ক্রিয়ভাবে একে বরদাস্ত করা। এর মূল ভীরুতার মধ্যে নিহিত বলে নিন্দনীয়। এর পরিণামে ভীরুতা তো থেকেই যাবে অথচ অপরাধ বৃদ্ধি পাবে। আর তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে নিষ্ক্রিয় হয়ে এইভাবে বরদাস্ত করে নিলে আমরা স্বয়ং ঐ অপরাধের ভাগীদার হই। গান্ধীজী যে তৃতীয় পন্থার সুপারিশ করলেন তা হল শুদ্ধ সত্যাগ্রহের পথ। এর জন্য এমন কি চোর ও অন্যবিধ অপরাধীদেরও আমাদের নিজেদের ভাই বা বোন বলে মনে করা উচিত। অপরাধকে মনে করতে হবে এমন এক ব্যাধি আমাদের ঐসব ভাই-বোনেরা যার শিকার এবং যার হাত থেকে তাদের মুক্ত করে তুলতে হবে। চোর বা অপরাধীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করা ও তাকে শাস্তি দেবার প্রয়াস করার পরিবর্তে আমাদের তাদের ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে হবে এবং যে কারণে সে অপরাধ করেছে তা হৃদয়ঙ্গম করে তার প্রতিকার করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা তাকে কোন হাতের কাজ শিখিয়ে সৎভাবে খেটে খাবার পথ করে দিতে পারেন ও এইভাবে তার জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারেন। তাঁদের বুঝতে হবে যে চোর বা অপরাধী তাঁদের থেকে পৃথক কেউ নয়। প্রত্যুত তাঁরা যদি সন্ধানী আলো ভিতরে ফেলে নিজেদের হৃদয়কে খুঁটিয়ে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে অপরাধীদের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ মাত্রার। যে সব ধনী ও বিত্তবান ব্যক্তি শোষণ ও অন্যান্য আপত্তিজনক উপায়ে ধনার্জন করেন, তাঁরা যে চোর, পকেট কাটে বা সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকে তাদের থেকে কম অপরাধী নন। তফাত শুধু এইটুকু যে ধনীরা মর্যাদার আবরণের পিছনে আশ্রয় গ্রহণ

করেন ও এইভাবে আইনসঙ্গত সাজা এড়িয়ে যান। গান্ধীজী মন্তব্য করলেন যে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে নিজের স্থায়সঙ্গত প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ সঞ্চয় বা জড় করা হয় তাকে চৌর্য আখ্যা দিতে হবে। ধনসম্পদের যদি বুদ্ধিপ্রযুক্ত নিয়ন্ত্রণ হয় ও যদি পরম সামাজিক স্থায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আর কারও চুরি করার দরকার হবে না এবং তাই সমাজে চোরও থাকবে না। গান্ধীজীর পরিকল্পনার স্বরাজে চোর বা অপরাধী থাকবে না। কারণ তা যদি থাকে তাহলে তা কেবল নামেই স্বরাজ হবে। অপরাধীর অস্তিত্ব সামাজিক ব্যাধির নিদর্শন এবং যেহেতু তিনি যেভাবে প্রাকৃতিক চিকিৎসার কথা ভাবেন তাতে শরীর মন ও আত্মা—এই তিনেরই চিকিৎসার নিদান আছে। কেবল শারীরিক ব্যাধিকে উরলি থেকে নির্বাসন দিয়েই তাঁরা সন্তুষ্টি বোধ করবেন না। মন ও আত্মার চিকিৎসাও তাঁদের কাজের অন্তর্গত হবে যাতে তাঁদের মাঝে পরিপূর্ণ সামাজিক শান্তি বিরাজ করে।

সত্যাগ্রহের পথ

অপরাধীর সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁরা যদি প্রাকৃতিক চিকিৎসার পদ্ধতির অনুসরণ করেন (পূর্বেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে এটা সত্যাগ্রহের পদ্ধতি) তাহলে অপরাধের সামনে তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারেন না। একমাত্র পূর্ণ মানবই আত্মলীন হয়ে এই পৃথিবীর দায়দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে পারেন। কিন্তু কেই বা সেই পূর্ণত্বের দাবি করতে পারেন? "অভিজ্ঞ নাবিক ও মাল্লারা গভীর সমুদ্রে হঠাৎ সব কিছু শান্ত হয়ে যাওয়াকে সর্বদাই উদ্বেগের ব্যাপার বলে মনে করেন। সম্পূর্ণ স্তব্ধতা সাগরের ধর্ম নয়। জীবনসমুদ্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। অধিকাংশ সময়ই এখানে দুর্যোগের আবহাওয়া। সত্যাগ্রহী তাই দুর্বৃত্তের প্রতি প্রতিশোধ নেবেন না বা তার কাছে নতিস্বীকারও করবেন না। নিজের চিকিৎসা করে তিনি তার নিরাময় সাধন করবেন। একসঙ্গে তিনি দুই ঘোড়ার সওয়ার হবার চেষ্টা করবেন না। অর্থাৎ একদিকে সত্যাগ্রহের বিধান অনুসরণ করার ভান করবেন এবং অন্যদিকে পুলিসের সাহায্য নেবেন—এ চলবে না। প্রথমোক্ত পন্থা অনুসরণ করার জন্য তিনি দ্বিতীয় পন্থা পরিহার করবেন। তবে দুর্বৃত্ত স্বয়ং যদি পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় তা হবে এক পৃথক ব্যাপার। দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে খবর দিতে প্রস্তুত থাকলে তার হৃদয় স্পর্শ করতে পারা বা তার আস্থাভাজন হবার কথা ভাবা

নিরর্থক। এটা আস্থার অভাবের সূচক। সংস্কারক কদাচ পুলিসের কাছে অভিযোগকারী হতে পারেন না।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি এমন কয়েকটি ঘটনার কথা বললেন যেক্ষেত্রে হিংসাশ্রয়ী বলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁর কাছে দোষ স্বীকার করায় তিনি পুলিসের কাছে সংবাদ দিতে অস্বীকার করেন। যে নিজের দোষ স্বীকার করেছে তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহীকে সাক্ষ্য দিতে কোন পুলিসের কর্তৃপক্ষ বাধ্য করতে পারেন না। সত্যাগ্রহী কদাচ বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হতে পারেন না। অপরাধ ও অপরাধীদের ক্ষেত্রে উরলির অধিবাসীরা সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করুন—এই তিনি চান। তাঁরা অপরাধীদের ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন, প্রেমময় নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করবেন। এইভাবে তাঁরা পাপ ও নোংরা স্বভাব থেকে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করবেন ও তাদের সৎভাবে খেটে খাবার পন্থা শিখিয়ে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন।

হরিজন, ১১-৮-১৯৪৬

॥ ৭৮ ॥

সমাজবাদ ও সত্যাগ্রহ

সমাজবাদে সত্য ও অহিংসা মূর্ত হওয়া চাই। আর এটা সম্ভব করে তোলার জন্য সমাজবাদের অনুরাগীর ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস থাকবে। সত্য ও অহিংসায় নিছক যান্ত্রিক বিশ্বাস থাকলে সঙ্কট মুহূর্তে তা হয়ত ভেঙে পড়বে। এইজন্যই আমি বলেছি যে সত্যই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর এক জীবন্ত শক্তি। আমাদের জীবনও সেই শক্তির অংশ। সে শক্তির অধিষ্ঠান এই দেহে হলেও এই দেহই কিন্তু সেই শক্তি নয়। সেই মহান শক্তির অস্তিত্ব যিনি অস্বীকার করেন সেই অফুরন্ত ক্ষমতার উৎস থেকে তিনি আর বল সংগ্রহ করতে পারেন না এবং এর ফলে তিনি নির্বীর্য হয়ে থেকে যান। তিনি হয়ে পড়েন এক মাস্তুলবিহীন জাহাজের মত যে জাহাজ এখানে ওখানে ঘুরপাক খেতে খেতে একটুও না এগিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ জাতীয় সমাজবাদের সমর্থকরা যে সমাজের বাসিন্দা সেই সমাজের উপকার করবেন কি, তাঁদের নিজেদের জীবনেরই থেই হারিয়ে ফেলেন।

আসল কথা হল এই যে, এই মহান শক্তি ও তার প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার কথা জানা চিরকালই এক শ্রমসাধ্য গবেষণার বিষয়।

আমার দাবি হচ্ছে এই যে সেই অনুসন্ধানের পথরেখা ধরেই সত্যাগ্রহের আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে। অবশ্য এমন দাবি জানানো হচ্ছে না যে সত্যাগ্রহের যাবতীয় বিধান আবিষ্কৃত হয়েছে বা তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয়েছে। নির্ভয়ে ও দৃঢ়তা সহকারে আমি এই কথা বলছি যে, যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যই সত্যাগ্রহের প্রয়োগে অধিগত হতে পারে। এ হল সর্বোচ্চ ও অভ্রান্ত পন্থা—মহত্তম শক্তি। অপর কোন পন্থায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক আর্থিক ও নৈতিক—সর্ববিধ পাপ থেকে সমাজকে শক্ত করতে পারে সত্যাগ্রহ।

হরিজন, ২০-৭-১৯৪৭

দশম খণ্ড ঃ প্রশ্নোত্তর

॥ ৭৯ ॥

বনিয়াদী অঙ্গীকার

জনৈক বিশিষ্ট পত্রলেখক যিনি বহু বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের অহিংস প্রতিরোধের কার্যক্রম ছাত্রের মত অধ্যয়ন করে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তিনি খুব প্রাঞ্জল যুক্তিসহ কয়েকটি সন্দেহের কথা ব্যক্ত করেছেন।··· সত্যাগ্রহের জন্য তিনটি বনিয়াদী অঙ্গীকারের কথা বলে তিনি এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে সর্বাবস্থায় ভারতবর্ষ এগুলি পূর্ণ করতে পারবে বলে মনে হয় না।

প্রস্তাবিত বনিয়াদী অঙ্গীকারগুলি হল :

১। স্বাধীনতার ইচ্ছা ও দাবির ব্যাপারে জনসাধারণের ভিতর পূর্ণ ঐক্য ;

২। সমগ্রভাবে জনসাধারণ এই নীতির যাবতীয় খুঁটিনাটি মেনে

নিয়ে তাকে নিজেদের মধ্যে রূপায়িত করবেন যার পরিণাম স্বরূপ প্রতিশোধ অথবা আত্মরক্ষাবৃত্তি চালিত হয়ে মানুষের ভিতর হিংসার শরণ নেবার যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তার উপর যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ; এবং (এইটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ)

৩। এই অনন্ত বিশ্বাস যে অগণিত জনসাধারণ কর্তৃক নিগ্রহ বরণ করার দৃশ্য আক্রমণকারীর হৃদয় দ্রবীভূত করবে এবং তাঁকে তাঁর হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে প্রবুদ্ধ করবে।

অহিংসারূপী প্রতিকারের প্রয়োগের জন্য সম্পূর্ণ ঐক্য অপরিহার্য শর্ত নয়। তা যদি হত তাহলে এই প্রতিকারের পন্থার কোন বৈশিষ্ট্য আছে বলে বলা চলত না। কারণ সম্পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে তো চাইবামাত্র স্বাধীনতা পাওয়া যায়। আমি কি বার বার এ কথা বলি নি যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এমন কি জনকয়েক খাঁটি সত্যাগ্রহীই যথেষ্ট। আমি বিশ্বাস করি যে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত সৈন্যদলের তুলনায় অনেক কমসংখ্যক সত্যাগ্রহীর প্রয়োজন আমাদের ঘটবে এবং বিভিন্ন জাতি অস্ত্রশস্ত্রের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করেন তার তুলনায় এর ব্যয় হবে নগণ্য।

দ্বিতীয় অঙ্গীকারটিও আবশ্যিক নয়। সত্যাগ্রহ নীতির যাবতীয় খুঁটিনাটি সমগ্র জনসাধারণের প্রত্যেককে যদি নিজেদের মধ্যে রূপায়িত করতে হয় তাহলে তাদের আর সত্যাগ্রহ করা চলে না। আমি নিজেই এ দাবি করতে পারি না যে আমি সত্যাগ্রহ নীতির সব কিছুর আত্তীকরণ করেছি—এমন কি আমার পক্ষে এ দাবি করাও সম্ভবপর নয় যে আমি এর সবগুলি জানি। সেনাবাহিনীর কোন সৈনিক যেমন রণবিজ্ঞানের সবটুকু জানেন না তেমনি সত্যাগ্রহীও সম্পূর্ণ সত্যাগ্রহ-বিজ্ঞান জানেন না। নিজের নেতার উপর তাঁর যদি বিশ্বাস থাকে, তাঁর নির্দেশ যদি তিনি সততা সহকারে পালন করেন এবং তথাকথিত শত্রুর বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ না করে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত থাকেন তাহলেই যথেষ্ট।

তৃতীয় অঙ্গীকারটি পূর্ণ করতে হবে। আমি হলে একে ভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ করতাম। কিন্তু এর পরিণাম একই হত।

আমার বন্ধু বলেছেন যে তৃতীয় অঙ্গীকারটির সপক্ষে কোন নজির নেই। একমাত্র সম্ভাব্য ব্যতিক্রমরূপে তিনি অশোকের উদাহরণ পেশ করেছেন। আমার উদ্দেশ্যের জন্য অবশ্য অশোকের উদাহরণ অপ্রয়োজনীয়। আমি স্বীকার

করছি যে কোন ঐতিহাসিক উদাহরণের কথা আমার জানা নেই। আর এইজন্যই আমি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনন্য এই দাবি করেছি। পরিবার এবং এমন কি গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা যা করি তার উদাহরণ নিয়ে আমি আমার পক্ষের যুক্তি প্রদর্শন করেছি। সমগ্র মানব-সমাজ একটি বিরাট পরিবার। আর ব্যক্ত প্রেম যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তাহলে তা সমগ্র মানব-সমাজের উপর প্রযুক্ত হবেই। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ এই নীতি এমন কি বর্বরের উপর প্রয়োগ করেও যদি সফল হয়ে থাকে তাহলে একটি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে—যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তারা বর্বর—কেন সফলকাম হবে না? আর ইংরেজদের ক্ষেত্রে আমরা যদি সফল হই, তাহলে নিঃসন্দেহে তা এই বিশ্বাসেরই সম্প্রসারণ যে অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃতি-সম্পন্ন বা অনুদার জাতির ক্ষেত্রেও আমরা সফল হব। আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যদি নির্ভেজাল অহিংস প্রচেষ্টায় ইংরেজদের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করি তাহলে অপরের ক্ষেত্রেও আমরা সাফল্য অর্জন করব। অর্থাৎ অহিংসার দ্বারা আমরা যদি স্বাধীনতা অর্জন করি তাহলে ঐ একই অস্ত্রে আমরা তার সংরক্ষণও করতে পারব। আর সে বিশ্বাসের সৃষ্টি যদি আমাদের ভিতর হয়ে না থাকে তাহলে আমাদের অহিংসা নিছক কৌশল-সাধক, এ খাদযুক্ত মিশ্রধাতু—খাঁটি সোনা নয়।

হরিজন, ২২-১০-১৯৩৮

॥ ৮০ ॥

সত্যাগ্রহীর যোগ্যতা

বিহারের বৃন্দাবনে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বাৎসরিক সম্মেলনে উদ্ঘাটন-ভাষণ দান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, সত্যাগ্রহীর অন্যতম অপরিহার্য যোগ্যতা হল ঈশ্বর-বিশ্বাস। জনৈক সদস্য প্রশ্ন করলেন যে, কোন কোন সমাজবাদী বা সাম্যবাদী যাঁরা কিনা ঈশ্বর-বিশ্বাসী নন তাঁরা কি সত্যাগ্রহী হতে পারেন না?

"আমার আশঙ্কা হচ্ছে তাঁরা পারেন না। কারণ ঈশ্বর ছাড়া সত্যাগ্রহীর অপর কোন অবলম্বন নেই। যাঁর অপর কোন শরণ বা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন আছে তিনি সত্যাগ্রহ করতে পারেন না। তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী,

অসহযোগকারী অথবা ঐ রকম আর কিছু হতে পারেন—কিন্তু যথার্থ সত্যাগ্রহী হতে পারবেন না। আপনারা অবশ্য এই যুক্তি পেশ করতে পারেন যে এর ফলে সাহসী সাথীদের বর্জন করা হবে এবং এমন সব লোকদের কোল দেওয়া হবে যাঁরা মুখে ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা বললেও দৈনন্দিন জীবনে সে বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠা নেই। আমি তাঁদের কথা বলছি না যাঁদের নিজ বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠা নেই, আমি বলছি তাঁদের কথা যাঁরা ঈশ্বরের নামে নিজ আদর্শের জন্য সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আমাকে যেন এই প্রশ্ন করবেন না যে আমি এই নীতির কথা আজ কেন বলছি? বিশ বৎসর পূর্বে কেন বলি নি? আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমি ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ নই—ভুল-ভ্রান্তিকারী সাধারণ মনুষ্য এবং ভুল-ভ্রান্তির ভিতর থেকেই সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছি। একজন প্রশ্ন করেছেন, 'তাহলে বৌদ্ধ ও জৈনদের কি হবে?' এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল এই যে বৌদ্ধ ও জৈনরা যদি নিজেরা এ আপত্তি তোলেন এবং বলেন যে এমন কঠিন নিয়ম করলে তাঁরা অযোগ্য প্রতিপাদিত হবেন তাহলে আমি বলব যে আমি তাঁদের সঙ্গে সহমত।

"তবে আমি একথা আদৌ বলতে চাই না যে আমি যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী আপনারাও সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন। আপনাদের সংজ্ঞার্থ আমার থেকে ভিন্ন হলেও সেই ঈশ্বরের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস যেন শেষ অবধি আপনাদের প্রধান অবলম্বন হয়। এটা এমন কোন পরম শক্তি বা সত্তা হতে পারে যার ব্যাখ্যা করা যায় না; কিন্তু এর উপর বিশ্বাস অপরিহার্য। ঈশ্বরের কাছ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তার সহায়তা ছাড়া কোন প্রতিবাদ বা টুঁ শব্দ না করে সব রকমের অত্যাচার সহন করা অসম্ভব। একমাত্র তাঁর বলেই আমরা বলী। আর সেই অপ্রমেয় শক্তির কাছে যাঁরা নিজেদের সব চিন্তা-ভাবনা বিসর্জন দিতে পারেন তাঁরাই বিশ্বাসী।"

অপর এক প্রসঙ্গে এই একই বিষয় সম্বন্ধে একই ভাবে আলোচনার সময় *গান্ধীজী বললেন, "ইংরাজী ভাষায় বর্তমানে 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার' বা পর্বত-*প্রমাণ ভুল নামে যে শব্দটি চালু হয়েছে এবং প্রায়ই যে শব্দটি আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় তার কথা বোধ হয় আপনারা জানেন। একটি গুজরাতী শব্দের ইংরাজী অনুবাদের জন্য আমি শব্দটির সৃষ্টি করেছিলাম। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে খেড়া ও আমেদাবাদের জনসাধারণের কাছে অহিংস আইন অমান্য

আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ করে আমি যে ভুল করেছিলাম তার নিন্দা করার জন্য আমি শব্দটি ব্যবহার করি। খেড়াতে অপর যে কোন জেলার তুলনায় অপরাধের সংখ্যা বেশী। সেখানকার লোকেরা মুখে 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়' বলে রেল লাইন উপড়ে ফেলে এবং রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করে। কপালের জোর থাকায় রেল দুর্ঘটনায় যে শত শত সৈনিক মারা যেতে পারতেন মারা যান নি। আমেদাবাদের কলের শ্রমিকরাও অনুরূপ কার্য করেন। অনসূয়া বেন গ্রেপ্তার বা প্রহৃত হয়েছেন—এই মিথ্যা গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই শুনে তাঁরা থানা আক্রমণ করেন, জনৈক ইংরেজ সার্জেন্টকে ধরে তাঁকে হত্যা করে প্রকাশ্য রাজপথে তাঁর মৃতদেহ দাহ করেন। তাঁরা টেলিগ্রাফ অফিস পোড়ান এবং আরও বহু ক্ষতিসাধন করেন। আমি বুঝতে পারলাম যে যাঁরা কখনও অহিংস আইন অমান্যের কলা শেখেন নি, তাঁদের কাছে এই কর্মসূচী পেশ করে আমি পর্বত-প্রমাণ ভুল করেছি। স্বভাবতই যাঁরা সহজ প্রবৃত্তি বশে আইন মেনে চলেন তাঁরা এই কলা শেখেন। আত্মার স্বভাবই আইন মেনে চলা। দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি ছেলেদের নাম রেজিস্ট্রী করতে চাই নি অথবা তাদের টিকা নিতে দিতেও ইচ্ছুক ছিলাম না। কিন্তু আমি প্রচলিত আইন মেনেছিলাম। কিন্তু তারপর আমি দৃঢ় টিকা দেওয়ার বিরোধী হয়ে উঠলাম। জেলে থাকা-কালীন টিকা দেবার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু তাঁরা একথা জানতেন যে আমি রাষ্ট্রের যাবতীয় নাগরিক ও নৈতিক বিধান মানি এবং তাই তাঁরা টিকা দেওয়া সম্বন্ধে আমার বিবেকের নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এই আনুগত্য থেকেই অহিংস আইন অমান্যের যোগ্যতার সৃষ্টি এবং তাই আমার অহিংস আইন অমান্য আমার উপযুক্ত।"

হরিজন, ৩-৬-১৯৩৯

॥ ৮১ ॥

সম্পত্তির ক্ষতি করা

প্রশ্ন : আপনি জানেন যে বহু কংগ্রেস কর্মী খোলাখুলি এই কথা প্রচার করেন যে সম্পত্তির ক্ষতি করায় অর্থাৎ রেল থানা ইত্যাদি দখল না করে তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে এবং টেলিগ্রাফের খুঁটি ও ডাকবাক্স ইত্যাদি নষ্ট করলে তা হিংসা হয় না।

উত্তর : এই জাতীয় যুক্তি-প্রণালী আমি কখনও বুঝে উঠতে পারি নি। এটা খাঁটি হিংসা। সত্যাগ্রহ হল আত্মনিগ্রহ অপরকে নিগৃহীত করা নয়। সময় সময় কাউকে দৈহিক আঘাত করার চেয়ে তার সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া বেশী হিংসামূলক হয়ে থাকে। সত্যাগ্রহী নামে আখ্যাতরা জরিমানা দেওয়া অথবা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে দেবার থেকে জেলে যাওয়া কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি? আমার জনৈক সমালোচক বোধ হয় ঠিকই বলেছেন যে বিভেদকারী আনুগত্য যা কিনা শেষ অবধি স্থায়ী হতে চলেছে, শেখানোর ব্যাপারে আমি সাফল্য অর্জন করলেও জনসাধারণকে সুকঠিন অহিংসার কলা শিক্ষা দেবার ব্যাপারে আমি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছি। তিনি আরও বলেছেন যে তাড়াহুড়ো করে আমি ঘোড়ার সামনে গাড়িকে জুতেছি এবং তাই অহিংস আইন অমান্য সম্বন্ধে আমার যাবতীয় উক্তি যদি আরও নিন্দনীয় কিছু না হয়ে থাকে তো তা মূর্খতা তো বটেই। এ সমালোচনার সন্তোষজনক উত্তর আমি দিতে অক্ষম। আমি স্বয়ং এক অকিঞ্চিৎকর নশ্বর দেহধারী মানুষ। নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ঐকান্তিক আন্তরিকতায় আমি বিশ্বাসী। তবে এমনও হতে পারে যে আমার মৃত্যুর পর আমার চৈত্য-লিপিতে শুধু এইটুকুই লেখা সমীচীন হবে যে, "ইনি চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।"

হরিজন, ১৩-৪-১৯৪০

॥ ৮২ ॥

তিনটি প্রশ্ন

১। সত্যাগ্রহীরা (অর্থাৎ যাঁরা সত্যাগ্রহের 'সঙ্কল্প-পত্রে দস্তখত করেছেন) গ্রেপ্তার হলে তাঁরা কি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লোক নিয়োগ করতে পারেন?

২। গ্রেপ্তার হবার পর অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভের জন্য তাঁরা কি 'ক' বা 'খ' শ্রেণীভুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করবেন?

৩। কারাবাসের সময় সত্যাগ্রহী কি তাঁর উপর যে সব শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে তা স্বীকার করে নেবেন না তিনি যাকে অধিকতর মানবোচিত ও সন্তোষজনক ব্যবহার মনে করেন তা পাবার জন্য চেষ্টা করবেন?

উত্তর

১। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লোক নিয়োগ করায় আপত্তি নেই এবং আজমীরের মোকদ্দমার মত কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

২। আমার মতে তাঁর কয়েদী হিসাবে শ্রেণী পরিবর্তনের কোন প্রয়াস করা উচিত নয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি কারাগারে শ্রেণীবিভাজনের বিরুদ্ধে।

৩। মানবোচিত পরিবেশ আনার জন্য সর্বপ্রকারের ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টা করার তিনি অধিকারী।

হরিজন, ২৫-৫-১৯৪০

॥ ৮৩ ॥

সারমন অন দি মাউণ্ট

প্রশ্ন: মাঝে মাঝে আপনি সারমন অন দি মাউণ্টের কথা বলেন। আপনি কি তার এই নীতিতে বিশ্বাসী যে, "কেউ যদি তোমার জামা নিয়ে নেয় তবে তাকে তোমার উত্তরীয়ও দিয়ে দাও?" অহিংস আদর্শের যুক্তি-যুক্ত পরিণাম কি এই নয়? তা যদি হয় তবে কোন গ্রামের দুর্বল ও দরিদ্র কৃষককে কি আপনি আজকাল প্রায়ই জমিদাররা যেভাবে তাদের আবাদী জমি বা রায়তী স্বত্বে জবরদখল করেন তা হাসিমুখে স্বীকার করে নিতে বলবেন?

উত্তর: হঁ্যা, অত্যাচারীর জমি ছেড়ে দেবার জন্ম আমি নিঃসঙ্কোচে পরামর্শ দেব। এটা হবে জামা চাইলে উত্তরীয়টিও দিয়ে দেবার মত। যা প্রয়োজন নেওয়া লাভজনক হতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত কাউকে দিলে তার কাছে তা বোঝা হয়ে দাঁড়ানোর খুবই সম্ভাবনা। পাকস্থলী বেশী করে ভরার অর্থ ধীরগতিতে মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো। জমিদার চান খাজনা, জমি ফেরত চান না। যখন তিনি জমি চান না তখন তাঁকে তা দিয়ে দিলে তার কাছে বোঝার মত হবে। কোন দস্যুকে যখন তার চাহিদার বেশী দেন তখন তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। এটা তার কাছে একটা আঘাতের মত হয়ে দাঁড়ায়। সে এতে অভ্যস্ত নয়। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে এ জাতীয় অহিংস আচরণ অন্যায়কারীর উপর সুস্থ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তবে যান্ত্রিকভাবে এটা করা যায় না; এর উৎস হল অপর পক্ষের প্রতি আস্থা এবং প্রেম ও করুণা। তবে আমার উত্তরের যাবতীয় বাহ্য তাৎপর্য নিয়ে এখনই মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এটা করতে গেলে কানাগলির মধ্যে পড়তে হবে। এখানে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন তাতে যীশু অত্যন্ত মনোরম ও হৃদয়স্পর্শীভাবে অহিংস অসহযোগের মহান নীতি উপস্থাপিত করেছেন। ঘুষির বদলে ঘুষি ফিরিয়ে দিলে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সঙ্গে আপনার অসহযোগ হিংসাভিত্তিক হয়ে পড়ে এবং শেষ অবধি এ জাতীয় অসহযোগ কার্যকরী হয় না। আর বিরুদ্ধপক্ষীয় যেটুকু চান তার বদলে সব কিছু দিয়ে দিলে আপনার অসহযোগ হয় অহিংস।

আপনার বাহ্য সহযোগিতার দ্বারা তাকে আপনি এই পদ্ধতিতে চিরতরে নিরস্ত্র করে ফেলবেন এবং এই সহযোগিতা প্রত্যুত সম্পূর্ণ অসহযোগ।

হরিজন, ১৩-৭-১৯৪০

॥ ৮৪ ॥

একক সত্যাগ্রহী কি করতে পারেন?

প্রশ্ন : ধরে নিন কোন গ্রামে মাত্র একজন সত্যাগ্রহী আছেন। গ্রামের অন্যান্যেরা হিংসা অহিংসা নিয়ে মাথা ঘামান না। এই রকম সত্যাগ্রহী কোন্ ধরনের অনুশীলন করবেন?

উত্তর : আপনার প্রশ্নটি ভাল। একক সত্যাগ্রহীকে আত্মনিরীক্ষা করতে হবে। তাঁর ভিতর যদি বিশ্বজনীন প্রেমভাব থাকে এবং তিনি যদি সেই অবস্থায় প্রযোজ্য যাবতীয় শর্ত পূর্ণ করেন তাহলে তাঁর দৈনন্দিন আচরণে তা অভিব্যক্ত হবে। সেবার বন্ধনে তিনি গ্রামের দরিদ্রতম ব্যক্তিটির সঙ্গেও আবদ্ধ থাকবেন। স্বয়ং তিনি হবেন ঝাড়ুদার, রোগী পরিচর্যাকারী, মামলা-মোকদ্দমার সালিশী এবং গ্রামের শিশুদের শিক্ষক। বাল বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই তাঁকে চিনবেন; গৃহী হলেও তিনি সংযমী জীবনযাপন করবেন। নিজের ও প্রতিবেশীদের সন্তানদের মধ্যে তিনি কোন ভেদভাব রাখবেন না; তাঁর নিজের বলতে কোন সম্পত্তি থাকবে না—তাঁর কাছে যা কিছু সম্পদ থাকবে অপরের জন্য ন্যাসীরূপে তিনি তার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তাই নিছক প্রয়োজনপূর্তির জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী তা থেকে তিনি খরচ করবেন না। আর তাঁর প্রয়োজনীয়তাও হবে যথাসম্ভব দরিদ্র ব্যক্তিদের সমান। তিনি অস্পৃশ্যতা মানবেন না এবং তাই সর্ব জাতি ও পথের লোকেরা আস্থা সহকারে তাঁর কাছে আসতে অনুপ্রেরিত হবে।

আদর্শ সত্যাগ্রহী হবেন এই রকম। যেখানে আদর্শের তুলনায় তাঁর ভিতর কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে আমাদের বন্ধুটি তার সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার ফাঁক পূর্ণ করবেন এবং এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করবেন না। তাঁর গৃহ হবে সুতা কাটাকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনীয় কাজের ব্যস্ত মধুচক্র। তাঁর গৃহস্থালী হবে সুশৃঙ্খল।

এরকম সত্যাগ্রহী বেশী দিন একা থাকবেন না। গ্রামবাসীরা অচেতনভাবে তাঁকে অনুসরণ করবেন। তবে গ্রামবাসীরা তা করুন বা না-ই করুন সঙ্কটমুহূর্তে তিনি এককভাবে তার মোকাবিলা করবেন অথবা সেই প্রয়াসে প্রাণ বিসর্জন দেবেন।...তবে একটি গ্রামের ক্ষেত্রে এইভাবে কোন মানুষের পক্ষে কোন না কোন দিন তাঁর আশা পূর্ণ করা সম্ভবপর হলেও সমগ্র ভারতবর্ষের রূপ পরিবর্তনের জন্য একজনের জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত সময়। তবে একজন যদি একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে পারেন তাহলে তিনি এমন একটি নমুনা পেশ করবেন যা সম্ভবতঃ কেবল এই দেশই নয়—সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই অনুকরণযোগ্য। এর চেয়ে বেশী সত্যসন্ধানী কেউ যেন আশা না করেন।

হরিজন, ৪-৮-১৯৪০

॥ ৮৫ ॥

অহিংস অসহযোগ

আমি বলেছি যে আমাদের নির্ভেজাল অহিংস অসহযোগ করতে হবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ যদি এতে সাড়া দিয়ে সম্মিলিতভাবে এটা করে তাহলে আমি প্রমাণ করতে পারি যে এক বিন্দু রক্তপাত বিনাই জাপানীদের অথবা একাধিক জাতির সম্মিলিত অস্ত্রবলকে নির্বীর্য করে দেওয়া যায়। এর জন্য ভারতের এই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রয়োজন যে কোনক্রমেই আত্মসমর্পণ করা হবে না এবং এর জন্য প্রয়োজন পড়লে কয়েক লক্ষ প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে এই মূল্য দেওয়াকে আমি অত্যন্ত সস্তা বলে মনে করব এবং এই মূল্যে যে বিজয় অর্জিত হবে তাও হবে গৌরবজনক। ভারতবর্ষ হয়ত এই মূল্য দিতে রাজী নাও হতে পারে। আমি আশা করব আমার এই আশঙ্কা মিথ্যা হবে। তবে যে দেশই নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চাক না কেন তাকে এ জাতীয় কোন না কোন মূল্য দিতেই হবে। রুশবাসী ও চীনারাও তো ইতিমধ্যেই প্রভূত আত্মত্যাগ করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আক্রমণকারী বা আত্মরক্ষাকারী যাই হোক না কেন, অপরাপর দেশের সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। অপরিসীম মূল্য দিতে হয়। সুতরাং অহিংস পদ্ধতি

গ্রহণ করতে বলে আমি ভারতবর্ষকে অপরাপর দেশ যে ঝুঁকি নিচ্ছে তার থেকে বেশী কিছু করতে বলছি না। সশস্ত্র প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত করলেও ভারতবর্ষকে এতটা ঝুঁকি নিতে হত।

হরিজন, ২৪-৫-১৯৪২

॥ ৮৬ ॥

নাশকতামূলক কার্য

জনৈক বন্ধু গান্ধীজীর সমক্ষে তাঁর কয়েকটি সন্দেহের কথা ব্যক্ত করলেন। সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করা কি হিংসা? "আপনি বলে থাকেন যে কারও অপরের কোন সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার নেই। তাই যদি হয়, সরকারী সম্পত্তি কি আমার নয়? আমি মনে করি যে সে সম্পত্তি আমার এবং আমি তা ধ্বংস করতে পারি।"

গান্ধীজী জবাব দিলেন, "আপনার যুক্তিতে দুটি হেত্বাভাস আছে। প্রথমে সরকারী সম্পত্তিকে যদি জাতীয় সম্পত্তি বলে ধরি (আজ যদিও তা নয়) তাহলে সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও তা নষ্ট করা উচিত নয়। প্রত্যেকেই যদি মনে করেন যে সরকারের কোন না কোন কাজ পছন্দ নয় বলেই তাঁর সেতু, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তা ইত্যাদি ধ্বংস করার অধিকার আছে তাহলে জাতীয় সরকারও এমন কি এক দিনের জন্যও কাজ চালাতে পারবেন না। তাছাড়া পাপের বাসা সেতু, রাস্তা ইত্যাদিতে নয়। এগুলি তো নিষ্প্রাণ বস্তু। পাপের বাসা হল মানুষের ভিতর। সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট ব্যক্তির কারবার মানুষের সঙ্গে। বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে সেতু ইত্যাদি ধ্বংস করা এই পাপকে স্পর্শ করতে পারে না। এর ফলে পক্ষান্তরে যে পাপের নিরাকরণ চাওয়া হয় তার থেকেও খারাপ এক পাপের সৃষ্টি হয়।"

হরিজন, ১০-২-১৯৪৬

॥ ৮৭ ॥

গুণ্ডামির সামনে সত্যাগ্রহ

অনেক বন্ধু নম্রভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে গুণ্ডাদের দ্বারা লুঠতরাজ বন্ধ করার জন্য সত্যাগ্রহী কি করবেন? সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বুঝতে পারলে তিনি এ প্রশ্ন করতেন না।

যা উচিত মনে হচ্ছে তার জন্য একা হলেও এমন কি প্রাণ বিসর্জন করা সত্যাগ্রহতত্ত্বের সারাংসার। এর বেশী কোন মানুষ করতে পারে না। তলোয়ারে সজ্জিত কোন মানুষ কয়েকজনের মাথা কেটে ফেলতে পারেন। কিন্তু শেষ অবধি অধিকতর বলশালী কোন ব্যক্তির কাছে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, অথবা লড়াই করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। সত্যাগ্রহীর তলোয়ার হল ভালবাসা ও এর থেকে উদ্ভূত অবিচল দৃঢ়তা। শত শত গুণ্ডা তাঁর সম্মুখীন হলেও তিনি তাঁদের নিজের ভাই-এর মত মনে করবেন এবং তাঁদের হত্যা করার চেষ্টা করার পরিবর্তে তাঁদের হাতে নিহত হয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন।

ব্যাপারটা সহজ এবং সরল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অনেকের মধ্যে কি করে একক একজন সত্যাগ্রহী সফল হতে পারেন? বোম্বাই শহরে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের জন্য শত শত গুণ্ডা বেরিয়ে পড়েছিল। এককভাবে কোন সত্যাগ্রহী এক্ষেত্রে সমুদ্রের মধ্যে বিন্দুবৎ হবেন। এই হল পত্রলেখকের যুক্তি।

আমার জবাব এই যে সত্যাগ্রহী একা হন অথবা সহকর্মী-পরিবৃত, বিপদের সামনে থেকে তিনি পালিয়ে যাবেন না। লড়াই করতে করতে যদি তিনি মারা যান তবে তিনি যথাযথভাবে নিজ কর্তব্য করেছেন বলা হবে। সশস্ত্র যুদ্ধের বেলায়ও এই একই ব্যাপার প্রযোজ্য। তবে সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য। তাছাড়া একের আত্মত্যাগ অনেককে আত্মত্যাগে প্রবুদ্ধ করবে এবং সম্ভবতঃ বৃহত্তর পরিণাম সৃষ্টি করবে। এ সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে। তবে ফলের ইচ্ছার প্রলোভন সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান যুগে প্রতিটি নর-নারীর আত্মরক্ষার কলা শিক্ষা করা উচিত। পশ্চিমে অস্ত্রের দ্বারা এটা করা হয়ে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে সৈন্যবাহিনীর কোন না কোন কাজে বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহের প্রশিক্ষণের

ব্যাপারে নর-নারী বা ছোট-বড়র বাছবিচার নেই। এক্ষেত্রে দেহের বদলে মানসিক প্রশিক্ষণেরই গুরুত্ব বেশী। আর মানসিক প্রশিক্ষণে বাধ্যতামূলক ব্যাপারের স্থান নেই। চতুর্দিকের পরিবেশের প্রভাব অবশ্যই মনের উপর পড়ে; কিন্তু তার জন্য জোর-জবরদস্তির সমর্থন করা যায় না।

এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে দোকানদার, ব্যবসায়ী, কারখানার মজুর, শ্রমিক, কৃষক, কেরানী—অর্থাৎ সংক্ষেপে সকলকেই সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাওয়া কর্তব্যজ্ঞান করতে হবে।

সত্যাগ্রহ সর্বদাই সশস্ত্র প্রতিরোধের থেকে শ্রেয়। তবু তর্কের দ্বারা নয়, প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা কার্যকরীভাবে এটা প্রমাণ করা যেতে পারে। এ অস্ত্র বলবানের আয়ুধ। দুর্বল কদাচ এর শরণ নিতে পারে না। দুর্বল বলতে এখানে দৈহিক দিক থেকে ক্ষীণ নয়, মন ও তেজের দিক থেকে ক্ষীণবলকে বোঝানো হচ্ছে। দৈহিক ক্ষীণতা একটা প্রশংসনীয় গুণ, এর জন্য দুঃখ করার কারণ নেই।

সত্যাগ্রহের অপর একটি সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও আমাদের জানা উচিত। অন্যায় কারণের সমর্থনে এর প্রয়োগ করা যায় না।

প্রতিটি গ্রামে এবং শহরের প্রত্যেক মহল্লায় সত্যাগ্রহ দলের সংগঠন করা যায়। এর সদস্য এমন ব্যক্তিরা হবেন যাঁদের সংগঠকরা ভাল করে জানেন। এই দিক থেকেও সত্যাগ্রহের সঙ্গে সশস্ত্র প্রতিরোধের পার্থক্য আছে। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য সরবার সবার সেবা পাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সত্যাগ্রহ দলে কেবল তাঁরাই যোগ দেবার অধিকারী যাঁরা অহিংসা ও সত্যে বিশ্বাসী। সেইজন্য যাঁদের 'দলে' নেওয়া হবে তাঁদের সম্বন্ধে সংগঠকদের ঘনিষ্ঠভাবে জানা প্রয়োজন।

হরিজন, ১৭-৩-১৯৪৬

॥ ৮৮ ॥

সত্যাগ্রহ ব্যাপক অস্ত্র

প্রশ্ন: দরিদ্রের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে ধনীদের সচেতন করে তোলার ব্যাপারে সত্যাগ্রহের স্থান কি?

উত্তর: বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে এর যা ভূমিকা এক্ষেত্রেও তাই। সত্যাগ্রহ বিশ্বজনীন প্রয়োগের এক বিধান। পরিবার থেকে শুরু করে যে কোন ক্ষেত্রে

এর প্রয়োগ সম্প্রাসরিত হতে পারে। ধরুন কোন জমির মালিক তাঁর রায়তদের শোষণ করছেন এবং তাঁদের পরিশ্রমের ফল নিজের উপভোগের জন্য গ্রাস করে নিয়ে তাঁদের বঞ্চিত করছেন। তাঁর কাছে রায়তেরা এ নিয়ে অনুযোগ করলে তিনি তাতে কর্ণপাত করছেন না এবং এই বলে আপত্তি করছেন যে তাঁর স্ত্রীর জন্য এত চাই, ছেলেপিলেদের জন্য চাই এত ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জাতীয় রায়ত এবং তাঁর পক্ষ সমর্থনকারী প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রথমে তাঁর স্ত্রীর কাছে আবেদন করবেন যাতে তিনি তাঁর স্বামীকে বোঝান। তিনি সম্ভবতঃ বলবেন যে তাঁদের নিজের জন্য স্বামীর শোষণের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ প্রয়োজন নেই। আর সন্তানেরাও হয়ত বলবেন যে তাঁদের যা প্রয়োজন তা তাঁরা রোজগার করে নেবেন।

ধরে নেওয়া যাক যে জমির মালিক এসব কোন কথাতেই কর্ণপাত করছেন না অথবা তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা রায়তদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। এ অবস্থাতেও রায়তেরা আত্মসমর্পণ করবেন না। বললে তাঁরা জমি ছেড়ে চলে যাবেন কিন্তু তাঁরা স্পষ্ট করে বলে দেবেন যে যিনি চাষ করেন জমি তাঁরই। জমির মালিক সব জমি নিজের হাতে চাষ করতে পারবেন না এবং তাই তাঁকে রায়তের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিতেই হবে। হয়ত কোথাও পূর্বতন রায়তদের বদলে মালিক নূতন রায়ত আমদানি করতে পারেন। সে অবস্থায় হিংসা বাদ দিয়ে আর সব রকমের আন্দোলনই চলবে যতক্ষণ না নবাগত রায়তরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারছেন এবং উচ্ছেদকৃত রায়তদের সঙ্গে সমরস হচ্ছেন। অতএব সত্যাগ্রহ হল জনমত সৃষ্টি করার একটি মাধ্যম যাতে সমাজের তাবৎ অঙ্গকে স্পর্শ করা যায় ও শেষ অবধি এ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। হিংসা এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এবং সমগ্র সামাজিক কাঠামোর সত্যকার বিপ্লবকে বিলম্বিত করে।

সত্যাগ্রহের সাফল্যের শর্ত হল: (১) বিরুদ্ধপক্ষীয়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহীর হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ থাকবে না, (২) যে উদ্দেশ্য নিয়ে সত্যাগ্রহ হবে তা যেন সত্য ও বাস্তবিক হয় এবং (৩) নিজ আদর্শের জন্য সত্যাগ্রহী যেন শেষ পর্যন্ত কষ্টবরণে প্রস্তুত থাকেন।

হরিজন, ৩১-৩-১৯৪৬

একাদশ খণ্ড ঃ সিদ্ধান্ত

॥ ৮৯ ॥

অহিংসায় আমার বিশ্বাস

আমি দেখেছি যে ধ্বংসের মধ্যেও জীবন ক্রিয়াশীল থাকে এবং তাই মনে হয় বিনাশের চেয়েও বড় কোন বিধান এই বিশ্বে আছে। একমাত্র সেই বিধানের আওতাতেই সুব্যবস্থিত সমাজ-ব্যবস্থার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং সেই পরিবেশে বেঁচেও সুখ। আর এই যদি জীবনের বিধান হয় তাহলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একে আমাদের রূপায়িত করতে হবে। চলার পথে যেখানেই বিসংবাদ বা বিরোধীর সম্মুখীন হবেন প্রেম দ্বারা তাকে জয় করুন। আমার নিজের জীবনে এই নীতিকে আমি স্থূলভাবে প্রয়োগ করেছি। তবে তার অর্থ এই নয় যে আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তবে আমি দেখেছি যে ধ্বংসের বিধান কদাচ যে সমস্যার সমাধান করতে পারত না প্রেমের এই বিধান সেখানে সফল হয়েছে। ভারতবর্ষে আমরা যথাসম্ভব ব্যাপকতম ভাবে এই বিধানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করেছি। তবে তার কারণ আমি একথা দাবি করতে পারি না যে ত্রিশ কোটি জনসাধারণের ভিতরই অহিংসা অধিষ্ঠিত হয়েছে। তবে অবশ্যই আমি এই দাবি করি যে অপর যে কোন বাণীর তুলনায় অহিংসা তাঁদের ভিতর বেশীমাত্রায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাও এক অবিশ্বাস্য রকমের স্বল্প সময়ে। আমরা সবাই সমপরিমাণে অহিংস ছিলাম না এবং অধিকাংশের ক্ষেত্রেই অহিংসা হচ্ছে কার্যসিদ্ধির একটা উপায়। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি আপনাদের এই সত্য খুঁজে বার করতে বলি যে অহিংসার পরিত্রাণকারী আওতায় দেশ প্রভূত পরিমাণ প্রগতি করেছে কিনা।

মনের দিক থেকে অহিংস হতে হলে যথেষ্ট শ্রমসাধ্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কেউ কেউ পছন্দ না করলেও অহিংসানিষ্ঠের দৈনন্দিন জীবনেও সৈনিকদের জীবনের মতই এক ধরনের নিয়মন বা অনুশাসন দরকার। তবে আমি একথা মানি যে মনের সোৎসাহ সহযোগিতা না থাকলে কেবল বাহ্য রীতিনীতি নিছক একটা মুখোশে পর্যবসিত হবে যা সেই ব্যক্তি এবং অপর সকলের পক্ষে

ক্ষতিকারক হবে। কায়মনোবাক্যে যখন সমরস হওয়া যায় তখনই কেবল আদর্শ স্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে চিরকালই এটা হল এক প্রচণ্ড মানসিক সংগ্রামের ফলশ্রুতি। উদাহরণ স্বরূপ বলব আমার যে রাগ হয় না তা নয়। তবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার মনের ভাবকে আমি স্ববশে রাখতে পেরেছি। পরিণাম যাই হোক না কেন, সর্বদা আমার ভিতর স্বেচ্ছায় এবং অবিরতভাবে অহিংস বিধানের অনুসরণ করার একটা সচেতন সংগ্রাম চলতে থাকে। আর এ জাতীয় সংগ্রামের ফলে মানুষ আরও শক্তিশালী হয়। অহিংসা সবলের অস্ত্র। দুর্বলের কাছে সহজেই এটা প্রতারণার রূপ নিতে পারে। ভয় এবং প্রেম পরস্পরবিরোধী শব্দ। প্রতিদানে কি পাবে একথা চিন্তা না করেই প্রেম দেবার আনন্দে উজ্জ্বল। ব্যক্তির মত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গেও প্রেম যুদ্ধ করে এবং শেষ অবধি অপর সব প্রবণতার উপর জয়ী হয়। আমার সহকর্মী ও আমার নিজের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এই যে সত্য ও অহিংসাকে আমার যদি জীবনের বিধান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই তাহলে সকল সমস্যার সমাধানের পথ বেরোয়। কারণ আমার কাছে সত্য ও অহিংসা একই মুদ্রার দুই পিঠ।

আমরা স্বীকার করি বা না করি মাধ্যাকর্ষণের বিধানের মতই প্রেমের বিধান কাজ করবে। বিজ্ঞানী যেমন প্রকৃতির বিধানকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেন তেমনি কোন ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক যথার্থতা সহকারে প্রেমের বিধানের প্রয়োগ করতে পারলে অধিকতর বিস্ময়কর চমৎকার সৃষ্টি করতে পারবেন। কারণ বিদ্যুৎ ইত্যাদি ভৌতিক প্রাকৃতিক শক্তির চেয়ে অহিংসার শক্তি নিঃসন্দেহে অধিকতর বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম সম্ভাবনাপূর্ণ। আমাদের জন্য যাঁরা প্রেমের বিধানের আবিষ্কার করেন আধুনিক যে কোন বিজ্ঞানীর তুলনায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। শুধু আমাদের অনুসন্ধান সুদূরপ্রসারী না হওয়ায় এর কার্যকুশলতা আমাদের প্রত্যেকের চোখে পড়ছে না। আমার এই বিশ্বাসকে যদি মতি-ভ্রান্তি বলেন তবে তাই সই; কিন্তু আমি কাজ করে চলেছি এরই আওতায়। আর যতই আমি এই বিধান নিয়ে কাজ করি জীবনে এবং বিশ্ববিধানে ততই আনন্দ অনুভব করি। এ আমাকে একটা অব্যক্ত শান্তি দেয় এবং এর ফলে প্রকৃতির রহস্যের এমন একটা তাৎপর্য আমি অনুভব করি যা প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

দি নেশনস ভয়েস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৯-১০

॥ ৯০ ॥

ভবিষ্যৎ

আমেরিকা থেকে জনৈক বন্ধু নিম্নোদ্ধৃত দুটি প্রশ্ন করেছেন :

১। ধরে নেওয়া গেল যে সত্যাগ্রহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ; কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে এই আদর্শ গৃহীত হবার সম্ভাবনা কতটুকু? অর্থাৎ শক্তিশালী ও স্বাধীন ভারতবর্ষ আত্মরক্ষার জন্য সত্যাগ্রহের উপর ভরসা রাখবে না যত আত্মরক্ষামূলক চারিত্রধর্মের হোক না কেন সেই সনাতন যুদ্ধ ব্যবস্থারই শরণ নেবে? নিছক তাত্ত্বিক সমস্যা হিসাবে কথাটিকে ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় : সত্যাগ্রহকে কি কেবল একটি প্রচণ্ড লড়াইরূপে স্বীকার করে নেওয়া হবে যে লড়াই-এ শহীদ হবার সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না এটি এমন একটি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের হাতিয়ার হবে যার শহীদ হবার প্রয়োজন নেই বা ঐ নীতি অনুসারে আচরণ করার অবকাশও নেই?

২। স্বাধীন ভারতবর্ষ যদি রাষ্ট্রনীতি হিসাবে সত্যাগ্রহকে গ্রহণ করে তাহলে অপর এক সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণের মুখে কি ভাবে ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা করবে? নিছক তাত্ত্বিক সমস্যা হিসাবে প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় : সীমান্তে আক্রমণকারী সৈন্যদলের সম্মুখীন হবার জন্য সত্যাগ্রহীর কার্যবিধি কোন্ ধরনের হবে? বর্তমানে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদীরা এবং ইংরেজ সরকার এক সাধারণ কার্যক্ষেত্রের বাসিন্দা। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, না আক্রমণকারী দেশ দখল না করা পর্যন্ত সত্যাগ্রহী তাঁর কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করা মুলতবী রাখবেন?

প্রশ্নগুলি নিঃসন্দেহে তাত্ত্বিক। তাছাড়া প্রশ্নগুলি করাও হয়েছে অসময়ে। কারণ অহিংসার সমস্ত কলা-কৌশল আমি এখনও আয়ত্ত করতে পারি নি। এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলেছে। এখনও তা পরিণত অবস্থায় পৌঁছায় নি। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রকৃতি এমন যে একসঙ্গে এক পা এগিয়েই সন্তুষ্টি মানতে হবে। দূরের বস্তু নিয়ে তাঁর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তাই প্রশ্নগুলির আমি যে উত্তর দেব তা আনুমানিক হতে বাধ্য।

সত্যি কথা বলতে কি স্বাধীনতা অর্জনের আমাদের সংগ্রাম নির্ভেজাল অহিংসামূলক নয় এবং একথা আমি ইতিপূর্বেও বলেছি।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি এই কথা বলব যে বর্তমানে আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে রাষ্ট্রনীতি হিসাবে অহিংসা গৃহীত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারতবর্ষ যদি অহিংসাকে তার নীতি হিসাবে স্বীকার না করে তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে।

তবে অহিংসার শক্তি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমত আমি এখানে ব্যক্ত করতে পারি। আমি বিশ্বাস করি যে অধিকাংশ জনসাধারণ যদি অহিংস হয় তাহলে কোন রাষ্ট্রকে অহিংস পদ্ধতিতে চালানো যেতে পারে। আমি যতদূর জানি ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যে দেশের এই রকম রাষ্ট্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। এই বিশ্বাস নিয়েই আমি আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি। তাই যদি ধরে নেওয়া যায় যে ভারতবর্ষ নিছক অহিংসার সহায়তায় স্বাধীনতা পেল তাহলে সেই পদ্ধতিতে ভারত তা রক্ষাও করতে পারবে। অহিংসানিষ্ঠ মানুষ বা সমাজ বাহ্য আক্রমণের আশঙ্কা করে না বা তার পথ রাখে না। পক্ষান্তরে এ জাতীয় ব্যক্তি বা সমাজ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে কেউ তাঁদের বিরক্ত করবে না। তবে সেই শোচনীয় ব্যাপার যদি ঘটেই তাহলে অহিংসার সামনে দুটি পথ খোলা আছে। আক্রমণকারীকে দেশ দখল করতে দেওয়া হবে কিন্তু তার সঙ্গে অসহযোগ করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরে নেওয়া যাক যে নীরোর কোন আধুনিক সংস্করণ ভারতের উপর এসে পড়লেন। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তাঁকে আসতে দেবেন; কিন্তু একথা জানিয়ে দেবেন যে জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি কোন সহায়তা পাবেন না। রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সেই নীরোর কাছে নতিস্বীকার করার থেকে বরং মৃত্যুবরণ বাঞ্ছনীয় মনে করবেন। দ্বিতীয় পন্থা হল জনসাধারণকে অহিংস প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে তাঁদের দ্বারা অহিংস প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। নিরস্ত্রভাবে তাঁরা আক্রমণকারীর কামানের খোরাক হবেন। উভয় পদ্ধতিতে এই বিশ্বাস অন্তর্নিহিত যে এমন কি নীরোও হৃদয়হীন হন। আক্রমণকারীর ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করার পরিবর্তে অগণিত নর-নারী সারি সারি দাঁড়িয়ে কেবল প্রাণই দিচ্ছেন এই অচিন্ত্যনীয় দৃশ্য দেখে শেষ অবধি তাঁর এবং তাঁর সৈন্যদলের হৃদয় দ্রবীভূত হবেই। সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে গেলে প্রাণের যে ক্ষয়-ক্ষতি হত এ পন্থায় বাস্তবপক্ষে সম্ভবতঃ তার চেয়ে বেশী ক্ষয়-ক্ষতি

হবে না। আর অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রতিরক্ষার জন্য অন্যবিধ যে সব ব্যয় হয় তা তো এ পন্থায় হবেই না। জনসাধারণ যে অহিংস প্রশিক্ষণ পাবেন তার দ্বারা তাঁদের নৈতিক স্তর অবিশ্বাস্য রকমের ঊর্ধ্বগামী হবে। সশস্ত্র যুদ্ধে যে বীরত্ব দেখানো হয় এ জাতীয় অহিংস প্রতিরোধকারী নর-নারীরা তার থেকে অনেক উঁচুদরের ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখাবেন। উভয় ক্ষেত্রেই সাহসিকতার পরিচয় মারায় নয়, মরায়। সর্বশেষে এই কথা বলব যে অহিংস প্রতিরোধে পরাজয় বলে কোন কথা নেই।

এ জাতীয় ঘটনা অতীতে কখনও ঘটে নি বললে আমার কথার জবাব হবে না। আমি কোন অসম্ভব চিত্র অঙ্কন করি নি। আমি যে ধরনের অহিংসার কথা উল্লেখ করেছি সে জাতীয় ব্যক্তিগত অহিংসার উদাহরণে ইতিহাস পূর্ণ। একথা বলার বা ভাবার কোন কারণ নেই যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলে এক দল নর-নারী গোষ্ঠী বা জাতি হিসাবে অহিংস আচরণ করতে পারবে না। প্রত্যুত মানবজাতির অভিজ্ঞতার সারমর্ম হল এই যে কোন না কোন উপায়ে মানুষ বেঁচে থাকে। এই তথ্য থেকে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে প্রেমশক্তিই মানবসমাজের অধিনায়ক। হিংসা অর্থাৎ ঘৃণা যদি আমাদের অধিরাজ হত তবে বহুপূর্বেই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। তবুও দুঃখজনক ব্যাপার হল এই যে তথাকথিত সভ্যমানুষ ও জাতিসমূহ এইভাবে আচরণ করেন যে সমাজের ভিত্তি যেন হিংসাশ্রিত। প্রেমই জীবনের সর্বোচ্চ ও একমাত্র বিধান—এই কথা প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আমার অনির্বচনীয় আনন্দ হয়। এর বিপরীত বহু সাক্ষ্য-প্রমাণেও আমার বিশ্বাস বিচলিত হয় না। এমন কি ভারতের মিশ্র অহিংসাও আমার বক্তব্যের সমর্থক। তবে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে এটা পর্যাপ্ত না হলেও বন্ধুভাবাপন্ন সমালোচককে সহৃদয়তা সহকারে এ ব্যাপারে দেখতে প্রবুদ্ধ করার পক্ষে এটা যথেষ্ট।

হরিজন, ১৩-৪-১৯৪০